প্রথম অমনিবাস সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রকাশক:
ময়ূখ বসু,
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ (ফোন : ৩৪-৩৮২৫)

মুদ্রক :
অদ্রীশ বর্ধন,
দীপ্তি প্রিন্টার্স,
৪ রামনারায়ণ মতিলাল লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০১৪ (ফোন : ৩৫-১৯৬৫)

প্রচ্ছদ : বিমল দাশ

দাম : আঠাশ টাকা

১ম খণ্ডের সূচি
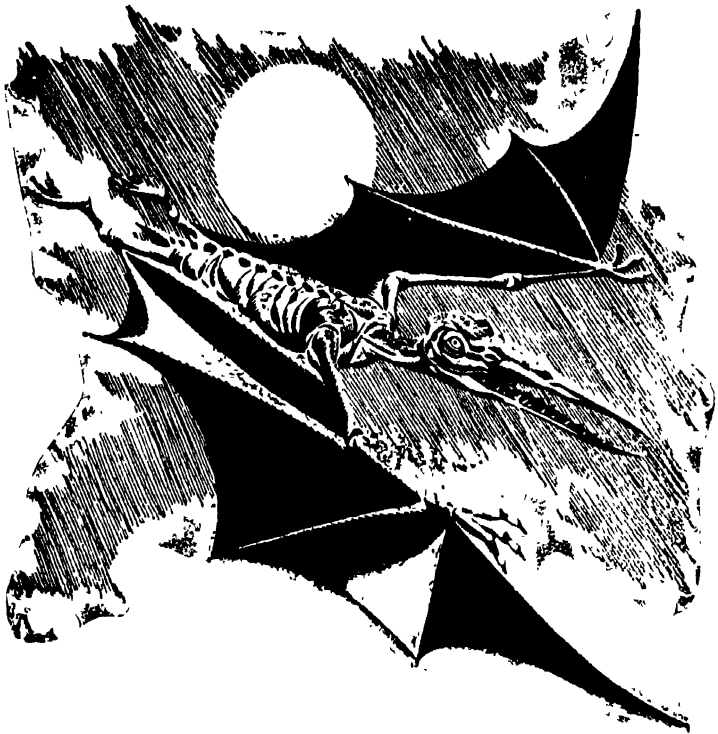
আচম্বিতে চাঁদের সামনে দিয়ে স্বয়ং শয়তানকে উড়ে যেতে দেখে রাইফেল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হয়েছিল প্রহরী। ।পৃ ২৫৫

ডয়াল এবং চ্যালেঞ্জার

স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল (১৮৫৯-১৯৩০) মূলতঃ স্মরণীয় শার্লক হোমসের স্রষ্টা হিসেবে, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না তিনি আরও গ্রন্থ রচনা করে গেছিলেন।

শার্লক হোমস্ চরিত্র তাঁর অমর সৃষ্টি সন্দেহ নেই, কিন্তু সৃষ্টি করার প্রতিভা যাঁর থাকে, তিনি কখনোই এক চরিত্র নিয়ে সারা জীবন গল্প লিখে যেতে পারেন না। নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা তাঁকে টেনে নিয়ে যায় নিত্যনতুন চরিত্রের মাধ্যমে বহুবিচিত্র কাহিনীর মধ্যে। অসাধারণ প্রাণবন্ত এবং পরিশ্রমী ছিলেন ডয়াল, তাই যেন শার্লক হোমস্ সৃষ্টি করেই তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। বেশ কিছু চমকপ্রদ সুবৃহৎ ঠাসবুনুনি কাহিনী রচনা করে গেছিলেন। আধুনিক যুগের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লেখেন 'দ্য ট্র্যাজেডী অফ কোরোসকো' (১৮৯৮), 'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড' (১৯১২) এবং 'দ্য পয়জন বেল্ট' (১৯১৩)। এ ছাড়াও লেখেন অসংখ্য ছোট বড় রহস্য গল্প, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, বীভৎস উপাখ্যান, কৌতুকাবহ আখ্যান এবং নিছক ফ্যানট্যাসি গল্পকল্প। লিখেছেন 'প্রেততত্ত্ববাদ ইতিহাস'—যে বিষয়টিতে উনি নিজেই উত্তরোত্তর আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, ল্যাণ্ড অফ মিস্ট' নামক প্রেততত্ত্ব সম্পর্কিত ভয়ালভয়ংকর অথচ কৌতুকী মেজাজের অসাধারণ উপন্যাস, দুটি নাটক এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর অনেক পুস্তক ও পুস্তিকা। যা কিছু লিখেছেন, তার মধ্যেই থেকেছে তাঁর উষ্ণ প্রাণের ছোঁয়া, অবিচল দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ, খেলাধূলায় প্রীতি এবং সাহিত্যিক ভণ্ডামির একেবারেই অনুপস্থিতি। চমক সৃষ্টি করতে চান নি বলেই মৃত্যুর ৫২ বছর পরেও আজও তাঁর সাহিত্য-কীর্তি দেশে বিদেশে সমাদৃত। স্যার উইনস্টন চার্চিল বুঝি সেই কারণেই লিখেছিলেন—'শার্লক হোমসের সব কাহিনী আমি পড়েছি তো বটেই, কিন্তু ডিটেকটিভ গল্পের চেয়েও আমার যা বেশী ভাল লেগেছে, তা তাঁর সুমহান ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো—শার্লক হোমসের মতই এই নভেলগুলি অবশ্যই স্থান করে নিয়েছে ইংরেজি সাহিত্যে।'

কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শার্লক হোম্স্ চরিত্র নিয়েই সারা জীবন ব্যাপৃত থাকার মত সৃজনীশক্তির দৈন্য তাঁর মধ্যে ছিল না। স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শার্লক কাহিনী যখন তাঁকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এনে দিয়েছে, তখনও তিনি নাম-যশের মোহে সৃষ্টির উন্মাদনা থেকে নিজেকে মুক্ত করেননি। শার্লক তাঁকে ক্লান্ত করে তোলে, খ্যাতির বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হয়ে বিশ্ববিখ্যাত চরিত্রকে নিধন করেন 'দ্য মেময়্যার্স' গল্পসমগ্রের শেষ

গল্পে। কিন্তু শার্লক-ভক্তদের তাগিদে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হয় তাকে।

তাই যখন শার্লক-অনুরাগীদের তাগিদে লিখলেন 'দ্য হাউণ্ড অফ দ্য বাস্কারভিল্‌স্' (১৯০২), 'দ্য রিটার্ন অফ শার্লক হোম্‌স্' (১৯০৪), দ্য ভ্যালী অফ ফিয়ার' (১৯১৫), 'হিজ লাস্ট বো' (১৯১৮) এবং 'দ্য কেসবুক অফ শার্লক হোম্‌স্' (১৯২৭)—তারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁর নিজের মনের সৃষ্টির চাহিদা মিটিয়ে চললেন আশ্চর্য জীবন্ত চরিত্রের পর চরিত্র সৃষ্টি করে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের জন্ম হয় তখনি—১৯১২ সালে—'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড' উপন্যাসে।

চ্যালেঞ্জার নামটা নিয়ে কিঞ্চিৎ গবেষণার প্রয়োজন আছে। এডিনবরা ইউনিভার্সিটির লেকচারার ডক্টর জোসেফ বেল-য়ের ব্রিলিয়ান্ট যুক্তি-পদ্ধতি যেমন শার্লক হোম্‌স্ চরিত্রের আইডিয়া এনে দিয়েছিল ডয়ালের মস্তিষ্কে, কে জানে ঠিক তেমনি ভাবেই বৃটিশ পরিচালিত সুবিখ্যাত 'চ্যালেঞ্জার অভিযান' থেকেই চ্যালেঞ্জার চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন কিনা। এ অভিযান গিয়েছিল সমুদ্রের অতল রহস্যের সন্ধানে। চ্যালেঞ্জার একটা কাঠের রণতরী (২,৩০৭ টন)—বৃটিশ নৌবাহিনীর পরিচালনায় ভূগোলকের সর্বত্র খোলা সমুদ্র বক্ষে সন্ধান চালিয়ে গিয়েছিল জাহাজটি। চ্যালেঞ্জারের কৃতিত্বের মূলে যিনি ছিলেন, তিনিও এডিনবরা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক—প্রফেসর চার্লস ওয়াইভিল থমসন (১৮৩০-৮২)। অভিযানের সায়েন্টিফিক ডিরেক্টর ছিলেন ইনিই। তাঁর দৈহিক বর্ণনা এবং চরিত্রের বৃত্তান্ত পাওয়া গেলে মিলিয়ে নেওয়া যেত 'লস্ট ওয়ার্ল্ড'-য়ের দুর্দান্ত, দাম্ভিক, প্রতিভাধর, গরিলা সদৃশ প্রফেসর জর্জ চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে। ১৮৮০ সালে পঞ্চাশ খণ্ডে 'চ্যালেঞ্জার রিপোর্ট' প্রকাশ করেছিলেন থমসন এবং সমুদ্র সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী, অনেক ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের অবসান ঘটিয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রফেসর জর্জ চ্যালেঞ্জারের জন্ম হয় ১৯১২ সালে—অনাবিষ্কৃত স্থলভূমিতে বিদ্যমান বহু বিস্ময়ের নমুনা সংগ্রহ করে তৎকালীন কট্টর বৈজ্ঞানিকদের ভ্রান্তি নস্যাৎ করার অভিপ্রায়ে।

'লস্ট ওয়ার্ল্ড' এক কথায় একটা ক্লাসিক। ডয়াল তাঁর মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে। ইতিহাস, অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ, বিভীষিকা, রহস্য, কৌতুক—সবই যেন পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে এই একটি মাত্র গ্রন্থে। সেই সঙ্গে প্রফেসর জর্জ চ্যালেঞ্জার ঠাঁই করে নিয়েছে বিশ্বসাহিত্যে। চ্যালেঞ্জার গোয়েন্দা নন শার্লকের মত—তিনি বৈজ্ঞানিক এবং তাঁর প্রতিটি কাহিনীই বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার উপাখ্যান। বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠ দূরকল্পনার অনুপম সাহিত্য কীর্তি। 'লস্ট ওয়ার্ল্ড'-য়ে তিনি বলেছিলেন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা আজও আছে এই পৃথিবীতে—তারা আছে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকায়। তিনি কি কল্পবিজ্ঞানীর মতই দূর-ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন? ১৯১২ সালে উনি যা বলেছিলেন, তারই কি সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না ৩.৮.১৯৮১-তে প্রকাশিত

'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার একটি খবরে? খবরটায় প্রকাশ, অগাস্ট মাসের শেষে তিন আমেরিকান অনুসন্ধানকারীর একটা দল রওনা হচ্ছে কঙ্গোর গভীর অভ্যন্তরে—প্রকাণ্ড, জলজ্যান্ত ডাইনোসরের সন্ধানে, যাকে ওখানকার লোকেরা বলে 'মোকেলেমবেমবে'। এর আগেও ১৯৭৮ সালে ফ্রান্সের একটা দল গেছিল কঙ্গোতে ডাইনোসর খুঁজতে, কিন্তু আজ অবধি তাদের আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। শিকাগো ইউনিভার্সিটির একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, মিঃ রয় পি ম্যাকেল বলেন যে এই অনুসন্ধান অনেক সময়সাপেক্ষ বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। তিনি একবার কঙ্গোতে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় লোকদের অনেক বিদেশী জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখান, যেমন, বুনো ভালুক ইত্যাদি—কিন্তু তারা সে সব জন্তু চিনতে পারেনি। এর পর তিনি তাদেরকে একটা ব্রনটোসরাসের ছবি দেখাতেই বলে ওঠে—এ-জন্তু তারা দেখেছে বৈকি। আরও বলে যে, এ-জন্তু বেশীর ভাগ সময়েই জলে থাকে, আর ভোরবেলা অথবা সন্ধ্যেবেলা উঠে আসে গাছপাতা খাবার জন্যে! বিজ্ঞানীরা বলেন, এই অঞ্চলের কোনো সঠিক মানচিত্র এবং অনুসন্ধান আজ অবধি করা হয়নি এবং গত সাত কোটি বছর ধরে জায়গাটা প্রায় একই রকম রয়ে গেছে। এখানে 'বিঙ্গা' পিগমীরা বাস করে। কিছুদিন আগে এ-অঞ্চলে ৩৬-ইঞ্চি লম্বা নখওয়ালা একটা অদ্ভুত পায়ের ছাপ পাওয়া যায়—তার ফটোও তোলা হয়েছে। অগাস্টের এই অভিযানে মিঃ ম্যাকেলের সঙ্গে যাচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়ার এক ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার এবং একজন খ্রীশ্চান মিশনারী।

তার্কিকরা প্রশ্ন তুলতে পারেন, কঙ্গো তো আফ্রিকায়—আর আমাজন তো দক্ষিণ আমেরিকায়—তাহলে ওয়ালকে সার্থক কল্পবিজ্ঞানী বলা কি সঙ্গত হবে? তাঁদের অবগতির জন্যে জানানো যেতে পারে যে, মহাদেশগুলো যে এককালে গায়ে গায়ে লেগেছিল, এই অনুমিতির সমর্থনে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আলফ্রেড উইজিনার নামে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক লিখেছিলেন —'দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের বিপরীত উপকূলগুলো পরীক্ষা করলে অবাক হতে হয় একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখে—ব্রেজিল আর আফ্রিকার উপকূল রেখার অদ্ভুত সাদৃশ্য! ব্রেজিল-উপকূলের যেখানে যেখানে ঠেলে বেরিয়ে আছে, তার প্রতিটি যেন খাপে খাপে বসে যায় উল্টোদিকের আফ্রিকা উপকূলের তোবড়ানিগুলোর মধ্যে—একই আকার উভয়দিকের উপকূলেই!'

আরও একটা তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন উইজিনার। দক্ষিণ আমেরিকা আর আফ্রিকার প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী এবং উদ্ভিদদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা। এই থেকেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এল যে কোনো এককালে গায়ে গায়ে লেগেছিল এই দুই মহাদেশ—পরে ভেসে সরে গেছে দূরে। তাঁর এই তত্ত্বটির নাম দিলেন—মহাদেশ স্থানান্তকরণ তত্ত্ব। ওয়াল কি খবর রাখতেন না এই তত্ত্বের?

প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞানী আর্থার সি ক্লার্ক-ও লিখেছেন (মিস্টিরিয়াস ওয়ার্ল্ড, ১৯৮১)—'একদিন মহাসমুদ্রগুলোর অতল থেকে উঠে আসবে এমন সব বিস্ময় যা জীববিজ্ঞানীদের তাজ্জব করে ছাড়বে (পৃঃ৮৩)।' বহু বছর ধরেই পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা রকমের বিরাটদেহী সরীসৃপদের ঘটনা-সংকলনের টীকায় আছে তাঁর এই মন্তব্য।

বাস্তবিকই, স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল সৃষ্ট চরিত্রদের প্রথম সারিতে রয়েছে প্রফেসর জর্জ চ্যালেঞ্জার, শার্লক হোম্স্ এবং ডক্টর ওয়াটসন। একদা এক আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সত্যিই অভিযান পাঠিয়েছিল 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' আবিষ্কার করার জন্যে! এটা কিন্তু একটা ঘটনা—কল্পনা নয়। চ্যালেঞ্জারের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর সঙ্গে এইচ.জি-ওয়েলসের সায়েন্টিফিক নভেলের সাদৃশ্য আছে কোথাও না কোথাও—বর্তমান যুগে এই সাহিত্যকেই বলা হচ্ছে সায়েন্স-ফিকশন। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা পার্থক্যও আছে। ডয়ালের চ্যালেঞ্জার কাহিনী নিরেট বৈজ্ঞানিক ঘটনাভিত্তিক—সম্ভাবনাভিত্তিক নয়। পাকা গল্পকারের মত তাঁর কল্পনা এবং শ্বাসরোধী উৎকণ্ঠা পাঠকপাঠিকাদের নিবিষ্ট করে রাখে ঘন্টার পর ঘন্টা। গল্প বলার ঝোঁকে গল্পের গরুকে গাছে উঠতে দেন না কক্ষনো—শক্ত যুক্তি আর নিটোল চরিত্রায়ন বিস্মৃত হন না একেবারেও। দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর অ্যাডভেঞ্চার-অভিযান-সমগ্রে রইল রুক্ষ কিন্তু সরল, দুর্দান্ত অথচ স্নেহপরায়ন, ভয়ংকর উগ্র অথচ কৌতুকী চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে কুঁদুলে প্রফেসর সামারলির নিরন্তর কান ঝালাপালা করা প্রচণ্ড কলহের মজাদার বিবরণ, সেই সঙ্গে গায়ের লোম খাড়া করার মত বিপদ আর বিভীষিকার উৎকণ্ঠাময় ঘটনা পরম্পরা—যা সম্ভবত ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে তাঁর 'হোয়েন দ্য ওয়ার্ল্ড স্ক্রীম্‌ড্' নামক অবিস্মরণীয় কাহিনীতে।

সব শেষে জানাই, সব মানুষের মত চ্যালেঞ্জারও পাল্টে গিয়েছেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, শোকেতাপে জর্জরিত হওয়ার পরে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর 'ল্যাণ্ড অফ মিস্ট' উপন্যাসে তাই দেখা যায় আরেক চ্যালেঞ্জারকে—'লস্ট ওয়ার্ল্ড'-'য়ের প্রচণ্ডতা সেখানে অনুপস্থিত। চরিত্রের এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের দিকে সযত্নে নজর রাখা হল পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের সময়ে।

অদ্রীশ বর্ধন

লস্ট ওয়ার্ল্ড
(অজ্ঞাত জগৎ)

১॥ কীর্তিমান হওয়ার সুযোগ বেষ্টিত আমরা সকলেই

গ্ল্যাডিস মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ। কিন্তু ওর পিতৃদেব মিস্টার হাঙ্গারটনের মত অতিশয় অবিচক্ষণ পুরুষ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। ফুরফুরে পালকওলা অপরিচ্ছন্ন কাকাতুয়া বললেই চলে। এমনিতে প্রকৃতি বড় মধুর—খুঁত নেই কোথাও। কিন্তু নিজের নির্বোধ সত্তার মধ্যেই নিমগ্ন অষ্টপ্রহর। এই রকম একখানা শ্বশুর আমার হবে, এই কল্পনাটাতেই সরে আসতে ইচ্ছে হত গ্ল্যাডিসের সান্নিধ্য থেকে। হপ্তায় তিনবার আমি চেসনাটস্ যাই শুধু ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গসুখের লালসায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ ধাতুনির্মিত মুদ্রার বৈধ প্রচলন সম্বন্ধে তাঁর মতামত শ্রবণ করতে—এই রকম একটা ধারণা যে তাঁর মধ্যে শেকড় গেড়ে বসে গিয়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই আমার। মুদ্রা সম্পর্কিত এই বিষয়টিতে তিনি পণ্ডিত।

বদ্‌মুদ্রা সৎ মুদ্রাকে কিভাবে হটিয়ে দেয়, রুপোর বাজার দর কি উওয়া উচিত, টাকার মূল্য কমছে কেন এবং মুদ্রা বিনিময়ের সঠিক মান কি হলে ভাল হয় এই সব ব্যাপারে একঘন্টা কি তারও বেশী তাঁর এক ঘেয়ে বকবকানি শুনলাম সেই সন্ধ্যায়।

তারপর বেশ উত্তেজিত ভাবে বললেন—'ধরো, এই মুহূর্তে যদি পৃথিবীর সব দেনা মিটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে এবং এক্ষুনি পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করা হয়, বলো তো তখন কি ঘটবে?'

যা ঘটবে, তা এতই সুস্পষ্ট যে বেশ প্রত্যয় সহকারেই জবাবটা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমি তাহলে পথে বসব। শুনেই উনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। আমার স্বভাবজাত লঘুতার জন্যে বিস্তর বকাবকি করলেন। এমতাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা অসম্ভব, তা উপলব্ধি করলেন। এবং নক্ষত্র বেগে ঘর থেকে উধাও হলেন ফ্রীম্যাসনদের একটা মিটিংয়ে যোগদানের অভিলাষে।

অবশেষে একলা পেলাম গ্ল্যাডিসকে। এসে গেল জীবনের এবং ভাগ্যের এক সংকট মুহূর্ত। এই মুহূর্তটির জন্যেই সারা সন্ধ্যেটা ওৎ পেতে ছিলাম অনেকটা সংকেতের প্রতীক্ষায় সৈনিক পুরুষের মত—যে সংকেত আশা নিরাশায় দুলিয়ে তুলতে পারে হিয়া-মনকে—দুরাশা জয়ের আশা এবং প্রত্যাখ্যানের ভীতি একে একে তাই অস্থির করে তুলেছিল মনটাকে।

লাল পর্দার পটভূমিকায় বসেছিল গ্ল্যাডিস। গর্বিত নিখুঁত দেহরেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল লাল পটভূমিকায়। সুন্দরী নিঃসন্দেহে! এমন রূপ, এমন দেহসুষমা চোখে পড়ে কদাচিৎ। অথচ রূপের ডালি সারা দেহে সাজিয়ে নিয়েও এত দূরত্ব বজায় রাখে কেন ভেবে পাই না! গভীর বন্ধুত্ব কিন্তু গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে। 'গেজেট' পত্রিকায় কাজ করি দুজনেই। সহকর্মী সাংবাদিক আরও আছে এ পত্রিকায়। কিন্তু ওর মত সাথী আর আমি পাইনি। মনখোলা, আন্তরিক অথচ একেবারেই যৌনাবেগ রহিত। যে মহিলা বেশী প্রাণখোলা আর অতি সহজ হয়ে মিশতে পারে আমার সঙ্গে, আমার সহজাত অনুভূতিগুলো একেবারেই তার বিরুদ্ধে। জানি, জানি, কোনো পুরুষের পক্ষে এটা একটা অভিনন্দনের ব্যাপার নয়। সত্যিকারের যৌন অনুভূতি জাগ্রত হলেই কুণ্ঠা আর অবিশ্বাস তার সঙ্গে আসবেই। প্রেম আর দাঙ্গাহাঙ্গামা যে যুগে হাতে হাত মিলিয়ে চলত, এই অনুভূতি সেই যুগেরই উত্তরাধিকার বলা চলে। যৌন আবেগের লক্ষণই হল লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে থাকা, আড়চোখে চাওয়া, কণ্ঠস্বরের জড়তা, শরীরের আড়ষ্টতা। অকপট চাহনি আর খোলাখুলি জবাব কখনোই অন্তরের যৌনাবেগের সিগন্যাল নয়। আমার এই ছোট্ট জীবনে তা সত্ত্বেও কিন্তু অনেক শিক্ষা হয়ে গেছে—জাতিগত স্মৃতি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি এবং তাকে নাম দিয়েছি সহজাত অনুভূতি।

ষোল আনা মেয়েলী গুণপনায় ঠাসা আমার বান্ধবী এই গ্ল্যাডিস মেয়েটি। কেউ কেউ অবিচার করে তার প্রতি। সে নাকি শীতল এবং রুক্ষ। এ রকম ধারণাও কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। ওর সুঠাম ব্রোঞ্জ মুখচ্ছবি, পেলব ত্বক, অবিকল প্রতীচ্যের মেয়েদের মতই গাত্রবর্ণ, দাঁড়কাকের মিশমিশে বর্ণকেও হার মানানোর মত মেঘবরণ কেশরাশি, বড় বড় টলটলে দুটি চোখ, পুরন্ত অথচ অপরূপ অধরোষ্ঠ—পুরুষের অন্তরে জোয়ার সৃষ্টি করার সব উপাদানই কি বর্তমান নয় এ হেন রূপ বর্ণনার মধ্যে? কিন্তু অত্যন্ত বিষণ্ণভাবেই বলব, আজও ওর অন্তরের যৌনাবেগের

ছিটেফোঁটাও নিজের প্রতি আকর্ষণ করতে পারিনি। কপালে যাই থাকুক না কেন, এই উৎকণ্ঠার অবসান আজ ঘটাবোই—এই সন্ধ্যা সমাপ্ত হওয়ার আগেই। এস্পার ওস্পার করব—এই সংকল্প নিয়েই তো এতক্ষণ বসে থাকা। প্রত্যাখ্যান করে করুক। ভাই হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে বিমুখ প্রেমিক হওয়াও বরং অনেক ভালো।

এই পর্যন্ত ভেবে নিয়ে যেই দীর্ঘ অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করতে যাচ্ছি, অমনি ছিদ্রান্বেষী, মর্মভেদী, দুটো কৃষ্ণ চক্ষু নিবদ্ধ হল আমার ওপর। স্মিত তিরস্কারের ভঙ্গিমায় গর্বিত মাথা নাড়িয়ে বললে গ্ল্যাডিস—'নেড, আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি, বিয়ের প্রস্তাব করার মতলব আঁটছো। ঐ কর্মটি করতে যেও না। বেশ তো আছি দুজনে।'

চেয়ারটা আরও একটু কাছে সরিয়ে নিলাম।

বললাম অকৃত্রিম বিস্ময়ে—'কি করে জানলে বিয়ের প্রস্তাব করতে যাচ্ছি?'

'মেয়েরা অন্তর্যামী হয়, এটাও কি জানো না? এই দুনিয়ার কোনো মেয়েকে হঠাৎ কিছু বলে চমকে দেওয়া কি যায়? নেড, আমাদের এই বন্ধুত্ব কিন্তু বড় মধুর, বড় আনন্দের! সম্পর্কটা নষ্ট করো না! তোমার আর আমার মত দুটি তরুণ তরুণীর মুখোমুখি বসে প্রাণ খুলে কথা বলে যাওয়ার মত দৃষ্টান্ত আর কি তুমি পাবে?'

'তা না পেতে পারি, তবে মুখোমুখি বসে তোমার সঙ্গে কেন—স্টেশন মাষ্টারের সঙ্গেও তো কথা বলতে পারি।' গুরুতর এই প্রসঙ্গের মধ্যে বিশেষ ঐ অফিসারটির অবতারণা ঘটিয়ে বসলাম কেন, আজও তা আমার কাছে একটা রহস্য। কিন্তু হুট করে ভদ্রলোক কথার মাঝে ঢুকে পড়ায় একচোট হেসে নিলাম দুজনেই। 'আমি চাই দু-বাহুর মধ্যে তোমাকে বাঁধতে, তোমার ঐ অনিন্দ্য সুন্দর মাথাটি আমার বুকের ওপর রাখতে। গ্ল্যাডিস, গ্ল্যাডিস, আমি চাই—'

আমার চাহিদার কিছুটা কাজে রূপান্তরিত করতে চলেছি, তা আঁচ করেই কিন্তু তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল মনের মানুষটি।

বললে—'দিলে তো সব বারোটা বাজিয়ে! কি সুন্দর স্বাভাবিক ছিল পরিবেশটা, ভণ্ডুল করে দিলে তুমি। কি কপাল আমার! সংযম জিনিসটা কবে আসবে তোমার মধ্যে?'

'আমি কি জোর করে করেছি? যা স্বাভাবিক, যা প্রাকৃতিক—তাই ঘটেছে! এরই নাম ভালোবাসা!'

'ভালোবাসা দু-তরফেই হলে তার একটা মানে দাঁড়ায়। আমি আজও বুঝতেই পারলাম না ভালোবাসা কাকে বলে।'

'সেকী! ভালবাসা—বাসতে তোমাকে হবেই! তোমার অমন রূপ, অমন সুন্দর অন্তর প্রকৃতি! গ্ল্যাডিস, ভালবাসার জন্যেই সৃষ্টি তোমার! ভাল তোমাকে বাসতেই হবে!'

'সময় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় প্রত্যেককেই।'

'আমাকে ভালবাসতে আপত্তিটা কী? আমার চেহারাটা?'

ঈষৎ হেঁট হল গ্ল্যাডিস। সুন্দর সুঠাম হাতটা বাড়িয়ে আমার মাথাটাকে একটু হেলিয়ে ধরল পেছন দিকে। কড়িকাঠের দিকে ফিরোনো আমার মুখখানার দিকে অত্যন্ত প্রশান্ত নিগূঢ় হাসি-হাসি চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপরে বললে—'উঁহু, চেহারায় আপত্তি নেই। তোমার স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে ছলচাতুরী নেই—সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারি, আপত্তি সেক্ষেত্রেও নেই। ব্যাপারটা আরো গভীরের।'

'আমার চরিত্র?'

প্রবলবেগে মাথা নাড়ালো গ্ল্যাডিস।

প্রবলতর বেগে আমি বললাম—'চরিত্র শোধরাতে তো আমি চাই! কিন্তু কিভাবে গ্ল্যাডিস? কিভাবে? বসো, আগে বসো! না বসলে একটা কথাও বলব না!'

কৃষ্ণতার দুই চোখে যুগপৎ অবিশ্বাস আর বিস্ময়বোধ ভাসিয়ে নির্নিমেষে আমার পানে চেয়ে রইল গ্ল্যাডিস। আমার প্রতি ওর সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের চাইতে অনেক জটিল, অনেক অস্বস্তিকর এই চাহনি। বর্ণনাটা আদিম পশুবৎ বর্বর অসভ্য নিঃসন্দেহে—কিন্তু আমি নিরুপায়। ঠিক যেমনটি সেই মুহূর্তে দেখেছি, লিখছিও সেই ভাবে! হয়ত আমারই ভুল—অদ্ভুত এই ধারণাটা আমারই চারিত্রিক দুর্বলতার লক্ষণ। যাই হোক, আমার কথা ও শুনলো. উপবিষ্ট হল চেয়ারে।

বললাম—'এবার বলো দিকি আমার কোনখানটা তোমার অপছন্দ?'

ও বললে—'আমি যে আর একজনকে ভালবেসে বসে আছি, নেড।'

এবার চেয়ার ছেড়ে তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠার পালা এল আমার।

আমার বিহ্বল মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করে কিন্তু হেসে গড়িয়ে পড়ল গ্ল্যাডিস। বললে—'বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে কিন্তু ভালবাসি না—বাসি একটা আদর্শকে। মানে, যে আদর্শের মানুষ আমার পছন্দ, সেই মানুষের সঙ্গে

আজও খোলাকাৎ হয়ে উঠল না আমার

'খুলেই বলো না—কি রকম দেখতে তাকে ?'

'এই—মানে, তোমার মতই অবিকল।'

'আঃ, প্রাণ জুড়িয়ে গেল ! এবার বলো তো সেই মহাপুরুষটি এমন কোন্ কর্মটি করতে পারে যা আমি পারি না ? মন থেকে বলো। কি করে সে ? সুরাপান করবে না বলে প্রতিশ্রুত ? নিরামিষভোজী ? বিমান-চালক ? ব্রহ্মবিদ্ ? অতিমানুষ ? বলো, বলো, খুলে বলো গ্ল্যাডিস। সে যা, আমি ঠিক তাই হতেই চেষ্টা করব—তোমাকে খুশী করার জন্যে পৃথিবী-টাকে বিশবার চক্করও দিয়ে আসব।'

আমার চরিত্রের এ-হেন স্থিতিস্থাপকতা শ্রবণ করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল গ্ল্যাডিস।

বললে—'প্রথমেই জানাই, আমার আদর্শ মানুষ ঠিক ঐ রকমটি নয়। আমি যাকে আদর্শ পুরুষ বলে মনে করি, সে হবে আরো শক্ত, আরো দৃঢ়, আরো কঠোর—একটা বোকা মেয়ের খেয়ালখুশী মাফিক নিজেকে ভেঙে চুরে নতুন করে গড়তে চাইবে না মোটেই। এ সব কিছুর ওপরেও কিন্তু হতে নির্ভীক—মৃত্যুকে সামনে দেখেও যার চোখের পাতা একটুও কাঁপবে না, আরব্ধ কর্ম করে যাবে অকুতোভয়ে—সে কর্ম হবে সুমহান—সাথে নিয়ে আসবে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। রক্তমাংসের একটা পুরুষকে কোনো দিনই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে আমি পারব না—পারব তার অর্জিত গৌরবময় কীর্তিকলাপকে—কেন না তার প্রতিটির প্রতিফলন ঘটবে আমার ওপরেই। রিচার্ড বার্টনের কথাটা মনে করে দ্যাখো ! তাঁর স্ত্রীর লেখা রিচার্ড বার্টনের জীবন কাহিনী পড়তে পড়তে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি কি গভীরভাবে ভদ্র-মহিলা ভালবাসতেন স্বামীকে। লেডী স্ট্যানলীর কথাটাও দ্যাখো ! স্বামীর সম্পর্কে লেখা বইখানার শেষ অধ্যায়টা পড়বার সুযোগ কখনো হয়েছে তোমার ? অদ্ভুত ! গায়ে রোমাঞ্চ জাগে। মেয়েরা অন্তরাত্মা দিয়ে ভাল-বাসতে পারে শুধু এই ধরনের মানুষদেরই—শুধু ভালবাসে বললে কম বলা হবে—অন্তর দিয়ে উপাসনা করে স্বামী-দেবতাদের—তাদের সুমহান কীর্তি-কলাপের জন্যে—দুনিয়া সম্মান দিয়েছে যে পুরুষদের, তাদের অবিস্মরণীয় কীর্তি আশ্চর্য প্রেরণা জুগিয়ে যায় স্ত্রীদের অন্তরেও।'

উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল গ্ল্যাডিসের অনিন্দ্য সুন্দর মুখচ্ছবি। যেন একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। নক্ষত্রালোকে উদ্ভাসিত হলাম আমি নিজেও।

কিন্তু তর্ক করতে ছাড়লাম না। বললাম—'আমরা সবাই তো আর স্ট্যানলী আর বার্টন হতে পারি না। তাছাড়া, সুযোগও আমরা পাই না—অন্ততঃ আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। পেলে ছাড়ব না—বর্তে যাব বলতে পারো।'

'সুযোগ? সুযোগ বেষ্টিত তো আমরা প্রত্যেকেই। চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে কীর্তিমান হওয়ার অজস্র সুযোগ। আমি যে পুরুষের লক্ষণ বর্ণনা করলাম, সেইসব পুরুষরাই কেবল পারে এই সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে—নিজের কাজে লাগাতে। এ ধরনের পুরুষদের হাজার চেষ্টা করেও তুমি রুখে রাখতে পারবে না। আমার আদর্শ পুরুষের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয়নি ঠিকই, কিন্তু তাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, জানি, বুঝি। বীরত্ব আমাদের চারদিকে প্রতীক্ষায় রয়েছে—লুফে নেওয়ার মানসিকতাটাই কেবল দরকার। পুরুষরাই জাহির করবে সেই বীরত্ব, মেয়েরা জমিয়ে রাখবে তাদের অন্তরের ভালবাসা বীর্যবান এই পুরুষ-দের বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ। গত হপ্তায় বেলুনে আকাশে উঠেছিলেন একজন ফরাসী, মনে পড়ে তাঁর কথা? তখন ঝড় উঠেছিল—অথচ ঠিক ঐ সময়টিতে বেলুন নিয়ে আকাশে উড়বেন কথা দিয়েছিলেন বলে ভয় পাননি—ঝড় মাথায় নিয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও উড়ে গেছিলেন ঝড়ের টানে। চব্বিশঘণ্টায় ধেয়ে গেছিলেন দেড়হাজার মাইল—গিয়ে পড়েছিলেন রাশিয়ার ঠিক মাঝখানে। আদর্শ পুরুষ বলতে বুঝি এই রকম মানুষ-কেই। যে মেয়েটিকে ভালবাসেন এই ফরাসী ডানপিটে, তার কথাটা একটু ভাবো তো! ভাবো তো অন্য মেয়েরা কতখানি ঈর্ষা করে তাকে! আমিও তাই চাই—আমার মনের মানুষের জন্য ঈর্ষা করুক আমাকে দুনিয়ার মেয়েরা।'

'তোমার মন পাওয়ার জন্যে ও কাজ আমিও করতে পারতাম, গ্ল্যাডিস।'

'শুধু আমার মন পাওয়ার জন্যে করতে যাবে কেন? করবে তোমার মনের ভেতরকার তাগিদে—বীরত্ব যে চায়, তাকে কি আটকে রাখা যায়? কোনো কিছুর প্রলোভনে কি বীর্যবান পুরুষ শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে? সে করে তার প্রকৃতির প্রেরণায়—যে তাগিদকে দমন করে রাখার ক্ষমতা তার নিজেরও নেই। বীর হবার বাসনা নিয়ে কেউ কি বীর হতে পারে? বীরোচিত সত্তাই তাকে বীর করে তোলে। গতমাসে উইগ্যান কয়লা বিস্ফোরণের বর্ণাঢ্য বর্ণনা লিখেছিলে দৈনিকে। চোক-ড্যাম্পের বিপদ থাকা সত্ত্বেও তোমার নিজের কি সেখানে যাওয়া উচিত ছিল না? দুর্গতদের

সাহায্যে নিজেকে নিবেদন করা উচিত ছিল না?'

'করেছিলাম বৈকি।'

'কিন্তু আমাকে তো বলো নি।'

'বড়াই করার মত কিছু ছিল না বলেই বলিনি।'

'তাই নাকি?' অধিকতর আগ্রহী চোখে এবার আমাকে নিরীক্ষণ করতে করতে গ্ল্যাডিস বললে—'তোমার বুকের পাটা আছে বটে।'

'না গিয়ে উপায় ছিল না। ভাল প্রতিবেদন লিখতে গেলে অকুস্থলে নিজের যাওয়া দরকার।'

'আহা রে! কি গদ্যময় উদ্দেশ্যের কথাই শোনালে! তোমার বীরোচিত কাজের চালনাশক্তি যদি এই হয়, তাহলে রোম্যান্স নিংড়ে নিলে পুরো ব্যাপারটা থেকেই। যাক গে, মোটিভ যতই গদ্যময় হোক না কেন, খনিতে গিয়েছিলে জেনে খুশী হলাম।' বলে হাত বাড়িয়ে দিল গ্ল্যাডিস আমার দিকে। কিন্তু এমনই মর্যাদা আর সম্ভ্রম বিচ্ছুরিত হল প্রসারিত হস্তের মধ্যে যে আমি হাতে হাত না নিয়ে হেঁট হয়ে চুম্বন করলাম পেলব ত্বক।

গ্ল্যাডিস বললে—'হয়তো আমি নেহাৎই উজবুক মেয়ের মত, বাচ্চা মেয়ের মত কল্পনাবিলাসী। তা সত্ত্বেও এই আদর্শ-কল্পনা আমার সত্তার মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে আমার কাছে তা অত্যন্ত বাস্তব – এই আদর্শ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে – আমি তাই নিরুপায়। বিয়েই যদি করি তো করব বিখ্যাত কোনো পুরুষকে।'

ঘর গম্ গম্ করে উঠল আমার উল্লাসধ্বনিতে 'করবে বৈকি. একশবার তাই করবে। তোমার মত মেয়েরাই তো পুরুষদের প্রেরণা জুগিয়ে যশের শিখরে পৌঁছে দেয়। দাও না একটা সুযোগ আমাকে, দেখিয়ে দিই আমিও তার সদ্ব্যবহার করতে পারি কিনা! তবে হ্যাঁ, একটা কথা তুমি ঠিকই বলেছো। সুযোগ তো পুরুষরাই খুঁজে নেবে – কারও দেওয়ার প্রতীক্ষায় বসে থাকবে না। ক্লাইভের কথাই ধরো না কেন, ছিলেন ছাপোষা কেরানী, শেষ-কালে ভারতবর্ষ দখল করে বসলেন। আমিও কথা দিচ্ছি, এই দুনিয়ায় বিরাট কিছু একটা না করে আমি ছাড়ছি না!'

আইরিশ-সুলভ আমার এই অকস্মাৎ প্রবল উত্তেজনার বুদ্‌বুদ্-উত্থানে সুমিষ্ট হাসিতে গড়িয়ে পড়ল গ্ল্যাডিস।

বললে সোল্লাসে—'না করেও তো তুমি পারবে না, নেড? আদর্শ পুরুষের যা-যা থাকা দরকার, সবই তো তোমার আছে, আছে যৌবন, স্বাস্থ্য, শক্তি, শিক্ষা, প্রাণশক্তি। তোমার প্রকৃত সত্তা যে জাগ্রত হচ্ছে, তোমার চিন্তা আর কথার মধ্যে তার লক্ষণ দেখে আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে—'

'যদি পারি তোমার মনের মত মানুষ হতে— ?'

উষ্ণ মখমলের মত কবোষ্ণ হাতে আমার ঠোঁট চেপে ধরল গ্ল্যাডিস।

বললে—'মশায়, এখন আর একটি কথাও না। আধঘন্টা আগেই ইভনিং ডিউটি দিতে অফিসে হাজির থাকা উচিত ছিল তোমার। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। বিশাল এই দুনিয়ায় যদি নিজের যোগ্য জায়গা করে নিতে পারো, সেইদিনই...শুধু সেইদিনই এই প্রসঙ্গ নিয়ে আবার আলোচনায় বসব তোমার সঙ্গে।'

কুয়াশাচ্ছন্ন নভেম্বরের সেই সন্ধ্যাটি তাই আমি ভুলতে পারব না কোনোদিনই। অগ্নিসম উদ্দীপনা উদ্বেলিত হৃৎযন্ত্রের মধ্যে সঞ্চয় করে নিয়ে ক্যামবারওয়েল ট্রামে বসে সংকল্প করেছিলাম, আর একটা দিনও অপচয় না করে বিরাট বীরত্বব্যঞ্জক একটা কিছু করে আমার প্রিয়তমার মুখোজ্জ্বল করবই করব। তখন কি দুনিয়ার কেউ ভাবতেও পেরেছিল বীরত্বব্যঞ্জক এই কর্মটি কি ধরনের অবিশ্বাস্য আকার ধারণ করতে চলেছে—এবং কোন্ কোন্ অদ্ভুত পরিস্থিতির ধাপ বেয়ে আমি তার সঙ্গে জড়িত হতে চলেছি?

যে উপাখ্যানের জন্য কলম ধরেছি, তার মুখবন্ধ হিসেবে এই অধ্যায়টুকু পাঠকপাঠিকার কাছে নেহাৎই অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু এই অধ্যায় ব্যতিরেকে আশ্চর্য সেই কাহিনীর সূত্রপাতই ঘটত না—যে কাহিনীর সূচনাই ঘটেছে একজন পুরুষের অন্তরস্থ বিরাট কিছু করার তাগিদ থেকে—একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিল অত্যাশ্চর্য কুহেলী-ঘেরা ছায়ামায়ায় ভরা এক অজ্ঞাত দেশের বিরাট অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে—যে অ্যাডভেঞ্চারের অন্তে প্রতীক্ষারত ছিল বিরাট পুরস্কার, বিরাট সম্মান, বিরাট যশ। 'ডেলী গেজেট' পত্রিকার কর্মচারীদের অত্যন্ত নগণ্য কর্মচারী আমি—কিন্তু সেই আমিই গ্ল্যাডিসের পাণিগ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার সংকল্প নিয়ে শীতার্ত সেই সন্ধ্যাতেই রওনা হয়েছিলাম বিরাট কিছু করার তাগিদে। আমার জীবন বিপন্ন করে গ্ল্যাডিস নিজের গৌরববৃদ্ধি করতে চেয়েছিল বলে কি তাহলে তাকে পাষাণহৃদয়া স্বার্থপর বলা সমীচীন হবে? এ জাতীয় চিন্তাভাবনা চিন্তাকাশে অনুপ্রবেশ করে মধ্যজীবনে, প্রথম প্রেমে উদ্বেলিত তেইশ বছরের জীবনে নয়।

২ ॥ ভাগ্য পরীক্ষা করে নাও প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে

ম্যাকআর্ডলকে আমার পছন্দ বরাবরই। 'ডেলী গেজেট'-এর বার্তা

সম্পাদক ম্যাকআর্ডল। খিটখিটে বুড়ো, পৃষ্ঠদেশ ধনুকের মতন বেঁকেই আছে, মাথার রঙ লাল। ভদ্রলোক যে আমাকেও পছন্দ করেন, সে ধারণাও প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল আমার মধ্যে। অবশ্য আমার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বিউমন্ট। প্রকৃত মনিব তিনিই। কিন্তু তাঁর অবস্থান তো এমন এক পাতলা আবহাওয়ার মধ্যে যে নাগাল ধরাই মুস্কিল। পর্বত শিখরে আসীন হলে কি ছোটখাট জিনিস দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়? উচ্চমার্গ থেকে মন্ত্রীসভার ভাঙন অথবা আন্তর্জাতিক সংকট ছাড়া আর কিছুই তাঁর নজরে পড়ে না। প্রায়ই দেখেছি তিনি ভেতরের নিজস্ব পবিত্র কক্ষমন্দিরে বসে আছেন একলা— রাজকীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে। শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন আকাশ পানে— মনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলকান বা পারসিয়ান উপসাগরে। তিনি শুধু আমাদের ঊর্ধ্বেই নন—নাগালেরও বাইরে। কিন্তু ম্যাকআর্ডল হলেন গিয়ে তাঁর প্রথম সহ-সেনাধ্যক্ষ এবং এই ম্যাকআর্ডলকেই আমরা চিনি আর জানি। এঁরই ঘরে সেই সন্ধ্যায় আমি প্রবেশ করলাম। মাথা নেড়ে প্রবেশের অনুমতি দিলেন বৃদ্ধ। চশমাজোড়া ঠেলে তুলে দিলেন বিরলকেশ ললাটের ঊর্ধ্বে।

স্কচ উচ্চারণে বললেন সহৃদয় কণ্ঠে—'ওহে মিঃ ম্যালোন, যা শুনছি তাতে তো মনে হচ্ছে কাজকর্ম তোমার ভালই চলছে। দুঁদে রিপোর্টার তৈরী হয়ে উঠছো দিনে দিনে।'

ধন্যবাদ জানালাম অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে।

'কয়লার খনির বিস্ফোরণ সংবাদটা উৎকৃষ্ট হয়েছে হে। সাদার্ক অগ্নিকাণ্ডের বিবরণটাও দাবানলের মত দেশজোড়া সাড়া ফেলেছে। নির্জলা বর্ণনার দক্ষতা আছে তোমার মধ্যে। এবার বলো, কেন দর্শন করতে এসেছো এই অধমকে?'

'একটা বর চাইতে।'

যেন শংকিত হলেন ম্যাকআর্ডল। দুই চক্ষু দুটো সার্চলাইটের মত বুলিয়ে নিলেন আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

'বটে! বটে! খুলে বলো কি বর চাই।'

'দৈনিকের তরফ থেকে কোনো বিশেষ বড় কাজে আমাকে পাঠানোর উপযুক্ত মনে করেন কি? আমার যথাসাধ্য করব কথা দিচ্ছি, উত্তম প্রতিবেদনও পাঠাবো।'

'ঠিক কি ধরনের বড় কাজে পত্রিকার দূত হয়ে যেতে চাও, সেটা কি বলবে মিঃ ম্যালোন?'

'যে কাজে দুঃসাহসিকতা আছে, বিপদ আছে—এমনি যে কোনো কাজে। নিজেকে বিপন্ন করেও আমি চাই অ্যাডভেঞ্চার করে আসতে। কথা দিচ্ছি, ল্যাজেগোবরে হব না—আপনার মুখ রাখবো? কাজটা যত কঠিন, যত দুষ্কর হবে, ততই জানবেন তা আমার মনের মত হবে।'

'বটে! দেখা যাচ্ছে, প্রাণটা খোয়ানোর জন্যে বড্ড ব্যস্ত হয়েছো?'

'বরং বলতে পারেন, প্রাণ বলে একটা বস্তু যে আমার মধ্যে আছে, সেটা সপ্রমাণ করার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি। জীবনের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে চাইছি।'

'কী সর্বনাশ! মিঃ ম্যালোন, তুমি যা বলছ, তার মত উন্নত মর্যাদাপূর্ণ আদর্শ আর হয় না। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, ইদানীং এই ধরনের আদর্শ আর কারো মধ্যে নেই—গৌরবময় যুগ এখন অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ অভিযানে যা খরচ তার উপযুক্ত কদর অবশ্য পাওয়া যায় না ফলটা পাওয়ার পর। তাছাড়া, এ-ধরনের কাজে দরকার অভিজ্ঞ ব্যক্তির—জনগণের আস্থা আছে যাঁর ওপর এমনি ব্যক্তির—বিশেষ অভিযানে দৌত্যের দায়িত্ব দেওয়া যায় এমন লোককেই। মানচিত্রের কত জায়গাই তো আগে খাঁ-খাঁ করত—ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট হয়ে আসছে আস্তে আস্তে—রোমান্সের জায়গা খুব বেশী আর নেই। তাহলেও একটু ভাবতে দাও, একটু সবুর করো—'অকস্মাৎ মুচকি হাসলেন ম্যাকআর্ডল। 'ম্যাপের ফাঁকা জায়গার কথা বলতে গিয়ে একটা আইডিয়া এসে গেল মাথার মধ্যে। একজন প্রতারকের প্রতারণা ফাঁস করে দিয়ে লোকচক্ষে তাকে হাস্যাস্পদ করে তুললে কেমন হয়? মান্সহাউজেনের নাম নিশ্চয় শুনেছ? ব্যারন কার্ল ফ্রেডরিক হাইরোনিমাস মান্সহাউজেন। জন্ম ১৭২০তে, মৃত্যু ১৭৯৭তে। ছিলেন জার্মান সৈনিক। বিখ্যাত মিথ্যুক। যাঁর কাল্পনিক অভিযানের কাহিনী 'মান্সহাউজেন ট্রাভেলস্' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৫ সালে?'*

'শুনেছি।'

'আমি যাঁর কথা বলছি, তাঁকে আধুনিক কালের মান্সহাউজেন বলা চলে। তিনি যে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যেবাদী, তোমাকে তা ফাঁস করে দিতে হবে! অহো! অহো! সে বড় মজার ব্যাপার হবে হে! প্রস্তাবটা লাগল কেমন, বলো?'

*মান্সহাউজেন কে ছিলেন, ডয়াল তা লেখেননি। পাঠক পাঠিকার জ্ঞাতার্থে 'বুক অফ নলেজ' থেকে বিশদ বিবরণ দেওয়া হল।—অনুবাদক

'যেখানে খুশী পাঠান—যে কোনো কাজে পাঠান—পরোয়া করি না আমি।'

মিনিট কয়েক চিন্তা নিমগ্ন রইলেন ম্যাকআর্ডল।

তারপর বললেন—'জানি না লোকটার সঙ্গে আদৌ বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতে পারবে কিনা, কথাই বলবে না হয়ত। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তোমার একটা আশ্চর্য প্রতিভা আছে। সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারো। অথবা বলতে পারো জান্তব আকর্ষশক্তি—এনিম্যাল ম্যাগনেটিজম্‌। যৌবনোচিত প্রাণশক্তি অথবা অন্য কিছুও বলা যায় তোমার ভেতরের এই শক্তিকে। আমি নিজে কিন্তু সচেতন তোমার এই শক্তির ব্যাপারে।'

'আপনার অসীম দয়া।'

'তাই বলছিলাম আশ্চর্য এই শক্তি নিয়ে এন্‌মোর পার্কের প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে তোমার ভাগ্যটা পরীক্ষা করে এলে কেমন হয়?

বলতে লজ্জা নেই, কথাটা শুনেই আমি বিষম চমকে উঠেছিলাম।

বলেছিলাম সবিস্ময়ে—'চ্যালেঞ্জার! সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার! উনিই না 'টেলিগ্রাফ' দৈনিকের সাংবাদিক ব্লানডেলের মাথার খুলি ভেঙে দিয়েছিলেন?'

নিগূঢ় হাসি হাসলেন বার্তা সম্পাদক।

'ঘাবড়ে গেলে নাকি? তবে না বলছিলে অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ঝাঁপ দিতে চাও?'

'যা কর্তব্য তা করতে হবে বৈকি।'

'ঠিক বলেছো। সব সময়েই যে ঐ রকম প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে উনি যাবেন, আমার তা মনে হয় না। আমার তো মনে হয়, ব্লানডেল ভুল সময়ে ওঁর সামনে গিয়ে পড়েছিল, অথবা ভুল ভাবে আলোচনা শুরু করে ফেলেছিল। কৌশল আর সময়জ্ঞানের অভাব দেখিয়ে ফেলেছিল। আরও একটু বেশী কৌশল তুমি হয়ত দেখাতে পারবে, ভাগ্যটাও তোমার ক্ষেত্রে একটু বেশী সুপ্রসন্ন হতে পারে। বিষয়টা কিন্তু তোমার স্বভাব প্রকৃতি কাজের ধারার মধ্যেই আসছে বলেই আমার বিশ্বাস 'গেজেট' অনায়াসেই খানিকটা সময় ব্যয় করতে পারে লোকটার ওপর। তাতে লাভ বৈ ক্ষতি নেই।'

'কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে কোনো খবরই তো আমি রাখি না। ব্লানডেলকে প্রহার করার অভিযোগে পুলিশ-আদালতে ওঁর নাম উঠেছিল—সেই সূত্রেই নামটার সঙ্গে কেবল পরিচয় ঘটেছে।'

'তোমার সাহায্যে আসতে পারে এমনি টুকটাক কিছু লেখা আমি দেব তোমাকে। বেশ কিছুদিন ধরে আমি নিজেও যে নজর রেখেছি প্রফেসরের ওপর।' বলতে বলতে ড্রয়ার থেকে এক তা কাগজ বার করলেন ম্যাক আর্ডল। 'চ্যালেঞ্জার-বৃত্তান্তের এই হল গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাচার। শোনো, আমি পড়ছি :—

' 'চ্যালেঞ্জার, জর্জ এডওয়ার্ড। জন্ম : লার্গ্‌স্‌, এন-বি, ১৮৬৩। শিক্ষা : লার্গস্ অ্যাকাডেমি, এডিনবরা ইউনিভার্সিটি। বৃটিশ মিউজিয়াম অ্যাসিস্ট্যান্ট ১৮৯২। তুলনামূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞান বিভাগের সহ-সংরক্ষক, ১৮৯৩। উগ্র পত্রালোপের পরিণামে সেই বছরেই পদত্যাগ করেন। প্রাণীবিজ্ঞান গবেষণায় ক্রেসটন পদক বিজয়ী। বিদেশী সদস্য ছিলেন—' অনেক কিছুই ছিলেন দেখছি……ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে পুরো দু-ইঞ্চি ধরে তার ফিরিস্তি—'সোসাইটি বেল্‌জ, আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সস, লা প্লাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবাশ্ম সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। সেকশন এইচ, বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন,—শেষ নেই, শেষ নেই!—'প্রকাশিত পুস্তক : "কালমাক করোটি সিরিজের ওপর কিছু পর্যবেক্ষণ", "মেরুদণ্ডীদের বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু খসড়া আলোচনা", এ ছাড়াও দেখছি অনেক নিবন্ধ লিখেছেন—অসংখ্য প্রবন্ধ, এর মধ্যে রয়েছে "ভিস্‌ম্যানিজম-য়ের অন্তর্নিহিত ভ্রমাত্মক ধারণা"—প্রবন্ধটা কিন্তু ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত প্রাণীবিজ্ঞান কংগ্রেসে উত্তপ্ত আলোচনা ঘটিয়ে ছেড়েছিল। অবসর বিনোদন : হাঁটা, আল্পস পর্বতে আরোহণ। ঠিকানা : এন্‌মোর পার্ক, কেনসিঙটন, ডব্লিউ।'

'এই নাও। নিয়ে যাও সঙ্গে। আজ রাতে আর কিছু দেওয়ার নেই আমার।'

কাগজের টুকরোটা পকেটস্থ করে নিলাম তৎক্ষণাৎ।

দেখলাম, লাল মুখ টেবিলের দিকে নামিয়ে গোলাপী টেকো মাথাটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন ম্যাকআর্ডল।

বললাম—'আর একটু বিরক্ত করব। ভদ্রলোকের সাক্ষাৎকার নিতে কেন যাচ্ছি আমি, সেই ব্যাপারটাই কিন্তু পরিষ্কার হল না আমার কাছে। কি করেছেন উনি?'

ফের লাল মুখটা ঝলসে উঠল আমার পানে।

'দু-বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকা গেছিলেন একক অভিযানে। ফিরে এসেছেন গত বছর। দক্ষিণ আমেরিকায় গেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ঠিক কোথায় গেছিলেন, বলতে চান নি। আবছাভাবে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী বলতে

শুরু করেছিলেন, কে একজন ছিদ্র অন্বেষণ শুরু করেছিল কাহিনীর মধ্যে, সেই থেকে শুক্তির মত ঠোঁট টিপে আছেন। অত্যাশ্চর্য কিছু একটা ঘটেছিল—তা না হলে বলতে হয় লোকটা মিথ্যাকথনের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী মিথ্যুক—আমার মতে শেষের সম্ভাবনাটাই বেশী। নষ্ট হয়ে যাওয়া কয়েকটা ফটোগ্রাফও আছে—লোকে বলে নাকি সবকটাই জাল। অর্থাৎ পয়লা নম্বর জালিয়াৎ অথচ একটুতেই তেলে বেগুনে জলে ওঠেন—মনের মত কথা না হলেই আর রক্ষে নেই। প্রশ্নকর্তাকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে বসবেন। সাংবাদিকদের সিঁড়ির ওপর থেকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেবেন, নিজেকে বড় বা শক্তিশালী বলে ভাবার বাতিক যার থাকে, তাকে বলে মেগালোম্যানিয়াক। আমার মতে ভদ্রলোক একাধারে খুনী, মেগালোম্যানিয়াক, অথচ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন। মিঃ ম্যালোন, এই লোককে নিয়ে খেলতে হবে তোমাকে। নাও, এবার চম্পট দাও দিকি বাছাধন—দেখাও তোমার কেরামতি। চেহারাটা তোমার মজবুত, আত্ম-রক্ষার ক্ষমতা তোমার আছে। তাছাড়াও নিরাপত্তা তো রইলই। জানোই তো 'নিয়োগ-কর্তাদের দায়িত্ব কানুন' সবসময় আগলে রয়েছে তোমাকে। পত্রিকার মালিকের একটা দায়িত্ব আছে। অতএব মাভৈঃ।'

দেঁতো হাসিতে ভরা লাল মুখ আবার নিচু হল টেবিল পানে, আদা-রঙের ফেঁসো পরিবৃত ডিম্বাকৃতি টেকো মাথা ঘুরে এল আমার দিকে। সাক্ষাৎকারের সমাপ্তি ঘোষিত হল বুঝলাম।

হেঁটে চলে এলাম বর্বর ক্লাবে। কিন্তু ভেতরে না ঢুকে অ্যাডেলফি টেরেসের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। একদৃষ্টে চিন্তাবিষ্ট চোখে চেয়ে রইলাম বাদাম-বর্ণের তৈল মসৃণ নদীর দিকে। খোলা বাতাসে চিরকালই আমার মাথা খোলে ভাল। চিন্তা করতে পারি অনাবিল ভাবে, পরম বিজ্ঞের মত। পকেট থেকে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ইতিবৃত্ত বার করে বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের তলায় রেখে পড়ে নিলাম গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। পড়বার পর আমার মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় ঘটল, তাকে বলা যায় প্রেরণা। সাংবাদিক হিসেবে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, ম্যাকআর্ডল যা বলেছেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। কলহপ্রিয় বদমেজাজী প্রফেসরের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ কস্মিনকালেও পাব না। ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দুটো পাল্টা অভিযোগ করণের উল্লেখ দেখেই বুঝলাম বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে ভদ্রলোক অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী। উন্মাদ বললেই চলে। কোনো ফাঁক ফোকরই নেই যার মধ্যে দিয়ে সুট করে গলে হাজির হওয়া যায় সামনে?

চেষ্টা করেই দেখা যাক না।

ঢুকলাম বর্বর ক্লাবে—মানে, স্যাভেজ ক্লাবে। তখন সবে এগারোটা বেজেছে। বিশাল ঘরখানা প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে বললেই চলে– যদিও সদস্যদের কাতারে কাতারে আগমন এখনো শুরু হয় নি। অগ্নিকুণ্ডের ঠিক পাশটিতে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে থাকতে দেখলাম দীর্ঘকায়, বিশীর্ণ, মোটা মোটা হাড়বিশিষ্ট কিন্তু মাংসবিরল এক ভদ্রলোককে। নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে সরিয়ে নিতেই আমার দিকে ঘুরে বসলেন তিনি। আমার বড় পছন্দসই পুরুষ ইনি—'নেচার' পত্রিকার টার্প হেনরী। শীর্ণ, শুষ্ক, চামসিটে জীব। কিন্তু যারা ওঁকে চেনে, তারা জানে মানবিক সহৃদয়তায় টলটলে ওঁর বিশুষ্ক আকৃতির ভেতরটা। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সরাসরি শুরু করলাম আমার প্রসঙ্গ।

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্বন্ধে কি জানেন আপনি ?'

'চ্যালেঞ্জার ?' বিজ্ঞানীসুলভ অননুমোদনের ভঙ্গিমায় ভুরুযুগল একত্র করলেন হেনরী। 'দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বেশ কিছু আষাঢ়ে গল্প নিয়ে দেশে ফিরেছেন যিনি, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তাঁরই নাম।'

'কি গল্প ?'

'আরে, সে এক অতি রাবিশ গল্প—অদ্ভুত কিছু জানোয়ার নাকি আবিষ্কার করেছেন—সেই গল্প। তারপর থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস। সব কথাই কিন্তু ধামাচাপা দিয়েছেন—অর্থাৎ বস্তাপচা সস্তা গল্প শুনিয়ে সুবিধে হবে না বুঝতে পেরেছেন। রয়টারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর এমন হট্টগোল হয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে যে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন গল্প ফেঁদে লাভ নেই কিছুই। পুরো ব্যাপারটা অতিশয় সম্মানহানিকর—সুনামের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। দু-একজন অবশ্য ওঁর গালগল্পে গুরুত্ব দিতে গিয়েছিল, উনি কিন্তু তাদেরও মুখবন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

'কি ভাবে ?'

'ওঁর অকথ্য রূঢ় আর অসম্ভব অসভ্য ব্যবহার দিয়ে। যেমন প্রাণীবিজ্ঞান সংস্থার ওয়াডলী বেচারা। বুড়ো মানুষটা চিঠি লিখেছিলেন চ্যালেঞ্জারকে এইভাবে : 'প্রাণীবিজ্ঞান সংস্থার সভাপতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি কৃতার্থ হবেন যদি পরবর্তী অধিবেশনে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার উপস্থিত থেকে সদস্যদের ধন্য করেন।' জবাব যা এসেছিল, তা ছাপার অযোগ্য।'

'বলেন কি?'

'জবাবটার পরিমার্জিত সংস্করণ দাঁড়ায় এইরকম: 'প্রাণীবিজ্ঞান সংস্থার সভাপতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি কৃতার্থ হবেন যদি সভাপতি মহাশয় জাহান্নমে যান।'

'হে ভগবান!'

'বৃদ্ধ ওয়াডলী ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। অধিবেশনে তাঁর সেই আর্তনাদ এখনো কানে ভাসছে আমার: 'বৈজ্ঞানিক মত বিনিময়ের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায়—'এই পর্যন্ত বলেই ভেঙে পড়েছিলেন বুড়ো।'

'চ্যালেঞ্জার সম্বন্ধে আর কোনো খবর আছে?'

'জানেন তো, আমি জীবাণু বিজ্ঞানী। ন'শ-ব্যাস অণুবীক্ষণে আমার নিবাস। খালি চোখে যা দেখি, সব সময়ে তার গুরুত্ব দিই না। জ্ঞানের সীমান্ত প্রদেশের মানুষ আমি। আমার পড়ার ঘরের বাইরে বিরাট দানবাকার স্থূল প্রাণীদের জগতে আমি নিতান্তই অচল। কেলেংকারী সম্পর্কিত আলোচনায় আমি নিস্পৃহ থাকতেই ভালবাসি। তা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে কিছু কথা আমার কানে এসেছে—এসেছে এই কারণেই যে উনি এমনই এক ব্যক্তি যাঁকে উপেক্ষা করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। অতিশয় ধূর্ত উনি, শক্তিতে ঠাসা একটা ব্যাটারী বললেও চলে—প্রাণশক্তিতে ফেটে পড়ছেন যেন অষ্টপ্রহর। তা সত্ত্বেও উনি ঝগড়াটে, বাজে রকমের সখ নিয়ে উন্মাদ এবং সেই সখের ব্যাপারেও অসৎ। দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে কয়েকটা ফটোগ্রাফ জাল করার মত অন্যায় ধৃষ্টতাও ওঁর মধ্যে দেখা গেছে।'

'বাজে রকমের সখ নিয়ে উন্মাদ বললেন। সখটা কি ধরনের?'

'হাজার সখ গজগজ করছে ওঁর বিরাট মাথায়। সর্বশেষ সখটি—ভিস্-ম্যান*এবং ক্রমবিবর্তন সম্পর্কিত। এই নিয়ে ভয়ানক ঝগড়াঝাঁটি হৈ-হট্টগোল হয়েছে ভিয়েনায়।'

'বিষয়টা বুঝিয়ে দেবেন?'

'এই মুহূর্তে নয়। অধিবেশনে যা ঘটেছে, তার একটা অনুবাদ আছে—আমাদের অফিসের ফাইলেই পাবেন। আসুন না একদিন।'

'সানন্দে। ভদ্রলোকের ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছি বলেই কিছু খবর আমার দরকার। এখুনি চলুন যাওয়া যাক আপনার সঙ্গে।'

---

* অগাস্ট ভিসম্যান (১৮৩৪-১৯১৪)। জার্মান জীববিজ্ঞানী। জার্মপ্লাজম পরিবর্তিত হয়ে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য পাল্টে দেয়—এই তত্ত্বের প্রবক্তা।—অনুবাদক

আধঘন্টা পরে দৈনিক পত্রিকার অফিসে বসলাম একটা সুবৃহৎ গ্রন্থ-খণ্ডের সামনে। 'ভিসম্যান বনাম ডারউইন'*প্রবন্ধটা জল জল করছে চোখের সামনে। নিচের সংক্ষিপ্ত শিরোনামটা এই : 'ভিয়েনায় তুমুল প্রতিবাদ। প্রাণচঞ্চল অধিবেশন।' বিজ্ঞান শিক্ষায় বরাবর অবহেলা দেখানোর ফলে বাদানুবাদের সবটুকু মগজস্থ করতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম, ইংরেজ অধ্যাপক মহাশয় বিষয়টাকে মারমুখো কায়দায় পরিচালনা করেছেন। মহাদেশীয় সতীর্থদের নিরতিসীম বিরক্ত করেছেন। প্রথম দর্শনেই প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা যে তিনটে শব্দ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা এই : 'প্রতিবাদ', 'হৈ-হল্লা', 'সভাপতি মশায়ের কাছে সম্মিলিত আবেদন'। বাদবাকী যা দেখলাম, তা চৈনিক ভাষায় লিখলে আমি যতটা অনুধাবন করতে পারতাম, তার বেশী নয়। আমার ব্রেনের ক্ষমতার দৌড় অত নেই।

অসহায় ভাবে বলেছিলাম—'ইংরেজিতে তর্জমা করে দিলে বুঝতে পারতাম।'

'তর্জমাই তো দেখছেন।'

'তাহলে মূল বিবরণটা নিয়ে কপাল ঠুকে দেখা যাক।'

'সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা খুবই গভীর ব্যাপার।'

'একটা মাত্র সোজা সরল বাক্য যদি পেতাম যার মধ্যে মানবিক ধ্যান ধারণার প্রকাশ ঘটেছে, তাহলেও আমার কাজটা সোজা হয়ে যেত। এই যে, পেয়েছি একটা। এতেই হবে। অস্পষ্টভাবে হলেও আন্দাজে বুঝতে পারছি অর্থটা। কপি করে নেওয়া যাক। ভয়ংকর প্রফেসরের সঙ্গে যোগসূত্র রচিত হবে এই একটা বাক্যের সেতু বেয়েই।'

'আর কিছু করতে পারি কিনা বলুন।'

'পারেন বৈ কি। একখানা চিঠি লিখে ফেলুন ওঁকে। বয়ান রচনা করছি আমি, ঠিকানা দিচ্ছি আপনার—তাতেই রচিত হবে যোগ্য পরিবেশ।'

'তাহলে তো ভদ্রলোক এখানে এসেই টেবিল চেয়ার ভাঙতে থাকবেন।'

'আরে না, চিঠি দেখলেই বুঝবেন বাগবিতণ্ডার লেশমাত্র থাকবে না তার মধ্যে। কথা দিচ্ছি।'

'তাহলে বসে পড়ুন আমার ঐ টেবিল আর চেয়ারে। কাগজও পাবেন ওখানে। চিঠি ছাড়বার আগে কিন্তু আমি সেন্সর করব।'

*চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-৮২)। ক্রমবিবর্তন তত্ত্বের প্রবক্তা। —অনুবাদক

সময় কিছুটা গেল বটে, তবে চিঠিখানা হল খাসা—নিজেই নিজের প্রশংসা করছি। বুক ফুলিয়ে সমালোচক জীবাণু-বিজ্ঞানীকে পড়ে শোনালাম আমার কথাশিল্প!

'প্রিয় প্রফেসর চ্যালেঞ্জার,

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অতি নগণ্য ছাত্র আমি। ডারউইন আর ভিসম্যানের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে আপনার দূরকল্পনা বরাবর বিপুল আগ্রহ সঞ্চার করেছে আমার মধ্যে। সম্প্রতি ভিয়েনায় আপনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যা একমাত্র বিজ্ঞানী-শিরোমণিদের ভাষণেই পরিলক্ষিত হয়, সেই বক্তৃতাটি সম্প্রতি নতুন করে পড়ে স্মৃতি ঝালাই করে নেওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল।'

'ডাহা মিথ্যুক তো আপনি!' স্বগতোক্তি করলেন টার্প হেনরী।

আমি পড়ে চললাম—'ভাষণটা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গে এই বিবৃতির পর আর কোনো বিবৃতি কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না আমার। ভাষণটার মধ্যে একটা বাক্য উদ্ধৃত করছি এখানে: 'প্রতিটি পৃথক ইড্* যে এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ, যে জগতের মধ্যে বিধৃত রয়েছে ঐতিহাসিক স্থাপত্য—যে স্থাপত্য ধীরগতিতে পুরুষানুক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে—অসহ্য এবং সম্পূর্ণভাবে যুক্তি-তথ্যনির্ভরহীন এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' এর পরে যে গবেষণা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার এই বিবৃতির উন্নতি সাধনের কোনো অভিপ্রায় কি আপনার আছে? বিষয়টির ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না আপনার? প্রসঙ্গটি আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে বলেই আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী আমি। আমার নিজস্ব কিছু প্রস্তাব সেই সুযোগে আপনার সামনে নিবেদন করতে চাই এবং সরাসরি বিশদ আলোচনা করতে চাই। আপনার অনুমত্যানুসারে আগামী পরশু (বুধবার) সকাল এগারোটায় আপনার সমীপে উপস্থিত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করছি।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানবেন।

ভবদীয়

এডওয়ার্ড ডি ম্যালোন।'

*ইড্—ভিসম্যান তত্ত্ব অনুসারে ইড্ হ'ল একটি ক্রোমোসোমের মধ্যেকার এমনই একটা মৌল যা বহন করে নিয়ে চলেছে যাবতীয় বংশগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য।—অনুবাদক

বললাম বিজয়োল্লাসে—'কি রকম লাগল বলুন।'

'মন্দ নয়! আপনার বিবেক যদি এতে সায় দেয়—'

'বিবেকের অনুশাসন কস্মিনকালেও অমান্য করি না আমি।'

'কিন্তু কি করতে চান বলুন তো?'

'ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকতে চাই। একবার যদি ওঁর ঘরে ঢোকার সুযোগ পাই, তাহলে ফাঁক ফোকরের সন্ধান পেয়ে যাবই। এমন কি প্রাণ-খোলা স্বীকৃতি পেশ করে ওঁর হৃদয় জয়ও করতে পারি। জীবনটাকে একটা খেলা বলে যাঁরা মনে করেন, উনি যদি সেই শ্রেণীর মানুষ হন তো এমন কাতুকুতু বোধ করবেন যে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তেও পারেন।'

'কাতুকুতু? তার চাইতেও বেশী কিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকুন। দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থিযুক্ত লোহার বর্ম যদি জোগাড় করতে পারেন গায়ে চাপিয়ে যান। নিদেন পক্ষে আমেরিকান ফুটবল পোশাক জোগাড় করে ফেলুন—গায়ের হাড়গুলো তো বাঁচবে। ঠিক আছে, বিদায় অভিনন্দন রইল। নিতান্তই যদি এ চিঠির জবাব উনি দেন তো সে জবাব এখানে এসে পৌঁছবে বুধবার সকালে। ভয়ানক দাঙ্গাবাজ, বিপজ্জনক এবং ঝগড়াটে চরিত্র এই ভদ্রলোকের—হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি শেষবারের মত। ওঁর সংস্পর্শে যারা এসেছে, তাদের প্রত্যেকেই মনেপ্রাণে ঘৃণা করে ভদ্রলোককে। এ চিঠির জবাব উনি না দিলেই জানবেন আপনার মঙ্গল।'

৩ ॥ একেবারে অসম্ভব ব্যক্তি এই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার

বন্ধুবান্ধবের আশংকা অথবা আশা—কোনোটাই বাস্তব রূপ নিল না। বুধবার সকালে গিয়ে দেখলাম চিঠি এসেছে আমার নামে। খামের ওপর ওয়েস্ট কেনসিংটনের ডাকঘরের ছাপ। নাম ঠিকানা লেখা হয়েছে যে হস্তাক্ষরে তার সঙ্গে তুলনা চলে কেবল কাঁটা তারের বেড়ার। চিঠির বয়ান এই:

'এনমোর পার্ক, ডব্লিউ।

'মহাশয়,—আপনার পত্র পেলাম। আমার মতবাদকে সমর্থন জানিয়েছেন। আপনার অথবা দুনিয়ার অন্য কারুর সমর্থনের অপেক্ষায় থাকে না আমার মতবাদ। আপনি 'দূরকল্পনা' শব্দটা ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। ডারউইনতত্ত্বের ওপর আমার প্রদত্ত বিবৃতি প্রসঙ্গে শব্দটার অবতারণা করার ধৃষ্টতা আপনার হয়েছে। এই ধরনের শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিকর—কথাটা খেয়াল রাখবেন। চিঠির বয়ান পড়ে স্পষ্ট বুঝেছি, মহাপাপটি বিদ্বেষবশে করেন নি, অজ্ঞতাই এর প্রকৃত

কারণ। তাই আমল দিলাম না এবম্বিধ স্পর্ধিত উক্তিকে। শব্দ প্রয়োগেও কুশলী নন আপনি। আমার বক্তৃতা থেকে একটা বিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছেন। অংশটার অর্থ ধরতে পারেন নি, এই রকমই মনে হল। আমার ধারণা ছিল এই অংশটার অর্থ একমাত্র মনুষ্যেতর ধীশক্তির কাছেই অস্পষ্ট হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও বিষয়টি প্রাঞ্জল করা যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়, নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে আপনার সঙ্গে নিশ্চয় সাক্ষাৎ করব। যদিও জেনে রাখুন, সাক্ষাৎ এবং সাক্ষাৎকারী দুটিই আমার কাছে অতীব অপ্রীতিকর। আপনি বলেছেন, মতবাদের উন্নতিসাধন সম্ভব হলেও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখুন, একবার যে সুচিন্তিত নিশ্ছিদ্র মতবাদ আমি ব্যক্ত করি, তার রদবদল করা আমার অভ্যাসবহির্ভূত। অনুগ্রহ করে আমার এই চিঠির লেফাপাটি গৃহভৃত্য অস্টিনকে দেখাবেন। 'সাংবাদিক' নামধারী উটকো উৎপাত আর বদমাসদের অনধিকার প্রবেশ রোধ করার জন্যে অনেকরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আমি করেছি—খামটা তাই দেখাবেন বাড়ীতে ঢোকার আগে।

আপনার বিশ্বস্ত

জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার'

টার্প হেনরী সাত সকালেই হাজির হয়েছিলেন আমার দুঃসাহসের পরিণাম জানবার আগ্রহ নিয়ে। চিঠিখানা পড়ে শোনালাম তাঁকে। একটাই মন্তব্য করলেন তিনি—'আর্নিকার* চাইতে শুনেছি আরো ভাল ওষুধ একটা আছে। নামটা কিউটিকুরা বা ঐ রকম কিছু।' কিছু ব্যক্তির কৌতুকবোধ বাস্তবিকই অসাধারণ রকমের হয়।

সাড়ে দশটা নাগাদ চিঠি পেয়ে একটা ট্যাক্সির দৌলতে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়েই পৌঁছে গেলাম এনমোর পার্কে। গাড়ীবারান্দাওলা বিরাট বাড়ী—মনে দাগ রাখার মত। জানলায় ঝুলছে ভারী পর্দা। দেখেই বোঝা যায়, ভয়ঙ্কর প্রকৃতি প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ধনবান পুরুষ। দরজা খুলে ধরল অদ্ভুত শ্যামবর্ণ বিশুষ্ক আকৃতির একটি লোক। বয়স আন্দাজ করা কঠিন। পরনে গাঢ় রঙের পাইলট জ্যাকেট আর চামড়ার হাঁটু পর্যন্ত বুট। পরে জেনেছিলাম লোকটা এ বাড়ীর গাড়ী চালায়। মাঝে মধ্যেই খাস চাকররা চাকরী ছেড়ে চম্পট দেয় বলে তাদের কাজও করতে হয়। হাল্কা রঙের

*আর্নিকা—আঘাত লাগলে বা থেঁতলে গেলে, কালশিরা পড়লে বা আঘাত জনিত রক্তস্রাব হলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ।—অনুবাদক

সন্ধানী চোখে আমার আগাপাশতলা দেখে নিল সে।

বললে—'আসবার কথা আছে তো?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'চিঠিটা এনেছেন?'

খামটা বাড়িয়ে দিলাম।

'ঠিক আছে।' লোকটা দেখলাম খুব কম কথার মানুষ। অলিন্দ বরাবর যাচ্ছি তার পেছন পেছন, এমন সময়ে আচমকা পথরোধ করে দাঁড়ালেন ক্ষুদ্রকায়া এক মহিলা—বেরিয়ে এলেন বোধহয় খাবার ঘরের দরজা দিয়ে। ঝলমলে, প্রাণবন্ত, কৃষ্ণচক্ষু রমণী—ফরাসী বলেই বেশী মনে হয়—ধরন ধারন ইংরেজ মেয়েদের মত নয়।

বললেন—'এক মিনিট। অস্টিন, একটু দাঁড়িয়ে যাও। আপনি মশায় এদিকে একটু আসবেন? আমার স্বামীর সঙ্গে এর আগে কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'না, ম্যাডাম। সুযোগ হয়নি।'

'তাহলে অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি। উনি কিন্তু অসম্ভব মানুষ—ষোল আনা অসম্ভব এবং বিপজ্জনক। আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি যাতে সংঘাত সামলে নিতে পারেন।'

'ম্যাডাম, আপনার বিচারবুদ্ধি আমার অন্তর স্পর্শ করেছে।'

'যেই দেখবেন উনি মারমুখো হওয়ার লক্ষণ দেখাচ্ছেন, ঝটপট বেরিয়ে আসবেন ঘর থেকে। তর্ক করতে যাবেন না মুখের ওপর—একটা সেকেণ্ডও আর দেরী করবেন না। এই ভুল করতে গিয়েই বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে এর আগে। পরে যে কেলেংকারীটা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, তার ধাক্কা আমাকে এবং আমাদের সবাইয়ের ওপর দিয়ে যায়। দক্ষিণ আমেরিকার প্রসঙ্গ নিয়ে নিশ্চয় কথা বলতে যাচ্ছেন না?'

ভদ্রমহিলার সামনে মিথ্যা কথাটা বলতে পারলাম না।

'কী সর্বনাশ! প্রসঙ্গটা কিন্তু সাংঘাতিক বিপজ্জনক। ওঁর একটা কথাও আপনি বিশ্বাস করে উঠতে পারবেন না। কিন্তু ওঁকে তা বলতে যাবেন না—তাহলেই প্রচণ্ড উগ্র হয়ে উঠবেন। এমন ভান করবেন যেন প্রতিটা কথাই বিশ্বাসযোগ্য—তাহলেই পার পেয়ে যাবেন। খেয়াল রাখবেন, উনি নিজে কিন্তু বিশ্বাস করেন। ওঁর মত সৎ পুরুষ পৃথিবীতে কখনো জন্মাননি—এই একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। বেশীক্ষণ থাকতে যাবেন না—ওঁর সন্দেহ হতে পারে। যদি দেখেন বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন

—সত্যিই বিপজ্জনক—ঘন্টা বাজিয়ে আটকে রাখবেন যতক্ষণ না আমি এসে পৌঁছোই। ওঁর জঘন্যতম মেজাজকেও সামাল দেওয়ার ক্ষমতা সাধারণতঃ আমি রাখি।'

এই বলে অল্পভাষী অস্টিনের হাতে আমাকে সমর্পণ করলেন ভদ্রমহিলা। ব্রোঞ্জ স্ট্যাচুর মত এতক্ষণ একধারে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল সে। আমাকে নিয়ে গেল অলিন্দের শেষ প্রান্তে। দরজায় টোকা দিতেই ভেতরে ষণ্ড-গর্জন শুনলাম এবং মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম প্রফেসরের সামনে।

একটা মস্ত টেবিলের ওপাশে ঘুরন্ত চেয়ারে বসেছিলেন উনি। বই, ম্যাপ আর নক্‌শা ছড়ানো রয়েছে টেবিলে। আমি ঘরে ঢুকতেই বোঁ করে চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে মুখোমুখি হলেন। আকৃতিটা দেখামাত্র দম আটকে এল। অদ্ভুত কিছু একটা দেখব প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এরকম প্রভুত্বব্যঞ্জক বিরাট ব্যক্তিত্বর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। ওঁর দেহের আয়তনটাই যে কোনো মানুষের শ্বাসরোধ ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। শুধু ঐ আয়তনটাই মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে যায়। কর্তৃত্ব বিচ্ছুরিত হচ্ছে সারা শরীর ঘিরে। মাথাটি প্রকাণ্ড। কোনো নরদেহে এতবড় মাথা কখনো দেখিনি। ওঁর মাথার টুপি যদি আমার মাথায় চাপানো যেত তাহলে তা আমার মাথা মুখ ঢেকে কাঁধে এসে ঠেকত। মুখ আর দাড়ির সঙ্গে আসীরিয় ষাঁড়ের কোথায় যেন একটা মিল আছে। মুখটা লোহিত। দাড়িটা কালো। প্রায় নীলবর্ণ কোদাল-আকৃতি। লুটোচ্ছে বুকের ওপর। চুলটা অদ্ভুত। বিরাট কপালের ওপর দীর্ঘ বক্র আঁটির মত লেপটে লাগানো। বিশাল কালো ভুরুগুচ্ছর তলায় চোখ জোড়া নীলচে-ধূসর। অতিশয় পরিষ্কার। অতিশয় সন্ধানী। অতিশয় কর্তৃত্বব্যঞ্জক। বিশাল কাঁধ ছড়িয়ে আছে দু-পাশে। বুকটা পিপের মত। টেবিলের ওপর দিকে দেহের এই কটি অংশ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে তাঁর দুটি প্রকাণ্ড হাত—কালো লম্বা চুলে ঢাকা। এহেন আকৃতি এবং মেঘগর্জনের মত গুরু গুরু ষণ্ড-গজরানি-সম কণ্ঠস্বর দিয়ে কুখ্যাত প্রফেসর চ্যালেঞ্জার প্রথম দর্শনেই বিমূঢ় করে তুললেন আমাকে।

বললেন অত্যন্ত উদ্ধত কটমটে চাহনি মেলে ধরে—'বলুন ?'

প্রবঞ্চনাটা প্রলম্বিত করা দরকার—নইলে সাক্ষাৎকারের সমাপ্তি ঘটবে তো এখুনি।

বিনীতভাবে খামটা বাড়িয়ে ধরে বললাম—'সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করার জন্যে আমি কৃতার্থ।'

চিঠিখানা নিয়ে নিজের সামনে টেবিলে রাখলেন প্রফেসর।

'নেহাৎই কাঁচা বয়স দেখছি। সোজা ইংরেজিও বুঝতে পারেন না? আপনার সম্বন্ধে আমার মোটামুটি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন আশা করি?'

'পুরোপুরি!' বললাম জোর দিয়ে।

'আরে গেল যা! ফলে আমি কিন্তু আরো জোরালো অবস্থায় পৌঁছে গেলাম, নয় কী? আপনার বয়স আর আকৃতি তুটোই দ্বিগুণ করে তুলছে আপনার সমর্থনকে। ভিয়েনার সেই শুয়ারের পালের চাইতে অন্ততঃ আপনি অনেক ভালো। অবশ্য বৃটিশ শুয়ারের দলছাড়া পচেষ্টার চাইতে ওদের দলবদ্ধ ঘোঁৎঘোঁতানি বেশী আপত্তিকর নয়।' বলে, বৃটিশ শুয়ারের বর্তমান প্রতিনিধিটির দিকে জ্বলন্ত চোখে উনি চেয়ে রইলেন।

'ওদের আচরণ সত্যিই অত্যন্ত জঘন্য হয়েছে,' বললাম আমি।

'আমি নিজেই লড়ি, আপনার সহানুভূতির কোনো প্রয়োজন নেই। একলা থাকতে দিন আমাকে—দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দিন—লড়াই কাকে বলে দেখিয়ে দেব। জি-ই-সি তখনই জানবেন সবচেয়ে সুখী। যাকগে মশায়, সাক্ষাৎকারটা এবার শেষ করে আনা যাক। ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে আপনার কাছে—আমার কাছে হবে অসীম বিরক্তিকর। আমার গবেষণামূলক নিবন্ধ সম্পর্কে আপনার কিছু মন্তব্য আছে?'

পদ্ধতিটা পাশবিক—ঘাড ধরে মূল বিষয়ে টেনে আনার জোরালো কায়দা। এড়িয়ে যাওয়া মুস্কিল। তা সত্ত্বেও খেলতে হবে আমাকে—ভালো সুযোগের প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করতেই হবে। দূর থেকে কাজটাকে জলের মত সোজা মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার আইরিশ বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেল। বডই অসহায় বোধ করলাম। ঠিক দরকারের সময়টিতেই মাথার মধ্যে ঘেঁাট পাকিয়ে গেল। ধারালো, ইস্পাতকঠিন তুটি চক্ষু আমার ওপর নিবদ্ধ রেখে উনি গুরু গুরু গর্জন ছেড়ে বললেন—'বলুন! বলুন।'

নির্বোধ-তুর্বল হাসি হেসে বললাম—'নেহাৎই ছাত্র আমি। সন্ধানী মনটা আছে—তার বেশী কিছু নেই। তবে আমার মনে হয়েছে, এ ব্যাপারে ভিস্‌ম্যানের ওপর আপনি একটু বেশী রকমের কঠোর হয়ে পড়েছেন। ওঁর তত্ত্ব যে সময় প্রকাশ পায়, তার পর অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সবের ভিত্তিতে কি মনে হয় না ওঁর পজিশন অনেক সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে?'

'কি সাক্ষ্যপ্রমাণ?' গা-ছমছমে প্রশান্ত কণ্ঠস্বর শুনে রক্ত হিম হয়ে গেল আমার।

'সঠিক সাক্ষ্যপ্রমাণের তেমন কোনো খবর অবশ্য আমি রাখি না। আধুনিক চিন্তাধারা আর সাধারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণ থেকে যদি বিচার করেন—'

পরম আগ্রহে ঝুঁকে বসলেন প্রফেসর।

আঙুলের কর গুণতে গুণতে বললেন—'করোটি নির্দেশক যে একটা অপরিবর্তনীয় কারণ, তা নিশ্চয় জানেন?'

'স্বভাবতঃই,' বললাম আমি।

'টেলিগনি* এখনও বিচার্য বিষয়, তা মানেন?'

'নিঃসন্দেহে।'

'বিশ্বাস করেন কুমারী ডিম্ব থেকে একেবারেই আলাদা হয় জার্ম-প্লাজ্‌ম্?'

'তা আর বলতে!' নিজের স্পর্ধায় নিজেই উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম।

'কিন্তু তাতে কি প্রমাণিত হল?' ধীর শান্ত প্ররোচক কণ্ঠে শুধোলেন প্রফেসর।

'তাই তো! কি প্রমাণিত হল তাতে?' বিড়বিড় করে বললাম কোন মতে।

'আমি বলব?' মৃদু স্বরে বললেন প্রফেসর—ঠিক যেন ঘুঘুর ডাক।

'বলুন না।'

আচম্বিতে প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সগর্জনে বিস্ফোরিত হলেন প্রফেসর—'প্রমাণিত হল যে আপনি লণ্ডনের একটা কদর্য জঘন্য ভণ্ড—কৃমিকীটের মত কদাকার কুৎসিত সাংবাদিক—বিজ্ঞান তো দূরের কথা সভ্যতাও নেই আপনার মগজের উপাদানের মধ্যে!'

দুই চোখে উন্মত্ত রোষানলের মশাল জ্বালিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠাময় ভয়ানক সেই মুহূর্তটিতেও পরম বিস্ময়ে আমি আবিষ্কার করলাম, উচ্চতায় ভদ্রলোক নেহাৎই খাটো। মাথা পৌঁছোয় বড় জোর আমার কাঁধ পর্যন্ত। বামন হারকিউলিস। নিদারুণ প্রাণশক্তি ছড়িয়ে পড়েছে দেহের বিস্তারে, গভীরতায় এবং মগজে।

ঝুঁকে দাঁড়িয়ে টেবিলে দশ আঙুল রেখে মুখটা সামনে বাড়িয়ে ধরে বললেন ষণ্ড গর্জনে—'আবোল তাবোল বকছিলাম এতক্ষণ! বুঝলেন মশায়? বৈজ্ঞানিক জগাখিচুড়ি শোনাচ্ছিলাম! ঐ তো ওয়ালনাট

*টেলিগনি—সহচরের কাল্পনিক প্রভাব সহচরীর সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হওয়ার পর তার ওপর পরবর্তী সহচর বা সহচরীর প্রভাব সঞ্চার। —অনুবাদক

বাদামের মত ব্রেন—ঐ ব্রেন নিয়ে ভেবেছেন কি ধড়িবাজির খেলায় আমাকে হারাবেন? নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করেন তাই না? নরকের কীট কোথাকার! নচ্ছার নকলনবীশ! ভাবেন বুঝি আপনাদের মুখের তারিফ শুনলেই মানুষ মাত্রই নেচে উঠবে, নিন্দে করলেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে? দেশশুদ্ধ লোক আপনাদের সেলাম ঠুকবে, দুটো প্রশংসাবাক্য ছাপার অক্ষরে দেখার জন্যে পায়ে তৈল মর্দন করবে? মর্জিমত একজনকে আকাশে তুলবেন, আরেকজনকে গর্তে ফেলবেন? শুয়ের পোকা, আমি আপনাদের চিনি! এসেছেন কিন্তু ঘাঁটির বাইরে। একটা সময় ছিল যখন কান কেটে দেওয়া হয়েছিল আপনাদের। মাত্রাজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। অহংকারে ফুলে গ্যাস বেলুন হয়ে গেছেন, তাই না? যে নর্দমায় আপনাদের থাকা দরকার, আমিই পাঠাবো আপনাকে সেখানে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জি-ই-সি বলছি—যাকে টেক্কা মারবার ক্ষমতা এখনো আপনাদের কারো হয়নি। এই দুনিয়ায় একটা লোক এখনো আছে জানবেন যে আপনাদের মনিব, আপনাদের মাস্টার, আপনাদের ভাগ্যবিধাতা—আজও—এখনো পর্যন্ত। হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল সে আপনাকে, তা তা সত্ত্বেও এসেছেন বিরাট ঝুঁকি নিয়ে। অপরাধ করেছেন, মাই গুড মিঃ ম্যালোন, দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হোন! বড় বিপজ্জনক খেলায় নেমেছিলেন—সে খেলায় গো-হারান হেরেছেন।'

পিছু হটতে হটতে দরজা খুলে ধরে বললাম—'দেখুন স্যার, যত খুশী গালাগালি দিন, কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে, আমার গায়ে হাত দিতে আসবেন না।'

'তাই নাকি? গায়ে হাত দোব না?' অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মন্থর চরণে অগ্রসর হতে হতে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে পরনের বালকোচিত খাটো জ্যাকেটের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন প্রফেসর—'এ বাড়ী থেকে বেশ কয়েকজনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আপনি হবেন চতুর্থ অথবা পঞ্চম। মাথাপিছু খরচ হয় অবশ্য তিন পাউণ্ড পনেরো শিলিং—গড়পরতা হিসেব। দামটা বেশী হলেও কাজটা একান্তই দরকার। মশায়, আপনার সতীর্থরা যে জাহান্নমে গেছে, এবার তো আপনাকে যেতে হবে সেখানে। যেতেই হবে, আমার ইচ্ছে যখন হয়েছে, তখন আর কোনো উপায় নেই।' বলতে বলতে আবার অস্বস্তিকর পাদচারণা শুরু করলেন ভদ্রলোক—মার্জারের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে এলেন নিঃশব্দ চরণে। নাচের মাস্টার যেভাবে জুতোর ডগা সামনে বাড়িয়ে হাঁটে, অনেকটা সেইভাবে।

আমি পাঁই পাঁই করে হলঘরের দরজা অভিমুখে পলায়ন করতে পারতাম—কিন্তু তাতে আমার মাথা কাটা যেত। তা ছাড়া, ধিকিধিকি রোষানল জ্বলতে শুরু করেছিল আমার নিজের মধ্যেও—এ অবস্থায় যা একান্তই স্বাভাবিক। একটু আগেই অসহায় বোধ করেছিলাম ভুলভাল কথা বলে ফেলায়, কিন্তু লোকটার চণ্ডমূর্তি ঠিক অবস্থায় এনে ফেলল আমাকে।

'গায়ে হাত দিলেই কিন্তু ঝামেলায় পড়বেন। বরদাস্ত করব না বলে রাখছি।'

'আরে সর্বনাশ!' কালো গোঁফজোড়া নেচে উঠল কথার ঝাঁকুনিতে—অবজ্ঞার দেঁতো হাসির সাদা ঝলক দেখা গেল কালো গোঁফের নিচে—'বরদাস্ত করবেন না, বলেন কী!'

গলার শির তুলে বললাম—প্রফেসর, বোকামি করবেন না, সাবধান করে দিচ্ছি! সুবিধে করে উঠতে পারবেন না কিন্তু। ওজনে আমি পনেরো স্টোন*, পেরেকের মত নিরেট, প্রতি শনিবার লণ্ডন আইরিশে সেণ্টার থ্রি-কোয়ার্টার খেলি। আপনার চোখ রাঙানিতে—'

থেমে এলেন উনি ঠিক এই সময়ে। কপাল ভাল দরজার পাল্লাটা খুলে ধরেছিলাম, নইলে দুজনেই দাঙ্গা ভেঙে বেরিয়ে যেতাম। খাঁজকাটা চাকা যেমন গড়িয়ে যায়, দুজনে পাশ বরাবর যুগল ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে গেলাম সেইভাবে। গড়াতে গড়াতে পড়লাম একটা চেয়ারের ওপর এবং চেয়ার সমেত যুগলমূর্তির ঘূর্ণায়মান চক্র ঠিকরে গেল সটান রাস্তার দিকে। আমার মুখের মধ্যে প্রফেসরের দাড়ি, চারবাহু জড়িয়ে-মড়িয়ে থাকার ফলে দেহদুটি একত্র সংলগ্ন এবং সেই জঘন্য চেয়ারটার চারখানা ঠ্যাং বেরিয়ে রয়েছে চারদিকে। সতর্ক-চক্ষু অস্টিন হলঘরের দরজা খুলে রেখেছিল দু-হাট করে। সামনের সোপান শ্রেণীর ওপর দিয়ে উল্টো ডিগবাজি খেতে খেতে বেরিয়ে গেলাম দুজনে। এ রকম সার্কাস এর আগেও দেখেছি—কিন্তু অনুশীলন ছাড়া এ সার্কাস দেখাতে গেলে হাড়গোড় ভাঙা আশ্চর্য নয়। সিঁড়ির নিচে যখন পৌঁছোলাম, চেয়ারখানা পলকা দেশলাইয়ের কাঠির মত ভেঙে ছত্রাখান হয়ে গেল—আমরা দুদিকে ঠিকরে গিয়ে পড়লাম বৃষ্টির জল বেরিয়ে যাওয়ার নর্দমায়। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হেঁপোরুগীর মত হুস্ হুস্ করে দম ছাড়তে ছাড়তে ঘুসি নাড়তে কিন্তু ছাড়লেন না প্রফেসর।

বললেন বেদম স্বরে—'আক্কেল হয়েছে তো?'

---

*এক স্টোনের সাধারণ হিসেব ১৪ পাউণ্ড। —অনুবাদক

যুগল মূর্তির ঘূর্ণায়মান চক্র ঠিকরে গেল সটান রাস্তার দিকে। পৃঃ ২৫

নিজেকে সামলে সুমলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম—'নচ্ছার ষাঁড় কোথাকার!'

নতুন করে লড়াই শুরু হয়ে যেত পরক্ষণেই—কেন না রণস্পৃহায় তখনো টগবগ করছিলেন ভদ্রলোক—কিন্তু ঘৃণার্হ এই পরিস্থিতি থেকে সৌভাগ্য-ক্রমে আমাকে উদ্ধার করলো একজন পুলিশ ম্যান। হাতে নোটবই নিয়ে ঠিক পাশটিতেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তাকে।

বলল—'আবার! আপনার লজ্জা হওয়া উচিত! 'এন্‌মোর পার্কে এর চাইতে সঙ্গত মন্তব্য আর শুনিনি।' আমার দিকে ফিরে—'বলুন তো কি হয়েছে?'

'আমাকে আক্রমণ করেছেন,' বললাম আমি।

'আপনি আক্রমণ করেছেন ওঁকে?' শুধোলো পুলিশম্যান।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন প্রফেসর। জবাব দিলেন না।

সবেগে মাথা নাড়ল পুলিশম্যান—'এই কিন্তু প্রথম নয়। গত মাসেও ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছিলেন। একই কাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন। দেখুন দিকি, ইয়ংম্যানের চোখে কালসিটে ফেলে দিয়েছেন। কি মশায়, আপনি কি চান চার্জ আনি ওঁর বিরুদ্ধে?'

মনটা নরম হয়ে এল আমার।

বললাম—'না, তা চাই না।'

'কেন চান না?'

'দোষটা আমারই। অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম আমিই। আগেই সাবধান করেছিলেন উনি।'

ফটাস্‌ করে নোটবই বন্ধ করল পুলিশম্যান।

বললে—'তাহলে এই নিয়ে আর ঝামেলার দরকার নেই। হেই! কি চাই? যাও, সরো ভীড় হটাও!' কশাইয়ের একটা ছেলে, দুটো উঞ্ছ ছোকরা আর একটা ঝি-কে তাড়া লাগালো শান্তিরক্ষক। ভারী ভারী পা ফেলে ভীড় হাটিয়ে নিয়ে গেল তফাতে। আমার দিকে ফিরলেন প্রফে-সর। চোখের কোণে দেখলাম প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

বললেন—'আসুন ভেতরে। আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া এখনো শেষ হয় নি।'

ভাষণটা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্লক্ষণযুক্ত। তা সত্ত্বেও ফের বাড়ার মধ্যে ঢুকলাম পেছন পেছন। কাঠের মূর্তির মত দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল গৃহভৃত্য অস্টিন।

৪ ॥ এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বস্তু বলতে যা বোঝায়, ঠিক সেইটিই

দরজা বন্ধ হতে না হতেই খাবার ঘর থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। ক্ষুদ্রকায়া মহিলার সে কী রাগ! ফুঁসছিলেন ফুটন্ত কেটলির মত। বুলডগের পথ রোধ করে দাঁড়াল যেন একটা পুঁচকে মুরগীর ছানা। স্পষ্টতঃ, উনি আমাকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখেছেন, আমার পুনরাগমন লক্ষ্য করেন নি।

বললেন চিলের মত চিৎকার করে—'জানোয়ার! জর্জ, তুমি একটা আস্ত পশু! অমন চমৎকার ইয়ংম্যানটাকে তুমি জখম করে বসলে?'

বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে পেছনে দেখিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন—'ঐ তো উনি। গায়ে আঁচড়টি লাগেনি।'

থতমত খেয়ে গেলেন প্রফেসরের ধর্মপত্নী।

'মাপ করবেন। আপনাকে দেখতে পাইনি।'

'ম্যাডাম, আমার কিচ্ছু হয়নি।'

'হয়নি মানে? ঐ তো মুখখানায় কালসিটে ফেলে দিয়েছে! জর্জ, জর্জ, তোমার মত জন্তু আমি আর দেখিনি! ফি হপ্তায় একটা না একটা কেলেংকারী ঘটিয়ে চলেছো। দেশশুদ্ধ লোক ঘেন্নায় নাক সিঁটকোচ্ছে, মজা করছে তোমাকে নিয়ে। আর সহ্য করতে পারছি না আমি—এই শেষ।'

'ঘরোয়া ঝগড়া বাইরে কেন?' গুরগুর করে উঠলেন প্রফেসর।

'গোপন আর কিছু নেই। রাস্তার সমস্ত লোক—গোটা লণ্ডন শহরটা—অস্টিন, যাও এখান থেকে—দুনিয়াশুদ্ধ লোক তোমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। মানসম্মান বলে কি কিছু নেই তোমার? মস্ত ইউনিভার্সিটির রেজিয়াস প্রফেসর হওয়া উচিত তোমার, হাজার ছাত্র ঘিরে থাকবে তোমাকে। শ্রদ্ধা করবে, সম্মান জানাবে—তা না কেলেংকারীর পর কেলেং-কারী ঘটিয়ে চলেছো? মানসম্মান ধুলোয় লুটোচ্ছো?'

'আর তোমার?'

'আমার সহ্যের বাঁধ তুমি ভেঙে দিয়েছো। বদমাস গুণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছো—দাঙ্গাবাজ রাস্তার গুণ্ডা!'

'জেসি, সংযত হও।'

'ষাঁড় কোথাকার! গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে মরছো চণ্ডালের মত রাগ নিয়ে!'

'ব্যস, আর নয়! এবার প্রায়শ্চিত্ত!'

বলেই, আমাকে অবাক করে দিয়ে উনি হেঁট হলেন, বউকে টুপ করে তুলে নিয়ে হলঘরের এক কোণে খাড়া কালো মার্বেল পাথরের স্তম্ভমূলে বসিয়ে দিলেন। থামটা কম করেও সাত ফুট উঁচু। এত সরু যে তার ওপর নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে সিঁটিয়ে কাঠ হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। ক্রোধ বিকৃত মুখে তাঁর সেই আড়ষ্ট পা ঝুলিয়ে বসে থাকা দেখে আমি তো হতবাক।

ঐ অবস্থাতেই কাতর আর্তনাদ করলেন—'নামিয়ে দাও বলছি!'

'আগে বলো, 'প্লীজ'!'

'জানোয়ার কোথাকার! এক্ষুনি নামিয়ে দাও!'

'আসুন মিঃ ম্যালোন, পড়ার ঘরে আসুন।'

'কিন্তু—' ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করেছিলাম আমি।

'দেখলে তো? মিঃ ম্যালোন তোমার হয়ে আবেদন জানাচ্ছেন। একবার খালি বলো 'প্লীজ'—তাহলেই নামিয়ে আনবো।'

'জানোয়ার কোথাকার! প্লীজ! প্লীজ!'

ঠিক যেন একটা ক্যানারী পাখীকে দাঁড় থেকে নামিয়ে আনলেন প্রফেসর।

বললেন—'জেসি, সমঝে চলবে মিঃ ম্যালোনের সামনে—উনি কিন্তু খবরের কাগজের লোক। কালকেই সব খবর ছাপিয়ে দেবেন নোংরা কাগজখানায়—ডজনখানেক বাড়তি কপি বিক্রী হয়ে যাবে এ পাড়ায় প্রতিবেশী মহলে। 'বড় মহিলার অদ্ভুত গল্প'—থামটার ওপর বসে নিজেকে নিশ্চয় বড় বলেই মনে হয়েছিল? তারপর থাকবে একটা ছোট হেডিং—'দাম্পত্য কলহের এক ঝলক'। বড় বাজে লোক এই মিঃ ম্যালোন—শয়তানের খোঁয়াড়ের নোংরা শুয়ার—ওঁরা প্রত্যেকে একই রকম—আজে বাজে লিখে কাগজ ভরাতে সিদ্ধ হস্ত। তাই না মিঃ ম্যালোন?'

বললাম উত্তপ্ত কণ্ঠে—'সত্যিই আপনি অসহ্য!'

দমকা অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে প্রফেসর বললেন—'খুব শীগগিরই আঁতাত হয়ে যাবে আপনার আমার মধ্যে।' পরক্ষণেই বললেন সুর পাল্টে—'তুচ্ছ এই পারিবারিক দ্বন্দ্বর জন্যে মাপ চেয়ে নিচ্ছি মিঃ ম্যালোন। ঘরোয়া কোঁদলে আপনাকে জড়িত করার জন্যে ডেকে আনিনি—ডেকেছি তার চাইতেও গুরুতর উদ্দেশ্যে। পালাও, পালাও, পুঁচকে মেয়ে, খিটির মিটির এখন শিকেয় তোলা থাক।' বলে, গিন্নীর দু-কাঁধে বিরাট দুই থাবা-হস্ত

রেখে বললেন—'যা-যা বলেছো, তার প্রত্যেকটা খাঁটি কথা। তোমার উপদেশ মত চললে মানুষ হিসেবে আরো একটু ভালো হতাম ঠিকই, কিন্তু জর্জ এডোওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার বলতে যা বোঝায় তা আর থাকতাম না। প্রাণাধিকে, ভালো লোক পৃথিবীতে ঢের আছে, কিন্তু জি-ই-সি আছে কেবল একজনই। তাকে নিয়েই সুখী হও, মানিয়ে নাও।' বলেই আচমকা সশব্দে এমন চুম্বন করে বসলেন গৃহিনীকে যে আমি মারধরের মধ্যেও যতটা না ভ্যাবাচাকা খেয়েছিলাম, তার চাইতে বেশী অপ্রস্তুত হলাম এখন। পরমুহূর্তেই হিমালয় প্রতিম মর্যাদা মণ্ডিত মূর্তিখানা ফিরিয়ে ধরলেন আমার পানে—'মিঃ ম্যালোন, আসুন এই দিকে।' সুগভীর আত্মমর্যাদার অটল মহিমা সহকারে এগিয়ে গেলেন আমাকে পেছনে নিয়ে।

দশ মিনিট আগে ঝটিকা বেগে যে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম, পুনঃপ্রবেশ করলাম সেই ঘরে। সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে প্রফেসর হাতের নির্দেশে আসন গ্রহণ করতে বললেন আমাকে এবং একবাক্স চুরুট ঠেলে এগিয়ে দিলেন আমার নাকের ডগায়।

বললেন—'নির্ভেজাল স্যান জুয়ান কলোরাডো—আপনার মত যারা অল্পতেই খেপে ওঠে, তাদের উপযুক্ত মাদকদ্রব্য। আরে! আরে! করছেন কী? দাঁতে কাটবেন না। মানী চুরুটের মান রাখুন—ছুরী দিয়ে কাটুন! এবার হেলান দিয়ে বসে যা বলি শুনে যান। মন্তব্য করার হচ্ছে হলে উপযুক্ত সময়ের জন্য তা মগজের মধ্যেই জমিয়ে রাখবেন।

'সঙ্গত কারণেই আপনাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়েছিলাম একটু আগে,' বলে কটমট করে উনি আমার মুখখানা দেখে নিলেন প্রতিবাদের প্রত্যাশায়—কালো দাড়িখানা এমনভাবে ঠেলে বাড়িয়ে ধরলেন যেন প্রতিবাদ শুনতে উনি প্রস্তুত—'তারপর আপনাকে ডেকে নিয়ে এলাম পুলিশের লোকটার কাছে আপনার জবাবটা শুনে। আপনার পেশার লোকদের আমি চিনি। আপনারা প্রত্যেকেই মানুষের চেয়ে নিচের শ্রেণীর ইতর জীব। আপনাদের সঙ্গে তাই আমি বাক্যালাপ করি না। আপনাকেও ফেলেছিলাম সেই দলে। কিন্তু পুলিশকে যেভাবে জবাবটা দিলেন, তাতেই সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে আপনি উন্নত শ্রেণীর জীব পদবাচ্য হয়ে গেলেন। বুঝলাম, আপনার মধ্যে সভ্যতা আছে—অন্যান্য নচ্ছার সাংবাদিকদের মত অসৎ নন। তাই আগ্রহ জাগল আপনার সম্পর্কে। ফিরিয়ে নিয়ে এলাম বাড়ীর মধ্যে পরিচয় নিবিড়তর করার অভিপ্রায়ে। চুরুটের ছাইটা অনুগ্রহ করে ফেলবেন

আপনার বাঁ কনুইয়ের কাছে বাঁশের টেবিলের ওপরকার জাপানী ট্রে-তে।'

যেন ক্লাশঘরে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন প্রফেসর—ঘর গমগম করতে লাগল তাঁর কণ্ঠস্বরে। ঘূরন্ত চেয়ার আমার দিকে ঘুরিয়ে বসেছিলেন প্রকাণ্ড একটা পেটমোটা ব্যাঙের মত। মাথাটা হেলে ছিল পেছনে, দুচোখের আধখানা ঢাকা পড়ে গেছিল ঝুলন্ত চোখের পাতায়। আচমকা মুখ ফিরিয়ে টেবিল হাঁটকাতে শুরু করায় দেখলাম জটপাকানো চুল আর ঠেলে বার করা এক-খানা লাল কান। টেবিলের কাগজপত্র তোলপাড় করে যে জিনিসটা উদ্ধার করলেন তা একখানা অতিশয় ছেঁড়াখোঁড়া স্কেচবুক বলেই মনে হল।

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—'দক্ষিণ আমেরিকা প্রসঙ্গে এবার কথা আরম্ভ করব। কোনোরকম মন্তব্য যেন না শুনি। যা বলব তার একটা অক্ষরও আমার অনুমতি ব্যতিরেকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা চলবে না। অনুমতি অবশ্য কস্মিনকালেও পাবেন না। মাথায় ঢুকেছে যা বললাম?'

'কিন্তু ভেবেচিন্তে যদি একটা বিবরণ—'

নোটবই টেবিলে রেখে দিয়ে বললেন সঙ্গে সঙ্গে—'আর কথা নয়। আপনি আসতে পারেন। গুডমর্নিং।'

'আরে না। না! কথা দিচ্ছি, যে কোনো সর্তেই আমি রাজী। এ ছাড়া উপায়ও দেখছি না।'

'দুনিয়ার কাউকে বলা চলবে না।'

'কথা দিলাম।'

'কথার দাম থাকবে তো?'

'থাকবে।'

'কিন্তু আপনার দাম কতখানি, তাই তো জানি না,' আবার সেই উদ্ধত চাহনি নিবদ্ধ হল আমার ওপর।

মাথা গরম হয়ে গেল আমার—'বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন আপনি! জীবনে এ-রকম অপমানিত হইনি!'

আমার রাগ আর গলাবাজি ওঁকে কিন্তু চটিয়ে দিল না—বরং যেন আরো আগ্রহী করে তুলল।

বললেন বিড়বিড় করে—'গোল মাথা, ছোট্ট সাইজ, করোটি চওড়ায় লম্বার ৮০ অথবা ৭৮ শতাংশ, ধূসর চোখ, কালো চুল, নিগ্রো আকৃতি। কেল্টিক নিশ্চয়?'

'আইরিশ ম্যান আমি।'

'আইরিশ? আইরিশ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'যাক এবার পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। কথা দিয়েছেন, যা বলব, তা পাঁচকান করবেন না, কথার দাম যেন থাকে। শুনেছেন বোধহয় দু-বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়াতে গেছিলাম—বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখে রাখা উচিত আমার সেই অভিযান কাহিনী। ওয়ালেস আর বেট্স্-য়ের কয়েকটা সিদ্ধান্ত যাচাই করে নেওয়ার জন্যেই অকুস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আমার, সেই অভিযানেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল—আমার সামনে খুলে গেল তদন্তের নব দিগন্ত।

'জানেন হয়তো—আপনার এই অর্ধশিক্ষিত কাঁচা বয়েসে না জানাটাও অস্বাভাবিক নয়—আমাজন নদীর বেশ খানিকটা অঞ্চল আজও অনাবিষ্কৃত এবং সেই সব অঞ্চল থেকে অনেক উপনদী এসে পড়েছে মূলনদীতে। এ সব উপনদীর বেশীর ভাগই আজও ঠাঁই পায়নি ম্যাপে। অজ্ঞাত এই অঞ্চলের জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ করতে গেছিলাম আমি। ফলাফলটা আমি একখানা বইতে লিখেছি—প্রাণীবিজ্ঞানের এই সুবৃহৎ কেতাব একটা স্মরণীয় কীর্তি হয়ে থাকবে আমার জীবনে। কাজ শেষ করে ফেরবার সময়ে রাত কাটিয়েছিলাম একটা ইণ্ডিয়ান গ্রামে। গ্রামটা যে উপনদীর পাড়ে তার নাম আপনাকে বলব না। এরা হল গিয়ে কুকুমার ইণ্ডিয়ান। স্বভাবে অমায়িক কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিতে নিম্নশ্রেণীর—লণ্ডনবাসীদের চেয়েও অনেক নিচে। নদী বরাবর অভিযানে রওনা হওয়ার সময়ে ওদের সাধারণ অসুখ বিসুখের কিছু উপকার আমি করেছিলাম, আমার ব্যক্তিত্বে ওরা আকৃষ্টও হয়েছিল। তাই ফেরবার পথে সাদর অভ্যর্থনা পেলাম। শুনলাম এক ব্যক্তিকে নাকি এখুনি চিকিৎসা করা দরকার। সর্দারের পেছন পেছন গেলাম তার কুঁড়েঘরে। গিয়ে দেখি লোকটা সেই মুহূর্তে অক্কা পেয়েছে। কিন্তু বিস্মিত হলাম মৃত ব্যক্তিকে দেখে, ইণ্ডিয়ান সে নয়—শ্বেতকায়। গায়ের রঙ সাদা, চুল সোনালী। অ্যালবিনো*বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু দেখলাম, পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন, চেহারা প্যাঁকাটি, যেন অনেক দুর্ভোগ সয়ে এসেছে। ইণ্ডিয়ানরা কেউ তাকে চেনে না। জঙ্গল ঠেঙিয়ে সে একাই এসে পৌঁছেছে গ্রামে—জীবনের শেষ মুহূর্তে।

'পাশেই পড়েছিল লোকটার ঝুলি। দেখলাম ভেতরকার জিনিসপত্র। নামঠিকানাও পেলাম ঝুলির গায়ে লাগানো লেবেলে—ম্যাপল হোয়াইট, লেক

*আমেরিকায় সাদা নিগ্রো অথবা রঞ্জকহীন উদ্ভিদ অথবা অস্বাভাবিক সাদা চামড়ার মানুষকে অ্যালবিনো বলে।—অনুবাদক

এভিনু্য ডেট্রয়েট, মিচিগান। এ নাম যতবার আমি শুনব ততবার শ্রদ্ধা জানাবো মাথার টুপি খুলে। যে কৃতিত্ব একদিন আমার প্রাপ্য হবে তার সমান অংশীদার হবে সে-ও। প্রতিভায় ম্যাপল হোয়াইট আমার সমকক্ষ এই একটি ব্যাপারে।

'ঝুলির অন্যান্য জিনিসপত্র দেখে বুঝলাম, লোকটা একাধারে শিল্পী আর কবি। তাই বেরিয়েছিল প্রকৃতির মধ্যে উপাদানের সন্ধানে। কবিতা কিছু কিছু দেখলাম। ও জিনিসটা আমি বুঝি না। কিন্তু যা দেখলাম, তার মত নিকৃষ্ট কবিতা আর হয় না। নদীর নিসর্গ দৃশ্য খানকয়েক দেখলাম—মামুলি ছবি, আর পেলাম এক বাক্স রঙ, এক বাক্স রঙীন খড়ি, একটা বাঁকানো হাড়—ঐ দেখুন রয়েছে আমার দোয়াতদানির ওপর, মথ আর প্রজা-পতি সম্পর্কে বাক্সটারের লেখা একখানা বই, কয়েকটা তুলি, একটা সস্তার রিভলবার আর কিছু কার্তুজ। আর বোধহয় কিছুই ছিল না সঙ্গে, থাকলেও বনেজঙ্গলে টো-টো করবার সময়ে হারিয়েছে। অদ্ভুত সেই আমেরিকান ভবঘুরের এই হল মোটামুটি বৃত্তান্ত।

'চলে আসার সময়ে নজরে পড়ল কি যেন একটা ঠেলে রয়েছে লোকটার ছেঁড়া কোটের পকেটে। দোমড়ানো মোচড়ানো একটা স্কেচ বুক—আপনার সামনেই যা দেখছেন। জিনিসটা আমার দখলে আসার পর থেকে যতটা কদর পেয়েছে ততটা কদর সেক্সপীয়ারের প্রথম লেখা কোনো পাণ্ডুলিপিও পাবে না। অমূল্য সেই জিনিসই তুলে দিচ্ছি আপনার হাতে। পাতার পর পাতা খুলে নয়ন সার্থক করুন।'

একটা চুরুট ধরিয়ে প্রফেসর কটমটে সমঝদার চোখে দেখতে লাগলেন দলিল দেখে আমার মুখচ্ছবি কি রকম হয়।

দারুণ একটা কিছু দেখব, এই আশা নিয়ে খুলেছিলাম স্কেচবুকটা—যদিও কি দেখব তা কল্পনা করতে পারিনি। প্রথম পৃষ্ঠা হতাশ করল। একটা মোটা লোকের ছবি এঁকে তলায় লেখা—'ডাক-নৌকোয় জিমি ক্লোভার'। পরের কয়েকটা পৃষ্ঠায় আঁকা ইণ্ডিয়ানদের দৈনন্দিন জীবনের খসড়া ছবি। এই রকম আরও দু-একটা লোকের আর বাচ্চাদের ছবির পর পর-পর আঁকা রয়েছে জন্তুজানোয়ারের ছবি। তলায় লেখা 'স্যাণ্ড ব্যাকে ম্যানাটি,' 'কচ্ছপ আর তাদের ডিম,' 'মিরিতি তালগাছের তলায় কালো অ্যাজুইতি'—শেষের জন্তুটা অনেকটা শুয়ারের মত দেখতে। তারপর দু-পাতা জুড়ে আঁকা বিটকেল চেহারার একটা সরীসৃপ প্রাণীর ছবি। মাথা মুণ্ডু কিচ্ছু বুঝলাম না। স্বীকারও করলাম প্রফেসরের কাছে।

দারুণ একটা কিছু দেখব, এই আশা নিয়ে খুলেছিলাম স্কেচবুকটা। পৃঃ ৩৩

'কুমীর নিশ্চয় ?'

'অ্যালিগেটর! অ্যালিগেটর! দক্ষিণ আমেরিকায় সত্যিকারের কুমীর কি পাওয়া যায় ? কুমীর আর অ্যালিগেটরের মধ্যে তফাৎটা—'

'কিন্তু চাঞ্চল্যকর কিছুই তো দেখছি না।'

ধ্যানী বুদ্ধর মত স্বর্গীয় হাসি হাসলেন প্রফেসর।

বললেন—'পরের পৃষ্ঠাটা দেখলেই তো হয়।'

পরের পৃষ্ঠাতেও চমকে ওঠার মত কিছু চোখে পড়ল না। পাতাজোড়া একটা নিসর্গ দৃশ্য—হাল্কা রঙে আঁকা—পরে যা দেখে ভাল করে আঁকবে বলে শিল্পীরা স্কেচ করে নেয়—সেই ধরনের নকশা। ফিকে সবুজ মাঠ আর বন আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে মিশেছে ঘন লাল পর্বত শ্রেণীতে—অদ্ভুত খাঁজ কাটা পাহাড়—আগ্নেয় শিলায় নির্মিত হলে যেমন দেখায়। একটানা প্রাচীরের মত বিস্তৃত রয়েছে এই পর্বত শ্রেণী। এক জায়গায় ব্যতিক্রম স্বরূপ দেখা যাচ্ছে পিরামিড-সদৃশ একটা পর্বতচূড়া—পাহাড়ের মাথায় একটা গাছ—বিশাল গাছ। তার পেছনে নীল নিরক্ষীয় আকাশ। লাল পর্বত ঘিরে রয়েছে ফিকে সবুজ বনানী। পরের পৃষ্ঠায় জল রঙে আঁকা ঐ একই ছবি আঁকা হয়েছে আরো কাছ থেকে—যাতে খুঁটিয়ে দেখতে সুবিধে হয়।

'কি দেখলেন ?' শুধোলেন প্রফেসর।

'অদ্ভুত নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমি ভূতত্ত্ববিদ হলে আশ্চর্য কিছু চোখে পড়ত।'

'আশ্চর্য মানে ? বলুন, তুলনাবিহীন! বলুন, অবিশ্বাস্য! পৃথিবীর কেউ আজ পর্যন্ত এমন সম্ভাবনা কল্পনাতেও আনতে পারেনি। পরের পৃষ্ঠাটা এবার দেখুন।'

পাতা ওলটালাম এবং বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম। পাতা-জোড়া অত্যন্ত অসাধারণ এক প্রাণীর ছবি—জীবনে অমন প্রাণী আমি দেখিনি।

আফিংখোরের দুরন্ত কল্পনা নিশ্চয়—দুঃস্বপ্ন আর প্রলাপের সংমিশ্রণ। মাথাটা মোরগের মাথার মত, দেহটা ফুলে ওঠা গিরগিটির মত, ল্যাজটা লম্বা—লুটিয়ে রয়েছে এঁকেবেঁকে ধরণীবক্ষে—কিন্তু খাড়া-খাড়া বর্শাফলকে ছাওয়া ওপরের দিকটা, পৃষ্ঠদেশ বক্র এবং করাতের উঁচু দাঁতের মত কাটা কাটা খাঁজ—ঠিক যেন ডজন খানেক কুক্কুটের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ক্ষুদ্র সংস্করণের মানব অথবা মানবাকৃতি বামন। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে

রয়েছে কিম্ভূতকিমাকার জন্তুটার দিকে।

বিজয়োল্লাসে দু-হাত ঘষতে ঘষতে বললেন প্রফেসর—'কি মনে হয়?'

'দানবিক – কিম্ভূতকিমাকার।'

'কিন্তু এ রকম একটা জানোয়ার অঙ্কনের প্রেরণাটা মাথায় এল কেন বলুন দিকি?'

'খুব কড়া জিন মদ্য খেয়েছিল নিশ্চয়।'

'বটে? এর চাইতে উত্তম ব্যাখ্যা মাথায় এল না বুঝি?'

'আপনার ব্যাখ্যাটা বলুন না শুনি।'

'ব্যাখ্যা তো একটাই – অবশ্যম্ভাবী ব্যাখ্যা। এ-প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। জীবন্ত প্রাণীর স্কেচ।'

হো-হো করে হেসে উঠতে গিয়ে আমার সেই ঘূর্ণায়মান চক্রের মত সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে যেতে হবে মনে পড়ায় অতি কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে।

বললাম—'নিঃসন্দেহে, নিঃসন্দেহে!' বললাম অনেকটা অবোধকে প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গিতে। 'ধোঁকা লাগছে কেবল ঐ পুঁচকে মানুষের ছবিটা নিয়ে। ইণ্ডিয়ান জংলী হলে না হয় বলতাম আমেরিকার পিগমি জাতীয় কেউ। কিন্তু তা তো নয়। এ তো দেখছি ইউরোপীয়, মাথায় রোদ্দুরঢাকা টুপীও রয়েছে।'

ক্রুদ্ধ মোষের মত নাসিকাগর্জন করলেন প্রফেসর—'বাস্তবিকই আপনি আমার ধৈর্যের সীমা ছুঁয়ে ফেলছেন। আপনার মগজ সম্বন্ধে ঠিক যা ভেবে-ছিলাম—দেখছি আপনি তার চাইতে এক কাঠি সরেস। আপনার মগজের খানিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে! মানসিক নিষ্ক্রিয়তায় ভুগছেন! আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!'

এরকম অতীব উদ্ভট লোককে নিয়ে রাগা কি যায়? এ লোকের ওপর চটতে শুরু করলে অষ্টপ্রহর চটেই থাকতে হবে—শক্তির অপচয়ই হবে। আচ্ছা সৃষ্টি ছাড়া মানুষ যা হোক! তাই একটু কাষ্ঠ হেসেই মনকে মানিয়ে নিলাম।

বললাম—'দেখে তো মনে হল লোকটা বেজায় বেঁটে।'

গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। ঝুঁকে পড়ে লোমশ সসেজের মত প্রকাণ্ড একখানা আঙুল ছবির এক জায়গায় টিপে ধরে বললেন গলাবাজি করে—'এই খানটায় তাকান না মশায়! জানোয়ারটার ঠিক পেছনেই গাছটা দেখছেন তো? হলুদ ফুলের ড্যাণ্ডেলাইয়ন অথবা বাঁধা-

কপির মত কুঁড়িওলা ব্রুসেল্‌স্‌ স্প্রাউট ভেবেছিলেন নিশ্চয় ? তাই তো ? মোটেই তা নয়। এ হল উদ্ভিজ্জ হস্তীদন্ত তালবৃক্ষ—লম্বায় দেখুন পঞ্চাশ থেকে ষাটফুট পর্যন্ত। লোকটাকে সামনে আঁকা হয়েছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে, এটা মাথায় ঢুকল না কেন! ঐ রকম একটা রাক্ষুসে জানোয়ারের সামনে বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় ছবিটা আঁকেনি শিল্পী ? উচ্চতার মাপকাঠি হিসেবে নিজেকে এঁকেছে। ধরা যাক, সে মাথায় পাঁচফুটের একটু বেশী। গাছটা তার দশগুণ লম্বা—এ ছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্ত মাথায় আসে কি ?'

'বলেন কী! তাহলে কি বলতে চান জানোয়ারটার সাইজ—আরে মশায় শেরিংক্রশ স্টেশনেও তো একে আঁটানো যাবে না !'

নির্বিকারভাবে প্রফেসর বললেন—'শুধু তাই নয়, অতিরঞ্জন যদি বাদও দেন, জন্তুটা নিঃসন্দেহে বাচ্চা নয়।'

উত্তেজনায় আমার কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে চড়ছিল—'কিন্তু এই একখানা মাত্র স্কেচের পরিপ্রেক্ষিতে মানব জাতটার যাবতীয় জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' বলতে বলতে পাতার পর পাতা উল্টে গেলাম। কিন্তু আর কিছুই চোখে পড়ল না—'একখানা মাত্র স্কেচ। এঁকেছে একজন আমেরিকান ভবঘুরে। হয়তো গাঁজা টেনেছিল, নয়তো সিদ্ধি খেয়েছিল, অথবা হয়তো জ্বরের ঘোরে প্রলাপের বদলে উদ্ভট ছবি এঁকে বসেছিল, নয়তো নিছক একটা আজগুবী কল্পনা চরিতার্থ করার জন্যে ছবি এঁকে উর্বর মস্তিষ্ককে শান্ত করেছিল। আপনি বিজ্ঞান সাধক, এ জিনিসের পক্ষ নিয়ে লড়াই করা আপনাকে তো মানায় না।'

উত্তরে প্রফেসর বইয়ের তাক থেকে টেনে নামালেন একখানা বই।

বললেন—'আমার ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাবান বন্ধু রে ল্যাঙ্কাস্টারের অত্যুৎকৃষ্ট নিবন্ধ পুস্তক রাখলাম আপনার সামনে। এই দেখুন, এইখানে একটা ছবি রয়েছে—ছবিটা আপনার মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করবেই করবে। এই তো —এই যে—পেয়েছি! তলায় দেখুন লেখা রয়েছে: 'জুরাসিক ডাইনোসর স্টেগোসরাসের সম্ভাব্য সজীব আকৃতি। শুধু পেছনের পা-খানাই পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের চাইতে দু-গুণ লম্বা। এবার বলুন দিকি কি মনে হয় ?'

খোলা বইখানা আমার হাতে গছিয়ে দিলেন প্রফেসর। ছবিটার দিকে তাকাতেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হল। বহু বছর আগে জগতে এককালে একটি জীব বিচরণ করেছিল, যে জীব এখন আর নেই, অথচ অজ্ঞাত আর্টিস্ট যার ছবি এঁকে এনেছে তার সঙ্গে দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে

অধুনালুপ্ত ছবির এই জীবটির।

বললাম বিমূঢ় কণ্ঠে—'একী আশ্চর্য ব্যাপার!'

'মন কিন্তু এখনো আপনার নিঃসংশয় নয়, স্বীকার করুন।'

'আমার তো মনে হয় নিছক কাকতালীয়। অথবা এই জাতীয় একটা ছবি আমেরিকান ভবঘুরে কোথাও হয়ত দেখেছিল—মনেও ছিল। জ্বরের ঘোরে দুঃস্বপ্নের আকারে স্মৃতির পর্দা থেকে ছবি নেমে এসেছে স্কেচবুকের পাতায়।'

'বলেছেন ভালই,' প্রফেসর যেন প্রশ্রয় দিয়ে গেলেন আমার বাচালতাকে—'স্কেচবুক এখন থাক। এই হাড়খানার দিকে এবার তাকান।'

বলে, যে হাড়খানা আমার হাতে উনি তুলে দিলেন তার বর্ণনা একটু আগেই শুনিয়েছিলেন—মৃত ব্যক্তির ঝুলি থেকে পাওয়া সেই অস্থি। লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক। আমার বুড়ো আঙুলের চাইতেও মোটা। তরুণাস্থির মত কি যেন লেগে রয়েছে।

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। অর্ধ-বিস্মৃত জ্ঞানকে স্মরণ পথে টেনে আনার চেষ্টা করলাম। বললাম—'নরদেহের খুব মোটা গলার হাড় হতে পারে।'

বিপুল অবজ্ঞায় হস্ত সঞ্চালন করলেন প্রফেসর।

'নরদেহের গলার হাড় হয় বাঁকানো। এটা সোজা। হাড়ের ওপরে একটা খাঁজকাটা দাগ দেখছেন? বিরাট একটা কণ্ডরা, মানে, পেশী আর অস্থির বন্ধনী ছিল ঐ খাঁজের মধ্যে। কণ্ঠায় বা গলার হাড়ে যা থাকে না।'

'তাহলে বলবো আমার মাথায় কিসসু ঢুকছে না।'

'আপনার অজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে লজ্জিত হওয়ার দরকার নেই। কেন না, আমার তো মনে হয় এ-হাড় চেনবার মত মানুষ গোটা সাউথ কেনসিংটনেও নেই।' বলতে বলতে ওষুধের বড়ি রাখবার কৌটো থেকে বার করলেন মটর দানার মত ছোট্ট একটা হাড়। 'মানুষের দেহের হাড় এটা—আর আপনার হাতে যেটা রয়েছে, ওটা এই হাড়েরই বৃহৎ সংস্করণ বলতে পারেন। দৈত্যাকার একটা রাক্ষুসে প্রাণীর হাড় ধরে রয়েছেন আপনি। এবার জানোয়ারটার আয়তন খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন। তরুণাস্থি দেখেই বুঝছেন, জীবাশ্ম এটা নয়—সাম্প্রতিক কালের হাড়। বলুন কি বলবেন?'

'হাতির হাড় নয় তো—'

যেন বিষম যন্ত্রণাবোধে চোখ কুঁচকোলেন প্রফেসর।

'দক্ষিণ আমেরিকায় হাতী! কি আবোল তাবোল বকছেন! এ-যুগের

একটা স্কুলের বাচ্চাও জানে—'

বাধা দিয়ে বললাম—'দক্ষিণ আমেরিকার বড় গোছের যে কোনো জানোয়ারও তো হতে পারে। যেমন, টেপির—শুয়ারের মত দেখতে—'

'ইয়ংম্যান, এই বিষয়টিতে আমার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে—খেয়াল রাখবেন। প্রাণীবিজ্ঞানে যে সব প্রাণীদের কুলজি জেনে বসে আছি, এ-হাড় তাদের কারোর নয়—টেপিরের তো নয়ই। এ হাড় খুব প্রকাণ্ড সাইজের এমন একটা প্রাণীর হাড় এককালে যার অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে—কিন্তু যার খবর আজও বিজ্ঞান পায়নি। বিশ্বাস হল না নিশ্চয় ?'

'না হলেও, কৌতূহল হয়েছে।'

'তা হলে বলব পুরোপুরি অপদার্থ আপনি নন। আপনার মধ্যে যুক্তিবোধ ঘাপটি মেরে আছে—এ ধারণা প্রথম থেকেই এসেছে আমার মধ্যে। দেখা যাক সেই যুক্তিবুদ্ধিকে হাতড়ে পাকড়াও করে আনা যায় কিনা। মৃত আমেরিকান এখন শিকেয় তোলা থাক—আমার কথা কান খাড়া করে শুনে যান। ব্যাপারটা তলিয়ে না দেখে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছি, এমন কল্পনাও মাথায় ঠাঁই দেবেন না। ভবঘুরে লোকটা কোন দিক থেকে ধুঁকতে ধুঁকতে গ্রামের মধ্যে ঢুকেছিল, সেটা বার করতে বেগ পেতে হয়নি। ইণ্ডিয়ান জংলীদের মধ্যে অদ্ভুত একটা জনশ্রুতি আছে। শুধু তার ভিত্তিতেই পথের নির্দেশ পেয়েছিলাম। ও অঞ্চলে একটা জোর গুজব শোনা যায়। নদীর ধারে ধারে যত উপজাতি দেখবেন, গুজবটা প্রত্যেকেই শোনাবে আপনাকে। কুরুপুরির নাম নিশ্চয় শুনেছেন ?'

'জীবনে না।'

'কুরুপুরি হল বনের অধিদেবতা। ভয়ংকর ক্রূর কুটিল মূর্তিমান জিঘাংসা—এড়িয়ে যাওয়াই মঙ্গল। তাকে দেখতে কি রকম, তার প্রকৃতি কি রকম, কেউ তা বলতে পারবে না। কিন্তু গোটা আমাজন অঞ্চলে শুনবেন তার বুক কাঁপানো ভয়ংকর কাহিনী। সবাই কিন্তু একটা ব্যাপারে একমত—কুরু-পুরির নিবাস কোনদিকে, সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই কারো মধ্যে। মৃত আমেরিকান ভবঘুরের আবির্ভাব ঘটেছিল ঠিক সেইদিক থেকেই। ভয়ানক কিছু একটা আছে সেইদিকে। কি সেই ভয় দেখানো ভয়ানক, তা জানাটাই আমার আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো।'

'কি করলেন তখন ?' বাচালতা উবে গেছিল আমার মধ্যে থেকে। ভদ্রলোক মনোযোগ কেড়ে নিতে জানেন, সম্মান আর শ্রদ্ধা আদায় করতে

পারেন।

'জংলীরা রামভীতু। ও অঞ্চল সম্বন্ধে মুখ খুলতেই চায় না। কিন্তু বুঝিয়ে সুঝিয়ে, নানারকম উপহার গছিয়ে, এমন কি স্বীকার করতে লজ্জা নেই—প্রাণের হুমকি দেখিয়ে দুজন পথ প্রদর্শককে জোগাড় করলাম। অনেক অ্যাডভেঞ্চারের পর (যা আমি বলতে চাই না), অনেক পথ যাওয়ার পর (যার বিবরণ আমি দিতে চাই না), বিশেষ একটা দিকে দিনের পর দিন রাতের পর রাত অগ্রসর হওয়ার পর (যে দিকটাও আমি ফাঁস করতে চাই না), অবশেষে এসে পৌঁছোলাম এমন একটা অঞ্চলে যার বর্ণনা আজও সভ্য-মানুষ পায়নি, আজও যেখানকার মাটি কেউ মাড়ায়নি—হতভাগ্য ঐ ভবঘুরে ছাড়া। দয়া করে এই ছবিটার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বাধিত হব।'

হাফ-প্লেট সাইজের একটা ফটোগ্রাফ আমার হাতে দিলেন প্রফেসর।

বললেন—'ছবিটার চেহারা সন্তোষজনক নয়। তার কারণও আছে। নদীপথে ফেরবার সময়ে নৌকো উল্টে গেছিল। যে বাক্সর মধ্যে আনডেভালাপ্‌ড্‌ ফিল্মগুলো ছিল—সেটা ভেঙে যায়। ফলটা হয়েছে যাচ্ছেতাই। প্রায় সব ফটোই নষ্ট হয়ে যায়—যে ক্ষতিপূরণ আর হবে না। খানকয়েক ফটো রক্ষে পায়। ছবির অস্বাভাবিকতা অথবা ত্রুটি দয়া করে মানিয়ে নেবেন। সেই কারণেই ছবিগুলো নাকি জাল, এমন কথাও উঠেছে। ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার মেজাজ আমার নেই।'

ফটোগ্রাফটা বাস্তবিকই বিরঙ, বিবর্ণ। ঐ রকম আবছা ছবি দেখে যে কোনো সমালোচক অনেক কটুক্তিই শোনাতে পারে—সেটা তার দোষ নয়। ম্যাড়মেড়ে ধূসর একটা নিসর্গ দৃশ্যের ছবি—এইটুকুই কোনমতে বোঝা যায়। চোখ পাকিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল টানা লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু এবড়ো খেবড়ো পর্বত শ্রেণী দেখছি অনেক দূরে—ঠিক যেন বহুদূরের একটা জলপ্রপাত—ঢালু হয়ে বনানী সমাকীর্ণ পর্বতগাত্র নেমে এসেছে সামনের সমতল ভূমিতে।

বললাম—'আঁকা ছবির জায়গাটাই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে নয়, বৎস, এইটাই সেই জায়গা। ভবঘুরের তাঁবুর চিহ্ন পেয়েছিলাম। এবার দেখুন এই ছবিটা।'

একই জায়গার ছবি, তবে আরো কাছ থেকে তোলা। অত্যন্ত অস্পষ্ট ফটোগ্রাফ। তা সত্ত্বেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম দলছাড়া একটা পাহাড়চুড়ো ঘিরে রয়েছে লম্বা লম্বা গাছ। এবড়ো খেবড়ো পর্বত শ্রেণী থেকে একেবারেই আলাদা সেই বৃক্ষপরিবৃত শীর্ষদেশ।

'নিঃসন্দেহে সেই জায়গারই ছবি,' বললাম আমি।

'তাহলে বেশ খানিকটা এগোনো গেল। পাহাড়টার চূড়োয় নজর রাখুন এবার। কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

'বিশাল একটা গাছ।'

'গাছটার ওপরে?"

'বিরাট একটা পাখী।'

একটা আতস কাঁচ আমার হাতে গুঁজে দিলেন প্রফেসর।

তাকালাম লেন্সের মধ্যে দিয়ে। বললাম—'গাছের ওপর বসে বিরাট একটা পাখী। চঞ্চুটা প্রকাণ্ড। পেলিক্যান নিশ্চয়।'

'আপনার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করতে পারলাম না। পেলিক্যান নয়, পাখীও নয়। যা দেখছেন, ওকে গুলি করে মাটিতে ফেলেছিলাম আমি। আমার এই অসম্ভবের অভিযান থেকে অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ এনেছিলাম শুধু একেই—আর কিচ্ছু নয়।'

অকাট্য প্রমাণটা তাহলে এবার দেখা যাবে। উল্লসিত স্বরে বললাম—'আছে আপনার কাছে?'

'ছিল। নৌকো দুর্ঘটনায় ফিল্মগুলো নষ্ট তো হয়েই ছিল—অকাট্য এই প্রমাণটাও জলে ভেসে যায়। ঘূর্ণিপাকের মধ্যেও প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলাম ডানার খানিকটা—সেইটুকুই কেবল থেকে যায় আমার মুঠোয়। তীরে এসে পড়েছিলাম অজ্ঞান অবস্থায়, কিন্তু আশ্চর্য নমুনার যৎকিঞ্চিৎ তখনো থেকে গেছিল মুঠোর মধ্যে। এবার তা রাখছি আপনার সামনে।'

ড্রয়ার থেকে যে জিনিসটা বার করলেন প্রফেসর, দেখে মনে হল তা বাদুড়ের ডানার ওপরের অংশ। লম্বায় প্রায় দু-ফুট। হাড়টা বাঁকানো। তলায় ঝিল্লীর আচ্ছাদন।

'রাক্ষুসে বাদুড়!' বললাম আমি।

কঠোর কণ্ঠে প্রফেসর বলে উঠলেন—'একেবারে নয়। শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেও প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে এতটা কম জ্ঞান আশা করা যায় না। প্রাণী বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রটাই আপনি জানেন না? তুলনা মূলক শারীরস্থানের প্রাথমিক জ্ঞানও অর্জন করেন নি, এও কি সম্ভব? আপনি কি জানেন না, পাখীর ডানা আসলে তার সামনের বাহু, আর বাদুড়ের ডানা আসলে তার ঝিল্লী ঢাকা তিনটে লম্বা আঙুল? যা দেখছেন, তা কিন্তু বাহু নয়, একটা মাত্র হাড়ের ওপর ঝুলছে ঝিল্লীপর্দা—কাজেই এ হাড় বাদুড়েরও নয়। যদি পাখী না হয়, বাদুড়ও না হয়—তবে কী?'

আমার জ্ঞানের সীমিত ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাওয়ায় সরাসরি তা স্বীকার করলাম—'আমার জানা নেই।'

যে বইটা একটু আগে দেখিয়েছিলেন প্রফেসর, আবার খুললেন সেই বইয়ের পাতা। অসাধারণ একটা উড়ুক্কু রাক্ষসের ওপর আঙুল রেখে বললেন—'এই যে ছবিখানা দেখছেন, জুরাসিক আমলের উড়ুক্কু সরীসৃপ অথবা টেরোড্যাকটাইল অথবা ডাইমোরফোডনের এত ভাল ছবি আপনি আর কোথাও দেখতে পাবেন না। পরের পৃষ্ঠায় দেখুন ডানার যন্ত্রাংশ দেখানো হয়েছে। আপনার হাতের ঐ নমুনাটার সঙ্গে এবার দয়া করে মিলিয়ে নিন।'

বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল আমার ওপর দিয়ে ছবিটার দিকে তাকাতেই। দৃঢ়মূল হল বিশ্বাস—না, আর কোনো সন্দেহ নেই। প্রমাণটা অভিভূত করে দেওয়ার মত। স্কেচ দেখেছি, ফটোগ্রাফ দেখেছি, বর্ণনা শুনেছি, এখন দেখলাম সত্যিকারের নমুনা। এতগুলো প্রমাণ সমষ্টিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—প্রফেসর ষোল আনা প্রমাণ হাজির করেছেন ধাপে ধাপে। মুখেও তা ব্যক্ত করলাম—সোল্লাসে সোচ্ছ্বাসে জয়ধ্বনি দিলাম। প্রফেসরের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, তা উপলব্ধি করেই আমার প্রশংসার বাঁধ খুলে দিলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলেন প্রফেসর অর্ধনিমীলিত চোখে—ঠোঁটের কোণে জেগে রইল বালখিল্যের উচ্ছ্বাস দেখে কৌতুক-তরলিত সংযত হাসি—ভাবখানা যেন পরম মেজাজে আধবোঁজা চোখে মিষ্টি রোদ পোহাচ্ছেন।

বিপুল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লাম বটে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস সাংবাদিকের উচ্ছ্বাস—বৈজ্ঞানিক উচ্ছ্বাস একেবারেই নয়। বললাম কল কল কণ্ঠে—'জীবনে এত বিরাট ব্যাপার আর আমি শুনিনি। আপনার এই কীর্তি শুধু মহান নয়, অবিস্মরণীয় নয়—অতিকায়! বিজ্ঞানের কলম্বাস আপনি। কলম্বাস ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়েছেন আমেরিকা আবিষ্কার করে—আপনি হলেন একটা অজ্ঞাত জগৎ আবিষ্কার করে। আপনাকে সন্দেহ করার স্পর্ধা আমার নেই—কিন্তু আমার ভাবসাব দেখে নিশ্চয় তাই মনে হয়েছিল আপনার। সে জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এ যে ভাবাও যায় না! যত আকাটই হই না কেন, সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে বোঝবার মত ছিটেফোঁটা বুদ্ধি আমার আছে। শুধু আমি কেন, এ জিনিস যে দেখবে, বিশ্বাস তাকে করতেই হবে।'

হৃষ্টচিত্তে ফর-র্-র্ ফর-র্-র্ আওয়াজ ছাড়তে লাগলেন প্রফেসর

ঠিক যেন একটা মস্ত বিড়াল।

বললাম—'এবার বলুন তারপর কি করলেন।'

'তখন বর্ষাকাল। আমার খাবার দাবারের ভাঁড়ারও খালি। বিরাট এই পাহাড়ের খানিকটা অঞ্চলে অভিযান চালনা করলাম বটে, কিন্তু ওপরে ওঠার কোনো পথ খুঁজে পেলাম না। পিরামিডের মত ঐ যে পাহাড়টা, যার মাথায় টেরোড্যাকটিলটাকে বসে থাকতে দেখে গুলি করে নামিয়ে এনেছিলাম—ঐ পাহাড়টায় তবুও ওঠা যায়। পর্বতারোহণ আমার হবি। তাই চুড়োর কাছে যেতে না পারলেও, অর্ধেক পথ উঠেছিলাম। জায়গাটা বেশ উঁচু বলেই মালভূমিটাকে আরো ভালভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। টানা লম্বা এবড়ো খেবড়ো পাঁচিলের মত পর্বতশ্রেণীর পূবে বা পশ্চিমে কোনো শেষ দেখতে পেলাম না—সবুজ বনভূমি ছাওয়া খাড়াই পাহাড়ের পর পাহাড় ছাড়া কোনো ফাঁক ফোকর চোখে পড়ল না। পর্বতপ্রাচীরের তলায় জলার মত খানিকটা জংলা জায়গা। সাপে ভর্তি। পোকামাকড় আর জরজ্বালায় দুর্গম। প্রকৃতি নিজেই যেন পাহারার ব্যবস্থা রেখেছেন এইভাবে—যাতে অত্যাশ্চর্য ঐ দেশে কেউ পৌঁছোতে না পারে।'

'প্রাণের আর কোনো লক্ষণ দেখেছিলেন?'

'না, দেখিনি। কিন্তু পর্বতপ্রাচীরের গোড়ায় একহপ্তা তাঁবু খাটিয়ে থাকবার সময়ে মাথার ওপরে অনেক অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছিলাম।'

'আমেরিকান ভবঘুরের আঁকা প্রাণীটা দেখেননি? সে তাহলে আঁকল কি দেখে?'

'অনুমানে বলা যায়, চূড়ায় ওঠবার পথের সন্ধান সে পেয়েছিল নিশ্চয়। উঠেওছিল। ছবিটা এঁকেছিল সেইখানে। কাজেই, ওঠবার পথ একটা আছে। আলবৎ আছে। কিন্তু সে পথ অতিশয় দুর্গম। তা না হলে ঐ দানব-প্রাণী নিচে নেমে এসে ও তল্লাটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করত। কী, মাথায় ঢুকেছে?'

'কিন্তু দানব প্রাণীরা ও তল্লাটে গেল কি করে বুঝিয়ে দিন?'

'সমস্যাটা খুব জটিল বলে তো মনে হয় না আমার। ব্যাখ্যা তো একটাই। শুনে থাকতে পারেন, দক্ষিণ আমেরিকা জায়গাটা একটা গ্র্যানাইট মহাদেশ। মহাদেশের ভেতর দিকে শুধু বিশেষ এই জায়গাটায় আচম্বিতে প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জমি ঠেলে উঠে গেছিল ওপর দিকে। এই যে পর্বত প্রাচীর দেখছেন, এটা কিন্তু ব্যাসাল্ট পাথরের পাহাড়—কাজেই প্লুটোনিক*।

*আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত।—অনুবাদক

টেরোড্যাকটিলটাকে গুলি করে নামিয়ে এনেছিলাম। পৃঃ ৪৩

প্রায় সাসেক্স জেলার মত বিরাট একটা অঞ্চল আচমকা হুড়-হুড করে সেই তল্লাটের সমস্ত জন্তুজানোয়ার গাছপালা সমেত উঠে যায় অনেক উঁচুতে খাড়াই আগ্নেয় পাথরের দেওয়াল ঘেরা অবস্থায়। সে পাথর এত কঠিন যে যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিন্দুমাত্র চিড় খাওয়াতে পারেনি তার গায়ে। ক্ষয়ে যায়নি বৃষ্টি বাদলায় ঝড় তুফানে। পরিণামটা তাহলে কি দাঁড়ায়? প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের আর জারিজুরি খাটল না সেখানে। স্থগিত হয়ে গেল প্রাকৃতিক বিবর্তন। নানারকম ঘাত প্রতিঘাত প্রতিবন্ধক আর প্রতিকূল অবস্থার প্রভাবেই অস্তিত্ব রক্ষার যে সংগ্রাম—তার কিন্তু অভাব দেখা গেল অঞ্চলটায়। লক্ষ্য করলেন তো টেরোড্যাকটিল আর স্টিগোসরাস—দুজনেই কিন্তু জুরাসিক যুগের* জীব। প্রাণী বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাসে সে যুগটা নেহাৎ ছোট নয়। অদ্ভুত দুর্ঘটনা কৃত্রিমভাবে টিঁকিয়ে রেখেছে তাদের বিলুপ্ত প্রাণবিবর্তনের সেই অধ্যায়টিকে।'

বললাম—'আপনার সাক্ষ্য প্রমাণে ফাটল দেখছি না কোথাও। এই সব নিয়েই আপনার যাওয়া উচিত যোগ্য মহলের কর্তাদের কাছে।'

তিক্তস্বরে প্রফেসর বললেন—'আমি সরল মানুষ। সরল বিশ্বাসে ঠিক ঐ রকমটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ফলটা হয়েছে অন্যরকম। পদে পদে অবিশ্বাসের সম্মুখীন হয়েছি। খানিকটা নির্বুদ্ধিতার জন্যে, খানিকটা ঈর্ষার বশে আমার একটা কথাও কেউ বিশ্বাস করেনি। কেউ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে, তবে তা প্রমাণ করার জন্যে কাকুতি মিনতি করা আমার ধাতে নেই। প্রথম ধাক্কাটা খাওয়ার পর এই যে অকাট্য প্রমাণগুলো দেখলেন—তার কোনোটাই আর হাজির করিনি—এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কাউকে বলিনি। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে এখন এমনই ঘৃণার্হ যে এ নিয়ে কথা বলতেও আর চাই না। সাধারণ লোকের নির্বোধ কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে আপনার মত লোকেরা যখন আমার নিরালা সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে আসে, তখন আত্মমর্যাদা বজায় রেখে সংযম রক্ষা করতে

---

*২৩০,০০০,০০০ বছর আগে থেকে ৬৩,০০০,০০০ বছর আগেকার মধ্যবর্তী প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বলা হয় মেসোজোয়িক যুগ। এই সময়ের কিছুটা অংশের নাম্ জুরাসিক যুগ—যখন টেরোড্যাকটিল, স্টিগোসরাসরা পৃথিবীতে বিচরণ করেছে। ফ্রান্স আর সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী জুরা পর্বতশ্রেণী থেকে জুরাসিক নামটা নেওয়া হয়েছে। অদ্ভুত পর্বতসংস্থান দেখা গেছিল এখানে। দেখেছিলেন জার্মান ভূবিজ্ঞানী ফন হামবোল্ডট

—অনুবাদক

পারি না, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার স্বভাবটা একটু উগ্র। খোঁচা খেলে দাঙ্গাবাজ হয়ে যাই। আপনার অভিমতও নিশ্চয় তাই।'

কালসিটে পড়া চোখে হাত বুলিয়ে নিয়ে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

'এ-ব্যাপারে বহুবারে আমাকে এক হাত নিয়েছে আমার স্ত্রী। তা সত্ত্বেও বলব, যে-কোনো আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ এই অবস্থায় একই কাণ্ড করে বসত। আজ রাত্রে কিন্তু আমার এই উগ্রচণ্ড আবেগকে সংযত রেখেছি নিদারুণ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে—আমার প্রচণ্ড সংযমশক্তির এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর হয় না। এই ইচ্ছাশক্তি আর সংযমশক্তির প্রদর্শনীতে আর একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে।' টেবিল থেকে একটা কার্ড তুলে নিয়ে আমার হাতে গছিয়ে দিলেন প্রফেসর। 'আজ রাত সাড়ে আটটায় প্রাণীবিজ্ঞান সংস্থার হলঘরে 'রেকর্ড অফ দ্য এজেস' সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন মোটামুটি প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ মিস্টার পার্সিভ্যাল ওয়ালড্রন। মঞ্চে উপস্থিত থেকে বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বিশেষ আমন্ত্রণ এসেছে আমার কাছে। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করব আমি। অসীম কৌশলে সূক্ষ্মভাবে আমার কাজটি সেরে নেব। এমন কিছু মন্তব্য নিক্ষেপ করব যা সুধীজনের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করবে—বিষয়টার আরো গভীরে এইভাবে কয়েকজনকে টেনে নামাবো। শুধু ইংগিত দেব। আভাসে বুঝিয়ে দেব, যা জানি আমরা, তার ওপরেও আছে গভীরতর জ্ঞানের দেশ। কড়া হাতে লাগাম টেনে ধরে রাখব আমার এই অগ্নিশর্মা মেজাজের এবং আপনি দেখবেন আত্মসংযম দিয়ে আরো ভালো ফল ফলিয়ে ছাড়ব।'

সাগ্রহে বললাম—'আমি আসতে পারি?'

সদয় কণ্ঠে প্রফেসর বললেন—'নিশ্চয়।' ভদ্রলোকের মেজাজে দুটো প্রান্তই চূড়ান্ত রকমের। হিমালয়প্রতিম অমায়িকতায় বিনয়ের অবতার যেমন হতে পারেন, তেমনি আবার দপ করে জ্বলে উঠে মারধরও করতে পারেন। দুটোই গভীর দাগ কেটে যায় মনের মধ্যে—অভিভূত করে যে কোনো মানুষকে। পরোপকারের সদিচ্ছা মধুর তাঁর ঐ মিষ্টি হাসি প্রকৃতই আশ্চর্য—তুলনাবিহীন। তখন কিন্তু হঠাৎ দুটো লাল আপেলের মত লোহিতবর্ণ ধারণ করে তাঁর দুটি গাল—আধবোঁজা চোখ আর কালো দাড়ির মাঝে লাল আপেলের সেই দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। 'আসবেন বৈকি। হলঘরে শ্রোতাদের মধ্যে আমার স্যাঙাৎ অন্ততঃ একজনও আছে জানলে মনটা কতখানি সান্ত্বনা পাবে বলুন তো? বিষয়টায় তার অপরিসীম অজ্ঞতা আর

অযোগ্যতা আছে জেনেও মনটা খুশী থাকবে আমার। সভাকক্ষে খুব ভীড় হবে বুঝতেই পারছি। কেন না, ওয়ালড্রন যতই বুজরুক হোক, ওর ভক্ত সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। মিঃ ম্যালোন, যতটা সময় আপনার পেছনে ব্যয় করব ভেবেছিলাম, তার চাইতে অনেকটা বেশী সময় দিয়ে ফেলেছি দেখছি। যা সারা দুনিয়ার প্রাপ্য, তা কারো একার ভোগ দখলে থাকা উচিত নয়। আজ রাতে বক্তৃতা কক্ষে আপনাকে দেখতে পেলে সুখী হব। ইতিমধ্যে খেয়াল রাখবেন, যে-সব বস্তু দিলাম আপনাকে, তার একটিও যেন জনগণের সামনে হাজির করা না হয়।'

'কিন্তু···আপনি তো জানেনই···আমার বার্তা সম্পাদক মিস্টার ম্যাক-আর্ডল জানতে চাইবেন এতক্ষণ কি করে এলাম আপনার সঙ্গে।'

'যা প্রাণ চাইবে, তাই বলবেন। সেইসঙ্গে আরও একটা কথা বলে রাখবেন। ফের যদি কাউকে পাঠান আমার সময় নষ্ট করতে, তাহলে ঘোড়ার চাবুক তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। তবে এসব কথার বিন্দুবিসর্গ যাতে কাগজে না-বেরোয়—সে দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম আপনার ওপর। ঠিক আছে। তাহলে দেখা হবে প্রাণীবিজ্ঞান সংস্থার হলঘরে রাত সাড়ে আটটায়।'

হাত নেড়ে ঘর থেকে আমাকে বিদেয় করে দিলেন প্রফেসর। শেষবারের মত দেখে নিলাম তাঁর লাল গাল, তরঙ্গায়িত নীল আর উদ্ধত অসহ্য দুই চোখের চাহনি।

৫ ॥ প্রশ্ন

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে আমার উপর্যুপরি দুটি ইন্টারভিউতে পেলাম দু-ধরনের শক্। প্রথমটা দৈহিক। দ্বিতীয়টা মানসিক। ফলে, বিপর্যস্ত হয়ে গেল আমার সাংবাদিক সত্তা। মাথা দপ্ দপ্ করতে লাগল কেবল একটি মাত্র চিন্তায়। খুবই যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা। ভদ্রলোক যা বলে-ছেন, তা নির্জলা সত্যি। কাহিনীটাকে ব্যবহার করার অনুমতি যদি কখনো পাই, তাহলে এমন একখানা প্রতিবেদন লিখবো 'গেজেট' পত্রিকায় যার পরিণাম হবে কল্পনারও অতীত। এনমোর পার্কে তাই বেরিয়ে এলাম প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম একটা ট্যাক্সি, লাফিয়ে বসলাম ভেতরে, সটান এলাম অফিসে। খুপরীতে যথারীতে বসে থাকতে দেখলাম ম্যাকআর্ডলকে।

আমাকে দেখেই সোল্লাসে বললেন বিষম প্রত্যাশায়—'কি খবর? জল কদ্দূর গড়ালো? দেখে তো মনে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরলে। মারধর

করেছেন নাকি?'

'প্রথম দিকে একটু মতান্তর ঘটেছিল।'

'আচ্ছা লোক তো! তুমি তখন কি করলে বলো।'

'পরে ধাতস্থ হলেন। অনেক গল্পগুজব করলাম। কিন্তু ছাপবার মত কিছুই আদায় করা গেল না।'

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না। এক চোখে কালসিটে নিয়ে ফিরেছো যখন, তখন ঐটাই হবে ছাপবার খবর। মিঃ ম্যালোন, এরকম সন্ত্রাসের রাজত্ব চলতে দেওয়াটা ঠিক নয়। লোকটাকে শিষ্টাচার শিখিয়ে ছাড়ব। কালকের কাগজেই ছাপব একটা ছোট্ট সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—গায়ে ফোস্কা ধরিয়ে ছাড়ব বাছাধনকে। মাল মশলা ছাড়ো দিকি বাপু, দাগী আসামী বানিয়ে ছাড়ছি ওঁকে। প্রফেসর মান্সহাউজেন শিরোনামটা দিলে কি রকম হয়? পুনর্জীবন পেয়েছেন স্যার জন ম্যানডিভিল,[1]—ক্যালিওস্ত্রো,[2]—ঐতিহাসিক সব কটা জোচ্চোর ভণ্ড আর ষণ্ডকে মিলিয়ে এই পয়লা নম্বর ধাপ্পাবাজটা সৃষ্টি হয়েছে। ওর জালিয়াতি আমি ফাঁস করবই করব।'

'কিন্তু আমি তো করব না।'

'কেন করবে না?'

'কেন না প্রতারক উনি মোটেই নন।'

'কি বললে?' মেঘগর্জন করলেন ম্যাকআর্ডল। 'এইসব ম্যামথ, ম্যাসটোডন আর অতিকায় সামুদ্রিক সরীসৃপদের গালগল্প তুমিও কি মাথায় ঢুকিয়ে বসে আছো?'

'ও সব ব্যাপার তো জানি না। ঐ ধরনের কোনো দাবীও উনি করেন না। কিন্তু নতুন কিছু পেয়েছেন, সে বিশ্বাস আমার হয়েছে।'

'তাহলে আর দেরী কেন হে? লিখে ফ্যালো!'

'লেখার ইচ্ছে তো রয়েছে। কিন্তু কিছুই লিখব না, এই কথা দেওয়ার পর বিশ্বাস করে সব বলেছেন।' সংক্ষেপে বিবৃত করলাম প্রফেসরের বর্ণিত কাহিনী। 'বলুন, এ অবস্থায় আমার মুখে চাবি দিয়ে থাকা উচিত কিনা।'

১। স্যার জন ম্যানডিভিল চতুর্দশ শতাব্দীর ভ্রমণ-কাহিনী লেখক।—অনুবাদক

২। অ্যালেসান্দ্রো ক্যালিওস্ত্রো (১৭৪৩—৯৫) একটা ছদ্মনাম। আসল নাম গিউসেপ্পে বালসামো। ইতালীয় প্রতারক—বাগাড়ম্বরের জন্য কুখ্যাত।—অনুবাদক

একটা বর্ণও যে বিশ্বাস করেননি ম্যাকআর্ডল, তা তাঁর মুখের সুগভীর অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি দেখেই বুঝলাম।

পরিশেষে অবশ্য বললেন—'যাকগে, আজ রাত্তিরের বৈজ্ঞানিক অধিবেশনটা নিয়ে ভাবা যাক। এ ব্যাপারে কোনো রকম গোপনতা নেই, থাকতে পারে না। ওয়ালড্রনের বক্তৃতামালা এর আগে বারোবার কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছে। কাজেই অন্য কাগজওয়ালারা মিটিংয়ের প্রতিবেদন ছাপবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, কেউ জানেও না প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বক্তৃতা দেবেন মিটিংয়ে। বিশিষ্ট খবর হিসেবে একা আমরা ফলাও করে ছাপতে পারব ওখানকার কাণ্ডকারখানা। তুমি তো যাচ্ছই। যা দেখবে শুনবে তার একটা মুখরোচক জমজমাট রিপোর্ট আমাকে দিয়ে যাবে। মাঝরাত পর্যন্ত জায়গা খালি রাখব।'

খুব ব্যস্ততার সঙ্গে কাটল সারাটা দিন। সকাল সকাল ডিনার খেয়ে নিলাম স্যাভেজ ক্লাবে টার্প হেনরীর সঙ্গে। অ্যাডভেঞ্চারের কিছু বিবরণ শোনালাম খেতে খেতে। বিশীর্ণ বদনে অবিশ্বাসের হাসি ঝুলিয়ে সব শোনবার পর যখন বললাম প্রফেসর আমাকে সব কিছুই বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন, তখন ভদ্রলোক অট্টহেসে গড়িয়ে পড়লেন।

'ভায়া, বাস্তব জীবনে ঠিক অমনটি কখনো ঘটে না। বিরাট আবিষ্কার হঠাৎ করে ফেলার পর কেউ সাক্ষ্যপ্রমাণ হারিয়ে ফেলে না। ওসব মানায় ঔপন্যাসিকদের। চিড়িয়াখানার বাঁদরের খাঁচার বাঁদরদের মতই অনেক বাঁদরামিতে ঠাসা লোকটা। যত্তো সব আষাঢ়ে গল্প! বকমবাজের ফড়ফড়ানি!'

'কিন্তু সেই আমেরিকান কবি?'

'কোনো কালেই তার অস্তিত্ব ছিল না।'

'তার স্কেচবুক আমি দেখেছি।'

'চ্যালেঞ্জারের স্কেচবুক।'

'জানোয়ারটার ছবি উনি এঁকেছেন?'

'আলবৎ উনিই এঁকেছেন।'

'ফটোগ্রাফগুলো?'

'ফটোগ্রাফে আছেটা কী? নিজেই তো বললেন দেখেছেন একটা পাখী।'

'টেরোড্যাকটিল।'

'ওটা আপনার মগজে উনিই ঢুকিয়েছেন।'

'হাড়গুলো ?'

'প্রথম হাড়টা আইরিশ মাংসের ঝোলের বাটি থেকে এসেছে। দ্বিতীয়টা জোড়াতালি দিয়ে বানিয়ে নিয়েছেন এই উপলক্ষ্যেই। ধড়িবাজ যদি হন, নিজের কারবারটি যদি ষোল আনা বোঝেন, ফটোগ্রাফ জাল করার মত একটা হাড়ও জাল করতে পারেন অনায়াসে।'

মহা অস্বস্তিতে পড়লাম আমি। তবে কি হুট করে বিশ্বাস করে ফেলাটা সমীচীন হয় নি ? পরক্ষণেই হঠাৎ একটা সুখকর চিন্তা খেলে গেল মাথায়।

'আসবেন মিটিংয়ে ?'

ভাবনায় পডলেন টার্প হেনরী।

বললেন—'চ্যালেঞ্জারের সান্নিধ্য কেউ পছন্দ করে না—লোকপ্রিয় মানুষ মোটেই নন। ওঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে কোমর বেঁধে তৈরী অনেকেই। আমি তো বলব, লণ্ডন শহরে সবচাইতে ঘৃণ্য জীব এখন উনিই। ডাক্তারী ছাত্ররা যদি আসে চূড়ান্ত হট্টগোল হবে। অতলোকের গোলমালের মধ্যে আমি হাজির থাকতে চাই না।'

'ওঁর বক্তব্য শুনে ওঁকে কৃতার্থ তো করতে পারেন ?'

'সেটা মন্দ বলেন নি। ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যাটা কাটাবো আপনার সঙ্গেই।'

হলে পৌঁছে দেখলাম, যা ভেবেছিলাম তার চাইতে জমায়েত হয়েছে অনেক বেশী। ইলেকট্রিক ব্রুহাম আসছে লাইন দিয়ে, ভেতর থেকে নামছেন দাড়িওলা প্রফেসরের পর প্রফেসর। খিলেনের তলা দিয়ে কাতারে কাতারে ঢুকছে সাধারণ মানুষ। জনস্রোত দেখেই বুঝলাম, শ্রোতারা লোকপ্রিয় এবং বৈজ্ঞানিক—দু-ধরনের বক্তৃতার জন্যেই প্রস্তুত। আসন গ্রহণ করার পর লক্ষ্য করলাম যৌবনোচিত এমন কি বালকোচিত উৎসাহ উদ্দীপনায় গম্ গম্ করছে ওপরকার গ্যালারী এবং পেছনকার আসনগুলো। সারি সারি মুখগুলো দেখেই চেনা যায়—সব ডাক্তারী ছাত্র। সব কটা বড় হাসপাতাল থেকে ছাত্রদের পাঠিয়েছে মনে হল। সেই মুহূর্তে শ্রোতাদের আচরণ সংযত হলেও নষ্টামির সম্ভাবনাপূর্ণ। পরম উৎসাহে মুখে মুখে জনপ্রিয় গান গাওয়া হচ্ছে কোরাস গলায়—এই ধরনের একটা গুরুগম্ভীর বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার মুখবন্ধ হিসেবে যা নিতান্তই বেমানান। ব্যক্তিগত টিটকিরি নিক্ষেপের প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। পরমোল্লাসে উচ্চকণ্ঠে গুড ইভনিং জানানো হচ্ছে যাদের তারা ঠিক এ ধরনের ছদ্ম সম্মানের প্রাপক হিসেবে যোগ্য কিনা সেই সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে হকচকিয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ ডক্টর মেলড্রাম মঞ্চে উপস্থিত হতেই শুরু হল এই কাণ্ড। ভদ্রলোক তাঁর বহুপরিচিত কোঁকড়ানো-কিনারা অপেরা৷ হ্যাটটি মাথায় চাপিয়ে এসে-ছিলেন। হলঘরে সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল প্রায় প্রত্যেকেরই কণ্ঠে একই কৌতূহলের বিস্ফোরণ—'টালিখানা কোত্থেকে পেলেন বলবেন?' ভদ্রলোক সাত-তাড়াতাড়ি টুপী খুলে লুকিয়ে ফেললেন চেয়ারের তলায়। বেতো প্রফেসর ওয়াডলী ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আসন গ্রহণ করতেই অমনি হলশুদ্ধ সবাই গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে জানতে চাইল তাঁর পায়ের আঙুলের দুরবস্থা কদ্দূর? ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন সম্মিলিত শারীরিক কুশলতার প্রশ্নে। সবচেয়ে হট্টগোল শোনা গেল প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যখন ভীড় ঠেলে গিয়ে বসলেন মঞ্চে রাখা চেয়ারগুলির সামনের সারির একদম শেষের চেয়ারটিতে। এককোনায় তাঁর কালো দাড়ির আভাস দেখামাত্র এমন তার-স্বরে হলশুদ্ধ সবাই চেঁচিয়ে উঠল যে শংকিত হলাম টার্প হেনরীর কথা মনে পড়ায়। বক্তৃতা শুনতে এত লোক আসেনি। বিখ্যাত প্রফেসর সভায় আসছেন এই খবরটা চাউড় হয়ে গেছে বলেই অট্ট অট্ট হট্টরোলে সভাপণ্ড করার জন্যে এসেছে চ্যাংড়ার দল।

মঞ্চের আসনে উনি আবির্ভূত হতেই সামনের সারির ফিটফাট পোশাক পরা শ্রোতারা সহানুভূতি সূচক মৃদু হাস্যে মুখর হয়েছিলেন—ভাবখানা যেন ছাত্র-দের এবম্বিধ উচ্ছ্বাস প্রদর্শনে তাঁরা অখুশী নন মোটেই। তুমুল এই হর্ষধ্বনির সঙ্গে তুলনা চলে কেবল চিড়িয়াখানার খাঁচা ভর্তি মাংসাশী জন্তুদের রক্তজল করা চীৎকারের—খাবার ভর্তি বালতি হাতে পশু-রক্ষকদের এগিয়ে আসতে দেখেই যেমন একযোগে হুম্-হাম্ করে ওঠে জানোয়ারের দল—এও যেন তাই। চেঁচামেচির মধ্যে জয়ধ্বনির আড়ালে আপত্তিকর একটা সুর লক্ষ্য করলেও মোটামুটিভাবে মনে হল নিছক হল্লাবাজি এটা নয়—গলাবাজি করে যাঁকে এইভাবে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে তাঁকে অপছন্দ বা ঘৃণা করে বলেই যেন চেঁচানো হচ্ছে তা নয়—ভদ্রলোক যেন একটা মজাদার কৌতুকের চলমান আড়ৎ—ছেলেপুলেরা তাই সজীব তাঁকে দেখে। ক্লান্তিকর সংযত অবজ্ঞার হাসি হাসলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—ভাবখানা যেন একপাল কুকুর তাঁকে দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে মরছে। চেয়ারে ধপ করে দেহভার ন্যস্ত করে পিপের মত বুকের খাঁচা থেকে বিরাট একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, আলগোছে হাত বুলিয়ে নিলেন দোদুল্যমান দাড়ির ওপর এবং অর্ধনিমীলিত উদ্ধত চোখে নিরীক্ষণ করলেন সামনের হলঘর ভর্তি ঠাসা শ্রোতৃমণ্ডলীকে। প্রফেসর রোনাল্ড মুরে (চেয়ারম্যান) এবং মিস্টার ওয়ালড্রন (বক্তা) যখন

ভীড় ঠেলে অগ্রসর হলেন মঞ্চাভিমুখে, দেখা গেল তখনো প্রফেসরের আবির্ভাব জনিত হর্ষধ্বনির রেশ জাগ্রত রয়েছে গোটা হলঘরে। তারপরেই শুরু হল সভার কাজ।

ক্ষমাপ্রার্থনা করে নিয়ে প্রফেসর মুরে সম্পর্কে একটা কথা আগেই বলব। সাধারণ ইংরেজদের মত অস্পষ্টভাবে কথা বলার বদভ্যাস তিনিও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। যা বলেন, তা শোনা যায় না। বক্তব্য বিষয়কে কর্ণেন্দ্রিয়তে প্রবেশ করানোর উপযুক্ত কণ্ঠস্বর কেন যে একটু কষ্ট করে বাক-যন্ত্র থেকে নিষ্ক্রান্ত করতে পারেন না, সভ্য দুনিয়ায় এ একটা বিরাট রহস্য। একটু চেষ্টা করলেই তো কথার ঝর্ণাধারা শ্রোতাদের মাথার চৌবাচ্চায় ঢেলে দেওয়া যায়। প্রফেসর মুরে বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য সকৌতুকে প্রকাশ করলেন তাঁর নিজের সাদা নেকটাই, পাশের টেবিলের কাচের জলপাত্র আর ডানদিকে রাখা রুপোর মোমবাতি-শামাদান সম্পর্কে। তারপর উনি বসলেন। উঠে দাঁড়ালেন মূল বক্তা মিস্টার ওয়ালড্রন—মৃদু হর্ষধ্বনির গুঞ্জনে মুখরিত হল সভাকক্ষ। ভদ্রলোকের আকৃতি কড়া ধাঁচের, শুষ্ক, বিশীর্ণ। কথা বলার ভঙ্গিমা আক্রমণাত্মক। কিন্তু অন্যের আইডিয়া সরস ঢংয়ে শ্রোতাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে জানেন। সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারে এবং মজা পায়। অদ্ভুত বিষয়কেও খটমট লাগে না। ফলে জলবিষুব আর মহাবিষুব সংক্রান্ত কথাবার্তা অথবা কশেরুকা তৈরী হয় কি করে, এই তথ্য শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে কেউ আঙুল মটকাল না।

সৃষ্টিরহস্য সংক্ষেপে নিবেদন করলেন বক্তা। বিজ্ঞান যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে, সেইভাবে। ভাষা প্রাঞ্জল, কখনো ছবির মত। গোলক আকারে বিরাট লেলিহান অগ্নিময় গ্যাসপিণ্ড কিভাবে আকাশ পথে ধেয়ে গেছিল, তার বর্ণনা দিলেন সুললিত ভাষায়। তারপর তা শীতল হল, শক্ত হল. উপরিভাগ কুঁচকে গিয়ে পাহাড় সৃষ্টি করল, বাষ্প থেকে জল তৈরী হল—নাটকীয়ভাবে বর্ণনা দিলেন সেই বিরাট অব্যাখ্যাত কাণ্ডকারখানার। প্রাণের উৎস প্রসঙ্গে কিন্তু ইচ্ছে করেই অস্পষ্ট রয়ে গেলেন। ঐ রকম জলন্ত কড়াইয়ের মধ্যে প্রাণকণা যে টিঁকে থাকতে পারে না, সে বিষয়ে তিনি মোটামুটি নিশ্চিত। সুতরাং প্রাণ আবির্ভূত হয়েছে তারও পরে। ভূগোলক তখন ঠাণ্ডা হয়ে চলেছে, সেই সময় কি অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল? খুব সম্ভব। উল্কা বাহিত হয়ে প্রাণকণা কি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল? ধারণাটা ঠিক বিশ্বাস করে ওঠা যায় না। মোটের ওপর, এই একটি ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞানবৃদ্ধও জোর দিয়ে কিছু বলতে পারেন না।

আজ পর্যন্ত আমরা কেউই গবেষণাগারে অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হইনি। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যেকার বিরাট ফাঁকে আজও কেউ সেতুবন্ধ করতে পারেনি। কিন্তু অনেক উন্নত এবং সূক্ষ্ম রসায়নবিদ হলেন প্রকৃতি স্বয়ং। যুগ যুগ ধরে প্রবল শক্তির প্রভাবে প্রাকৃতিক গবেষণাগারে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে—আমাদের পক্ষে যা অসম্ভব। অতএব এই সিদ্ধান্ত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা যাক।

এইখান থেকেই ধাপে ধাপে প্রাণীজগতের সোপান বেয়ে উঠতে লাগল বক্তৃতার ধারা। বর্মদেহী তুচ্ছ সামুদ্রিক প্রাণী থেকে সরীসৃপ, মৎস্য হয়ে বক্তৃতা এসে পৌঁছোলো ক্যাংগারু-ইঁদুরে—বাচ্চার জন্ম দেয় যারা সরাসরি এবং যারা সব স্তন্যপায়ী জীবের আদিপুরুষ—এমন কি সম্ভবতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রত্যেকের। ('না, না' উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালো জনৈক অবিশ্বাসী ছাত্র পেছনের সারি থেকে)। লাল নেকটাই পরা ঐ যে তরুণটি এখুনি 'না, না' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, তাঁর হয়তো বিশ্বাস তাঁর জন্ম হয়েছে ডিম ফুটে। বক্তৃতার শেষে তিনি যদি অপেক্ষা করে যান, তাহলে কৌতূহলটা চরিতার্থ করা যাবে। (হাসি)। যুগযুগ ধরে প্রকৃতির কারখানায় প্রাণী বিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণাম যে লাল টাই পরা ঐ তরুণটি, এ-হেন ক্লাইম্যাক্স প্রকৃতই কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু কারখানার কাজ কি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে? যা এতদিন হয়ে গিয়েছে এবং যা হয়ে চলেছে—তার সবই কি থেমে গিয়েছে লাল টাই পরা ঐ ভদ্রলোকের মধ্যে? মোটেই তা নয়। লাল টাই পরা ভদ্রলোকই প্রকৃতির কারখানায় শেষ উৎপাদন নয়। বিবর্তন থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে, আরো বিস্ময় আসছে আগামী যুগে।

এইভাবেই কথার মধ্যে বাধা দেওয়ার জবাব ভারী সুন্দরভাবে দিয়ে গেলেন কুশলী বক্তা। হলঘরের গুঞ্জন অব্যাহত রইল কিছুক্ষণ। তারপর তিনি ফিরে গেলেন অতীতের চিত্রে। সমুদ্র শুকিয়ে যাচ্ছে, বালুকা-বেলা ঠেলে উঠছে, সমুদ্রের কিনারায় কাদাটে ঘোলাটে অঞ্চলে থকথকে প্রাণের স্পন্দন দেখা যাচ্ছে, প্রাণীকুলে ভরে উঠেছে উপসাগরগুলো, কাদা-জমির ওপর উঠে আসবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে, খাদ্যের অভাব নেই সেখানে, পরিণামে তাদের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে—অতিকায় হয়ে উঠছে জীবজগৎ। বললেন—'লেডীজ অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন, ভয়ংকরদেহী যে সরীসৃপদের আমরা উইয়ালডেন আর সোলেনহোফেন স্লেটপাথরের স্তরে দেখে আঁৎকে উঠি আজও, এই গ্রহে মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগেই কিন্তু তারা লুপ্ত হয়ে গেছে।'

'প্রশ্ন !' মঞ্চের ওপর ধ্বনিত হল একটা বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর।

মিস্টার ওয়ালড্রন অতিশয় কড়া বক্তা, নিয়মানুবর্তিতায় অতীব নিষ্ঠাবান। ভদ্রলোকের পরিহাসেও ছুরীর ধার—লাল টাই পরা ছোকরাটি বক্তৃতায় বাধা দিতে এসে হাড়ে হাড়ে তা টের পেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তের বাগড়াটা এমনই উদ্ভট যে কি করবেন, তা ভেবে পেলেন না তিনি। লাল টাই বুঝেছে বাধা দেওয়াটা কতখানি বিপজ্জনক। তার পরেও এ রকম অদ্ভুত বাগড়া দেওয়ার দুঃসাহসটা হল কার? সস্তা সাহিত্যিকের সম্মুখীন হলে সেক্সপীয়ারের সাহিত্যকর্মে পণ্ডিতের অবস্থা যা হয়, অথবা পৃথিবীটা চ্যাপ্টা—এই অন্ধ ধারণায় কোনো উন্মাদ দক্ষ জ্যোতির্বিদকে আক্রমণ করলে যে অবস্থা দাঁড়ায়, ওয়ালড্রনের অবস্থা হল তাই। ক্ষণেক বিরতি দিয়ে গলা চড়িয়ে আস্তে আস্তে তিনি আবার পুনরাবৃত্তি করলেন শেষ কথাটা—'মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগেই কিন্তু তারা লুপ্ত হয়ে গেছে।'

'প্রশ্ন !' আবার ধ্বনিত হল সেই বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর।

সবিস্ময়ে মঞ্চে আসীন সারবন্দী প্রফেসরদের অবলোকন করলেন ওয়াল-ড্রন। চোখ পড়ল সবশেষে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ওপর। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মুদিত চোখে পরম কৌতুকবোধে তিনি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মিটি মিটি হাসছেন।

কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললেন ওয়ালড্রন—'তাই বলুন, বন্ধুবর প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কাণ্ড!' হাসির অট্টরোল থামতে না থামতেই আবার শুরু করলেন বক্তৃতা। যেন ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটে গেল ঐখানেই এবং উটকো উৎপাতের যুৎসই ব্যাখ্যাও একটা পাওয়া গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু সমাপ্ত হয়নি মোটেই। বক্তৃতা যে পথেই অগ্রসর হোক না কেন, ঘুরে ফিরে যতবার অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রসঙ্গে তিনি এলেন, ততবারই ষণ্ড-গর্জনে তৎক্ষণাৎ 'প্রশ্ন' শব্দটি নিক্ষেপ করে চললেন প্রফেসর। শ্রোতারাও বুঝে নিলে বাধা ঠিক কখন আসবে এবং আসার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ল ছাদ কাঁপানো চিৎকারে। ছাত্ররা তক্কে তক্কে রইল ঠিক কখন নড়ে উঠবে প্রফেসরের কালো দাড়ি এবং মুখ দিয়ে ষণ্ড-গর্জন নিঃসৃত হওয়ার আগেই শতকণ্ঠে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল 'প্রশ্ন!' বলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শোনা যেতে লাগল আরও বহু কণ্ঠের 'ছিঃ! ছিঃ! কী লজ্জা! কী লজ্জা!' 'থামুন! থামুন!' ইত্যাদি ধ্বনি। অমন যে কড়া ধাঁচের বক্তা ওয়ালড্রন, তাঁরও ধাত ছেড়ে গেল অবশেষে। দ্বিধায় পড়লেন, তোৎলাতে লাগলেন, একই কথা বারবার বলে গেলেন, সুদীর্ঘ বাক্য

শেষ করতে গিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফেললেন, শেষকালে অগ্নিশর্মা মূর্তি নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন যত উৎপাতের মূল উৎসটির দিকে।

বজ্রনাদে বললেন জ্বলন্ত চোখে—'অসহ্য! প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, অজ্ঞ আর অসভ্যের মত এভাবে বাধা আর দেবেন না।'

ঘর নিস্তব্ধ। গ্রীক দেবতাদের আবাসভূমি অলিম্পাস পর্বতের ওপর দুই বড় দেবতার লড়াই দেখবার আনন্দে আড়ষ্ট ছাত্রমণ্ডলী। ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে দেবতায় দেবতায়—কী মজা! কী মজা!

ধীরে ধীরে বিশাল বপুটাকে চেয়ার থেকে উত্থিত করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

বললেন—'আমারও একটা কথা বলার আছে মিস্টার ওয়ালড্রন। যা নিকষ বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর নয়, সে রকম সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না।'

ব্যস, আর যায় কোথা! ঐ একটা কথাতেই শেকল ভেঙে মত্ত প্রভঞ্জন যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। তাথৈ তাথৈ নৃত্যে যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল ঘরের চার দেওয়াল—ভেঙে পড়ল বুঝি ছাদখানাও! 'ছিঃ! ছিঃ!' 'কথা বলতে দিন না ওঁকে!' 'ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দিন বার করে!' 'মেরে নামিয়ে দিন মঞ্চ থেকে!' 'বেশ হয়েছে! ঠিকই বলেছেন!' 'সাবাস!' অট্টরোলের মধ্যে থেকে ঠিকরে এল এই ধরনের হাজার উক্তি—কেউ বলছে মজা করতে, কেউ বলছে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। পাখীর ডানা সঞ্চালনের মত দু-হাত দু-দিকে নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ারম্যান—ভীষণ উত্তেজনায় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েই গেলেন। তুমুল চেঁচামেচি ছাপিয়ে তাঁর কথার যে-কটি শব্দ শোনা গেল, তা এই—'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—ব্যক্তিগত—অভিমত— পরে।' বাধা দিয়ে এই যে নরক-গুলজার বাঁধিয়ে বসেছিলেন যে মানুষটি, চেয়ারম্যান সাহেবের কথায় তিনি স্মিত মুখে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিনন্দন জানিয়ে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ফের বসে পড়ে যেন ঘুমিয়েই পড়লেন। ওয়ালড্রন ভদ্রলোক ততক্ষণে রেগেমেগে লাল হয়ে গেছেন—রণংদেহী মূর্তি ধারণ করে এই মারেন কি সেই মারেন ভাব দেখাচ্ছেন। প্রফেসর আসন গ্রহণ করতেই আবার বক্তৃতা আরম্ভ করলেন ভদ্রলোক। কথার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু বারংবার বিষ নয়ন হেনে গেলেন প্রতিপক্ষ যে পুরুষটির দিকে তিনি কিন্তু তখন একই রকম পরমতৃপ্ত আকর্ণ হাসি ঠোঁটের কোণে কোণে ভাসিয়ে মনে হল গভীর নিদ্রাসুখে মগ্ন রয়েছেন।

অবশেষে সাঙ্গ হল বক্তৃতা। আমি অবশ্য বলব, ঝটপট শেষ করে

দেওয়া হল। উপসংহারটা এল আগেভাগে—প্রথমদিকের বক্তৃতা ধারার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংগতি রক্ষা না করে। যুক্তি সূত্র ছিন্ন করে দেওয়া হল নির্দয় হস্তে এবং আরও কিছুর প্রত্যাশায় ছটফট করতে লাগল শ্রোতারা। ওয়ালড্রন চেয়ারে গিয়ে বসতে না বসতেই চেয়ারম্যান তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে আহ্বান করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে। চেয়ার ছেড়ে বিশাল বপুটাকে মঞ্চের কিনারায় নিয়ে গিয়ে তিনি যা বললেন, পত্রিকার স্বার্থে আমি তার প্রতিটি শব্দ হুবহু টুকে নিলাম।

উনি শুরু করেছিলেন 'লেডীজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন' বলে। কিন্তু পেছন থেকে একনাগাড়ে এমন বাধা পড়তে লাগল যে কহতব্য নয়। উনি তখন বললেন—'ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি লেডীজ, জেন্টলমেন এবং চিলড্রেন—ভুলবশতঃ শ্রোতাদের বিরাট একটা অংশের উল্লেখ করতে একদম ভুলে গেছিলাম।' (তুমুল হট্টগোল। প্রফেসর সেই সময়ে কিন্তু প্রকাণ্ড একখানা হাত তুলে মাথা নেড়ে গেলেন এমন ঢংয়ে যেন সহানুভূতি জ্ঞাপন করছেন অপমানাহত বালকদের এবং একই সাথে আন্তরিক আশীর্বাদ দিয়ে ধন্য করছেন উপস্থিত প্রত্যেককেই।) 'এইমাত্র যে ছবির মত কাল্পনিক কাহিনীটা আপনারা শুনলেন মিস্টার ওয়ালড্রনের মুখে, আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাঁকে সেই কষ্টটুকু করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। বক্তৃতার মধ্যে বেশ কয়েকটা বিষয়ে আমার মতানৈক্য থাকলেও উনি বক্তব্য রেখেছেন ভারী সুন্দরভাবে এবং ওঁর ধারণা অনুসারে এই গ্রহের ইতিহাস যে রকমটি হওয়া উচিত, তার একটা সহজ সরল কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা উপস্থিত করেছেন। লোকপ্রিয় লেকচার দেওয়া যেমন সহজ তার চাইতেও সহজ হল শুনে যাওয়া। এবং মিস্টার ওয়ালড্রন,' (এইখানে উনি প্রোজ্জ্বল আননে চোখ মিট মিট করে তাকালেন মিস্টার ওয়ালড্রনের পানে) 'আমাকে যেন ক্ষমা করেন তাঁর বক্তৃতার ভাসা ভাসা আর ভুলভাল তথ্যগুলি অজ্ঞ শ্রোতাদের শোনানোর বিরুদ্ধে আমার এই প্রতিবাদে।' (বিদ্রূপতীক্ষ্ণ হর্ষধ্বনি।) 'লোকপ্রিয় বক্তৃতা মাত্রই হয় পরাশ্রয়ী—এ ধরনের সহজে বোধগম্য বক্তৃতার ধর্মই তাই।' (ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গী করতে আরম্ভ করলেন মিস্টার ওয়ালড্রন।) 'এ ধরনের বক্তৃতা যারা দেয়, তারা হয় খ্যাতি চায় অথবা অজ্ঞাত সৎ সতীর্থদের কীর্তি ভাঙিয়ে নিজেদের সুবিধে করে নেয়। ছোট্ট একটা নতুন আবিষ্কার, বিজ্ঞান মন্দিরে একখানা ইঁট অলস মুহূর্তের এই সব চোরাই বাগাড়ম্বরের চেয়ে অনেক দামী—এ ধরনের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কারো উপকারেও লাগে না। অযথা পণ্ডশ্রমই বলতে পারেন। মিস্টার ওয়ালড্রনকে খাটো করার

জন্যে এ সব কথা বলছি, তা যেন কেউ ভাববেন না। আমি চাই আপনারা যেন বিচার বুদ্ধি হারিয়ে নকল গুরুর পায়ে ফুল দিয়ে না বসেন।' (এই সময়ে চেয়ারম্যানের কানে কানে কি যেন বললেন মিস্টার ওয়ালড্রন। চেয়ারম্যান সাহেব অমনি শক্ত গলায় কি যেন বললেন তাঁর জলপাত্রটাকে।) 'এবার আসুন আরও বড় ব্যাপার নিয়ে আলোচনায়। খেয়াল রাখবেন, আমি কিন্তু আসল তদন্তকারী। ঠিক কোন্ বিষয়টিতে আমি বক্তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম বলুন তো? বিশেষ কয়েকটা প্রাণী এখনো পৃথিবীর বুকে টিঁকে আছে কি না, এই বিষয়ে তো? লোকপ্রিয় বক্তা হিসেবে এখন কিন্তু আমার বক্তব্য রাখছি না—রাখছি সখের তদন্তকারী হিসেবেও নয়। আমার বৈজ্ঞানিক বিবেক বলতে বাধা করছে একটা মহামূর্খতা। যেহেতু মিস্টার ওয়ালড্রন প্রাগৈতিহাসিক কোনো প্রাণী স্বচক্ষে দেখেননি, অতএব এরকম কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে—তাঁর এই ধারণা সর্বৈব ভুল। তারা আছে বৈকি, আমাদের আদিপুরুষ হিসেবে সুদূর অতীতে তারা যেমন ছিল, ঠিক এখনও সমসাময়িক আদি-পুরুষ হিসেবেও তারা আছে এই পৃথিবীতে। বুকের পাটা যদি কারো থাকে, অফুরন্ত প্রাণশক্তি যদি কারো থাকে, তাহলে খুঁজে বার করে নিক তাদের ডেরা—স্বচক্ষে দেখে আসুক তাদের কদাকার ভয়াবহ মূর্তি। জুরাসিক যুগে এককালে যারা দাপিয়ে বেড়িয়েছে, আমাদের বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে হিংস্র স্তন্যপায়ী জীবকেও যারা অনায়াসে শিকার করে কোঁৎ করে গিলে নিয়ে ফলার করতে পারে—ভয়ংকর সেই প্রাগৈতি-হাসিক প্রাণীরা আজও আছে—আজও আছে।' ('ফালতু বকছেন কেন?' 'প্রমাণ করুন।' 'আপনি কি হাত গুনে জানলেন?' 'প্রশ্ন!') 'আমি হাত গুনে জানলাম কিনা জানতে চাইলেন একজন। অর্থাৎ তারা যে আজো আছে, তা জানলাম কি করে? এই তো? তাদের গোপন আলয় আমি দেখে এসেছি বলেই জেনেছি। তাদের কয়েকজনকে প্রত্যক্ষ করেছি বলেই আমি জেনেছি। (হাততালি, হট্টগোল, একটা কণ্ঠস্বর—'মিথ্যেবাদী!') 'কী বললেন? আমি মিথ্যেবাদী?' (আন্তরিক সম্মতির হল্লাবাজি।) 'কে যেন বললেন আমি মিথ্যেবাদী? দাঁড়িয়ে উঠে চাঁদ মুখখানা একবার আমাকে চিনিয়ে রাখবেন?' (শোনা গেল একটা কণ্ঠস্বর—'এই যে স্যার, এই যে!' চশমাপরা নিরীহ চেহারার একটি ছেলেকে ধস্তাধস্তি করতে দেখা গেল আশপাশের ছাত্রদের সঙ্গে—জোর করে ছেলেটিকে তারা তুলে ধরেছে মাথার ওপর।) 'আপনার এত বড়

স্পর্ধা আমাকে মিথ্যেবাদী বলেন?' ('না, স্যার, না,' অভিযুক্ত ছেলেটি আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেই টুপ করে মিলিয়ে গেল পাশের চেয়ারের তলায়।) আমার বক্তব্যে যদি কারো তিলমাত্র সন্দেহ থাকে, তিনি যেন দয়া করে বক্তৃতা শেষ হবার পর আমার সঙ্গে দেখা করেন।' ('মিথ্যেবাদী!') 'কে বললেন? কে আমাকে মিথ্যেবাদী বললেন?' (আবার ধস্তাধস্তি অবস্থায় নিরীহ দর্শন ছেলেটিকে তুলে ধরা হল শূন্যে।) 'যাবো নাকি ওখানে?' (সমস্বরে আমন্ত্রণ—'আসুন দাদা, আসুন!') ফলে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গেল সভার কাজকর্ম। উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ার ম্যান মশায় এমন ভাবে দু-হাত ওপর নিচ করতে লাগলেন যেন অর্কেস্ট্রা-পার্টি পরিচালনা করছেন। প্রফেসর তখন ষোলআনা খ্যাপা মূর্তি ধারণ করেছেন। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, মুখ রাঙা হয়ে গেছে, দাড়ি খাড়া হয়ে উঠছে।) 'পৃথিবীর প্রতিটি বড় আবিষ্কারকে এই ধরনের অবিশ্বাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে—এক দঙ্গল মূর্খের পাল্লায় পড়তে হয়েছে। আপনাদের নাকের ডগায় বড় বড় ঘটনা মেলে ধরার পরেও ঘটে এতটুকু বুদ্ধি বা কল্পনা থাকে না তার কদর করার—বোঝা তো দূরের কথা। বিজ্ঞানের নব দিগন্ত খুলে ধরতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করে যারা, তাদের গায়ে কাদা ছুঁড়তেই কেবল শিখেছেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের আপনারা জুতোর মালা পরান! গ্যালিলিও, ডারউইন, এবং আমি—'(প্রলম্বিত হর্ষধ্বনি এবং সভার কাজ একেবারেই পণ্ড।)

দ্রুত হাতে টুকে নিচ্ছিলাম প্রতিটি কথা। হলঘর জুড়ে তখন যে কি বিপর্যয় কাণ্ড চলছে, তার পুরো আভাসটুকুও অনুপস্থিত আমার এই বর্ণনার মধ্যে। তুমুল হট্টগোলের মধ্যে বেগতিক বুঝি কয়েকজন মহিলাকেও চম্পট দিতে দেখা গেল। গম্ভীরবদন শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠরাও সংক্রামিত হয়ে গেলেন ছাত্রদের হল্লাবাজিতে। বেশ কয়েকজন শুভ্রকেশ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উঠে মুঠো পাকিয়ে নাড়তে লাগলেন গোঁয়ারগোবিন্দ কোপন স্বভাব প্রফেসরের দিকে। পুরো শ্রোতৃমণ্ডলী—যেন টগবগ সোঁ-সাঁ শব্দে ফুটতে লাগল উনুনের ওপর চাপানো কড়াইয়ের মধ্যে। এক পা এগিয়ে এসে দু-হাত তুলে ধরলেন প্রফেসর। লোকটার মধ্যে এমন একটা প্রখর ব্যক্তিত্ব, একটা অসাধারণ প্রভুত্বব্যঞ্জক অভিব্যক্তি আছে যে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল হাততালি, চেঁচামেচি, শিস দেওয়া আর গলাবাজি। বিশাল দুই চোখের প্রচণ্ড পৌরুষের সামনে মাথা নুয়ে পড়ল পাগল জনতার। দেখে মনে হল বিশেষ একটা বার্তা এবার উপস্থাপিত করতে চান উনি। হট্টগোল

থামিয়ে সবাই উৎকর্ণ হল তা শোনবার জন্যে।

উনি বললেন—'আপনাদের আর আটকে রাখব না। কোনো লাভ নেই। যা সত্যি, তা চিরকালই সত্যি। এক দঙ্গল আহাম্মক তরুণ এবং বলতে বাধ্য হচ্ছি, ততোধিক আহাম্মক তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা হাজার গলা ফাটিয়েও সত্যকে বিকৃত করতে পারবে না। বিজ্ঞানের নতুন একটা ক্ষেত্র আমি আবিষ্কার করেছি—এই আমার দাবী এবং তা জোর গলায় জানাচ্ছি সব্বাইকে। মানতে যদি না চান—'(হর্ষধ্বনি) 'তাহলে তা যাচাই করে নেওয়ার ডাক দিচ্ছি। আপনাদের মধ্যে থেকে একজন কি দুজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে দিন—হাতেনাতে পরীক্ষা করে আসুক আমার বিবৃতির মধ্যে আদৌ সত্যি আছে কিনা!'

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর সামারলি। তুলনামূলক শারীরস্থানের অধ্যাপক। দীর্ঘকায়, শীর্ণ, তিক্ত আকৃতি। বিশুষ্ক তাপসিক চেহারা দেখে ভ্রম হয় বুঝি বা ব্রহ্মবিদ। উনি জানতে চাইলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার কি দু-বছর আগেকার আমাজন অভিযানের প্রসঙ্গ তুলতে চাইছেন?

সায় দিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

প্রফেসর সামারলি তখন জানতে চাইলেন, যে-অঞ্চলটা চষে ফেলেছেন ওয়ালেস, বেট্‌স্‌ এবং তাঁদেরও পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরা, সে অঞ্চলে এ রকম একটা আবিষ্কারের দাবী প্রফেসর চ্যালেঞ্জার রাখেন কি করে? পূর্ববর্তী অভিযাত্রীদের চোখ এড়িয়ে গেছিল ধরে নিতে হবে কী?

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার জবাবে বললেন, প্রফেসর সামারলি টেম্‌স্‌ নদীর সঙ্গে আমাজন নদীকে গুলিয়ে ফেলছেন। আমাজন যে অনেক বড় নদী, এ খেয়াল তাঁর নেই। প্রফেসর সামারলি শুনলে কৌতূহলী হবেন যে ওরিনোকো-র* সঙ্গে আমাজন মিলেমিশে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল পরিমিত জমি জুড়ে রয়েছে। কাজেই বিরাট এই অঞ্চলে একজনের যা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, অন্যের চোখে তা অবশ্য ধরা পড়তে পারে।

তিক্ত হেসে প্রফেসর সামারলি বললেন, টেমস-য়ের সঙ্গে আমাজনের তফাৎ তিনি অবশ্যই উপলব্ধি করছেন। তবে মুস্কিল হল এই যে টেমস-য়ের জলপথ এবং পাশের জায়গা জমি যাচাই করে নেওয়া যায়—আমাজনের যায় না। কাজেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যদি দয়া করে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী

*দক্ষিণ আমেরিকার নদী। ১৬০০ মাইল লম্বা

অধ্যুষিত অঞ্চলটির লঘিমা আর দ্রাঘিমা নিবেদন করেন, তাহলে তিনি কৃতার্থ বোধ করবেন।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার জানালেন, উপযুক্ত কারণেই তিনি এই তথ্যটি সভামধ্যে পেশ করতে নারাজ। তবে যদি একটা কমিটি গঠিত হয় শ্রোতাদের মধ্যে থেকেই সদস্য বাছাই করে নিয়ে, তাহলে তিনি লঘিমা দ্রাঘিমার হিসেব দেবেন সেই কমিটিকে। প্রফেসর সামারলি কি সশরীরে কমিটিতে আসতে রাজী আছেন?

মিঃ সামারলি—'হ্যাঁ আছি।' (বিপুল হর্ষধ্বনি।)

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—'তাহলে কথা দিচ্ছি আপনার হাতে এমন উপাদান দেব যার দৌলতে অনায়াসেই পথ খুঁজে নিয়ে সেই অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারবেন। কিন্তু যেহেতু প্রফেসর সামারলি যাচ্ছেন আমার বিবৃতির সত্য মিথ্যা যাচাই করতে, সুতরাং সঙ্গত কারণেই কমিটিতে আরেকজনের থাকার দরকার যিনি প্রফেসর সামারলির বিবৃতির সত্যমিথ্যা যাচাই করতে পারবেন। আগে থেকেই কিন্তু বলে রাখছি, পথে বিপদ আছে, ভোগান্তি আছে। প্রফেসর সামারলির দরকার একজন তরুণ সহযোগীর। স্বেচ্ছাসেবক হতে কে রাজী আছেন?'

মানুষের জীবনে বিরাট বিরাট সংকট মুহূর্তগুলো ঠিক এইভাবেই আচমকা লাফিয়ে এসে পথ জুড়ে দাঁড়ায়। সভাগৃহে ঢোকবার আগে কি অতিবড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম যে বৃহত্তর অ্যাডভেঞ্চারে ব্রতী হতে হবে আমাকে? মনে পড়ল গ্ল্যাডিসের কথা—ঠিক এই ধরনের সুযোগ পেলেই বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দশজনের একজন হওয়ার কথা সে আমাকে শুনিয়েছিল না? এই মুহূর্তে গ্ল্যাডিস আমার পাশে থাকলে কনুইয়ের গুঁতো মেরে দাঁড় করিয়ে দিত এতক্ষণে। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত। কি যে বলব তার প্রস্তুতি মনের মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও বকর বকর করে বকে গেলাম অনেক কথা। বন্ধুবর টার্প হেনরী সমানে আমার স্কার্ট ধরে টেনে বসানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল—শুনলাম কানের কাছে ফিসফিসানি—'আঃ! কি হচ্ছে ম্যালোন? বসে পড়ুন! পাঁচজনের সামনে নাই বা নিজেকে গর্দভ বানালেন!' ঠিক সেই সময়ে লক্ষ্য করলাম আমার কয়েকটা চেয়ার সামনে দাঁড়িয়ে উঠলেন দীর্ঘকায় শীর্ণকায় এক পুরুষ। চুলগুলো গাঢ় আদা রঙের। রাগত কঠোর চোখে কটমট করে আমার দিকে তিনি তাকালেন বারংবার—কিন্তু গ্রাহ্য করলাম না আমি—দাঁড়িয়েই রইলাম।

এবং আউড়ে গেলাম একটাই আবেদন বারবার—'মিস্টার চেয়ারম্যান, মিস্টার চেয়ারম্যান! আমি যাবো! আমি যাবো!'

'নাম কী? নাম কী?' সোল্লাসে জানতে চাইল শ্রোতারা।

'আমার নাম এডওয়ার্ড ডান ম্যালোন। ডেলী গেজেট দৈনিক পত্রিকা'র রিপোর্টার আমি। এ ব্যাপারে আগে থেকেই কোনো মতামত খাড়া করে রাখিনি আমার মধ্যে—সুতরাং সাক্ষী হিসেবে আমিই যোগ্য ব্যক্তি।'

'আপনার নামটা কি মশায়?' আমার দীর্ঘকায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রশ্ন করলেন চেয়ারম্যান।

'লর্ড জন রক্সটন। আমাজন অঞ্চলে এর আগেও টহল দিয়ে এসেছি। ওখানকার নাড়িনক্ষত্র আমার জানা। সুতরাং এই তদন্ত-অভিযানে আমার বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে।'

চেয়ারম্যান বলে উঠলেন—'স্পোর্টস্‌ম্যান আর পর্যটক হিসেবে লর্ড জন রক্সটনের সুনাম সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না কারোরই। তবে কিনা সেই সঙ্গে খবরের কাগজের তরফ থেকেও একজন প্রতিনিধির যাওয়া দরকার।'

মেঘমন্দ্র কণ্ঠে অমনি প্রস্তাবটা লুফে নিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—'তাহলে আমি বলব প্রফেসর সামারলির সঙ্গে এই সভাগৃহ থেকে এই দুজনেই চলুক আমার বিবৃতির সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্যে।'

ফলটা হল এই: হর্ষধ্বনি আর হৈ-হল্লার মধ্যে দিয়ে স্থিরীকৃত হয়ে গেল আমাদের বিধিলিপি। মনুষ্য স্রোতে প্রবাহিত হয়ে যেতে দেখলাম নিজেকে। ধেয়ে গেলাম প্রবহমান স্রোতের সঙ্গে দরজা অভিমুখে। মনটা কিন্তু আচ্ছন্ন হয়ে রইল আচম্বিতে হাতে পাওয়া এই বিরাট সুযোগের পরিণাম স্বরূপ অকল্পনীয় সম্ভাবনা কল্পনায়। দরজার বাইরে আসার পর ক্ষণেকের জন্যে খেয়াল হল হাসতে হাসতে ছাত্ররা যাচ্ছে ফুটপাত বেয়ে, আর একটা হাত ছাতাপেটা করতে করতে এগিয়ে চলেছে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে। তারপরেই আর্তনাদ আর জয়ধ্বনির সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ইলেকট্রিক ব্রুহাম সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল ফুটপাতের ধার থেকে এবং রিজেন্ট স্ট্রীটের রুপোলি আলোর তলা দিয়ে গ্ল্যাডিস আর আগুয়ান ভবিষ্যতের বিস্ময় চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে হেঁটে চললাম আপন মনে।

হঠাৎ কে যেন স্পর্শ করল আমার কনুই। ফিরে দাঁড়ালাম। চোখোচোখি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম সেই দীর্ঘকায় শীর্ণকায় পুরুষটিকে যিনি আমার সঙ্গেই অদ্ভুত এই তদন্ত অভিযানে সহচর হচ্ছেন। তাঁর প্রভুত্ব-

ব্যঞ্জক দুই চোখে এখন কিন্তু কৌতুকের রোশনাই।

বললেন—'মিস্টার ম্যালোন তো? একই যাত্রার সঙ্গী হলাম দুজনে—তাই না? রাস্তা পেরোলেই আমার নিবাস—অ্যালবানিতে। আধঘণ্টা আমার সঙ্গে ব্যয় করতে নিশ্চয় অমত করবেন না। দু-একটা ব্যাপার আপনাকে না বললেই নয়।'

৬ ॥ ঈশ্বরের ডাণ্ডস ছিলাম আমি

ভিগো স্ট্রীট বরাবর এগিয়ে গেলাম আমি আর লর্ড জন রক্সটন। দু-পাশে সুবিখ্যাত অভিজাত পল্লীর ঘিঞ্জি গাড়ীবারান্দার পর গাড়ীবারান্দা। একটা দীর্ঘ মলিন গলি পথের শেষে পৌঁছে দরজায় ঠেলা দিলেন সঙ্গী ভদ্রলোক, ইলেকট্রিক সুইচ টিপলেন। রঙীন শেড আচ্ছাদিত অনেকগুলো ঝলমলে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিশাল একটা ঘর। দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম অসাধারণ আরামপ্রদ বিলাসবহুল ঐশ্বর্য নিচয়ের সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে প্রচণ্ড পৌরুষের বিবিধ নিদর্শন। ঘরের যে দিকে তাকাই, সেইদিকেই দেখি ধনবানের রুচিসুন্দর বিলাসসামগ্রীর পাশাপাশি চিরকুমারের অগোছালো অপরিচ্ছন্নতা। প্রতীচ্যের বাজার থেকে আমদানী দামী পশুলোমের চামড়া আর অদ্ভুত দ্যুতিময় মাদুর বিক্ষিপ্ত রয়েছে মেঝেতে। দেওয়াল ঢাকা পড়ে গেছে অজস্র ছবি আর ছাপা জিনিসে—অনভ্যস্ত চক্ষুতেও প্রতীয়মান হল বস্তুগুলো অমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। মুষ্টিযোদ্ধা, ব্যালে নৃত্য মশগুল তরুণী এবং ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের ছবি একের পর এক ঝুলছে দেওয়ালে। এই সবের মধ্যেই কিন্তু রয়েছে বহু প্রতিযোগিতা থেকে জয় করে আনা বিস্তর পদক এবং কাপ—দেখলেই মনে পড়ে যায় লর্ড জন রক্সটন এককালে শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়াবিদ ছিলেন—বিজিত জয়ের মুকুটগুলো কিন্তু হেলায় ছড়িয়ে আছে ঘরময়। ঘন নীল রঙের একটা দাঁড়ের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে রাখা একটা চেরী-গোলাপী দাঁড় ম্যান্টলপিসের ওপর—অর্থাৎ নৌকো চালনা বিদ্যাতেও জয়ের মুকুট তিনি পরেছেন এককালে। দাঁড়ের ওপরে আর নিচে একখানা ডগায় বোতাম আঁটা তরবারি যুদ্ধের ভোঁতা তরবারি আর মুষ্টিযোদ্ধার একজোড়া গ্লাভস দেখেই বুঝলাম দুটো বিদ্যেতেই তিনি সমান পারদর্শী। ঘরের যত্রতত্র ছড়ানো রয়েছে শিকারে নিহত জন্তুদের মাথা—পৃথিবীর নানান অঞ্চল থেকে সংগৃহীত—এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নজর কাড়ে ঠোঁট-খোলা একটা গণ্ডারের মুণ্ড—ল্যাডো এনক্লেভের দুষ্প্রাপ্য শ্বেত গণ্ডার।

মূল্যবান লাল গালিচার ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা কালো আর সোনা রঙের লুই কুইঞ্জ টেবিল। অপূর্ব সুন্দর প্রাচীন সম্পদ। গ্লাস রাখার দাগে ওপরটা যাচ্ছেতাই আকার নিয়েছে—পোড়া সিগারেটের দাগও দেখা যাচ্ছে। দুর্লভ কিন্তু অযত্নে রক্ষিত এই টেবিলের ওপর রয়েছে একটা রুপোর রেকাবী। রেকাবীর ওপর রয়েছে চকচকে বার্নিশ করা একটা স্পিরিট স্ট্যাণ্ড আর সাইফন। এই দুটি বস্তু থেকে উৎকৃষ্ট সুরা দুটো গেলাসে ঢেলে নিলেন আমার অভিজাত সঙ্গী ভদ্রলোক। হাতের নির্দেশে দেখিয়ে দিলেন একটা হাতল চেয়ার, পাশে রাখলেন অবসাদ দূর করার সুরাপাত্রটি এবং হাতে গুঁজে দিলেন একটা লম্বা মসৃণ চুরুট। তারপর বসলেন আমার বিপরীত দিকে। অদ্ভুত, চিকমিকে, বেপরোয়া দৃষ্টি মেলে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন আমার পানে। শীতল, হাল্কা, নীল চোখ—হিমবাহ হ্রদের রঙে রঙীন।

চুরুটের পাতলা ধোঁয়াশার মধ্যে দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম সেই মুখ যে-মুখের সঙ্গে ইতিপূর্বেই বহুবার পরিচয় ঘটেছে বহু ফটোগ্রাফের মাধ্যমে। ধারালো বক্র নাসিকা, মাংসহীন সিঁটিয়ে থাকা গাল, গাঢ় লালচে চুল, ওপর দিকে বিরল, কোঁকড়ানো পুরুষালী গোঁফ, ঠেলে বেরিয়ে আসা থুৎনিতে মারমুখো দাড়ির গুচ্ছ। ভদ্রলোকের চেহারায় রয়েছে কিছুটা তৃতীয় নেপোলিয়ন, কিছুটা ডন কুইক্সোট—আর কিছুটা গ্রাম্য ইংরেজের সারবস্তু—সজাগ, সতর্ক; কুকুর এবং ঘোড়া নিয়ে খোলামেলা পরিবেশে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত মানুষের সতেজ ছাপ। গাত্রবর্ণ লাল ফুলদানী রঙের—রোদ্দুর আর বাতাসে তামাটে। ভুরুগুচ্ছ কার্নিশের মত ঝুলে রয়েছে শীতল চক্ষু জোড়ার ওপর—ফলে চাহনি অমন ভীষণ—কঠোর বলিরেখা আঁকা ললাটের দরুন তীব্রতর হয়েছে সেই চাহনি। আকৃতিতে ছিমছাম, কিন্তু অত্যন্ত পেটাই গড়ন। ইতিপূর্বে একাধিকবার প্রমাণ দিয়েছেন ওঁর মত কষ্ট সহিষ্ণু মজবুত শরীর তামাম ইংলণ্ডে বেশী নেই। মাথায় ছ-ফুটেরও একটু বেশী। কিন্তু স্কন্ধযুগল অদ্ভুতভাবে গোল হয়ে থাকার দরুন অতটা লম্বা মনে হয় না। বিখ্যাত এ-হেন লর্ড জন রক্সটন আমার ঠিক সামনেই উপবিষ্ট হয়ে কড়া দাঁতে চুরুট কামড়ে ধরে নিমেষহীন নয়নে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন দীর্ঘ অস্বস্তিকর নীরবতা বজায় রেখে।

বললেন অবশেষে—'ভায়া, একই ঝঞ্ঝাটে শেষ পর্যন্ত এসে পড়লাম দুজনে। সভায় ঢোকার আগে নিশ্চয় ভাবেননি এরকম একটা ব্যাপারে

জড়িয়ে পড়বেন ?'

'একেবারেই না।'

'আমিও ভাবিনি। উগাণ্ডা থেকে ফিরলাম 'তো এই সেদিন—তিন হপ্তাও হয়নি। স্কটল্যাণ্ডে জায়গাজমিও লীজ নিয়ে ফেলেছি। বড় মজার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম শেষ পর্যন্ত। আপনার কি মনে হয় ?'

'আমার মূল কাজই তো এই। পেশায় আমি সাংবাদিক। 'গেজেট' পত্রিকা।'

'তাই তো শুনে এলাম। ভাল কথা। আমার ছোট্ট একটা উপকার করতে পারবেন ?'

'সানন্দে।'

'ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই তো ?'

'কি ধরনের ঝুঁকি ?'

'ঝুঁকি তো ব্যালিঞ্জার নিজেই। নাম শুনেছেন নিশ্চয়।'

'না।'

'কী আশ্চর্য! ভায়া, থাকেন কোন জগতে ? উত্তর অঞ্চলে স্যার জন ব্যালিঞ্জারের চেয়ে দুঁদে জকি আর নেই। সোজা দৌড়ে আমি ওকে টক্কর দিতে পারলেও লাফিয়ে বাধা পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে আমার মাস্টার সে। ট্রেনিং যখন না থাকে, তখন কিন্তু পাঁড় মাতাল। মঙ্গলবার থেকে প্রলাপ বকছে—এখনও পর্যন্ত কাছে যায় কার সাধ্যি। থাকে আমার ওপরের ঘরে। ডাক্তার বলে গেছেন, লোকটার পেটে যদি দানাপানি না ঢোকানো যায়, আর বাঁচানো যাবে না। কিন্তু বালিশের তলায় ছ-ঘড়া রিভলবার নিয়ে সে শুয়ে আছে—হুমকি ছাড়ছে ছ-টা গুলিই বুকে ঢুকিয়ে দেবে যে যাবে কাছে। ফলে চাকর বাকর দরজার সামনেও আর যাচ্ছে না। ধর্মঘট করে বসে আছে। জ্যাকের গুলি কখনো ফসকায় না। তাই বলে কি এইভাবে গ্রাণ্ড ন্যাশন্যাল বিজয়ীকে মরতে দেওয়া যায় ?'

'কি করতে বলেন আমাকে ?'

'দুজনে যদি তেড়েফুঁড়ে ঢুকে পড়ি, তাহলে জ্যাক গুলি করবে একজনকে টিপ করে, সেই ফাঁকে আরেকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে ছিনিয়ে নেব রিভলবারটা। তারপর ফোন করে স্টোম্যাক-পাম্প আনিয়ে পেট থেকে সব টেনে বার করে দিলেই রাতের খানাটা গিলিয়ে দেওয়া যাবে।'

এ আবার কি ঝঞ্ঝাট! এমনি করেই কি আচমকা ফ্যাসাদ এসে যায়

দৈনন্দিন জীবনে? স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি খুব একটা ডাকাবুকো ডানপিটে মানুষ নই। আইরিশ কল্পনা শক্তি দিয়ে অজ্ঞাত বিষয়কে আরো ভয়ংকর করে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা আছে ঠিকই। কিন্তু মানুষ হয়েছি কাপুরুষ পরিবেশে—এ সব ব্যাপারে আঁৎকে উঠি রীতিমত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ হ্রদের মত খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারি কেবল আমি যে নির্ভীক তা প্রতিপন্ন করার জন্যে—সাহস আছে বলে নয়। তাই ওপরতলার হুইস্কি-গেলা উন্মাদটার চেহারাখানা কল্পনা করে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠা সত্ত্বেও চোখে মুখে দারুণ একটা বেপরোয়া ভাব ফুটিয়ে তুলে রাজী হয়ে গেলাম যথা সম্ভব নির্বিকার গলায়। লর্ড জন রক্সটন তা সত্ত্বেও যখন কাজটায় আরও সম্ভাব্য বিপদের ফিরিস্তি দিতে বসলেন, মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার।

বললাম খিটখিটে গলায়—'কথায় কাজ কী? চলুন যাই।'

বলেই উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে—উনিও দাঁড়িয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপরেই খুব যেন একটা গোপন ব্যাপার মনের মধ্যে পুষে রেখেছেন, এই রকম একটা গূঢ় শুষ্ক খুক-খুক হাসি হেসে বার দু-তিন আমার বুক চাপড়ে অবশেষে ঠেলে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে।

'পারবে, ছোকরা, তুমি পারবে!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি।

'জ্যাক ব্যালিঞ্জারের হিল্লে করে এসেছি আমি আজ সকালেই। নেশার-ঘোরে হাত কাঁপছিল তাই রক্ষে, গুলিটা আমার কিমোনো ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। হপ্তাখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে ব্যালিঞ্জার। ছোকরা—ছোকরা বলছি বলে কিছু মনে করছো না তো?—ছাখো, একই পথের পথিক হতে চলেছি দুজনে। দক্ষিণ আমেরিকা জায়গাটা ছেলেমানুষী করার জায়গা নয়—তাই আমার সঙ্গে যে যাবে তার বুকের পাটা কদ্দুর, তার ওপর আদৌ ভরসা রাখা যায় কিনা—তা বাজিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল। দেখলাম, তুমি কেটে বেরিয়ে গেলে পরীক্ষায়। বুড়ো সামারলিকে কিন্তু গোড়া থেকেই আগলে রাখতে হবে আমাদের দুজনকেই। ভালো কথা, আয়র্ল্যাণ্ডে রাগবি কাপ জিততে এনেছিল যে ম্যালোন, তুমিই কি সেই ম্যালোন?'

'রিজার্ভে বলুন।'

'তাই তো বলি, তোমার মুখখানা অমন চেনা-চেনা লাগছিল কেন। রিচমণ্ডকে তুমি যখন বেঁকে চুরে দৌড়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলে, আমি

তো তখন ওখানেই ছিলাম—ওরকম ফাইন দৌড় আমি এই মরশুমে আর দেখিনি। রাগবি ম্যাচ দেখতে কখনো ভুলি না কেন জানো? এরকম পুরুষালী খেলা আর হয় না। যাক গে, খেলা নিয়ে বকবক করার জন্যে তোমাকে এখানে ডেকে আনিনি। কাজের কথা হোক। টাইমস-এর প্রথম পৃষ্ঠায় এই দ্যাখো লিখেছে কবে কোন্ জাহাজ ছাড়বে। সামনের সপ্তাহের বুধবারে প্যারা যাচ্ছে একটা বৃশ বোট। প্রফেসরকে যদি রাজী করাতে পারো, তাহলে ঐতেই যাওয়া যাক। কি বললে? আমাকেই রাজী করাতে হবে? ঠিক আছে। তাই করব। সঙ্গে জিনিসপত্র কি নেবে?'

'সে ব্যবস্থা আমার অফিস থেকে করে দেবে।'

'গুলি করতে জানো?'

'টেরিটোরিয়াল ট্রেনিংয়ে যদ্দুর শেখায়—তদ্দুর।'

'হায় ভগবান! তাহলে তো বন্দুকবাজিতে একেবারে আনাড়ি বললেই চলে। ছোকরা, তোমরা এই বিদ্যেটা শেখার ব্যাপারে কেন যে এত হেলাফেলা করো বুঝি না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় যে ছোকরা বন্দুক সোজা করে না ধরলেই নয়। কেন না, প্রফেসর পাগল অথবা মিথ্যুক যদি না হন, তাহলে অদ্ভুত অনেক কিছুরই সামনাসামনি হতে হবে। কোন্ বন্দুক চালাও তুমি?'

বলে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন একটা কাবার্ডের সামনে। পাল্লা খুললেন। ভেতরে সারি সারি চকচকে বন্দুকের নল দেখলাম—ঠিক যেন অরগ্যান পাইপ।

'দেখি কোন্‌টা তোমাকে দেওয়া যায়।'

একটার পর একটা চমৎকার সুন্দর রাইফেল টেনে বার করলেন, খুললেন এবং খটাং খট করে বন্ধ করে অপত্যস্নেহে অতি সন্তর্পণে ফের সাজিয়ে রাখলেন কাবার্ডে।

সাদা গণ্ডারের মুণ্ডটা দেখিয়ে বললেন—'ওকে মাটিতে ফেলেছিলাম এই রাইফেলটা দিয়ে—ব্ল্যাণ্ড'স্ পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন অ্যাক্সাইট এক্সপ্রেস। আর দশ গজ এগিয়ে এলেই আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত। গর্ডনের নাম শুনেছো? ঘোড়া আর বন্দুক দুটোই চালাতে জানত। কবিতাও লিখতো। তার এই কবিতাখানা তাহলে শুনে রাখো।

'ভাগ্য ঝোলে শঙ্কুসম ঐ বুলেটের হাতে
চিত্ত যদিও কাঁপে জেনো সুযোগ আছে সাথে।'

'এই যে একটা কাজের হাতিয়ার পেয়েছি। পয়েন্ট ফোর সেভেন

জিরো, টেলিস্কোপিক সাইট, ডাব্ল্ ইজেকটর, তিপ্পান্নগজ পর্যন্ত চাঁদমারির ঠিক মাঝখানে গিয়ে ঢুকবে বুলেট। তিনবছর আগে পেরুর দাসব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করেছিলাম এই রাইফেল দিয়ে। ও অঞ্চলে ঈশ্বরের অঙ্কুশ বলা হত আমাকে—ভগবানের ডাণ্ডাও বলতে পারো। অবশ্য কোন ধর্মগ্রন্থে তা লেখা নেই। জীবনে এমন এক-একটা সময় আসে যখন আমাদের প্রত্যেককেই সত্য আর ন্যায়ের জন্যে মানুষের স্বার্থে ডাণ্ডা হাঁকিয়ে শায়েস্তা করতে হয় অমানুষদের। নইলে যে, ছোকরা মনের ময়লা কাটে না। তাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম একাই। লড়েছিলাম একাই। জিতেওছিলাম একাই। এই যে সারি সারি খাঁজগুলো দেখছ, এর এক-একটা খাঁজ এক-একজন দাস-খুনীর নামে উৎসর্গ করেছিলাম। ঐ বড় খাঁজটা পেড্রো লোপেজের। দাস-খুনীদের সম্রাট। পুটোমায়ো নদীর ও'র তাকে পরলোকে পাঠিয়েছিলাম। এই যে…এইটা তোমার কাজে লাগবে।' ভারী সুন্দর বাদামী রুপোলী একটা রাইফেল টেনে বার করলেন লর্ড রক্সটন—'স্টকের রাবার ভালোই, সাইট নিখুঁত, ক্লিপে পাঁচখানা কার্তুজ। তোমার প্রাণরক্ষের ভার নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারো এর ওপর।' আমার হাতে রাইফেল-খানা তুলে দিয়ে পাল্লা বন্ধ করে দিলেন ক্যাবিনেটের। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন—'ভালো কথা, প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের খবর কিছু রাখো? জানো কিছু ওঁর সম্বন্ধে?'

'আজকের আগে জীবনে দেখিনি ভদ্রলোককে।'

'আমিও তাই। যাঁকে চিনি না জানি না—তাঁর হুকুম তামিল করতেই বেরোতে হচ্ছে দুজনকে—মজা আর কাকে বলে! বুড়ো বড় দাম্ভিক ঘুঘু। সতীর্থ বৈজ্ঞানিকরা দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। এ ব্যাপারে তোমার আগ্রহ এল কি ভাবে?'

সংক্ষেপে বললাম সকালের অভিজ্ঞতা। উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন লর্ড জন রক্সটন। তারপর দক্ষিণ আমেরিকার একটা ম্যাপ এনে বিছিয়ে ধরলেন টেবিলের ওপর।

বললেন আন্তরিকভাবে—'ওঁর প্রত্যেকটা কথা সত্যি—আমার তাই বিশ্বাস। খেয়াল রেখো, জলো ব্যাপার হলে এভাবে কথা বলতাম না। দক্ষিণ আমেরিকা জায়গাটাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি কেন জানো? এই গ্রহে ওর চাইতে ওয়াণ্ডারফুল, গ্র্যাণ্ড, সমৃদ্ধ অঞ্চল আর তুমি পাবে না কোথাও ড্যারিয়েন থেকে ফুয়েগো পর্যন্ত। একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলেছি আমি। দাস ব্যবসায়ীদের ডাণ্ডা হাঁকিয়ে দণ্ড দেওয়ার

সময়ে দু-দুটো শুক্‌নো ঋতু কাটিয়েছি ওখানেই। তখন ঠিক এই ধরনের কিছু গুজব আমার কানেও এসেছিল। শুনেছিলাম ইণ্ডিয়ান জংলীদের কাছে। ভেবেছিলাম জঙ্গলের কিংবদন্তী। তবে সব কিংবদন্তীর মূলে যেমন কিছু একটা থাকে, এ ক্ষেত্রেও যে তা আছে, তখনি আমার মনে হয়েছিল। ও দেশে তুমি যত ঘুরবে দেশটাকে যত বেশী চিনবে জানবে— ততই বুঝবে ওখানে সব সম্ভব—সব সম্ভব। সরু সরু কয়েকটা জলপথে জংলীরা যাতায়াত করে। তার বাইরে সমস্তই অজানা অন্ধকারে রহস্যময়।' চুরুটটা ম্যাপের এক জায়গায় রেখে—'এই ছাখো ম্যাটো গ্রোসো, অথবা তিনটে দেশ যেখানে মিশেছে—এইখানটায়—চক্ষু চড়ক গাছ করে দেওয়ার মত অনেক তাজ্জব ব্যাপার আছে এ অঞ্চলে। অসম্ভব অবিশ্বাস্য কিছু নেই এখানে—আমি অন্ততঃ তা বিশ্বাস করি না। বুড়ো তো বলেই দিলেন একটু আগে, শুধু জলপথই জুড়ে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার মাইল—আয়তনে যা গোটা ইউরোপ মহাদেশের সমান। স্কটল্যাণ্ড থেকে কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌ যদ্দূর—ততটা তফাতে তুমি আর আমি থাকলেও জানবে রইছি সেই একই বিশাল ব্রেজিল জঙ্গলের মধ্যে। বিরাট এই গোলক ধাঁধার দুটো একটা জায়গায় কেবল মানুষ পা দিতে পেরেছে। বর্ষায় চল্লিশ ফুট পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে নদীর জল নেমে আসছে গ্রীষ্মে আর শীতে। আধখানা দেশ জুড়ে রয়েছে এমন জলা জায়গা যা টপকে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। এ রকম জায়গায় ঢুঁ মারতে যাবো না কেন বলতে পারো? তাছাড়া,' বলতে বলতে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শীর্ণ অদ্ভুত মুখখানা—'এখানকার প্রতি মাইলে জানবে স্পোর্টসের মজা আছে। ঝুঁকি আছে। বিপদ আছে। সাদা গলফ্‌বল বলতে পারো আমাকে—সাদা রঙটা ঘা খেয়ে খেয়ে উঠে গেছে অনেক আগেই। জীবনে আর তেমন চমক পাই না—মনে আর কোনো দাগ পড়ে না। কিন্তু ছোকরা, যে স্পোর্টসে ঝুঁকি আছে, বেঁচে থাকার মজাও তার মধ্যে আছে। তাই আবার বাঁচার মত বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেই যেন বড্ড আরামে তুলতুলে হয়ে নরম হয়ে যাচ্ছি। তাই যেতে চাই বিরাট পতিত জমিতে হাতে একখানা রাইফেল নিয়ে জীবন বিপন্ন করেও অজানার সন্ধানে—এমন কিছুর সন্ধানে যা আমার জীবনকে ধন্য করে দেবে। আমি ঘোড় দৌড়ে নেমেছি, এরোপ্লেন চালিয়েছি, লড়াই করেছি—কিন্তু জন্তু শিকারের মধ্যে এমন একটা তৃপ্তি আছে যা গলদা-চিংড়ির ঝোল খাওয়ার মত টাটকা স্বপ্নেরই সামিল।' সম্ভাবনাটার কল্পনায় খুক-খুক করে পরমানন্দে

হেসে উঠলেন লর্ড জন রক্সটন।

প্রথম পরিচয়-পর্ব নিয়ে হয়তো একটু বেশীই লিখে ফেললাম। কিন্তু বহুদিন যাঁর সাথী থাকতে হবে, তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, কথা বলার ঢং আর চিন্তাধারা যথাসম্ভব খুঁটিয়ে লেখবার চেষ্টা করলাম সেই কারণেই। শেষ পর্যন্ত বিদেয় নিতে হল অধিবেশনের প্রতিবেদন লেখবার তাগিদে। আসবার সময়েও দেখে এলাম খুক্‌খুক্ করে শুষ্ক হাসি হাসতে হাসতে দুর্গম অঞ্চলের অজ্ঞাত অ্যাডভেঞ্চারের সুখস্বপ্নে মশগুল হয়ে আপন মনে তেল দিয়ে চলেছেন রাইফেলগুলোয়। হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, বিপদ যদি আসে আশ্চর্য এই অভিযানে, সেই বিপদের অংশীদার হওয়ার মত এমন ঠাণ্ডা মাথা আর সাহসী মন সারা ইংল্যাণ্ডে আর দুটি নেই।

সেই রাতেই ম্যাকআর্ডল সব শুনলেন। পরের দিন সকালেই স্যার জর্জ বিউমন্টকে সমস্ত বললেন। ঠিক হল অ্যাডভেঞ্চারের বিশদ বিবরণ আমি ম্যাকআর্ডলকে পাঠিয়ে দেব। উনি তা হাতে পাওয়ামাত্র 'গেজেট'-য়ে ছাপবেন কি পরে প্রকাশের জন্যে রেখে দেবেন সেটা ঠিক হবে প্রফেসরের অনুমতির ওপর—এখনও তো জানা যায় নি এ ব্যাপারে কি-কি সর্ত তিনি আরোপ করতে চলেছেন। টেলিফোনে খোঁজ নিতে গিয়ে সংবাদ মহলের বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিষোদ্গার প্রাপ্তি ছাড়া আর কোনো লাভ হল না। সেই সঙ্গে শুনিয়ে দিলেন, জলযানের ব্যবস্থা যদি করি, যাত্রার মুহূর্তে উনি খেয়ালখুশীমত পথনির্দেশ দেবেন। দ্বিতীয়বার ফোন করে শুনলাম তাঁর স্ত্রীর কান্না জড়ানো কণ্ঠস্বর—স্বামীদেবতা নাকি নটরাজ নৃত্য নেচে বেড়াচ্ছেন বাড়ীময়—দয়া করে আবার ফোন করে যেন তাঁর উগ্র মেজাজটাকে উগ্রতর করে না তুলি। তৃতীয় প্রচেষ্টায় শোনা গেল একটা প্রচণ্ড মড়মড় শব্দ—কি যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সেন্ট্রাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে খবর নিয়ে জানা গেল, প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের টেলিফোন যন্ত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তারপর থেকেই যোগাযোগের যাবতীয় প্রচেষ্টা শিকেয় তুলে রাখলাম।

হে সহিষ্ণু পাঠক পাঠিকাগণ, এরপর থেকে কিন্তু সরাসরি আপনাদের উদ্দেশে আর কিছু লিখতে পারবো না। এখন থেকে (আমার বর্ণনা-কাহিনী যদি আদৌ নিয়মিত পৌঁছোয় আপনাদের কাছে) সব কিছুই বেরোবে আমার পত্রিকার মাধ্যমে। অত্যাশ্চর্য এই অভিযান-কাহিনী প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব এখন থেকে সম্পাদকের হাতে। ইংলণ্ডে যদি আর কোনো-দিন ফিরতে নাও পারি, অভিযানের বিবরণ তো থেকে যাবে। বুথ লাইনার

'ফ্রান্‌সিস্‌কা'য় বসে লিখছি এই শেষ ক'টা লাইন—পাইলটের হাতে পৌঁছে যাবে মিস্টার ম্যাকআর্ডলের কাছে। নোটবুক বন্ধ করার আগে শেষ একটা ছবি উপহার দিয়ে যাই আপনাদের—যে দেশ ছেড়ে যাচ্ছি, সেই দেশের স্মৃতি-উজ্জ্বল সর্বশেষ ছবি। বসন্তের শেষ। কুয়াশাচ্ছন্ন আর্দ্র প্রভাত। ঝিরঝিরে হিম কনকনে বৃষ্টি। পাটাতনের দিকে জেটি বেয়ে আসছে চকচকে ম্যাকিনটশ পরা তিনটে মূর্তি—পাটাতন উঠে এসে ঠেকেছে জাহাজে। জাহাজে উড়ছে ব্লু-পিটার পতাকা। তিন মূর্তির সামনে ট্রলী বোঝাই ট্রাঙ্ক, প্যাকেট এবং বন্দুকের বাক্স ঠেলে নিয়ে আসছে একজন কুলি। হেঁট মস্তকে বিষণ্ণ চেহারায় পা টেনে টেনে হাঁটছেন প্রফেসর সামারলি—এর মধ্যেই যেন মুষড়ে পড়েছেন ভবিষ্যৎ কল্পনা করে। ক্ষিপ্র-চরণে আসছেন লর্ড জন রক্সটন—শিকারী টুপি আর মাফলারের ফাঁকে জ্বল জ্বল করছে উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখটি। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা, বিদায়-অভিনন্দন আর প্রস্তুতির উৎকণ্ঠা থেকে রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি যেন আমি—চলনে বলনে নিশ্চয় তা পরিস্ফুট হচ্ছে। জাহাজের কাছাকাছি হতেই আচমকা একটা হাঁক শুনলাম পেছনে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আসছেন—বিদায়-অভিনন্দন জানাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলেই আসছেন। আরক্ত-মুখ, কোপনস্বভাব মূর্তিটা হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে আসছে বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে।

বলছেন—'না, না, অজস্র ধন্যবাদ। জাহাজে ওঠার কোনো বাসনা আমার নেই। দু-একটা কথা বলতে চাই এখানেই। অভিযানে অংশ নিতে চলেছেন বলে আপনাদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম, অনুগ্রহ করে এইরকম একটা ধারণা নিয়ে যাবেন না। কিচ্ছু এসে যায় না আমার—কৃতার্থ করে বসলেন, এমন আত্মতুষ্টি যেন ঘুণাক্ষরেও মনের মধ্যে না আসে। সত্য চিরকাল সত্যই থেকে যাবে—হাজার রিপোর্টই লিখুন না কেন—অত্যন্ত অযোগ্য অপদার্থ কিছু ব্যক্তির কৌতূহল চরিতার্থই সার হবে কেবল। খ আঁটা খামের মধ্যে রইল আমার নির্দেশ আর পথের নিশানা। আমাজনের পাড়ে ম্যানাওস শহরে পৌঁছোনোর আগে খামটা খুলবেন না—কবে, কখন খুলতে হবে, তা লেখা রইল খামের বাইরে। বোঝাতে পেরেছি তো? সর্তগুলো যেন ঠিক-ঠিক মেনে চলা হয়। মিঃ ম্যালোন, খবর ছাপার ব্যাপারে কোনো বাধা আরোপ করছি না আপনার ওপর। ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই তো যাচ্ছেন আপনি। তবে ঠিক কোথায় যাচ্ছেন, তার হদিশ ফাঁস করছে

পারবেন না এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই ছাপতে পারবেন আপনার জঘন্য পেশাটা সম্বন্ধে আমার অপ্রীতিকর ধারণার কিছুটা পরিবর্তন করেছেন আপনি। বিদায়, লর্ড জন। বিজ্ঞান আপনার কাছে দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু শিকারী হিসেবে অনেক আনন্দ পাবেন—অভিনন্দন রইল আগে থেকেই। রকেটের মত ধাবমান ডাইমোরফোডোনকে গুলি করে পেড়ে ফেলার চাঞ্চল্যকর বিবরণ 'ফিল্ড' পত্রিকায় প্রকাশ করার সুযোগটাও পেয়ে যাবেন আশা করি। প্রফেসর সামারলি বিদায় জানাই আপনাকেও। খোলাখুলিই বলছি, আপনার আত্ম-উন্নতির সম্ভাবনা নেই বলেই দৃঢ় বিশ্বাস আমার, তা সত্ত্বেও যদি ও কাজটা করতে পারেন, তাহলে লণ্ডনে ফিরবেন অধিকতর জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে।'

এই বলেই বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালেন চ্যালেঞ্জার। মিনিটখানেক পরে ডেক থেকে দেখলাম তাঁর খর্বকায় বিপুল আকৃতি মিলিয়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরে ট্রেন অভিমুখে। যাই হোক, 'চ্যানেলে' জাহাজ অনেকটা এগিয়ে এসেছে। চিঠি দেওয়ার শেষ ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বিদায় জানাই পাইলটকে। এখন থেকে শুরু হয়ে গেল অজানা অভিযান। যাদের ফেলে এলাম পেছনে, ঈশ্বর যেন তাদের সবাইকে সুখে রাখেন এবং আমাদেরকে সুস্থ শরীরে ফিরিয়ে আনেন।

৭ ॥ আগামীকাল উধাও হব অজানার উজানে

এ কাহিনী যাঁদের কাছে পৌঁছোবে, বুথ লাইনারের বিলাসবহুল সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দিয়ে তাঁদের বিরক্ত করতে চাই না। প্যারা-তে যে সাত-দিন কাটিয়েছিলাম, তারও বর্ণনা দিয়ে কাহিনীকে একঘেয়ে করতে চাই না। ঋণ স্বীকার করব কেবল পেরিরা ডা পিন্টা কোম্পানীর কাছে। অসীম কৃপা তাঁদের। সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন এবং অনেক সাহায্য করেছিলেন। নদীপথে যাত্রার বর্ণনাও দেব সংক্ষেপে। আটলান্টিক পেরিয়ে এলাম যে জাহাজে, তার চাইতে একটু ছোট স্টীমারে রওনা হয়ে-ছিলাম নদীপথে। বেশ চওড়া নদী। ধীরগতিতে প্রবহমান। কাদা-গোলা ঘোলাটে জল। ওবিডোস-র সঙ্কীর্ণ পথ পেরিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছোলাম ম্যানাওস শহরে। সরাইখানা এখানে একটাই—আকর্ষণীয় তেমন নয়। এ-হেন চটিতে ওঠার নিরানন্দ থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দিলেন বৃটিশ অ্যাণ্ড ব্রেজিলিয়ান ট্রেডিং কোম্পানীর প্রতিনিধি মিস্টার শর্টম্যান। এঁর সহৃদয় আতিথ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর এল সেই বিশেষ দিনটি

যেদিন প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের নির্দেশ এবং পথের নিশানা লেখা চিঠিখানা খাম খুলে পড়া হবে। সেই দিনটির বিস্ময়কর ঘটনাবলী বিবৃত করার আগে মোটামুটি স্পষ্ট কিছু কথাচিত্র উপহার দেব এই অভিযানে আমার সঙ্গীসাথীদের। যাঁরা এসেছেন লণ্ডন থেকে, তাঁদের তো বটেই—সেই সঙ্গে যারা দলভারী করেছে এই দক্ষিণ আমেরিকায় পা দেওয়ার পর—তাদেরও। যা লিখব, তা খোলাখুলিই লিখব। কিন্তু তার কাটছাঁট সম্পাদনার ভার রইল আপনার ওপর। কেন না, মিস্টার ম্যাকআর্ডল, আপনার হাত দিয়েই তো শেষ পর্যন্ত আমার এই প্রতিবেদন পৌঁছোবে দুনিয়ার সামনে।

প্রফেসর সামারলির বৈজ্ঞানিক কীর্তিকাহিনী আমি ভালভাবেই জানি বলেই তার আর স্মৃতিচারণ করতে চাই না। ভদ্রলোককে প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল বুঝি এ ধরনের দুর্গম পথের অভিযাত্রী হওয়ার মত যোগ্যতা তাঁর নেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিলক্ষণ যোগ্যতা তাঁর আছে। পথশ্রমে তিনি অবিচলিত—দীর্ঘ, শীর্ণ, দড়ির মত তন্তুময় চেহারাখানা পথের কষ্ট অনুভব করতে পারে বলে মনেই হয় না। পরিবেশ যতই পালটাক না কেন, পালটায় না তাঁর শুষ্ক, শ্লেষজড়িত এবং একেবারেই সহানুভূতিবিহীন প্রকৃতি। প্রায়ই বিষম কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাদের সকলকেই, কিন্তু ছেষট্টি বছর বয়েসেও বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুনিনি। গজগজ করতে দেখিনি। ভেবেছিলাম এই অভিযানে তিনি হবেন একটা গলগ্রহ, এখন দেখছি আমার মতই বিষম কষ্টসহিষ্ণু উনি। মেজাজে উনি উগ্র প্রকৃতির, রসনা শানানো এবং স্বভাবে অবিশ্বাসী। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যে ষোলআনা ভণ্ড এবং প্রবঞ্চক, তাঁর এই দৃঢ়মূল বিশ্বাস প্রথম থেকেই গোপন রাখবার কোনো প্রয়াসই তিনি করেননি। বারবার বলেছেন, বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করা হচ্ছে, ফিরতে হবে হতাশ হয়ে অনেক বিপদের সম্মুখীন হওয়ার পর এবং হাস্যাস্পদ হতে হবে ইংলণ্ডে। সাদামটন থেকে শুরু করে ম্যানাওস পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় তাঁর এই সব সুচিন্তিত অভিমত সরু ছাগলে দাড়ি নাড়তে নাড়তে এবং ভীষণ ভাবাবেগে সরু মুখখানা তেউড়ে বেঁকিয়ে সমানে ঠুসে দিয়ে গেলেন আমাদের কর্ণকুহরে। স্টীমার থেকে নামবার পর ইস্তক অনেকটা সান্ত্বনা পেলেন চারপাশের সৌন্দর্যময় পরিবেশ এবং বিচিত্র কীটপতঙ্গ এবং বিহঙ্গকুলের সমাবেশে—কেন না, মনেপ্রাণে উনি নিজেকে তো বিজ্ঞানের বেদীমূলে উৎসর্গ করেই বসে আছেন। সারাদিন কাটান বনের মধ্যে—

ছুটোছুটি করেন—এক হাতে থাকে শট গান, আরেক হাতে প্রজাপতি পাকড়াও করার জাল। তন্নিষ্ঠ হয়ে সন্ধ্যেটা কাটান দিনের নমুনা সংগ্রহগুলোকে বোর্ডে সেঁটে রাখার কাজ নিয়ে। ভদ্রলোকের ছোটখাট অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটা উল্লেখ করার মত। পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। শরীর অতিশয় অপরিচ্ছন্ন। স্বভাবে দারুণ অন্যমনস্ক। নেশার মধ্যে একনাগাড়ে ধূমপান। খাটো ব্রায়ার-পাইপখানাকে কখনো তো মুখ থেকে সরে যেতে দেখিনি। যৌবনে বেশ কয়েকবার বৈজ্ঞানিক অভিযানে বেরিয়েছিলেন (পাপুয়া গেছিলেন রবার্টসনের সঙ্গে), তাই শিবির-জীবন এবং ক্যানোয় ভ্রমণ তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়।

কতকগুলো বিষয়ে সাদৃশ্য আছে লর্ড জন রক্সটনের সঙ্গে প্রফেসর সামারলির—অন্যান্য বিষয়ে রয়েছে বিষম বৈষম্য। বয়সে প্রথমজন দ্বিতীয়-জনের চেয়ে বিশবছরের ছোট কিন্তু দুজনেরই আকৃতি একইরকম মাংসবিরল অস্থিসার। লর্ড জনের চেহারার বিবরণ তো লণ্ডনে বসে লেখা বিবৃতির মধ্যে লিখে এসেছি। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং মার্জিত ছিমছাম রুচিসম্পন্ন পুরুষ। পরনে সব সময়ে সাদা ড্রিলের সুট, পায়ে উঁচু বাদামী মশক বুট এবং দৈনিক অন্তত: একবারও দাড়ি কামাবেনই। অধিংকাশ কর্মচঞ্চল পুরুষের মত কথা বলেন কম, কিন্তু প্রতিটা শব্দ গভীর অর্থবহ। প্রয়োজন বোধে নিমেষে চিন্তাবিষ্ট হন। প্রশ্নের জবাব দিতে দেরী করেন না। কথাবার্তায় অংশ নিতে অতি তৎপর। কথার ঢংটা কিন্তু অদ্ভুত ভাবে কৌতুক তরলিত। দুনিয়াটা সম্বন্ধে বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। প্রফেসর সামারলির নাসিকাকুঞ্চন এবং শ্লেষ বঙ্কিম হাসি সত্ত্বেও বর্তমান পর্যটন যে বিফলে যাবে না—এ বিষয়ে তাঁর আত্যন্তিক প্রত্যয় ব্যক্ত করতে পরাঙ্মুখ নন মোটেই। কণ্ঠস্বর মৃদু, আচরণ ধীর স্থির প্রশান্ত। কিন্তু নক্ষত্রের মত চিকমিকে দুটি চোখের আড়ালে সংগোপিত চণ্ড ক্রোধ আর অটল সংকল্প আরও বিপজ্জনক বোধহয় প্রবল আত্মসংযম দিয়ে ক্রোধ আর সংকল্প দুটিকেই লাগাম টেনে ধরে রাখার অসাধারণ ক্ষমতার জন্যে। ব্রেজিল আর পেরু সম্পর্কে খুব একটা মুখ না খুললেও তাঁর উপস্থিতিতে নদীপাড়ের জংলীদের উত্তেজনা বাস্তবিকই লক্ষণীয় —উনি যেন ওদের যুগপৎ প্রভু এবং ত্রাতা, হুজুর এবং রক্ষক। লাল সর্দার খেতাবেই উনি পরিচিত জংলীদের কাছে—এমনই এক সর্দার যাঁর প্রকৃত কীর্তিকলাপ পিলে চমকে দেওয়ার মত—অন্তত: আমি যত টুকু জানতে পেরেছি।

পেরু, ব্রেজিল, কলম্বিয়ার অর্ধ-নির্দিষ্ট সীমান্ত মধ্যবর্তী এ-হেন এখ্‌তিয়ার-হীন অঞ্চলে বছর কয়েক কাটিয়ে গেছেন লর্ড জন রক্সটন। বিশাল এই জেলার বুনো রবার বৃক্ষের সমৃদ্ধিই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে। কঙ্গোয় যেমন ভ্যারিয়েনের রূপোর খনিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের জবরদস্তি শ্রমিক বানিয়েছে স্পেনীয়রা—এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মুষ্টিমেয় কিছু পিশাচ প্রকৃতির দো-আঁশলা শয়তান রাজত্ব কায়েম করে নিয়েছে সামান্য কিছু জংলীদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে—বাকী জংলীদের গোলাম বানিয়েছে অবর্ণনীয় অমানবিক অত্যাচার, সন্ত্রাস, উৎপীড়নের মাধ্যমে। তাদের দিয়ে ইণ্ডিয়া রবার সংগ্রহ করছে এবং চালান দিচ্ছে নদীপথে প্যারা-তে। দুর্গত ভাগ্যহীনদের হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে লর্ড জন রক্সটনের কপালে জুটেছিল লাঞ্ছনা এবং প্রাণের হুমকি। শেষমেষ যুদ্ধঘোষণা করলেন দাস-ব্যবসায়ী শিরোমণি পেড্রো লোপেজের বিরুদ্ধে, পলাতক নির্যাতিতদের জড়ো করে ছোটখাট একটা সৈন্যবাহিনীও গড়ে নিলেন এবং স্বহস্তে কুখ্যাত দো-আঁশলাটিকে নিধন করে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন তাদের পৈশাচিক সংগঠন।

এই কারণেই আমাজনের দু-পাড়ের জংলীরা তাঁকে অত সমীহ, অত সম্ভ্রম করে। অবশ্য এদের মধ্যে একটা দল তাঁকে ঘেন্নাও করে। দাস-ব্যবসায়ের দৌলতে নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছিল তারা—জাতভাইদের গোলাম বানিয়ে নিজেদের হিল্লে করে নিচ্ছিল। এরা কিন্তু রেগে আছে সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই সাদা মানুষটির ওপর। তবে গতবারের এই ঝুট-ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ফলে একটা বিরাট লাভ হয়েছে ওঁর। লিঙ্গুয়া জেরাল ভাষাটা গড় গড় করে বলে যেতে পারেন। অদ্ভুত এই ভাষার এক তৃতীয়াংশ পর্তুগীজ, দুই তৃতীয়াংশ ইণ্ডিয়ান। গোটা ব্রেজিলে চালু রয়েছে এখন এই ভাষা।

আগেই বলেছি দক্ষিণ আমেরিকা-বাতিকগ্রস্ত ইনি। উচ্ছ্বাস ব্যতিরেকে বিরাট এই দেশের কথা বলা সম্ভবই ছিল না তাঁর পক্ষে। উচ্ছ্বাসটা অতিশয় সংক্রামক। আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তিও কৌতূহলে ফেটে পড়তাম তাঁর কথা শুনতে শুনতে। শুধু আমি কেন, প্রফেসরের মত বিশ্ব নিন্দুক ব্যক্তিরও অবিশ্বাসের হাসি আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হত ঠোঁটের কোণ থেকে। তাঁর সেই বর্ণনা-ঐশ্বর্য সঠিক জ্ঞান এবং দুরন্ত কল্পনার বিচিত্র সংমিশ্রণ যথাযথ উপস্থাপিত করতে না পারার গ্লানি আমাকে বিষণ্ণ করে তুলছে এই মুহূর্তে। পেরুতে যারা প্রথম বিজয় কেতন উড়িয়ে আসে তারা পুরো মহাদেশটাকে অতিক্রম করেছিল জলপথে। দ্রুত-বিজিত মহাদেশ বিজয়ের সেই রোমাঞ্চকর

কাহিনী, নদীপথে পরিভ্রমণের ইতিহাস বলে যেতেন উনি ছবির মত। নদী-নালা যাদের নখদর্পণে তারা কিন্তু নদীর দুই পাড়ের অজানা দেশের বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারে নি। নদীর পাড় ক্রমাগত ভাঙাগড়ায় মধ্যে দিয়ে নদী-পথের গতিও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে—অজানা দেশ অজানাই রয়ে গেছে।

আঙুল দিয়ে উত্তর দিকে দেখিয়ে বলতেন বিপুল উচ্ছ্বাসে—'বলুন দিকি কি আছে ওদিকে? জঙ্গল, জলা, দুর্ভেদ্য অরণ্য। অদ্ভুত কিছুর আশ্রয়স্থলও তো হতে পারে অজ্ঞাত ঐ দেশ? আর ঐ দক্ষিণে? জলার পর জলাভর্তি জঙ্গল আর জঙ্গল— যতদূর চোখ যায়, ঐ একই দৃশ্য। আজ পর্যন্ত কোনো সাদা মানুষের পা পড়েনি ওখানে। সরু এই নদী পথের বাইরে বিস্তীর্ণ ঐ অঞ্চলে কি যে আছে, আজও কেউ তা জানে না। দু-দিকেই অজ্ঞাত রহস্যের রাজত্ব। এ-দেশে কি যে সম্ভব, আর কি সম্ভব নয়—গ্যারান্টি দিয়ে কারও পক্ষে তা বলা কি সম্ভব? বৃদ্ধ প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কথায় সত্যতা থাকবে না কেন বলতে পারেন?' সামারলির অবিশ্বাসকে এইভাবে সটান ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই একগুঁয়ে নাসিকাকুঞ্চনের পুনরাবির্ভাব ঘটতে দেখতাম শীর্ণকায় প্রফেসরের সরু মুখে। জবাব না দিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে মাথা দোলাতেন—ব্রায়ার-রুট পাইপ নিঃসৃত ধূম্রজালের অন্তরালে চোখে মুখে সহানুভূতির বাষ্পটুকুও দেখতে পেতাম না।

শ্বেতকায় সঙ্গী দুজনের আরও অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরে কথা বলা যাবে'খন। কাহিনী এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রসঙ্গে অনেক কথাই এসে যাবে—যেমন এসে যাবে আমার নিজের প্রসঙ্গেও। বিচিত্র এই অভিযানে সাময়িক চুক্তিতে স্থানীয় কিছু বাসিন্দা নিয়োগ করেছিলাম—এবার তাদের কথায় আসা যাক। প্রথম ব্যক্তি জাম্বো নামধারী এক দৈত্যকায় নিগ্রো। কৃষ্ণকায় হারকিউলিস বললেও চলে। অশ্বের মতই তেজী এবং তৎপর, অথচ রীতিমত বুদ্ধিমান। তাকে চাকরী দিয়েছি প্যারা'তে। সুপারিশ করেছিল জাহাজ কোম্পানী। জাহাজে থাকতে থাকতেই ভাঙা ভাঙা ইংরেজিটা সে শিখে নিয়েছিল।

প্যারাতে কাজে বহাল করেছিলাম আরো দু-জন দো-আঁশলাকে—গোমেজ আর ম্যানুয়েল তাদের নাম। জঙ্গল থেকে লাল কাঠের বোঝা ঘাড়ে সবে এসে পৌঁছেছিল প্যারা-তে। দুজনেই শ্যামবর্ণ, দাড়িওলা এবং ভীষণ দর্শন—প্যান্থারের মত ক্ষিপ্র এবং তেজিয়ান। আমাজনের যে অঞ্চল অভিমুখে চলেছি, দুজনেই সে অঞ্চলে কাটিয়েছে দীর্ঘকাল। এই

সুপারিশের জোরেই লর্ড জন তাদের কাজে নিয়েছেন। এদের মধ্যে গোমেজ আবার চমৎকার ইংরেজিও বলতে পারে। মাসিক পনেরো ডলার বেতনের বিনিময়ে এরা আমাদের ব্যক্তিগত ভৃত্য হিসেবে রান্নাবান্না করে দেবে, নৌকো বাইবে, এবং যাবতীয় ব্যাপারে সাহায্য করবে। এ ছাড়াও চাকরী দিয়েছি বলিভিয়া থেকে আগত তিনজন মোজো ইণ্ডিয়ানকে। মাছ ধরতে আর নৌকো বাইতে পোক্ত তিনজনেই। নৌকো বানাতেও জানে। এদের সর্দারকে ডাকতাম মোজো বলে, বাকী দুজনের নাম জোস আর ফারনান্দো। তিনজন শ্বেতকায়, দুজন দো-আঁশলা, একজন নিগ্রো, এবং তিনজন ইণ্ডিয়ান—এই নিয়েই সম্পূর্ণ হয়েছিল আমাদের অভিযানের সদস্য তালিকা। নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে ম্যানাওস শহরে খাম ছিঁড়ে অত্যাশ্চর্য এই তদন্ত অভিযানের নির্দেশ এবং পথের নিশানা পড়বার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়েছিলাম এ-হেন প্রস্তুতিপর্ব সাঙ্গ করার পর।

উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষা-প্রলম্বিত সাত-সাতটা দিন অতিকষ্টে কাটানোর পর এল সেইদিন এবং সময়। ফাজেণ্ডা সান্তা ইগনাসিও'র বসবার ঘরটা মনের চোখে ছবির মত প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করুন, স্যার। জায়গাটা ম্যানাওস শহর থেকে দু-মাইল ভেতর দিকে। বাইরে জলদেটে তাম্রবরণ সূর্যকিরণের গনগনে দীপ্তি, তালবৃক্ষের ছায়াগুলোও গাছগুলোর মতই ঘন কালো এবং সুস্পষ্ট। বাতাস স্থির এবং শান্ত। কীটপতঙ্গের বিবিধ স্বরগ্রামের ঐকতানে মুখর। বোলতার গম্ভীর বোঁ-বোঁ আওয়াজ থেকে আরম্ভ করে মশার তীক্ষ্ণ পোঁ-পোঁ আওয়াজ—সবই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের চিরন্তর কীট-কোরাস। বারান্দার পরেই ক্যাকটাস-বেড়া দিয়ে ঘেড়া একটা ফুলের বাগান। বড় বড় নীল প্রজাপতি আর পুঁচকে সাইজের গাইয়ে পাখীর দল কলগুঞ্জনে মুখর করে তুলেছে কুসুম-কানন। হীরক উজ্জ্বল বিচিত্র রোশনাই ঠিকরে যাচ্ছে তাদের গা থেকে। ভেতরে আমরা বসে রয়েছি বেতের টেবিল ঘিরে। টেবিলের ওপর মুখ আঁটা সেই খাম। কাঁটাতারের বেড়ার মত কণ্টকাকৃতি হস্তাক্ষরে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তার ওপর লিখে রেখেছেন এই ক টি কথা :

'লর্ড জন রক্সটন এবং তাঁর দলবলের প্রতি নির্দেশ সমূহ। ম্যানাওস শহরে জুলাই মাসের ১৫ তারিখে কাঁটায় কাঁটায় দুপুর বারোটার সময়ে খাম খুলে দেখতে হবে।'

পাশেই টেবিলের ওপর ঘড়িটা রেখেছিলেন লর্ড জন রক্সটন।

বললেন—'আর সাত মিনিট বাকী। বুড়োবাবু দেখছি বড্ড ঘড়ি ধরে

লো।'

ঠোঁটের কোণে গা-জ্বলানো হাসি ভাসিয়ে খামটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন প্রফেসর সামারলি।

বললেন—'সাত মিনিট আগে খুললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? সবই তো হাতুড়েগিরি আর রাবিশ ব্যাপার—খামের এই লেখা যিনি লিখেছেন, তিনি কিন্তু কুখ্যাত এই দুটি কারণেই।'

লর্ড জন বললেন—'কিন্তু খেলতে যখন নেমেছেন, খেলার নিয়ম মেনে চলতে হবে বইকি। এ খেলা প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের, তাঁর ইচ্ছেতেই যখন আমরা এতদূর এসেছি, তখন চিঠির ব্যাপারেও তাঁর নির্দেশ না মেনে চলাটা অনুচিত হবে।'

তিক্ত কণ্ঠে প্রফেসর বললেন চড়া গলায়—'যত্তো সব বাজে ব্যাপার! লণ্ডনে বসেই বুঝেছিলাম বাঁদর-নাচ নাচানো হচ্ছে—এখন তো দেখছি ঠিক সেই রকমটিই ঘটছে। চিঠির মধ্যে কি লেখা আছে জানি না ঠিকই, কিন্তু চিঠি খোলার পর বিষয়বস্তু যদি প্রলুব্ধ করতে না পারে আমাকে, পরের বোটেই প্যারা ফিরে গিয়ে 'বলিভিয়া'য় উঠে বসব বলে দিলাম। একটা উন্মাদের গালগল্প মিথ্যে প্রতিপন্ন করার চাইতেও অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হয় আমাকে এই দুনিয়ায়। রক্সটন, এবার কিন্তু সময় হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হয়েছে। বংশীধ্বনি করতে পারেন—খুলছি খাম।' পকেট-ছুরী দিয়ে খামের মুখ কেটে ফেললেন লর্ড জন। ভেতর থেকে বেরুলো এক তা ভাঁজ করা কাগজ। সন্তর্পণে ভাঁজ খুলে মেলে ধরলেন টেবিলের ওপর। বেবাক সাদা কাগজ। উল্টে দেখলেন। কালির আঁচড় কোথাও নেই। যুগপৎ হতভম্ব এবং নিশ্চুপ আমরা তিনজনেই। বিমূঢ়ভাবে চাইলাম পরস্পরের মুখপানে। নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হল প্রফেসর সামারলির বেসুরো বিদ্রূপাত্মক অট্টহাসিতে।

'আর বাকী রইল কী? বাগাড়ম্বরের রাজা তো নিজেই স্বীকার করে নিলে কতবড় চালিয়াৎ চন্দর সে! জোচ্চোর ঠগ্ কোথাকার। এবার চলুন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে জালিয়াতের মুখোশটা খুলে দেওয়া যাক।'

'অদৃশ্য কালি নয় তো?' বললাম আমি।

'মনে হয় না!' বলে আলোর সামনে কাগজটা ধরলেন লর্ড রক্সটন। 'না হে ছোকরা, মনকে প্রবঞ্চনা করতে যেও না। বাজি ফেলে বলতে পারি এ কাগজে কস্মিনকালেও কিছু লেখা হয়নি।'

'ভেতরে আসতে পারি?' 'বারান্দায় ধ্বনিত হল বজ্রগর্ভ গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

রোদ্দুরের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে কখন জানি এগিয়ে এসে এলিয়ে আছে একটা বেঁটে মোটা মূর্তির ছায়া। কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বর তো ভোলবার নয়! আর ঐ দানবিক বৃষস্কন্ধ! তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমরা তিনজনেই। বালকোচিত রঙীন ফিতে বাঁধা স্ট্র হ্যাট মাথায় গটগট করে ক্যানভাস জুতোর ডগা সামনে উঁচিয়ে জ্যাকেট পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন—চ্যালেঞ্জার। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে, আসীরিয় দাড়ির সমৃদ্ধি সামনে উঁচিয়ে অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু-পল্লবের অসীম ঔদ্ধত্য আর অসহ্য দুই চোখের চাহনি আমাদের ওপর নিবদ্ধ রেখে, সোনা-বরণ রৌদ্র-প্রভার মাঝে রাজকীয় ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার!

ঘড়ি বার করে শুধু বললেন—'কয়েক মিনিট দেরী করে ফেলেছি দেখছি। খামটা দেওয়ার সময়ে মনে মনে ভেবেই রেখেছিলাম, এ খাম খোলবার সুযোগ আপনাদের দেব না—তার আগেই হাজির হব সশরীরে। দেরীটা হল একটা গবেট পাইলট আর একটা অনাহুত বালির চড়ার জন্যে। সুযোগটার অপব্যবহার নিশ্চয় করেননি সতীর্থ প্রফেসর সামারলি—আমার মুণ্ডপাত করা হয়ে গেছে ভালভাবেই।'

কঠোর স্বরে বললেন লর্ড জন—'স্যার, বলতে বাধ্য হচ্ছি, অভিযান বানচাল হয়েছে মনে করার ঠিক মুহূর্তটিতে আবির্ভূত হয়ে আপনি যেমন আমাদের অশেষ স্বস্তি দান করেছেন, ঠিক তেমনই অবাক হচ্ছি আপনার এই অত্যন্ত অসাধারণ আচরণ দেখে। কি ব্যাপার বলুন তো? মস্করাটার দরকার ছিল কী?'

নিরুত্তরে ঘরে ঢুকে আমার আর লর্ড জনের সঙ্গে করমর্দন করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, ঔদ্ধত্য-কঠিন বিরাট অভিবাদন জানালেন প্রফেসরকে বাতাসে মাথা ঠুকে এবং দেহভার ন্যস্ত করলেন একটা ঝুড়ি-চেয়ারে। দেহের ভারে দুলে উঠে মচ্‌মচ্‌ পট্‌পট্‌ শব্দে প্রতিবাদ জানালো দুর্বল আসনটি।

'যাত্রার প্রস্তুতি সব শেষ?'

'কালকেই রওনা হতে পারি।'

'তাহলে তাই হব। লিখিত পথনির্দেশ এখন নিষ্প্রয়োজন। কেন না আমার নিজের পথ-নির্দেশের অপরিমেয় সুযোগলাভে ধন্য হবেন এখন

থেকে। প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম আমি নিজেই এই অভিযানের সভাপতির পদটি অলংকৃত করব। পথ নির্দেশ যতই বিশদভাবে লেখা হোক না কেন, আমার নিজের প্রতিভা বুদ্ধিমত্তা আর উপদেশের চাইতে তা কখনোই সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না—এ কথা আপনাদের মানতেই হবে। চিঠির ব্যাপারে সামান্য এই ধোঁকাবাজিটুকু নিরুপায় হয়ে করতে হয়েছে। কেন না আগে ভাগে যদি স্বয়ং অভিযাত্রী হওয়ার ইচ্ছেটা প্রকাশ করতাম, তাহলে আপনাদের পর্যটনে সাথী হওয়ার ব্যাপারে বহুবিধ অবাঞ্ছনীয় চাপ সৃষ্টি হত আমার ওপর এবং খামোকা লড়তে হত আমাকে তাই নিয়ে।'

তীব্রস্বরে বলে উঠলেন প্রফেসর সামারলি—'চাপটা অন্ততঃ আমি দিতাম না—আটলান্টিক পেরোনোর জন্যে আর একটা জাহাজ নিশ্চয় পাওয়া যেত।'

বিশাল লোমশ হস্ত সঞ্চালনে খিটখিটে ভদ্রলোককে একেবারে খারিজ করে দিলেন চ্যালেঞ্জার—'উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে আমার আপত্তির যৌক্তিকতা অনুধাবন করুন। আমার প্রয়োজন ঠিক যে মুহূর্তে হওয়া উচিত, আমার আবির্ভাবও ঘটবে সেই মুহূর্তে—এই ছিল আমার পরিকল্পনা। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের প্রভু আমি নিজে—আর কেউ নন। যাই হোক, প্রয়োজনের ঠিক মুহূর্তটিতেই আবির্ভূত হয়েছি আমি। আপনারা প্রত্যেকেই এখন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করতে পারেন আমার আশ্রয়ে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবেনই—বিফল হবেন না। এখন থেকে এই অভিযানের কর্তৃত্ব নিলাম আমি নিজে। যা কিছু আয়োজন, আজ রাতেই শেষ করতে হবে—যাতে কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়তে পারি। আমার সময়ের দাম আছে, আপনাদেরও আছে—তবে আমার চাইতে একটু কম মাত্রায়। চটপট তৈরী হয়ে নিন—যা দেখতে এসেছেন—তার জন্যে প্রস্তুত হন। আমার বিবৃতির যাথার্থ্য যাচাই করে নিন।'

একটা বড় স্টীম লঞ্চ ভাড়া নিয়েছিলেন লর্ড জন রক্সটন। নাম, 'এসমারা-লডা'। বছরের এ-সময়ে আবহাওয়া বেশ ভালই। যে কোনো সময়ে রওনা হওয়া যায়। গরমকালে আর শীতকালে এ অঞ্চলের তাপমাত্রা পঁচাত্তর ডিগ্রী থেকে নব্বই ডিগ্রীর মধ্যে ওঠানামা করে। উত্তাপের হেরফের খুব একটা টের পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়ায়। বর্ষার সময় ডিসেম্বর থেকে মে। এই সময়ে নদীর জল একটু একটু করে বাড়তে থাকে। সবচেয়ে নিচের জলের দাগ ছাড়িয়ে জল উঠে

যায় চল্লিশ ফুট ওপরে। বানের জল দু-পাড় বেয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবিয়ে দেয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে গ্যাপো। এমন জলা জায়গা যে পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যাওয়া দুষ্কর, তেমনিই অসম্ভব নৌকো বেয়ে যাওয়া। জুন মাস থেকে জল কমতে থাকে—একদম কমে যায় অক্টোবরে আর নভেম্বরে। এখন শুকনো ঋতু। বিরাট নদী আর উপনদীগুলো মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। অভিযানের উপযুক্ত সময়।

নদীস্রোত অতিশয় মন্থর, মাইলে আট ইঞ্চির বেশী ঢেউয়ের ওঠানামা নেই। নৌচালনার পক্ষে উপযুক্ত। বাতাস বইছে দক্ষিণ পূবে। পালতোলা নৌকো একনাগাড়ে এগিয়ে যেতে পারে পেরুর সীমান্ত পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের বাষ্পীয় পোতের শক্তিশালী ইঞ্জিন ধেয়ে গেল এমন গতিবেগে যেন যাচ্ছে নিস্তরঙ্গ, বদ্ধ হ্রদের ওপর দিয়ে। তিন দিন একটানা উত্তরপশ্চিমে যাওয়ার পর মোহানার মুখ থেকে হাজার মাইল দূরে এসেও দেখা গেল নদী বেশ চওড়া—মাঝখান থেকে দু-পাড়ের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে দূর দিগন্ত রেখার মত। চতুর্থদিনে পৌঁছোলাম একটা উপনদীর মুখে। মূল নদীর চাইতে প্রবেশ পথ বেশ সরু। আরও সরু হতে হতে দু-দিন পরে পৌঁছোলাম একটা ইণ্ডিয়ান গ্রামে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আমাদের সেখানেই নামতে বললেন—'এসমারালডা' ফিরে যাক মানাওস শহরে। বুঝিয়ে দিলেন, এর পর থেকে স্টীম-লঞ্চ নিয়ে যাওয়া খুব মুস্কিল হবে। গোপনে বললেন, অজ্ঞাত দেশের তোরণ এসে গেল বলে। এখন যত কম লোকজন সঙ্গে যায়, ততই মঙ্গল। গাদাগাদা লোককে তো বিশ্বাস করে সব কিছু দেখানো যায় না, সব কথা বলা যায় না। একই কারণে আমাদের প্রত্যেককে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন এই মর্মে যে আমরা পর্যটনের সঠিক হদিশ কাউকে বলব না, কোথাও ছাপব না। চাকরবাকরদেরও শপথ করতে হল ভাব গম্ভীর অনুষ্ঠানে। এই কারণেই পাঠকপাঠিকাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, কাহিনীর মধ্যে ম্যাপ আর নকশা থাকলেও জানবেন জায়গাগুলোর অবস্থান সংকেত পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে সঠিক হলেও কম্পাসের নির্দেশে সুকৌশলে হেরফের ঘটানো থাকবে—যাতে অজ্ঞাত সেই দেশের নিখুঁত পথনির্দেশ হিসেবে কেউ তা গ্রহণ করতে না পারেন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের যুক্তির সারবত্তা থাকুক আর না থাকুক, তাঁর সর্তাবলী মেনে না নিলে যে কোনো মুহূর্তে অভিযান স্থগিত রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর।

'এসমারালডা'কে বিদায় জানালাম দোসরা অগাস্ট—বহির্জগতের সঙ্গে সবশেষ সম্পর্কসূত্রটিও ছিন্ন হল সেই দিন। এরপর কেটেছে চারটে দিন। ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি দুটো বড় ক্যানো। খুব হাল্কা। বাঁশের কাঠামোর ওপর চামড়া দিয়ে তৈরী। পথে বাধা পড়লে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে অনায়াসেই। আমাদের যাবতীয় সরঞ্জাম চাপিয়েছি এই দুটো ক্যানোয়। ক্যানোর দাঁড় টানার জন্যে নিয়োগ করেছি আরো দুজন ইণ্ডিয়ানকে। এদের নাম আতাকা আর আইপেতু। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের আগের অভিযানে অংশ নিয়েছিল এই দুজনই। আবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে দেখে আতংকের শিহরণ দেখলাম দুজনেরই সর্বাঙ্গে। কিন্তু গ্রামের মোড়ল প্রধান ধর্ম-যাজকের মত ঐশ্বরিক ক্ষমতা ধরে এ-অঞ্চলে। দরদামে তাকে যদি সন্তুষ্ট করা যায়, গোষ্ঠীর কারো ক্ষমতা নেই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার।

তাই, আগামী কালই আমরা উধাও হব অজানার উজানে। নদীপথে ক্যানোয় করে পাঠিয়ে দিচ্ছি এই বিবরণ! আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা কৌতূহলী, সম্ভবতঃ এই বিবরণই তাঁদের কাছে আমাদের শেষ বক্তব্য। পূর্বব্যবস্থামত বিবরণটা উদ্দেশ করলাম আপনাকে। মিস্টার ম্যাকআর্ডল, আপনার খুশী মত কাটছাঁট রদবদল করে নিতে পারেন। প্রফেসর সামারলির নিরন্তর অবিশ্বাস-প্রদর্শন সত্ত্বেও প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আমাদের এই অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে বারবার যেভাবে আশ্বস্ত করছেন, তাতে মনে হয় অতীব আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জনে আর বিলম্ব নেই।

৮ ॥ নব দুনিয়ার সীমান্তস্থিত খুঁটির বেড়া

স্বদেশের বন্ধুরা আমাদের খুশীর ভাগ নিতে পারেন। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছি। অন্ততঃ, এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে দাঁড়িয়ে বলা চলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বিবৃতি যাচাই করে নেওয়া যাবে। মালভূমি বেয়ে এখনো আরোহণ পর্ব শুরু হয়নি। কিন্তু মালভূমি বিস্তৃত রয়েছে চোখের সামনেই। এমন কি প্রফেসর সামারলির মেজাজও এখন আগের চাইতে অনেক সংশোধিত, সংযত। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সত্যবাদী বলতে এখনও প্রস্তুত না হলেও, নিরন্তর আপত্তি বর্ষণে ভাঁটা পড়েছে এবং বেশীর ভাগ সময় নিঃশব্দে নিবিষ্টচিত্তে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। কাহিনীর যেখানে ইতি টেনেছিলাম, শুরু করা যাক সেইখান থেকেই। যে ইণ্ডিয়ানরা আমাদের সঙ্গে এসেছিল, তাদের একজন জখম হয়েছে

বলে ফিরে যাচ্ছে। আশ্চর্য কাহিনীর এই পর্বটা তার হাতেই পাঠাচ্ছি। যদিও গন্তব্যস্থলে আদৌ পৌঁছোবে কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে।

'এসমারালডা' একটা গ্রামে নামিয়ে দিয়ে গেছিল আমাদের। পরের দিন রওনা হওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছি—এই পর্যন্ত লিখেছিলাম আগের কিস্তিতে। খারাপ খবর দিয়ে শুরু করা যাক এই কিস্তি। খারাপ খবর বলতে দুই প্রফেসরের বিরামবিহীন কলহের কথা কিন্তু নয়—সে প্রসঙ্গ না হয় বাদ দেওয়া গেল। খবরটা অন্য দুটি মানুষকে নিয়ে। এই প্রথম গুরুতর ঝামেলায় পড়লাম। ঘটনাটা ঘটেছে আজ সন্ধ্যায়। পরিণতিটা বিয়োগান্তক হলেও হতে পারত। ইংরেজি বলায় পোক্ত দো-আঁশলা গোমেজের উল্লেখ আগেই করেছি। লোকটা কাজ-কর্ম করে ভাল, হুকুম তামিল করতে এক পায়ে খাড়া। কিন্তু বড্ড কৌতূহলী। এ-ধরনের লোকদের মধ্যে যা স্বাভাবিক। সন্ধ্যানাগাদ আমরা যখন কুঁড়েঘরে বসে প্ল্যান আঁটছি এরপর কি করা যায়, গোমেজ তখন লুকিয়ে ছিল পাশেই। দেখে ফ্যালে আমাদের নিগ্রো চাকর জাম্বো। লোকটা কুকুরের মত প্রভুভক্ত। দো-আঁশলাদের দু চক্ষে দেখতে পারে না—সব নিগ্রোর মতই ঘেন্না করে মনে প্রাণে। গোমেজকে ধরে হিড়হিড় করে সে টেনে আনে আমাদের সামনে। ফস্ করে ছুরী টেনে বার করেছিল গোমেজ। খপাৎ করে এক হাতে কব্জি চেপে ধরে ছুরী খসিয়ে আনে জাম্বো—নইলে নির্ঘাৎ ছুরিকাহত হত। বকাবকি করে নিষ্পত্তি করা গেছে ব্যাপারটা। হাতে হাত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে গোমেজ আর জাম্বোর। আশা করি, আর কিছু ঘটবে না। পণ্ডিত দুজন কিন্তু সমানে তিক্ততার সৃষ্টি করে চলেছেন। অযথা উত্যক্ত করতে চ্যালেঞ্জারের জুড়ি নেই ঠিকই—কিন্তু সামারলির জিভের অ্যাসিডে গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরে যায়। একজন খুঁচিয়ে রাগিয়ে দিচ্ছেন, আর একজন আগুনে ঘি ঢালছেন। প্রথমটার চাইতে দ্বিতীয়টা আরো যাচ্ছেতাই। ফলে, দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড লেগেই আছে। কাল রাতে চ্যালেঞ্জার বলছিলেন, টেমস্ নদীর পাড়ে বেড়াতে তাঁর বয়ে গেছে—নতুন কিছুই তো দেখা যায় না। সামারলি অমনি তেঁতো হাসি হেসে বলে উঠলেন, পাগলা গারদে পাঁচিলটা যে ভেঙে পড়েছে, সে খবরটা তিনি রাখেন। হিমালয় প্রতিম আত্মশ্লাঘার দরুন চ্যালেঞ্জারের পক্ষে উষ্মা প্রকাশ করা সম্ভব হল না। দাড়ির আড়ালে মুচকি হেসে অবোধ বালককে প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গিমায় অনুকম্পা মিশ্রিত কণ্ঠে কেবল বললেন—'তাই না

কি ?' বাস্তবিকই দুজনেই দুটি বালক। একজন শুষ্কবদন এবং কলহপ্রিয়, অপর জন রুদ্রপ্রকৃতি এবং ভয়ংকর দাপুটে। দুজনেরই করোটিতে কিন্তু আছে এমন দুটি উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক যার দৌলতে দুজনেই আসন পেয়েছেন বৈজ্ঞানিক যুগের প্রথম সারিতে। জীবনকে যত বেশী দেখা যায়, ততই বোঝা যায়—মস্তিষ্ক, চরিত্র আর আত্মা—এই তিনটের প্রত্যেকেটাই প্রত্যেকটা থেকে কি রকম আলাদা।

পরের দিনই শুরু হল আমাদের অত্যাশ্চর্য অভিযান। জিনিসপত্র সমান ভাগ করে রাখা হল দুটি ক্যানোতে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রফেসর দুজনকেও চালান করে দেওয়া হল আলাদা আলাদা ক্যানোয়। নইলে শান্তি বজায় রাখা যেত না। আমি কিন্তু রইলাম চ্যালেঞ্জারের দলে। কেন না আমি তো দেখেছি তাঁর চরিত্রের দুটো দিক। কৌতুকের অপরূপ রোশনাইতে ঝলমল করছেন—পরোপকারের সদিচ্ছা যেন নিঃশব্দে শত ধারায় বর্ষিত হচ্ছে সর্বাঙ্গ থেকে। ওঁর আগের মূর্তিও আমি দেখেছি। খররৌদ্রে বিষম প্রভঞ্জনের মত চণ্ডমূর্তির আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্মিত হব না মোটেই। পরিস্থিতিটা কিন্তু অস্বস্তিকর। কখন যে কি মেজাজে থাকবেন, তা আঁচ করতে করতেই উৎকণ্ঠায় প্রাণটা কণ্ঠাগত হয়ে থাকে।

দু-দিন দু-শ গজ চওড়া বিরাট যে নদীর ওপর দিয়ে ক্যানো এগিয়ে গেল, তার জল এত টলটলে যে তল পর্যন্ত দেখা যায়। আমাজনের অর্ধেক এই রকম—বাকী অর্ধেক সাদাটে এবং অস্বচ্ছ। জলের অবস্থা নির্ভর করে দুপাড়ের জমির মাটির ওপর। গাঢ় রঙ হলেই বুঝতে হবে পচা গাছপালা—ঘোলাটে হলে কাদাটে মাটি। দুবার নদী খাড়া নেমে যাওয়ার ফলে প্রবল স্রোতের টানে পড়লাম। প্রতিবারেই কাঁধে করে আধমাইলটাক পথ ক্যানো বয়ে নিয়ে গেলাম। দুপাশের অরণ্য আদিম প্রকৃতির হলেও ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে খুব একটা কষ্ট হল না। প্রাচীন বনানীর সেই রহস্য বর্ণনা করব কি করে ভেবে পাচ্ছি না। শহরে মানুষ আমি। এত উঁচু গাছ অথবা গুঁড়ির মধ্যে এত বিরাট গর্ত কখনো দেখিনি যে মহীরুহর পর মহীরুহ বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে ডালপালা মেলে ধরেছে চাঁদোয়ার মত। নিবিড় শাখা পত্রের আচ্ছাদন ভেদ করে কচিৎ স্বর্ণ-রশ্মির গুচ্ছ সূর্যকিরণ নেমে আসছে নিচে। পচা গাছপাতার পুরু, নরম গালিচার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটবার সময়ে মনে হল যেন বিশাল খিলানওয়ালা গির্জের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এমন কি চ্যালেঞ্জারের নিনাদী কণ্ঠস্বরও নেমে এল ফিস-

ফিসানির মত নিম্নখাদে। বিশাল এই সব মহীরুহের নাম আমি জানি না। কিন্তু দুই বিজ্ঞান-সাধক বুঝিয়ে দিলেন চিরহরিৎ সিডার কাকে বলে, রেশম তুলোর গাছ কোনটা, রেডউড গাছ কিরকম দেখতে। প্রকৃতির এই উদ্ভিজ্জ সম্পদ বিপুল পরিমাণে মানুষের উপকারে লাগছে ঠিকই, অথচ পশু-সম্পদের দিক থেকে বিরাট এই মহাদেশ অনেক পেছিয়ে আছে। শ্যামবর্ণ গুঁড়ি আঁকড়ে রয়েছে বহুবর্ণের অর্কিড আর আশ্চর্য রঙীন শৈবাল। সোনালী আলামান্ডা আর গাঢ়-লোহিত নক্ষত্র-পুঞ্জের মত টাকসোনিয়ার ওপর ঠিকরে যাচ্ছে খামখেয়ালী সূর্য কিরণ, আশ্চর্য রোশনাইতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ঘন নীল ইপোমিয়া। সব মিলিয়ে এ যেন এক রূপকথার স্বপ্নলোক। নিবিড় এই বনতলের অন্ধকার পরিত্যাগ করে যাবতীয় প্রাণের গতি কিন্তু মাথার ওপর-কার আলো ঝলমলে পাদপ-চন্দ্রাতপের দিকে। ছোটবড় প্রতিটি উদ্ভিদ বড়ভাইদের গা পাকিয়ে উঠে যেতে চাইছে উর্ধ্বলোকের সবুজ সমারোহের দিকে। লতানে গাছ যে এরকম দানবিক হয় কখনো জানতাম না। কিন্তু লতানে যারা কস্মিনকালেও নয়, সেই সব নেট্‌ল্‌, জেসমিন, জ্যাসিটারা পামবৃক্ষও সুগন্ধি সিডারের গা পেঁচিয়ে এই অন্ধকারের রাজ্য ত্যাগ করে উঠে যেতে চাইছে আলোকের উর্ধ্বলোকে। আশেপাশে জন্তু জানোয়ারের কোনো নড়া চড়া লক্ষ্য করলাম না—কিন্তু টের পেলাম মাথার ওপর অজস্র সর্প, বানর, পাখী এবং শ্লথ নিচের বনতলে ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীগুলোকে হোঁচট খেতে খেতে অগ্রসর হতে দেখে মহাকলরবে অসীম বিস্ময় প্রকাশ করে চলেছে। ঊষাকালে এবং সূর্যাস্তের সময়ে গলাবাজ বাঁদররা আকাশফাটা চেঁচামেচি করেছে, কাকাতুয়ারা কটর কটর করেছে দল বেঁধে—কিন্তু সূর্য যখন রোদ্দুর ঢেলে চারিদিক তাতিয়ে তুলেছে তখন কিন্তু গলায় ছিপি এঁটেছে তারা, মুখর হয়েছে কীট পতঙ্গ। দূরাগত সমুদ্র গর্জনের মত একটানা শব্দ আছড়ে পড়েছে কানের পর্দায়। আশেপাশে সঞ্চরমান কিন্তু কিছুই চোখে পড়েনি—নিবিড় নিশ্ছিদ্র আদিম অরণ্য বিস্তৃত হয়ে থেকেছে কেবল দূর হতে দূরে নিঃসীম মিস্রার আবরণ রচনা করে। একবার মাত্র একটা পিপীলিকাভুক অথবা লুক খড়মড় করে টলমল ভঙ্গিমায় মিলিয়ে গেছিল ছায়ার মধ্যে। বিশাল রাজন জঙ্গলে এ ছাড়া আর কোনো পার্থিব প্রাণীর সঞ্চার আমি দেখিনি।

তা সত্ত্বেও কিন্তু বারংবার টের পেয়েছি মানুষ রয়েছে আমাদের চারি-পাশে—রহস্যময় বনতলের দিকে দিকে। তৃতীয় দিবসে অদ্ভুত একটা ধুপ ধুপ ঢুক ঢুক আওয়াজ শুনেছিলাম বাতাসে। অদ্ভুত গভীর ভাবে বাতাস

যেন স্পন্দিত হচ্ছে সারা সকাল ধরে। ক্যানো দুটো কয়েক গজের ব্যবধান বজায় রেখে যাচ্ছিল বলেই ইণ্ডিয়ানদের মুখের চেহারা দেখতে পেয়েছিলাম। নীরব, নিস্পন্দ, আড়ষ্ট, উৎকর্ণ। আতংকে চোখ ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছে।

'কি বলুন তো?' শুধিয়েছিলাম আমি।

'ঢাক বাজছে,' উদাসীন কণ্ঠে বলেছিলেন লর্ড জন। 'রণদামামা। আগেও শুনেছি।'

দো-আঁশলা গোমেজও সায় দিলে—'হাঁ, হুজুর, যুদ্ধের ঢাক। বুনো ইণ্ডিয়ান—ব্র্যাভোস—ম্যানোস নয়। প্রতি মাইলে নজর রেখেছে আমাদের ওপর। পারলে এখুনি খতম করবে।'

তমিস্রাময় নিস্পন্দ বনানীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম সবিস্ময়ে—'কিন্তু নজর রাখছে কি করে?'

বৃষস্কন্ধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল দো-আঁশলা—'ওরা জানে। কায়দা আছে। নজর রাখে। ঢাক পিটিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। পারলে এখুনি খতম করবে।'

আমার পকেটবুকে সে দিনের তারিখটা লিখে রেখেছিলাম—১৮ই আগস্ট, মঙ্গলবার। বিকেলের দিকে কম করেও ছ-সাতটা ঢাকের বাদ্যি শোনা গেল। গুরু গুরু গুম গুম শব্দটা কখনো হল দ্রুতছন্দে, কখনো ধীরতালে, কখনো যেন প্রশ্নোত্তরের ঢংয়ে, অনেকদূরে পূবদিক থেকে কাটা কাটা কট্ কটা কট্ কট্ কটা কট্ শব্দের জবাব এল বহুদূরের উত্তর থেকে গম্ভীর ভরাট একটানা গুরু গুরু গুরু গুরু শব্দে। অদ্ভুত এই শব্দ লহরীর মধ্যে এমন একটা অবর্ণনীয় স্নায়ু কাঁপানো জিঘাংসা বিরামবিহীন ভাবে গজর গজর করে চলল যা ঐ দো-আঁশলার হুঁশিয়ারির মতই শব্দের আকারে বারংবার আছড়ে পড়তে লাগল কানের পর্দায়—'পারলে তোদের মারব আমরা! পারলে তোদের মারব আমরা!' শেষ নেই, বিরাম নেই রক্ত হিম করা সেই পুনরুক্তির—'পারলে তোদের মারব আমরা! পারলে তোদের মারব আমরা!' নিস্তব্ধ বনভূমিতে কাউকেই বিচরণ করতে দেখলাম না। প্রকৃতি শান্ত স্নিগ্ধ। কিন্তু গাঢ় পাদপশ্রেণীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আমাদেরই জাতভাইরা বিরামবিহীন ভাবে পাঠিয়ে গেল তাদের জিঘাংসা বার্তা—'পারলে তোদের মারব আমরা! পারলে তোদের মারব আমরা!' পূব থেকে ধেয়ে এল সেই হুঁশিয়ারি, এল উত্তর থেকে।

সারাদিন ধরে চলল এই ঢাকের বাদ্যি, দামামার ফিসফিসানি। প্রতিক্রিয়ায় ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল সহচর ইণ্ডিয়ানরা। শক্ত ধাতের শ্যামবর্ণ দো-

আঁশলারা পর্যন্ত খটাখট দাঁতের বাদ্যি বাজিয়ে চলল ঢাকের বাদ্যির তালে তালে। সেই দিনই কিন্তু জানলাম, চ্যালেঞ্জার এবং সামারলি দুজনেই সমান সাহসী—উঁচু জাতের নির্ভীক পুরুষ—বৈজ্ঞানিক সাহস বলতে যা বোঝায়—দুজনেই মধ্যেই তা সমান মাত্রায় বর্তমান। প্রকৃত বিজ্ঞান পাগলরা চিরকালই এমনি অকুতোভয় হন। পাপুয়ার স্প্যানিশ আর ইণ্ডিয়ান দো-আঁশলা গকোস-দের মধ্যে ঠিক এইভাবেই ভয়শূন্য থেকেছেন ডারউইন, মালয়ের নৃমুণ্ড শিকারীদের মাঝেও চিত্ত কাঁপেনি ওয়ালেসের। মানুষের মগজের বৈশিষ্ট্যই হল এক সাথে দুটি জিনিস সমান তালে চিন্তা করতে পারে না।—করুণাময়ী প্রকৃতির এই কৃপার ফলেই বিজ্ঞান কৌতূহলে নিবিষ্ট অন্তরে ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা ঠাঁই পায় না। সারাদিন ধরে দামামা বাদ্যির মধ্যে গাছপালা আর বিহঙ্গকুল নিয়ে তন্ময় হয়ে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করে চললেন সামারলি এবং চ্যালেঞ্জার। কিন্তু রণদামামার ভয় ধরানো শব্দলহরী আদৌ কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে এ রকম লক্ষণ একবারও দেখালেন না। ঠিক যেন সেন্ট জেমস্ ক্লাবের রয়াল সোসাইটি ক্লাবের স্মোকিং রুমে বসে বিজ্ঞান নিয়ে বাদানুবাদে মত্ত দুই বিজ্ঞান তপস্বী। একবারই কেবল প্রসঙ্গটা আলোচিত হল দুজনের মধ্যে।

ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিময় বনভূমির দিকে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে তুলে চ্যালেঞ্জার বললেন—'মিরানহা অথবা অ্যামাজুয়াকা নরখাদক।'

'নিঃসন্দেহে,' জবাব দিলেন সামারলি। 'অন্যান্য উপজাতিদের মত এদের ভাষাও নিশ্চয় পাঁচমিশেলী—জাতে মঙ্গোলিয়ান।'

'ভাষাটা পাঁচমিশেলী সন্দেহ নেই। এ ছাড়া এ মহাদেশে আর কোনো ভাষা নেই। আলাদা আলাদা শ-খানেক এমনি ভাষার জগাখিচুড়ি এর আগেও লক্ষ্য করেছি। তবে মঙ্গোলিয়ান তত্ত্বে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।'

তিক্তকণ্ঠে সামারলি জবাব দিলেন—'তুলনামূলক শারীরস্থানের সীমিত-জ্ঞান থাকলেও ব্যাপারটা যাচাই করে নেওয়া যেত।'

ঝাঁকুনি মেরে উদ্ধত থুৎনিটাকে ঊর্ধ্বে তুললেন চ্যালেঞ্জার। ফলে দাড়ি আর টুপিতে মুখটা প্রায় ঢেকে গেল বললেই চলে—'সীমিত জ্ঞানে তা সম্ভব ঠিকই। কিন্তু জ্ঞান যখন ফুরিয়ে যায়, তখন অন্য সিদ্ধান্তে আসতে হয় নিরুপায় হয়ে।' কটমট করে দুজনে চেয়ে রইলেন দুজনের পানে। দূরাগত ফিসফিসানি কিন্তু অব্যাহত রইল কানের গোড়ায়—'পারলে তোদের মারব আমরা! পারলে তোদের মারব আমরা!'

রাত্তির কাটালাম নদীর ঠিক মাঝখানে—ভারী পাথর ঝুলিয়ে নোঙর

বানিয়ে নিলাম। প্রস্তুত হয়ে রইলাম সর্ববিধ আক্রমণের জন্যে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সকাল হলে রওনা হলাম। ঢাকের বাদ্যি মিলিয়ে গেল পেছনে। বিকেল তিনটে নাগাদ এক মাইলেরও বেশী চওড়া একটা প্রবল প্রপাতের পাল্লায় পড়লাম—খাড়া হয়ে নেমে গেছে নদী। ঠিক এইখানেই নৌকো উল্টে যাওয়ায় ভেসে গিয়েছিল চ্যালেঞ্জারের প্রমাণ সামগ্রী। জায়গাটা দেখে সান্ত্বনা পেলাম। সত্যিই তাহলে বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করছি না—ওঁর কাহিনীর সত্যতার প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ—এই সেই অঞ্চল। ইণ্ডিয়ানরা নিবিড় ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে প্রথমে বয়ে নিয়ে গেল ক্যানো দুটো, তারপর অন্যান্য সরঞ্জাম। রাইফেল কাঁধে বনের বিপদের জন্যে সজাগ অবস্থায় আমরা চারজন গেলাম তাদের সামনে পেছনে। সন্ধ্যের আগেই খরস্রোতা বিপজ্জনক প্রপাতটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এসে নদীপথে গেলাম আরও দশমাইল—নোঙর ফেলে রাত কাটালাম নদীর বুকে। জায়গাটা মূলনদী থেকে উপনদীর মধ্যে দিয়ে একশ মাইলের কম নয়।

পরের দিন দ্বিপ্রহরের অনেক আগেই শুরু হল আমাদের গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার। সকাল থেকেই অত্যন্ত অস্বস্তিতে ছটফট করছিলেন চ্যালেঞ্জার। সমানে নিরীক্ষণ করে চলেছিলেন নদীর দু-পাড। হঠাৎ হৃষ্ট চিৎকার ছেড়ে দেখালেন নদীর বুকে অদ্ভুত ভাবে ঝুঁকে পড়া একটি মাত্র গাছ।

'বলুন দিকি ওটা কী?'

'আসাই পাম,' বললেন সামারলি।

'ঠিক। পথের চিহ্ন হিসেবে চিনে রেখেছিলাম ঐ আসাই পাম-কেই। নদীর উল্টোদিকের পাড়ে আরও আধমাইল গেলে পাবেন গোপন প্রবেশ পথটা। গাছের জটলায় কিন্তু ফাঁক নেই। আশ্চর্য সেইখানেই, যত রহস্য এইখানেই। গাঢ় সবুজ ঝোপের বদলে ঐ যে হাল্কা সবুজ নলখাগড়া দেখছেন, ঐখানে বিশাল তুলোগাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রয়েছে অজ্ঞাত দেশের গেট। ঠেলে ভেতরে না ঢুকলে বুঝবেন না।'

সত্যিই জায়গাটা অপূর্ব। লগি ঠেলে হাল্কা সবুজ নলখাগড়ার মধ্যে দিয়ে কয়েকশ গজ যাওয়ার পর এসে পড়লাম নিস্তরঙ্গ অগভীর জলপথে—টলটলে পরিষ্কার জল, তলায় বালি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চওড়ায় বিশ গজের মতন—দু-পাড়েই গাছপালার অপরূপ সমারোহ। ঝোপঝাড়ের বদলে নলখাগড়া-গুলোকে যে না দেখবে, শান্ত সুন্দর এই স্রোতস্বিনী আর তার পরের রূপ-কথার দুনিয়াকে সে কোনদিনই খুঁজে পাবে না।

রূপকথার দুনিয়াই বটে। মানুষ তার কল্পলোকে আজ পর্যন্ত যত বিচিত্র ছবির সৃষ্টি করেছে, তার সবই হার মেনে যায় এখানে। ওয়াণ্ডারফুল, সত্যিই ওয়াণ্ডারফুল! কল্পনাতেও আনা কঠিন। দু-পাশের উদ্ভিদ সমারোহের শাখাপ্রশাখা আশ্চর্য চন্দ্রাতপ রচনা করেছে শান্ত সুন্দর নদীর ওপর দিয়ে। সবুজ প্রশান্ত নদীপথে স্বর্ণকিরণ তির্যকরেখায় পড়ছে চন্দ্রাতপের ফাঁক দিয়ে এবং রামধনু বর্ণের সমারোহে সৃষ্টি করেছে বর্ণনাতীত এক মায়ালোক। সবুজ এই সুড়ঙ্গ পথের বিস্ময়কর সেই দৃশ্য এককথায় সত্যিই অবর্ণনীয়। ক্রস্ট্যালের মত স্বচ্ছ জল, দর্পণের মত নিস্তরঙ্গ স্থির জল, সবুজ-প্রান্ত হিমবাহের মত অপরূপ নিথর জল ছলকে ছলকে উঠছে দাঁড়ের ঘায়ে— হাজার তরঙ্গ অজস্র দ্যুতিময় ভাসমান মণি মাণিক্যের মত ধেয়ে যাচ্ছে দু-পাড়ের দিকে। ওপরকার পত্র ছাওয়া চাঁদোয়া থেকে সোনালী রশ্মিরেখা এসে পড়ছে হেথায় সেথায়! আশ্চর্য দেশে অ্যাডভেঞ্চারের উপযুক্ত প্রবেশ পথই বটে। জংলী ইণ্ডিয়ানদের সাড়াশব্দ আর পাচ্ছি না—কিন্তু বিস্তর অরণ্যবাসী পশুদের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। পোষা প্রাণীর মত তাদের নির্ভীক আচরণ দেখে বুঝছি শিকারীদের আতংক কি জিনিস তা তারা জানে না। কালো মখমলের মত ভেলভেট চামড়ায় মোড়া ক্ষুদে বাঁদররা তুষার শুভ্র দাঁত দেখিয়ে বিদ্রূপ চক-চকে চোখে চেয়ে রইল আমাদের দিকে। ঝপাৎ করে একবার একটা অ্যালিগেটর পাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। একবার ঝোপের ফাঁক দিয়ে একটা গাঢ়বর্ণের টেপির আমাদের এক ঝলক দেখে নিয়ে হেলে-দুলে মিলিয়ে গেল বনের মধ্যে। আর একবার ঘাড় বেকিয়ে সবুজ হিংস্র চোখে আমাদের উদ্দেশ্যে ঘৃণা বর্ষণ করে বিদ্যুৎ বেগে উধাও হল একটা বিরাট পুমা। বিহঙ্গকুল যে কত বিচিত্র এখানে তার বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। বিশেষ করে দু-পাড়ের জল ঠেলে দলে দলে চলেছে সারস, বক আর আইবিশ—রঙ তাদের নীল, লাল আর সাদা। ক্যানোর নিচে স্ফটিক স্বচ্ছ জলে দেখা যাচ্ছে বিচিত্র বর্ণের এবং আকারের অগুন্তি মাছের মীন-সাম্রাজ্য।

ঝাপসা সবুজ রৌদ্রালোকিত এই সুড়ঙ্গপথ বেয়ে চললাম তিনটে দিন। বহুদূরে তাকিয়েও কিন্তু দেখতে পেলাম না সবুজ জল কোথায় শেষ হয়েছে এবং সবুজ পাদপ চন্দ্রাতপ কোথায় শুরু হয়েছে—বিরামবিহীন এ এক অপূর্ব স্বর্গ-বীথি। নিবিড় প্রশান্তি বিরাজমান এখানকার জলপথে—মানুষের কোনো চিহ্ন নেই।

গোমেজ বললে—'ইণ্ডিয়ানরা এখানে আসে না। ভয় পায়। কুরুপুরি।'

'কুরুপুরি হল বনের দেবতা,' বুঝিয়ে দিলেন লর্ড জন। 'যে কোনো শয়তানের স্যাঙাৎকে এই নামে ডাকে এ অঞ্চলে। ওদের বিশ্বাস এদিকে ভয়ংকর কিছু একটা আছে—তাই এ তল্লাটের ধার দিয়ে যায় না।'

তৃতীয় দিবসে দেখা গেল নদী এত অগভীর হয়ে আসছে যে ক্যানো নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। দু-বার বেশ কয়েকঘন্টার জন্যে নদীতলে আটকে গেল ক্যানো। শেষকালে ঝোপের মধ্যে ক্যানো তুলে রেখে রাত কাটালাম পাড়ে। সকালবেলা আমি আর লর্ড জন মাইল দুয়েক এগিয়ে গিয়ে দেখে এলাম নদী আরো অগভীর হয়েছে। চ্যালেঞ্জারও সেই সন্দেহ করেছিলেন। এর বেশী আর ক্যানো নিয়ে যাওয়া যাবে না। কাজেই ক্যানো লুকিয়ে রাখলাম ঝোপের মধ্যে—কুঠার দিয়ে দাগিয়ে রাখলাম একটা গাছ যাতে পরে খুঁজে নিতে পারি। তারপর জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে বয়ে নিয়ে চললাম নিজেরাই।

অভিযানের এই পর্বটায় আমাদের পরিশ্রম বৃদ্ধি পেল ঠিকই। সেইসঙ্গে দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে। অভিযানের শুরু থেকেই কাকে কি করতে হবে, সে হুকুম চ্যালেঞ্জার একাই দিয়ে এসেছেন। সামারলির তা মোটেই পছন্দ হয়নি। এখন যেই তাঁকে বলা হল সামান্য একটা অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার বয়ে নিয়ে যেতে হবে, অমনি আগুন লেগে গেল বারুদের স্তূপে।

অগ্নিগর্ভ প্রশান্তি বজায় রেখে সামারলি বললেন—'মশায় কি অধিকারে হুকুমটা চালাচ্ছেন জানতে পারি কি?'

কটমট করে তাকালেন চ্যালেঞ্জার—খাড়া হয়ে গেল দাড়ি।

'অভিযানের নেতা হিসেবে।'

'আপনাকে নেতা বলে মানতে রাজী নই আমি।'

'বটে!' বিষম বিদ্রূপে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানালেন চ্যালেঞ্জার—'অনুগ্রহ করে তাহলে বুঝিয়ে দেবেন অভিযানে আমার স্থানটা কোথায়?'

'আপনার বিবৃতির সত্যতা যাচাই করতে এসেছি আমরা। বিচারক এই কমিটি। সুতরাং আপনি টুক টুক করে শুধু হেঁটে যাবেন বিচারকদের সঙ্গে—গলাবাজি আর নেতাগিরি ফলাতে নয়।'

'বলেন কী!' বলে একটা ক্যানোর পাশে দেহভার ন্যস্ত করলেন চ্যালেঞ্জার—'তাহলে আপনারা যান আপনাদের খুশীমত—আমি যাব আমার খুশীমত। নেতা যদি না হই, অভিযান পরিচালনার দায়িত্বও আমি নেব না।'

তৃতীয় দিবসে দেখা গেল নদী এত অগভীর হয়ে আসছে যে ক্যানো নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। পৃঃ ৮৯

ভাগ্য ভাল লর্ড জন রক্সটন এবং আমার মত দু-জন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি ছিল অভিযানে। নইলে এই দুই বিদ্বান পুরুষের খিটির মিটির উচ্ছৃঙ্খলতা আর ক্ষমাহীন দোষত্রুটির ফলে বানচাল হয়ে যেত অভিযান—রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হত লণ্ডনে। দুজনকেই সামলাতে হল আমাদের। তর্কবিতর্ক অনুনয় বিনয় এবং অনেক ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যার পর দুজনকে পথে আনলাম। অবশেষে দেখা গেল নাসিকাকুঞ্চনের নিচে ব্রায়ার পাইপে ধূমোদ্গীরণ করতে করতে সর্বাগ্রে চলেছেন সামারলি। ধূমায়িত চলন্ত আগ্নেয়গিরির মত গুর-গুর গুম-গুম শব্দে পেছন পেছন চলেছেন চ্যালেঞ্জার। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে একটা বিরাট আবিষ্কার করে ফেললাম আমি আর লর্ড জন। এডিনবরার ডক্টর ইলিংওয়ার্থ সম্বন্ধে দুজনেরই অভিমত অতিশয় খারাপ। সেই থেকে এই টোটকা প্রয়োগ করে গেলাম অগ্ন্যুৎপাতের সূচনা দেখামাত্র। নামোল্লেখের সঙ্গে দুই প্রফেসরই একটা সাময়িক আঁতাত আর বন্ধুত্ব গড়ে নিয়ে একযোগে মুণ্ডপাত করতেন দুজনেরই সমান প্রতিদ্বন্দ্বী স্কচ প্রাণীতত্ত্ব বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের।

কিছুদূর এগোনোর পর দেখা গেল স্রোতস্বিনী ক্রমশঃ নালায় পরিণত হতে চলেছে। তারপর একসময় তা হারিয়ে গেল স্পঞ্জকোমল বিশাল শৈবাল স্তূপের নিম্নদেশে—হাঁটতে গিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল আমাদের। মশা এবং বিবিধ উড্ডীন কীটপতঙ্গের ঝাঁক বেঁধে আকাশ বিহারের ফলে জায়গাটা অতীব বিপজ্জনক। তাই শক্ত জমি আবার পায়ের তলায় স্পর্শ করার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উড্‌কুদের ঘাঁটি জলাজায়গাটা বেড় দিয়ে পাশ কাটিয়ে গাছের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে কানে ভেসে এল পতঙ্গ কূজন—ঠিক যেন উচ্চনিনাদী অর্গ্যান বেজে চলেছে।

ক্যানো ছেড়ে আসার দ্বিতীয় দিবসে দেখলাম পুরো জায়গাটার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বদলে যাচ্ছে। রাস্তা ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠছে। যতই ওপরে উঠছি, ততই গাছপালা কমে আসছে—নিরক্ষীয় বৃক্ষের নিবিড় সমৃদ্ধি তিরোহিত হচ্ছে। পাললিক আমাজনীয় অববাহিকার বিশাল মহীরুহর স্থান নিচ্ছে ফিনিক্স এবং কোকো পামবৃক্ষ, হেথায় সেথায় জটলা পাকিয়ে বেড়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে—মাঝের জায়গা জুড়ে রয়েছে আগাছার জঙ্গল। মাঝে মাঝে আর্দ্র খোবলের মধ্যে গজিয়েছে মরিসিয়া পামবৃক্ষ—ফার্ণের পাতার বাহারি ঝালর ঝুলিয়ে রয়েছে নয়ন মনোহর ভঙ্গিমায়।

কম্পাশের কাঁটার নির্দেশ মেনেই চলতে হচ্ছে। দু-একবার খিটিমিটি লেগেছিল চ্যালেঞ্জার আর দু-জন ইণ্ডিয়ানের মধ্যে। প্রফেসর রেগেমেগে

সখেদে তখন যা বলেছিলেন, তা উদ্ধৃত না করে পারছি না—'আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির বৃহত্তম উৎপাদন এই মস্তিষ্ককে তাচ্ছিল্য করে অনুন্নত বর্বরদের সহজাত প্রবৃত্তির ওপর আস্থা রাখার মত ভ্রান্তি আর নেই।'

তৃতীয় দিনে দেখা গেল কাজটা ঠিকই করেছিলাম। চ্যালেঞ্জারও স্বীকার করলেন—হ্যাঁ, গত অভিযানের কয়েকটা চেনা অংশ চোখে পড়ছে বটে। এক জায়গায় পেলাম আগুনে-কালো চারখানা পাথর—তাঁবু পাতা হয়েছিল এখানে।

রাস্তা কিন্তু এখনো ওপর দিকেই উঠে চলেছে। শেষ নেই চড়াইয়ের। দুদিন লাগল পাথর সমাকীর্ণ একটা ঢালু জায়গা পেরিয়ে আসতে। পাদপসমূহ এবং উদ্ভিদ জগতের প্রকৃতি আবার বদলে যাচ্ছে। উদ্ভিজ্জ হস্তীদন্ত বৃক্ষটাই কেবল চিনতে পারলাম আমি। আশ্চর্য সুন্দর অর্কিড সমারোহের মধ্যে চেনা অর্কিড দেখলাম কেবল দুর্লভ 'নাট্টোনিয়া ভেক্সিলারিয়া' এবং ক্যাটলিয়া। চিনতে পারলাম ওডোনটো গ্লোসামের বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল গোলাপী আর লোহিত পুষ্পগুচ্ছকেও। খাটো গিরিবর্ত্মের মাঝে মধ্যে প্রবাহিত ঝিরঝিরে ঝর্ণাধারার দু'পাশে দেখলাম ঝুঁকে পড়া ফার্ণ, নুড়ি দিয়ে ছাওয়া তলদেশ। ইংলিশ ট্রাউট মাছের মত নীল পিঠওয়ালা এক রকম মাছ পেলাম ছোট ছোট জলাশয়ে। পুকুরপাড়ে তাঁবু পেতে মুখ পালটালাম মৎস্য-আহারে।

ক্যানো ছেড়ে আসার নবম দিবসে, অর্থাৎ একশ বিশ মাইল পথ আসবার পর, ছাড়িয়ে এলাম গাছপালা। অচিরেই ঝোপঝাড়ের আকার নিল বৃক্ষসমূহ। তারপরেই দেখা গেল প্রকাণ্ড বাঁশবন জুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ইণ্ডিয়ানরা কুঠার দিয়ে বাঁশ কেটে পথ বানিয়ে না দিলে এই নিরেট বংশ-প্রাচীর ভেদ করে এক-পাও অগ্রসর হতে পারতাম না। সকাল সাতটায় বেরিয়ে রাত আটটা পর্যন্ত লাগল সুবিশাল বাঁশবনের এই দেওয়াল পেরিয়ে আসতে—মাঝখানে দু-বার খালি জিরিয়ে নিয়েছিলাম ঘন্টাখানেক করে উদর পূজার জন্যে। এরকম একঘেয়ে ক্লান্তিকর অরণ্য আমি আর দেখিনি। দশ-বারো গজ দূর পর্যন্তও দেখা যায় না। সামনের দিকে আমার চোখ নিবদ্ধ লর্ড জনের কট্‌ন্‌ জ্যাকেটের পৃষ্ঠদেশে--ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে কেবল দেখছি এক ফুটের মধ্যেই হলুদ প্রাচীর। মাথার ওপর থেকে ছুরীর মত তীক্ষ্ণ রোদের ধারা নামছে। পনেরো ফুট ওপরে দেখা যাচ্ছে দুলন্ত নলখাগড়ার শীর্ষদেশ—তারও ওপরে সুনীল আকাশ। কি ধরনের প্রাণীর নিবাস এ অঞ্চলে, তা আমার

জানা নেই। কিন্তু বেশ কয়েকবার বিরাটকায় গুরুভার জানোয়ারদের অস্তিত্ব টের পেয়েছিলাম আশে পাশে। যেন ঝাঁপিয়ে পড়েই মড়মড় মট মট শব্দে সরে যাচ্ছে। হাঁকডাকের আওয়াজ শুনে লর্ড জন বললেন বুনো গরু মোষ হলেও হতে পারে। রাত নামতেই বেরিয়ে এলাম বংশ-অরণ্য ভেদ করে। ফাঁকায় তাঁবু পাতলাম, সারাদিনের অসহ্য পরিশ্রমে তখন জিভ বেরিয়ে পড়ার সামিল প্রত্যেকেরই।

পরের দিন প্রত্যুষে আবার শুরু হল হন্টন-পর্ব। দেখলাম, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আবার পালটে যাচ্ছে। পেছনে সেই বাঁশের পাঁচিল—নদীরেখাও সুস্পষ্ট। সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। ঢালু হয়ে উঠে গেছে ওপরে। মাঝে মাঝে ফার্ন-বৃক্ষের জটলা। ঢাল শেষ হয়েছে সুদীর্ঘ তিমির পিঠের মত খাঁজ কাটা পর্বত প্রাচীরে। দুপুর নাগাদ পৌঁছোলাম সেখানে। আবার দেখলাম একটা দেবে যাওয়া উপত্যকা বিস্তীর্ণ রয়েছে দিগন্ত পর্যন্ত। বহু দূরে উপত্যকা আবার চড়াই আকারে ওপর দিকে উঠতে উঠতে খাটো গোলাকার-দিগ্‌রেখায় মিলেছে। পর্বতসারি পেরিয়ে আসতেই সর্বপ্রথম এমন একটা ঘটনা ঘটল যা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, নাও পারে।

দুজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে যেতে যেতে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে উত্তেজিত-ভাবে ডানদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম সেই দিকে। দেখলাম, মাইল খানেক দূরে একটা অতিকায় পাখী ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ধীর গতিতে উঠে এল জমি থেকে এবং মসৃণ ভঙ্গিমায় বাতাস কেটে খুব নিচ দিয়ে উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল ফার্ন-বৃক্ষদের মাথার ওপর দিয়ে।

সোল্লাসে বললেন চ্যালেঞ্জার—'দেখেছেন? দেখেছেন সামারলি?'

সতীর্থ বিজ্ঞান-তপস্বীটি তাকিয়েছিলেন ঠিক সেই দিকেই বিস্ফারিত চোখে, যেদিকে একটু আগেই অদৃশ্য হয়েছে দানব-পক্ষীটি।

বললেন—'কি বলতে চান?'

'টেরোড্যাকটিল।'

বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন সামারলি—'টেরোড্যাকটিল না কচু! সারস পাখী!'

চ্যালেঞ্জার এমন ভয়ংকর রেগে গেলেন যে বাক্যস্ফূর্তি ঘটল না। বোঝাটা কাঁধের ওপর ঝাঁকিয়ে ফেলে আবার শুরু করলেন কুচকাওয়াজ। আমার পাশে এগিয়ে এলেন লর্ড জন। মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর—সচরাচর এ রকম গম্ভীরবদনে ওঁকে দেখিনি। হাতে রয়েছে দূরবীন।

বললেন—'গাছের ওপর দিয়ে মিলিয়ে যাওয়ার আগে আমি ফোকাস করে দেখে নিয়েছি ছোকরা। সত্যিই যে কি তা বলতে পারব না, তবে স্পোর্টসম্যান হিসেবে বাজী ফেলে বলতে পারি পাখী নয়—জীবনে এ রকম পাখী আমি শিকার করিনি।'

ব্যাপারটা ঐখানেই স্থগিত রইল। শ্রদ্ধেয় নেতার বিবৃতি অনুসারে সীমান্তস্থিত বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে সত্যিই কি অবশেষে অজ্ঞাত দেশের তোরণদ্বারে এসে পৌঁছোলাম? ঠিক যেরকমটি ঘটেছিল, বললাম সেই ভাবেই। পড়ে আপনি যা বুঝছেন, আমিও বুঝছি তাই। আপাততঃ এর বেশী আর কিছু বলা সঙ্গত নয়—অত্যাশ্চর্য কিছু দেখেছি, এমন কথা বলার সময় এখনো হয় নি।

সুধী পাঠকপাঠিকাগণ, আর কিছু উপহার আপনাদের না দিতে পারি, আপনাদের কিন্তু নিয়ে এসেছি চওড়া নদীর বুক দিয়ে, নলখাগড়ার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, সবুজ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে, পাম-ট্রি সমাকীর্ণ ঢালু পথের ওপর দিয়ে, বাঁশের অরণ্য বিদীর্ণ করে, এবং ফার্ণ-বৃক্ষ ছাওয়া প্রান্তরের মাঝ দিয়ে। অবশেষে গন্তব্যস্থল দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনেই। দ্বিতীয় পর্বত শ্রেণী পেরিয়ে আসার পর পাম-বৃক্ষ ছাওয়া একটা অসমতল প্রান্তর দেখেছিলাম—আর দেখেছিলাম ছবিতে দেখা সেই সুউচ্চ লাল-বর্ণের এবড়োখেবড়ো পর্বতশ্রেণী। আবার লিখছি, এই সেই ছবির জায়গা—কোনো সন্দেহই নেই। তাঁবু যেখানে পেতেছি সেখান থেকে ঐ লোহিত পর্বতপ্রাচীরের সবচেয়ে কাছের জায়গাটাই কম করে মাইল সাতেক তো বটেই। যতদূর দু-চোখ যায়, বেঁকে মিলিয়ে গেছে সুউচ্চ এই শৈল প্রাচীর। লর্ড্‌ রক্সটন ময়ূরের মত নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন চ্যালেঞ্জার। সামারলি নীরব, কিন্তু সংশয়াচ্ছন্ন। আরেকটা দিন গেলেই সংশয়ের অবসান ঘটবে। জোস-য়ের হাত ফুটো হয়ে গেছে কাটা বাঁশে। তাই ফিরে যাচ্ছে। চিঠিখানা ওর হাতেই দিচ্ছি। আশা করি যথাস্থানে পৌঁছোবে। সেরকম ঘটনার সূত্রপাত ঘটলেই আবার কলম ধরব। পর্যটনের একটা খসড়া নকশা দিলাম এই সঙ্গে। বিবরণটা বুঝতে সহজ হবে।

৯ ॥ এ দৃশ্য দেখব কেউ কল্পনাও করেছিল কী?

বীভৎস কাণ্ড! লোমহর্ষক ব্যাপার? কপালে এই পরিণতি লেখা ছিল অবশেষে? কেউ তো কল্পনাও করতে পারিনি এমন বিপদে পড়ব শেষকালে। যে বিপদে পড়েছি, তার শেষ দেখতে পাচ্ছি না—

পর্যটনের একটা খসড়া নকশা দিলাম এই সঙ্গে। পৃষ্ঠা ৯৪

বিপদ মুক্তি আর কোনোদিন ঘটবে বলে মনে হয় না। অজ্ঞাত অন-ধিগম্য এই অঞ্চলেই বাকী জীবনটা কাটাতে হবে, এই হয়ত আমাদের বিধিলিপি। মাথার মধ্যে সব ঘোট পাকিয়ে যাচ্ছে এখনও। বর্তমানের ঘটনা অথবা ভবিষ্যতের সুযোগ-সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করবার মত পরিষ্কার মাথা এখন নয়। বিমূঢ় অনুভূতি দিয়ে কেবল এইটুকুই বুঝছি, বর্তমান যেমন ভয়ংকর, ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকার।

এর চাইতে খারাপ অবস্থায় ধরাধামের কোনো মনুষ্য কখনো পড়েনি। আমাদের বর্তমান ঠিকানার সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান আপনাদের জানিয়েও কোনো লাভ হবে না। উদ্ধারকারী দলবল নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের ডাকব কি ভরসায়? কেউ আমাদের রক্ষে করতে পারবে না। যদিও বা কোমর বেঁধে কেউ আসে, দক্ষিণ আমেরিকায় সে পদার্পণ করার আগেই আমাদের নিয়তির লিখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

সত্যি কথা বলতে কি, চাঁদের ওপর পৌঁছোলে কোনো মানুষের পক্ষে সেখানে যেমন কোনো সাহায্য পাঠানো সম্ভব নয়—আমরাই আছি প্রায় সেই অবস্থায়। এ বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারি কেবল নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি আর কায়িক শক্তি দিয়ে—সাহায্য পাঠিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে কেউ পারবে না। সহচর হিসেবে পেয়েছি তিন-তিনজন

অত্যাশ্চর্য পুরুষকে—তিনজনেরই মগজের ক্ষমতা অসাধারণ, অটল সাহসে অকুতোভয় তিনজনেই। ভরসা শুধু এই তিনজনের ওপর—মুক্তির একমাত্র আশা ওঁদেরকে ঘিরেই এখনো টিমটিম করছে আমার মধ্যে। তিনসঙ্গীর অবিচলিত মুখপানে চাইলেই তমিস্রার মাঝে রশ্মিরেখা দেখতে পাচ্ছি। বাহ্যতঃ আমার বিশ্বাস ওঁদের মত আমিও উদাসীন। ভেতরে ভেতরে কিন্তু ভয়ে কাঁপছি।

কিভাবে এই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লাম, যদ্দূর সম্ভব খুঁটিয়ে তার বিবরণ দেওয়া যাক।

শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম লালচে খাড়াই পর্বত প্রাচীর বেষ্টিত উপত্যকার মাইল সাতেক দূরে রয়েছি আমরা—নিঃসন্দেহে প্রকাণ্ড এই বলয়াকার পর্বতালয়ের কথাই এতদিন আমাদের শুনিয়ে এসেছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কিন্তু উনি যে উচ্চতার আভাস দিয়েছিলেন, দেখা যাচ্ছে জায়গায় জায়গায় খাড়াই পাহাড়টা তার চাইতে উঁচু—হাজার ফুট তো বটেই। গড়নটা অদ্ভুত। এবড়োখেবড়ো, খাঁজকাটা, খোঁচা খোঁচা। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আগ্নেয়শিলা ঠেলে উঠলে যে রকম দেখায়, অবিকল সেই রকম। ঠিক এই ধরনের ভীষণ প্রকৃতির ব্যাসাল্ট পাথরের আগ্নেয় শৈল দেখা যায় এডিনবরার স্যালিসবুরি ক্র্যাগ্‌স্‌-য়ে। শীর্ষদেশে কিন্তু উদ্ভিদ-সমৃদ্ধির যাবতীয় লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিনারার দিকে ঘন ঝোপ, তারও পেছনে বিস্তর-লম্বা মহীরুহ। প্রাণের স্পন্দন কিন্তু কোথাও নেই—কোনোদিকে না।

সেই রাতেই তাঁবু পাতলাম খাড়াই পাহাড়ের ঠিক তলদেশে। জায়গাটা অত্যন্ত বন্য এবং নির্জন। মাথার ওপরকার বন্ধুর শৈল প্রাচীর যে শুধু লম্বালম্বিভাবে উঠে গেছে, তা নয়—শীর্ষদেশ ঝুঁকে রয়েছে বাইরের দিকে; কাজেই গা বেয়ে ওঠা প্রশ্নাতীত। খুব কাছেই রয়েছে সেই উঁচু, সরু, শঙ্কুর মত পর্বত চূড়া—আগের বিবরণে এর বর্ণনা দিয়েছিলাম মনে আছে। ঠিক যেন একটা লাল রঙের বিরাট গির্জের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ—যে অগ্রভাগের চুড়ো রয়েছে মালভূমির সঙ্গে সমান লেভেলে—মাঝখানে রয়েছে কিন্তু একটা বিরাট ফাটল। চূড়ার ওপর গজিয়ে উঠেছে একটি মাত্র বেজায় উঁচু গাছ। খাড়াই এই পর্বত আর তার শীর্ষদেশ দুটোই অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতা বিশিষ্ট—আমার তো মনে হয় পাঁচ-ছ'শ ফুটের বেশী নয়।

গাছটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—'ঐখানে বসেছিল টেরোড্যাকটিলটা। পাহাড়টার মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠেছিলাম,

গুলি করেছিলাম তারপর। উত্তম পর্বতারোহী হিসেবে বলতে বাধা হচ্ছি, পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত উঠে যেতে পারতাম ঠিকই—তবুও মালভূমির নাগাল পেতাম না।'

চ্যালেঞ্জার যখন টেরোড্যাকটিল প্রসঙ্গ নিয়ে মশগুল, আমি তখন তাকিয়েছিলাম সামারলির দিকে। তাই দেখতে পেলাম, সেই প্রথম বিশ্বাস আর অনুশোচনা নিবিড় হয়ে উঠছে তাঁর শীর্ণ, সরু মুখের রেখায় রেখায়। ঠোঁটের কোণে নেই সেই অবজ্ঞার গা-জ্বলানো হাসি—তার বদলে গোটা মুখখানা ধূসর হয়ে উঠেছে বিপুল উত্তেজনা এবং বিস্ময়বোধে। চমৎকৃত হয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহে, তাজ্জব হয়ে গেছেন মনে প্রাণে। চ্যালেঞ্জারও লক্ষ্য করলেন এবং যুদ্ধজয়ের প্রথম স্বাদটাকে উপভোগ করলেন তারিয়ে তারিয়ে।

ওঁর যা স্বভাব, ঠিক সেইভাবে অত্যন্ত অপটু ভঙ্গিমায় বিপুল বিদ্রূপ মেলে ধরলেন প্রতিটি শব্দের মধ্যে—'প্রফেসর সামারলি অবশ্য মনে করতে পারেন, সারসকে দেখে আমি টেরোড্যাকটিল বলি—তবে এ হল সেই জাতের সারস যার গায়ে পালক বলতে কিস্সু নেই—আছে কেবল কড়া চামড়া, ঝিল্লীমোড়া ডানা আর চোয়ালভর্তি দাঁত।' বলে, দাঁত খিঁচিয়ে চোখ মিটমিট করে এমন হাড়পিত্তি জ্বালানো হাসি হেসে মাথা হেলিয়ে সতীর্থকে সবিনয়ে অভিবাদন জানালেন যে ভদ্রলোক দ্বিরুক্তি না করে অন্য দিকে সরে পড়লেন।

সকাল হল। কফি আর ম্যানিওক খেলাম সামান্য পরিমাণে। ভাঁড়ারের খাবারদাবার পেট ভরে খেয়ে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না—এখন থেকে মিতব্যয়ী হওয়া দরকার। তারপর বসলাম যুদ্ধ-মন্ত্রণায়। মাথার ওপরকার মালভূমিতে আরোহণের সবসেরা পন্থা কি হওয়া উচিত, এই নিয়ে শুরু হল আলোচনা।

সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন চ্যালেঞ্জার। এমন গুরুগম্ভীর মর্যাদা নিয়ে বসলেন যেন প্রধান বিচারপতি বসেছেন বড় আদালতে। ছবিটা মনে মনে কল্পনা করে নিন। ওঁর আসনটা কিন্তু একটা পাথরের চাঁই। বালকোচিত স্ট্র-হ্যাটটা ঠেলে দিয়েছেন মাথার পেছন দিকে। অহংকৃত অর্ধনিমীলিত দুই চোখে এমন তাচ্ছিল্যের সাথে আমাদের অবলোকন করছেন—যেন আমরা কয়েকটা পোকামাকড় ছাড়া আর কিছু নই। বিশাল কালো দাড়ি দোলাতে দোলাতে ধীরকণ্ঠে বিবৃত করলেন আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা।

মানস-চিত্রে নিশ্চয় আমাদের তিনজনকেও দেখতে পাচ্ছেন। আমি

গাছটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন প্র:ফসর চ্যালেঞ্জার—'ঐখানে বসেছিল টেরোড্যাকটিলট।'

পৃঃ ৯৬

বসে আছি তাঁর পদতলে। খোলামেলায় অভিযান করে আসার ফলে আমার গায়ের রঙ জলে গেছে—রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছি—কিন্তু আগের মতই ভরপুর আছি প্রাণশক্তিতে—বুড়িয়ে যাইনি পথকষ্টে। সামারলি গম্ভীর বদনে অনন্ত-পাইপ টানতে টানতে এখনো সমালোচনা করার সুযোগ পেলেই খোঁচা মেরে চলেছেন। লর্ড জন দাঁড়িয়ে আছেন রাইফেলে ভর দিয়ে। দীর্ঘ নমনীয় সতর্ক বপুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিবিড় তন্ময়তা—ঈগলচক্ষু নিবদ্ধ বক্তার ওপর। আগ্রহ-নিবিড় সূচাগ্র চাহনি। আমাদের পেছনে শ্যামবর্ণ দো-আঁশলা দুজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ইণ্ডিয়ানদের ক্ষুদে দলটা। সামনে অতিকায় গগনভেদী ইমারতের মত লোহিতবর্ণ সেই পঞ্জরময় শৈলশ্রেণী—লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোনোর পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে অটল মহিমায়।

নেতা মশায় বললেন—'গত অভিযানে পাহাড় বেয়ে ওঠবার সব চেষ্টাই করেছিলাম। আমি যা পারিনি তা আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না—কেন না পর্বতারোহী হিসেবে বিলক্ষণ দক্ষতা আছে এই শর্মার। পাহাড়ে ওঠার কোনো সরঞ্জাম সঙ্গে ছিল না সেবার, বুদ্ধি করে এবার সঙ্গে এনেছি সবই। দল ছাড়া ঐ চুড়োটার ওপর এবার ঠিক উঠবই। কিন্তু ঝুলন্ত ঐ মূল পাহাড়টায় তো পৌঁছোনো যাবে না—দল ছাড়া পাহাড়চুড়োয় ওঠা পণ্ডশ্রমই হবে। গতবারে বর্ষা শুরু হয়ে যাবে বলে আর খাবারদাবার শেষ হয়ে আসায় ধড়ফড় করে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই হাতে কম সময় ছিল। পূবদিকে মাইল ছয়েকের বেশী দেখে আসতে পারিনি। ওপরে উঠবার কোনো পথও পাইনি। এবার কি করব বলুন।'

'সঙ্গত পন্থা একটাই আছে,' বললেন প্রফেসর সামারলি—'পূবদিক যদি আপনি দেখে এসে থাকেন, তবে চলুন এবার পশ্চিম দিক দিয়ে টহল মেরে দেখা যাক ওপরে ওঠবার পথ পাওয়া যায় কিনা।'

সায় দিলেন লর্ড জন—'ঠিকই বলেছেন। মালভূমিটা এমন কিছু বিরাট নয়। অনায়াসে চক্কর মেরে এসে এখানেই ফের পৌঁছোনো যাবে।'

চ্যালেঞ্জার বললেন—'আমার এই ছোট্ট বন্ধুটিকে বরাবর বলেছি (আমার প্রসঙ্গ উঠলেই ঠিক এই ভাবেই কথা বলেন প্রফেসর—যেন স্কুলের দশবছরের খোকা আমি), ওপরে ওঠার পথ এখানে নেই বললেই চলে। থাকলে পাহাড়চূড়োয় দেশ এতদিন অজ্ঞাত থাকত না,

জগৎ ছাড়া হয়ে থাকত না, প্রাকৃতিক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা ওখানে টিঁকে থাকত না। তা সত্ত্বেও বলব, ভারী গতর নিয়ে জানোয়াররা যে পথে নেমে আসতে পারে না, কিন্তু পাকা পর্বতারোহী যে-পথ বেয়ে উঠে যেতে পারে—এমন পথ থাকলেও থাকতে পারে।'

'আপনি মশায় তা জানছেন কি করে?' তীক্ষ্ণ মন্তব্য নিক্ষেপ করলেন সামারলি।

'আমার পূর্ববর্তী অভিযাত্রী ম্যাপল হোয়াইট সশরীরে উঠেছিলেন বলেই এমন একটা পথের আন্দাজ করা যায়। না উঠলে অমন একটা রাক্ষুসে প্রাণীর স্কেচ আঁকলেন কি করে?'

গোঁয়ার গোবিন্দ সামারলি কি তাতে সন্তুষ্ট হন? বললেন তেড়েমেড়ে—'যুক্তিটা গ্রাহ্য করা গেল না—প্রমাণিত হয় নি। মালভূমি দেখতে পাচ্ছি—কাজেই তার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওখানে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, সে প্রমাণ পাইনি।'

'আপনি কি মানলেন আর কি মানলেন না আমার কাছে তার কোনো গুরুত্ব নেই। মালভূমিটাই যে আপনার বুদ্ধিমত্তায় খামচা মারতে পেরেছে, তাতেই আমি খুশী।' বলে, মালভূমির দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েই আচমকা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জার এবং আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে ক্যাঁক করে সামারলির ঘাড় ধরে মুখটা ফিরিয়ে দিলেন আকাশের দিকে—'মালভূমিতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, সে বিষয়ে আরো প্রমাণের দরকার আছে কী?'

আগেই বলেছি, ঝুলন্ত পর্বতশীর্ষে ঘন ঝোপ দেখা যাচ্ছিল নিচ থেকেই। একটা ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল চকচকে কালো একটা বস্তু। অতিশয় ধীর গতিতে ঝোপের বাইরে এসে ঝুলে পড়তেই দেখলাম একটা অদ্ভুত অতিশয় বিরাট সাপ—মাথাটা বিচিত্র—কোদালের মত চ্যাপ্টা। এরকম প্রকাণ্ড সরীসৃপ জীবনে আমি দেখিনি। মিনিট খানেক আমাদের মাথার ওপর দোদুল্যমান অবস্থায় থাকার সময়ে ভোরের রোদ্দুর ঠিকরে গেল তার হিলহিলে বক্র কুণ্ডলী থেকে। তারপর আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিলে নিজেকে ঝোপের মধ্যে—অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

চ্যালেঞ্জার যে তাঁর ঘাড় ধরে ওপর দিকে জোর করে ঘুরিয়ে রেখেছেন, প্রবল আগ্রহের ফলে এতক্ষণ তা খেয়ালই ছিল না সামারলির, এখন নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বীর কবল মুক্ত করে নিয়ে বললেন মর্যাদাগম্ভীর গলায়—'প্রফেসর

চ্যালেঞ্জার, আমার থুৎনিতে হাত না দিয়ে মন্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করলে বাধিত হব। অত্যন্ত মামুলি পাহাড়ী ময়াল সাপ দেখে এতটা স্পর্ধা আর দেখাবেন না।'

বিজয়োল্লাসে প্রতিদ্বন্দ্বী মহাশয় তখন তুরুকনাচ নাচছেন—'আরে মশায়, মালভূমিতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা প্রমাণ চেয়েছিলেন—চাক্ষুস প্রমাণ তো পেলেন। যাই হোক প্রমাণটা যদি কেউ বদ্ধমূল অন্ধধারণা বা স্থূল যুক্তিবুদ্ধির জন্যে মাথায় ঢোকাতে নারাজ হয়, তাতে কিছু এসে যায় না। গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর চলুন এবার তাঁবু গুটিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হওয়া যাক ওপরে ওঠবার পথের সন্ধানে।'

চোখা পাহাড়ের পাদদেশ কিন্তু এমনই বন্ধুর আর পাথর সমাকীর্ণ যে দ্রুত এগোয় কার সাধ্যি। আচম্বিতে মহানন্দে ময়ূরের মত নেচে উঠল আমাদের হৃৎযন্ত্রগুলো। তাঁবু পাতা হয়েছে যেন অনেকদিন আগে—তারই চিহ্ন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটা খালি শিকাগো মাংসের টিন, 'ব্র্যাণ্ডি' লেবেল লাগানো একটা বোতল। টিনের কৌটো কাটবার একটা ভাঙা যন্ত্র, আর পর্যটকদের ফেলে যাওয়া কিছু জঞ্জাল। দলা পাকানো ছিঁড়ে খুঁড়ে গলে আসা একটা 'শিকাগো ডেমোক্র্যাট' খবরের কাগজ—তারিখটা একেবারেই গলে গেছে।

চ্যালেঞ্জার বললেন—'আমার নয় কিন্তু—ম্যাপল হোয়াইটের।'

তাঁবু-চত্বরের ওপর ঝুঁকে থাকা একটা বিরাট ফার্ণ-বৃক্ষের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিলেন লর্ড জন। বললেন—'পথের নিশানা দেখছি!'

এক চিলতে শক্ত কাঠ এমনভাবে পেরেকে মেরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে গাছটার গুঁড়িতে যেন দিক নির্দেশ করছে পশ্চিম দিকে।

চ্যালেঞ্জার বললেন—'পথের নিশানা বলেই তো মনে হচ্ছে। তা ছাড়া আর কি হতে পারে বলুন? খুবই বিপজ্জনক পথে পা বাড়িয়েছেন বুঝতে পেরে এমন পথের নিশানা রেখে গেছেন ভদ্রলোক যাতে পরে কেউ এসে পথ চিনে নিতে পারে। ঐ পথেই এগোনো যাক, আরো কিছু নিশানা পেলেও পাওয়া যেতে পারে।'

পেলামও তাই—কিন্তু তা বিলক্ষণ ভয়ংকর এবং অপ্রত্যাশিত ধরনের। আসবার সময়ে দুর্ভেদ্য যে বাঁশের জঙ্গল পেরিয়ে এসেছিলাম, ঠিক সেই ধরনের খুব উঁচু ছুঁচলো বাঁশের বন দেখলাম চোখা পাহাড়ের ঠিক তলায়। কতকগুলো বাঁশ তো লম্বায় বিশ ফুট বটেই। ডগাগুলো এমন ধারালো আর শক্ত যে বর্শার ডগা বললেই হয়। দেখেই গা শির-শির করে। বাঁশ-

বনের ধার ঘেঁসে যেতে গিয়ে ভেতরে চকচকে কি যেন চোখে পড়ল। বনের মধ্যে মুণ্ড ঢুকিয়ে দেখতে গিয়ে আঁৎকে উঠলাম। মাংসহীন একটা নর-করোটি। পুরো কংকালটাই রয়েছে—মাথার খুলিটা কেবল বিচ্ছিন্ন হয়ে ঠিকরে পড়েছে কয়েক ফুট দূরে।

ইণ্ডিয়ানদের কৃপাণের কয়েকটা ঘা পড়তেই ফাঁক হয়ে গেল বাঁশবন। খুঁটিয়ে দেখলাম দেহাবশেষ। জামাকাপড়ের কয়েকটা ফালিই কেবল চোখে পড়ল। কিন্তু পায়ের বুট দেখেই বোঝা গেল অতীতের বিয়োগান্তক নাটকে বিগতপ্রাণ এই ব্যক্তিটির নিবাস ছিল ইউরোপে। নিউইয়র্কে নির্মিত একটা সোনার ঘড়ি, আর শেকলে লাগানো একটা স্টাইলোগ্রাফিক কলম পড়েছিল হাড়ের মধ্যে। ছিল একটা রুপোর সিগারেট কেসও—ডালায় খোদাই করা 'A. E. S. দিচ্ছে J.C.' কে। ধাতুর অবস্থা থেকে আন্দাজ করে নেওয়া গেল বিপর্যয়টা খুব বেশী দিন আগে ঘটেনি।

লর্ডজন বললেন—'বেচারী। কে মনে হয় বলুন তো? প্রত্যেকটা হাড় তো দেখছি গুঁড়িয়ে গেছে।'

সামারলি বললেন—'পাঁজর ফুঁড়ে বাঁশও গজিয়েছে। বাঁশ অবশ্য তাড়াতাড়িই গজায়, তাহলেও নিশ্চয় কল্পনা করা ঠিক হবে না যে কুড়িফুট উঁচু থাকা অবস্থায় বাঁশের মধ্যে পড়েছিল দেহটা।'

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বললেন—'লোকটাকে সনাক্তকরণের ব্যাপারে খুব একটা অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। আপনাদের এগিয়ে দিয়ে পেছন পেছন নদী পথে আসবার সময়ে ম্যাপল হোয়াইট সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে নিতে এসেছিলাম। প্যারা-তে কেউ কোনো খবরই দিতে পারল না। কিন্তু কপাল ক্রমে একটা মোক্ষম সূত্র ছিল আমার হাতে। ম্যাপল হোয়াইটের স্কেচ বুকে একটা ছবি ছিল। রোজারিও-তে বিশেষ একজন পাদরীর সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার ছবি। লোকটাকে খুঁজে বার করেছিলাম। বড্ড তার্কিক। পেট থেকে অনেক খবরও আদায় করেছিলাম—সেইসঙ্গে বলে দিয়েছিলাম তার ঐ সব বাজে বিশ্বাসের থোড়াই কেয়ার করে আধুনিক বিজ্ঞান। যাই হোক, কথাবার্তা থেকে জেনেছিলাম, আমার ও অঞ্চলে যাওয়ার দু-বছর আগে রোজারিওর সঙ্গে ম্যাপল হোয়াইটের দেখা হয়েছিল। ম্যাপল হোয়াইটের সঙ্গে ছিল জেম্‌স্‌ কোভার নামে একজন আমেরিকান—ফিরতি পথে কিন্তু ম্যাপল হোয়াইটের সঙ্গে তাকে দেখা যায় নি। এই যে কংকালটা দেখছেন, নিঃসন্দেহে তা এই জেম্‌স্‌ কোভারের।'

লর্ড জন বললেন—'মৃত্যুর কারণটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওপর থেকে হয় পড়ে গেছিল—নয় কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—বাঁশের মধ্যে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে সেই কারণেই। এ ছাড়া হাড়গোড় এভাবে ভাঙতে পারে না—বিশফুট উঁচু বাঁশের মধ্যে দিয়ে পাঁজরাগুলো গলে যেতে পারে না।'

থমথমে নীরবতার মধ্যে সাদা হাড়গুলোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম আমরা। খাঁটি কথাই বলেছেন লর্ড জন। পাহাড়ের মাথা ঝুঁকে ঝুলে রয়েছে বাঁশবনের ঠিক মাথার ওপর। ওপর থেকেই পতনটা ঘটেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু নিজে থেকেই কি পড়ে গেছে? নিছক দুর্ঘটনা বলা যায় কি? না কি—অজ্ঞাত দেশ সম্পর্কে হাড়কাঁপানো ভয়ংকর সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে লাগল মনের মধ্যে।

এগিয়ে চললাম নিঃশব্দে। পর্বত শ্রেণীর গা বরাবর যেতে যেতে দেখলাম, আকৃতিটা কুমেরু-সন্নিহিত মসৃণ বরফ-প্রান্তরের মত দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত—কোথাও কোনো ফাঁক নেই—অভিযাত্রী-জাহাজের মাস্তুল ছাড়িয়ে উঠে যাওয়ার যে রকম ছবি দেখেছি—সেই রকমই। পাঁচ মাইল পথ এসেও কোনো ফাঁক ফোকর দেখলাম না। তার পরেই হঠাৎ একটা জিনিস দেখে আশার আলো দেখতে পেলাম। পাহাড়ের এক জায়গায় একটা খোবলের মধ্যে একটা খড়ি দিয়ে আঁকা তীরচিহ্ন। বৃষ্টির জল সেখানে পড়ে না—তীরের মুখ ফেরানো রয়েছে পশ্চিমদিকে।

চ্যালেঞ্জার বললেন—'আবার দেখা যাচ্ছে ম্যাপল হোয়াইটের আঁকা পথের নিশানা। উপস্থিত বুদ্ধি ছিল বলেই আঁচ করেছিল যোগ্য ব্যক্তিদের পায়ের ধুলো পড়বে তার পায়ের ছাপের ওপর।'

'ওর সঙ্গে তাহলে খড়ি ছিল?'

'ছিল বৈকি। এক বাক্স রঙীন খড়ির বাক্স পেয়েছিলাম পিঠের ঝোলার মধ্যে। এখন মনে পড়ছে, সাদা খড়িটা ক্ষয়ে চুন হয়ে এসেছিল।'

সামারলি বললেন—'প্রমাণ হিসেবে এটা অতি উত্তম। ভদ্রলোকের পথনির্দেশ মেনে নিয়ে আরো এগোনো যাক পশ্চিমদিকে।'

আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে পাথরের গায়ে আবার দেখলাম একটা খড়ি দিয়ে আঁকা তীর চিহ্ন। এই খানেই এই প্রথম দেখা গেল তেল-তেলে মসৃণ পাহাড় চিড় খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখব্যাদান করে। তীরের চিহ্নটা এই ফাঁকের মধ্যেই একটু ওপরের দিকে মুখ করে আঁকা—

যেন সমতল জমি ছেড়ে ওপরে ওঠার নির্দেশ।

জায়গাটার পরিবেশ বড় ভাবগম্ভীর। পাথুরে প্রাচীর দানবিক, মাথার ওপরে ঘন ঝোপঝাড়ের দৌলতে নীলাকাশ দেখা যাচ্ছে আবছা-ভাবে, ছায়ার মত আলো এসে পড়েছে তলদেশে। অনেকক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি, পাথুরে বন্ধুর পথে হেঁটে অবস্থাও কাহিল, তা সত্ত্বেও জিরেন নেওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না কারো মধ্যে। স্নায়ু যেন গ্র্যানাইট দিয়ে গড়া প্রত্যেকেরই। ইণ্ডিয়ানদের তাঁবু খাটাতে বলে দো-আঁশলা দুজনকে নিয়ে আমরা চারজনে সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম বেয়ে উঠতে লাগলাম ওপর দিকে।

মুখের দিকে যা ছিল চল্লিশ ফুটের মত চওড়া, কিছুদূর গিয়েই খাড়াই কোণে তা এমনই মসৃণ আর সিধে হয়ে গেল যে আর ওঠে কার সাধ্যি। পুরোধা ম্যাপল হোয়াইট নিশ্চয় এ পথে যায় নি। পথের নিশানাও নিশ্চয় এদিক দেখায়নি। তাই আবার ফিরে এলাম সিকি মাইল গভীর গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে এবং তারপরেই লর্ড জনের চকিত চোখে ধরা পড়ল যা এতক্ষণ খুঁজছিলাম আমরা। অনেক উঁচুতে গাঢ় ছায়ার মধ্যে একটা গোলাকৃতি জমাট অন্ধকার। নিঃসন্দেহে গুহার মুখ।

পাহাড়ের এই জায়গাটার তলদেশে স্তূপীকৃত আলগা পাথর পড়ে থাকায় আরোহণপর্ব খুব একটা কষ্টদায়ক হল না। গাঢ় অন্ধকারের জায়গাটায় পৌঁছোতেই সংশয়ের নিরশন ঘটল। গুহাই বটে। মুখের কাছে আবার একটা সাদা তীর চিহ্ন। সঙ্গীসহ ম্যাপল হোয়াইট এই পথেই প্রবেশ করেছিল অজ্ঞাত জগতে।

তখন আমরা এতই ক্লান্ত যে গুহার মধ্যে দিয়ে নতুন অভিযান চালানোর অবস্থা কারোরই নয়। কিন্তু এতটা পথ উঠে এসে শেষ না দেখে ফেরবার পাত্রও কেউ নয়। লর্ড জন বার করলেন একটা ইলেকট্রিক টর্চ। হলদেটে আলোকবৃত্ত সামনে ফেলে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন আমাদের—এক লাইনে পেছন পেছন চললাম আমরা।

গুহার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয় এককালে জলের ধারা বয়ে গেছিল। পাথর-গুলো ক্ষয়ে গোল নুড়ির আকার নিয়েছে। দেওয়ালগুলো মসৃণ। মাথা হেঁট করে কোনমতে পঞ্চাশ গজ যাওয়ার পর গুহাপথ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণে উঠে গেল ওপর দিকে। তারপর তা এমন খাড়া হয়ে গেল যে আলগা নুড়ির মধ্যে হাত আর হাঁটু চেপে ধরে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে কোনমতে উঠলাম কিছুদূর। তারপরেই অবাক চিৎকার শুনলাম লর্ড জনের কণ্ঠে।

'পথ বন্ধ!'

ও'র ঠিক পেছনে ছিলাম আমি। হলদে আলোকবৃত্তের মধ্যে দেখলাম ভাঙা ব্যাসাল্ট পাথরের দেওয়াল ঠেকেছে সিলিং পর্যন্ত।

'গুহার ছাদ ভেঙে পড়েছে দেখছি!'

বৃথাই কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড সরিয়ে পথ বার করার চেষ্টা করলাম। ফলটা হল মারাত্মক। আরো বড় আলগা পাথর গড়িয়ে এসে আমাদের শুদ্ধ নিয়ে নিচে যাওয়ার উপক্রম করতেই ক্ষ্যামা দিলাম অসম্ভব এই প্রয়াসে। মানুষের সাধ্য নয় গুহা মুখ খুলে ওপরে উঠে যাওয়ার। ম্যাপল হোয়াইট বন্ধুকে নিয়ে যে পথে গেছিল, সে-পথে যাওয়া আর সম্ভব নয়।

নিঃসীম নৈরাশ্যে বাকরহিত হয়ে হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকার সুড়ঙ্গ বেয়ে নেমে এসে রওনা হলাম তাঁবু অভিমুখে।

গিরিবর্ত্মটা পেরিয়ে আসার আগে কিন্তু একটা ঘটনা ঘটেছিল। পরের আর একটা ঘটনার ভূমিকা স্বরূপ তার বিবরণ দিয়ে রাখি।

ফাটলটার তলায় গুহামুখ থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে এসে আমরা চারজনে মুখোমুখি দাঁড়াতেই ওপর থেকে আচমকা গড়গড়িয়ে নেমে এল বিশাল একটা পাথরের চাঁই—ভীষণ বেগে আমাদের পাশ দিয়ে ছিটকে নেমে গেল নিচে। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলাম বললেই হয়। কোত্থেকে এই উটকো উৎপাতের আগমন তা ঠাহর করতে পারলেও গুহার মুখে তখনও দাঁড়িয়ে থাকা দো-আঁশলা দুজন হেঁকে বললে পাথরটা ওদেরও পাশ কাটিয়ে গেছে—অতএব নিশ্চয় এসেছে চূড়ার ওপর থেকে। ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরপানে তাকিয়ে শীর্ষদেশ ছাওয়া ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে প্রাণের কোনো স্পন্দন কিন্তু দেখলাম না। কিন্তু পাথরটা যে আমাদেরকে টিপ করেই ফেলা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার মানে দাঁড়ায় একটাই—মানুষ আছে ওপরে এবং সে মানুষ জিঘাংসা-নিষ্ঠুর হিংস্র নির্মম।

মালভূমিতে মানুষ!

দ্রুত পা চালিয়ে সরে এলাম ফাটলের কাছ থেকে। ব্যাপারটা গভীর-ভাবে নাড়া দিয়ে গেল আমাদের। একে তো বাধার পর বাধা সৃষ্টি করে চলেছেন প্রকৃতি দেবী স্বয়ং, এরপর যদি মানুষও কোমর বেঁধে লাগে তো এ অভিযান ভণ্ডুল হবেই। তা সত্ত্বেও কিন্তু মাত্র কয়েকশ ফুট মাথার ওপরকার ঘন সবুজ বৃক্ষগুল্মাদি দেখবার পর মন কারো চাইলো না অভিযান শিকেয় তুলে রেখে লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার। রহস্যের এত কাছে এসে ভেতর পর্যন্ত না দেখে ফিরি কি করে!

শলাপরামর্শ করার পর ঠিক হল মালভূমি ঘিরে চক্কর মেরেই দেখা যাক না কেন। খাড়াই পাহাড়ের পাঁচিল তো এর মধ্যেই মোড় নিয়েছে পশ্চিম থেকে উত্তরে। এই হারে বাঁক নিতে থাকলে প্রাচীর পরিধি এমন কিছু বিরাট নয়। দিন কয়েক হাঁটলেই ফিরে যেতে পারবো যেখান থেকে শুরু করেছি সেইখানেই।

সেদিন হাঁটলাম বাইশ মাইল। অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটারে দেখলাম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছি। তাপমাত্রা আর উদ্ভিদ জগতও পালটেছে। পতঙ্গদের দুর্বিসহ ভয়ানক আক্রমণ আর নেই। দু একটা তালবৃক্ষ আর ফার্ণ-বৃক্ষ এখনও চোখে পড়ছে বটে, কিন্তু আমাজনীয় অরণ্যের সেই দাপট আর নেই। চেনা-জানা অনেক ফুলগাছও দেখলাম। একটা লাল বেগোনিয়া দেখে মনে পড়ে গেল ঠিক এই রঙের এই ফুল দেখে এসেছি স্ট্রেটহ্যামের বিশেষ একটা বাড়ীতে—কিন্তু আর নয়—একান্ত গোপনীয় স্মৃতি রোমন্থনের ঝোঁক পেয়ে বসছে আমাকে—সুতরাং ইতি এইখানেই।

মালভূমি পরিক্রমার প্রথম রজনীতে এমন একটা বিরাট ঘটনা ঘটল যে সন্দেহের ছিটে ফোঁটাটুকুও বাষ্প হয়ে উবে গেল মনের মধ্যে থেকে—বাস্তবিকই অসীম বিস্ময় ভরা এক অজ্ঞাত জগতের একদম গা ঘেঁসে অভিযান চলেছে আমাদের—এ বিষয়ে আর দ্বিমত নেই কারো মনে।

মিস্টার ম্যাকআর্ডল, এই কাহিনী পড়তে পড়তে আমার মতই নিশ্চয় হাড়ে হাড়ে বুঝছেন পত্রিকা এত খরচ করে আমাকে এখানে পাঠিয়ে ভালই করেছে। সত্যিই বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়োচ্ছি না আমরা। প্রফেসর ছাড়পত্র দিলেই এমন অপূর্ব রচনা দুনিয়ার সামনে উপস্থিত হবে যা কল্পনারও অতীত। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রমাণ নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত এই কাহিনী ছাপবার দুঃসাহস আমার নেই। সাংবাদিক জগতের মান্সহাউজেন ধাপ্পাবাজ হতে আমি চাই না। আপনিও নিশ্চয় চাইবেন না 'গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত এই এই অসম্ভব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ঠাট্টা-বিদ্রূপ-সমালোচনায় হাবুডুবু খেয়ে পত্রিকার এতদিনের সুনাম ক্ষুণ্ণ করুক। কাজেই অদ্ভুত এবং পরমাশ্চর্য যে ঘটনাটা জলন্ত শিরোনাম নিয়ে পত্রিকার কাটতি এবং আকর্ষণ যুগপৎ বৃদ্ধি করতে পারে রাতারাতি, আপাততঃ তা সম্পাদকের ড্রয়ারেই বন্দী থাকুক।

ঘটনাটা ঘটল কিন্তু বিদ্যুৎ বেগে—উপসংহার স্বরূপও আর কিছু ঘটল না—শুধু তিরোহিত হল আমাদের যাবতীয় অবিশ্বাস।

ঘটনাটা এই। শূয়ারের মত ছোট্ট প্রাণী একটা আজউতি গুলি করে আমাদের খানার বন্দোবস্ত করেছিলেন লর্ড জন। আধখানা ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে বাকী আধখানা আগুনে সেঁকছিলাম। শীতার্ত রাত। অগ্নিকুণ্ড ঘেঁসে বসে আছি চার মূর্তি। আকাশে চাঁদ নেই, তারার ছিটে কেবল দেখা যাচ্ছে। প্রান্তরের খানিকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে। আচম্বিতে নিশীথ রাত্রি বিদীর্ণ করে, তমিস্রার আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে হু—উ—উস্ করে কি যেন একটা নেমে এল এরোপ্লেনের মত। ক্ষণিকের জন্য আমরা সবাই ঢাকা পড়ে গেলাম কড়া চামড়ার ডানা আবৃত একটা চাঁদোয়ার তলায়। চকিতের জন্যে আমি দেখলাম লম্বাটে সাপের মত একটা গলা, ভীষণ দর্শন রক্তবর্ণ একজোড়া লোলুপ চক্ষু এবং দাঁতের সারি ঝকঝকে একটা বিরাট চঞ্চু— আমার পিলে চমকে গেল দংষ্ট্রা সহ সেই চঞ্চু দেখে এবং স্পষ্ট বুঝলাম হাঁ-করা চঞ্চু খপাৎ করে দাঁতের কামড় বসানোর জন্যে বড়ই ব্যাকুল। পর মুহূর্তেই উধাও হল রাতের বিভীষিকা—সেই সঙ্গে আমাদের রাতের খানাও। প্রায় বিশফুট চওড়া একটা বিপুল মসীকৃষ্ণ ছায়া ঝড়ের বেগে উঠে গেল গগন পানে। মুহূর্তের জন্যে বিপুল ডানায় আড়াল হয়ে গেল আকাশের নক্ষত্র। তারপরেই উড়ুক্কু আগন্তুক অদৃশ্য হয়ে গেল মাথার ওপরকার চোখাপাহাড়ের শীর্ষদেশে। নিবিড় বিস্ময়ে থ হয়ে বসে রইলাম আমরা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে—মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বার করতে পারলাম না। প্রথম কথা বললেন সামারলি।

আবেগ কম্পিত মন্দ্রমন্থর কণ্ঠে শুধু বললেন—'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আমাকে ক্ষমা করবেন। এতদিন যা ভেবেছি, সব ভুল। দয়া করে অতীত ভুলে যান।'

বললেন চমৎকার এবং সেই প্রথম হাতে হাত মেলালেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। স্বচক্ষে টেরোড্যাকটিল দর্শনের এইটাই আমাদের পরম লাভ। খানা লুঠ হয় হোক, এই দুজনকে টেরোড্যাকটিল যে মিলিয়ে দিতে পেরেছে এইটাই যথেষ্ট।

মালভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অস্তিত্ব থাকলেও কাতারে কাতারে নেই—কেন না পরের তিনটে দিন কারো ছায়াটুকুও দেখতে পেলাম না। এই তিনদিনে পেরিয়ে এলাম অনুর্বর পতিত জমি। কখনো দেখলাম পরিত্যক্ত পাথুরে মরু, কখনো দেখলাম খাঁ-খাঁ করছে জলাভূমি। বুনো মোরগ দলে দলে ঘুরছে জলায়। জায়গাটা সত্যিই দুর্গম। শক্ত পাথরের একটা আলসে না পেলে ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে আসতে

প্রায় বিশ ফুট চওড়া একটা বিপুল মসীকৃষ্ণ ছায়া ঝড়ের বেগে উঠে গেল গগন পানে। পৃঃ ১০৭

হত। বহুবার কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল আধা-নিরক্ষীয় জলার পাঁক আর কাদায়। গোদের ওপর বিষফোড়ার মত পুরো জলা অঞ্চলটায় থিক্ থিক্ করছে দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত বিষধর এবং হিংস্র জারাকাকা সাপে। এই জলা তাদের বংশবৃদ্ধির জায়গা। কতবার যে কাদার ওপর দিয়ে তারা ছিটকে এল আমাদের দিকে এবং কতবার যে শটগানের দৌলতে পার পেয়ে গেলাম আমরা, সে হিসেব দিতে গেলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে আপনার। যতদিন বাঁচব, ততদিন নিশীথ নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখব সেই সবুজ জলাটাকে—ঠিক যেন ফানেলের মত মাঝখানটা দেবে গেছে, শ্যাওলা সবুজ পাঁকের মধ্যে কিলবিল করছে দুর্দান্ত জারাকাকা সাপ। দেবে যাওয়া জায়গায় ঢালের ওপরেও কিলবিল করছে তারা দলে দলে। দেখলেই নাকক প্রথমেই তেড়ে এসে ছোবল মারে। গুলি করে আর কত মারা যায়? শেষকালে পাঁই পাঁই করে দৌড় লাগালাম। ছুটতে ছুটতে বেদম হয়ে গেলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম নলখাগড়ার মধ্যে তখনো ফণা তুলে আমাদের যেন টিটকিরি দিচ্ছে বিকট সরীসৃপ বাহিনী। সে দৃশ্য ভোলবার নয়। যে ম্যাপটা আঁকছি, তাতে জায়গাটার নাম দিয়েছি জারাকাকা জলা।

জলা পেরিয়ে আসার পর চোখা পাহাড়ের রঙ পালটে গেল। ছিল লালচে, হল চকলেট-বাদামী। শীর্ষদেশের গাছপালাও বিরল এবং বিক্ষিপ্ত। উচ্চতাও কমে এসেছে তিন-চারশ ফুটের বেশী নয়। কিন্তু গা বেয়ে ওপরে ওঠবার মত জায়গা পেলাম না কোথাও। প্রথম যেখানে এই পাহাড়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম—সেখানেও বরং গা বেয়ে ওঠা যায়—এখানে একেবারেই নয়। পাথুরে মরু থেকে খাড়াই পাঁচিলের মত অদ্ভুত এই পাহাড়ের ফটো নিয়েছিলাম। দেখলেই বুঝবেন হৃৎকম্প জাগানোর মত অঞ্চলই বটে।

এ-হেন পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করেছিলাম—'বৃষ্টির জল নিশ্চয় গড়িয়ে পড়ে কোনোখান দিয়ে—ওঠবার পথও থাকবে সেখানে।'

আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন—'ছোট্ট বন্ধুর ভাষা কিন্তু বেশ প্রাঞ্জল।'

'বৃষ্টির জল নামবার নালা নিশ্চয় আছে,' গোঁ ছাড়লাম না আমি।

'বাস্তবকে বেশ আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে ছোট্ট বন্ধুটি। অসুবিধে কেবল একজায়গায়। তন্নতন্ন করে দেখে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছি বৃষ্টি নামার জলের নালা পাহাড়ের গায়ে নেই কোথাও।'

'জলটা তাহলে যায় কোথায়?' আমার তখন রোখ চেপে গেছে।

'বাইরে গড়িয়ে যদি না পড়ে, তাহলে অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে জলটা যায় ভেতরে।'

'তাহলে মাঝে একটা লেক আছে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

সামারলি বললেন—'সম্ভবতঃ আগে ছিল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ—এখন হয়েছে লেক। পুরো মালভূমি আর পাহাড়ের পাঁচিলটাই তো দেখছি আগ্নেয়গিরির তাণ্ডবলীলার স্বাক্ষর বহন করছে সর্বাঙ্গে। আমার কিন্তু মনে হয় মালভূমির এই খাড়াই পাঁচিল ঢালু হয়ে বেরিয়ে এসে পড়ছে জারাকাকা জলায়।'

'জল উঠে যাওয়ার ফলেও লেকের জলের ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে,' চ্যালেঞ্জারের এই অভিমত ব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই মহামহোপাধ্যায় আবার শুরু করে দিলেন বৈজ্ঞানিক বাদাম্বুবাদ—যা চৈনিক ভাষার মতই দুর্বোধ্য এই অধমদের কাছে।

ষষ্ঠদিনে ভগ্নহৃদয়ে ফিরে এলাম প্রথম তাঁবুর জায়গায়। মালভূমি পরিক্রমাই সার হল। ওঠবার জায়গা কোথাও পেলাম না। ম্যাপল হোয়াইট বন্ধুকে নিয়ে তীরচিহ্নিত যে পথে উঠেছিল, সে-পথ তো এখন বন্ধ।

কি করা যায় এখন? খাবারদাবার আর গুলিবারুদ যথেষ্ট আছে ঠিকই, কিন্তু একদিন তা ফুরোবেই। দু-মাস পরে বর্ষা নামলে আমরা বন্যায় ভেসে যাব। বারুদ ফুটিয়ে অথবা গাঁইতি মেরে পাথর ফুটো করে নেওয়ার মত সরঞ্জামও আমাদের কাছে নেই—তাছাড়া ও পাথর যা শক্ত, ফুটো করা চাট্টিখানি কথা নয়। ফলে, নীরবে সবাই রাতের খানা খেলাম। বিষাদাচ্ছন্ন মনে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে 'গুড নাইট' জানাতে গিয়ে দেখলাম তিনি বিশাল একটা ব্যাঙের মত চিৎপটাং হয়ে দু-হাতে মাথা ন্যস্ত করে গভীর চিন্তা করছেন—আমার শুভেচ্ছা কানেও ঢুকল না।

পরেরদিন সকালে কিন্তু একেবারে অন্য এক চ্যালেঞ্জার হৈ-হৈ করে শুভেচ্ছা জানালেন আমাদের। আগের রাতের অবনত-মস্তক বিষাদ-মলিন চ্যালেঞ্জারের জায়গায় দেখলাম আত্মতুষ্টি আর আত্ম-প্রশস্তিতে স্ফীত চির-পরিচিত সেই চ্যালেঞ্জারকে—ঝলমল করছেন যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত। প্রাতরাশ খেতে খেতে দুই চোখের ছদ্ম-বিনয়ের ফুলঝুরি ছড়িয়ে নীরব ভাষায় যেন বলে গেলেন—'জানি জানি, তোমাদের মনের কথা আমি জানি—কিন্তু সবুরে মেওয়া ফলে এই কথাটি কেবল মনে রেখো—খামোকা চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে আমাকে চটিয়ে দিও না।' ঠিক এই ধরনের

চেহারায় উনি যদি নিজেকে কল্পনায় দাঁড় করাতে পারতেন ট্রাফালগার স্কোয়ারে—লণ্ডন শহরের পথঘাটের বিভীষিকা বৃদ্ধি করা যেত নতুন করে।

কালো দাড়ি ভেদ করে ঝকঝকে চকচকে দাঁতির সারি মেলে ধরে বললেন অবশেষে—'ইউরেকা! জেন্টলমেন, সবাই মিলে আমাকে অভিনন্দন জানান আগে—তারপর অবশ্য আমিও জানাবো আপনাদের। সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

'ওপরে ওঠার রাস্তা পেয়ে গেছেন?'

'বুক ঠুকে তা বলতে পারি বৈকি।'

'কোথায়?'

উত্তর দিলেন আঙুল তুলে গির্জের চূড়ার মত ডানদিকের দলছাড়া পাহাড়টা দেখিয়ে।

চোয়াল ঝুলে পড়ল প্রত্যেকেরই—আমার তো বটেই। চ্যালেঞ্জার সাহেব তো বলে খালাস ঐ পথই ওপরে ওঠার পথ—কিন্তু উঠবটা কি করে? উপত্যকা আর ঐ সৃষ্টি ছাড়া শঙ্কু-পর্বতের মাঝখানে বিরাজ করছে ভয়াবহ সেই খাদ!

খাবি খেতে খেতে তাই বলেই ফেললাম—'খাদ পেরোনো সম্ভব নয়—কোনো দিনই না।'

চ্যালেঞ্জার বললেন—'বাপু হে, ওপরে উঠতে দোষ কী? তারপর দেখিয়ে দেব হরেক রকম উপায়-উপাদানে ঠাসা এই মগজটা এখনো খালি হয়ে যায়নি।'

প্রাতরাশ সাদ করে পর্বতারোহণের সরঞ্জাম বোঝাই বাণ্ডিলটা খুললাম। ভেতর থেকে বেরুলো দেড়শ ফুট লম্বা খুব শক্ত আর হাল্কা দড়ি, হুক, আঁকশি, এবং অন্যান্য সামগ্রী। লর্ড জন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। এ অভিজ্ঞতা সামারলির জীবনেও কয়েকবার ঘটেছে। অনভিজ্ঞ কেবল আমি একা। কিন্তু আমার দৈহিক শক্তি আর তৎপরতা দিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করে নেওয়া যাবে।

কাজটা বস্তুত: খুব একটা কঠিন নয়—যদিও মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছিল যে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গিয়েছিল। প্রথম আধখানা উঠে এলাম সহজেই। তারপর থেকেই পাহাড়ের গা খাড়া হয়ে যেতে লাগল একটু একটু করে এবং শেষের পঞ্চাশফুট তো একেবারেই দুরারোহ মনে হল আমার কাছে। কিন্তু বলিহারি যাই প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে। অমন একখানা বদখৎ গতর নিয়ে কোনো প্রাণী যে সর সর করে টিকটিকির

মত পাহাড়ের পাঁচিল বেয়ে উঠে যেতে পারে, না দেখলে তা প্রত্যয় হয় না। ভাগ্যিস উনি উঠেছিলেন, নইলে আমাদের ঐখান থেকেই মুখ চুন করে নেমে আসতে হত। ওপরে উঠে গিয়ে দড়িটা পেঁচিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন শীর্ষ-দেশের একটি মাত্র সুবৃহৎ সেই বৃক্ষটির গুঁড়ির গায়ে। সেই দড়ি ঝুলিয়ে দিতে পায়ের আঙুল আর হাতের আঙুল পাহাড়ের গায়ে টিপে ধরে কোন মতে সবাই উঠে এলাম ওপরকার ঘাসছাওয়া মঞ্চে। ছোট্ট ঘেসো প্লাটফর্ম চুদিকে পঁচিশফুট করে বিস্তৃত। পর্বত চূড়া বলতে এইটুকুই।

ওঠবার পর বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম ফেলে আসা পেছনকার নিসর্গ দৃশ্যের দিকে। অসাধারণ সেই চিত্র বাঁধিয়ে রাখবার মত। পুরো ব্রেজিলীয় প্রান্তরখানা পড়ে রয়েছে পায়ের তলায়। দূর হতে দূরে বিস্তৃত হয়ে মিলিয়ে গেছে আবছা নীল কুয়াশার মত আরো দূরের দিগন্তে। এক-দম পায়ের তলা থেকে নুড়ি-ছাওয়া ফার্ণ চিহ্নিত ঢালু প্রান্তর; আরো দূরে মাঝামাঝি জায়গায় পাহাড়ের গায়ে সেই হলুদ বাঁশবনের আভাস, তারপর থেকেই গাছপালা নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে ঘন বনানীর আকারে বিস্তৃত থাকা দু-হাজার মাইল—দৃষ্টিসীমার বাইরে।

মণ্ডলাকারে বিস্তৃত অত্যাশ্চর্য এই দৃশ্যপট-সুধা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে পান করছি যখন, কাঁধের ওপর ভারী হাতখানা রেখে বললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—'এদিকে তাকাও ছোট্ট বন্ধু। পেছনে কখনো তাকিও না—দৃষ্টি রাখবে সব সময় সামনের উজ্জ্বল লক্ষ্যবস্তুর দিকে।'

দেখলাম, মালভূমির মাথা আর এই পর্বত শীর্ষের মঞ্চের মাথা একেবারে সমান সমান—একই লেভেল। মালভূমির ওপরকার ঘন গুল্মাদি এত সুস্পষ্ট যে এইটুকু ব্যবধান ডিঙিয়ে ওখানে পৌঁছতে পারব না ভাবতেও অদ্ভুত লাগে। এইটুকু ব্যবধান বলতে যা বললাম, তার বিস্তার অবশ্য কম সে কম চল্লিশ ফুট—ডাইনে বাঁয়ে তা বিস্তৃত কম করেও চল্লিশ মাইল পর্যন্ত। গুঁড়িটা এক-হাতে আঁকড়ে ধরে ঝুঁকে পড়ে পুতুলের মত ছোট্ট ছোট্ট ইণ্ডিয়ানদের কালো মূর্তিগুলো দেখতে পেলাম। সামনের খাদটা কিন্তু সাংঘাতিক খাড়াই। দেখলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

প্রফেসর সামারলির ক্যাটকেটে কড়মড়ে কণ্ঠস্বর শোনা গেল কানের কাছে—'অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত!'

ফিরে তাকিয়ে দেখি যে গাছটা বাহু দিয়ে আঁকড়ে আছি, প্রফেসর সামারলি সাগ্রহে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। মসৃণ ছাল আর ছোট ছোট শিরওলা পাতাগুলো আমার খুব চেনা লাগল।

সবিস্ময়ে বলেও ফেললাম—'আরে! এ যে বাচ গাছ!'

'একেবারে ঠিক,' সায় দিলেন সামারলি। 'দূরদেশের অন্ততঃ একজন জ্ঞাতিভাইয়েরও সন্ধান পাওয়া গেল।'

চ্যালেঞ্জার বললেন—'মাই গুড স্যার, শুধু জ্ঞাতিভাই-ই নয়, আপনার তুলনাটাকে ব্যাপকতর করার অনুমতি যদি দেন তো বলব—আমাদের পয়লা নম্বর স্যাঙাৎও বটে। কেন না, এই বাঁচ গাছটাই মুশকিল আসান করবে এখন আমাদের।'

'আরে সর্বনাশ!' সোল্লাসে গগনভেদী চিৎকার ছাড়লেন লর্ড জন—'ব্রীজ!'

'এগজ্যাক্টলি, মাই ফ্রেণ্ডস্! ব্রীজ! সেতু! অকারণে কাল রাতে পরিস্থিতিটা নিয়ে একটা ঘন্টা ব্যয় করিনি, মনটা ফোকাস করেছিলাম এই গাছের ওপরেই। আমার এই ছোট্ট বন্ধুটিকে আগে একবার বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয় যে আসল ভি-ই-সি ফুটে বেরোয় যখন তাকে কোণঠাসা করা যায়। কাল রাতে আমরা প্রত্যেকেই কোণঠাসা অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু বুদ্ধিশক্তি আর ইচ্ছা শক্তি যদি হাতে হাত মিলিয়ে চলে, সব সমস্যার সমাধান করা যায়। খাদের এই ফাঁকটুকু পেরোনোর জন্যে দরকার একটা কাঠের টানা পোলের। ঐ দেখুন সেই পোল।'

আইডিয়াটা ব্রিলিয়ান্ট নিঃসন্দেহে। গাছটা কম করেও ষাট ফুট উঁচু। ঠিক মত ফেলতে পারলে অনায়াসেই ওপারে গিয়ে পড়বে। পাহাড় বেয়ে ওঠবার সময়ে কুড়ুল কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন চ্যালেঞ্জার। এখন তা সমর্পণ করলেন আমার হাতে।

বললেন—'ছোট্ট বন্ধুটির হাড়ে-মাসে ভেল্কি খেলে। এ কাজ ওকেই মানাবে। তবে খুব সাবধান, নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেও না—ঠিক যে রকমটি বলব, তাই করবে।'

আমার বয়ে গেছে, নিজের ইচ্ছেমত কুড়ুল চালাতে—ঠিক যে রকমটি বললেন, সেইভাবে কোপের পর কোপ মেরে গেলাম গুঁড়ির গোড়ায়। এমনিতেই গাছটা হেলে ছিল খাদের দিকে। তলার কাঠে কুড়ুল মেরে খসিয়ে আনতে সেই দিকেই হেলতে লাগল একটু একটু করে। লর্ড জন পালা বদল করলেন আমার সঙ্গে। এক ঘন্টার একটু বেশী সময় লাগল। মড়মড় শব্দে ষাট ফুট লম্বা গাছটা গিয়ে পড়ল খাদের ওপর দিয়ে ওপারে—এপারে কাটা গুঁড়িটা গড়িয়ে গেল কিনারা পর্যন্ত—দম আটকে এল আমাদের—আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি গেলেই আমাদের সব আশাই ফর্সা হয়ে যাবে

যে। কিন্তু না—ঐ কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান বজায় রেখেই কিনারা ঘেঁসে স্তব্ধ হল গুঁড়ি—রচনা করে দিল অজ্ঞাত জগতে প্রবেশের আজব সেতু।

একটি কথাও না বলে প্রত্যেকে একে একে করমর্দন করলাম চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে—উনিও প্রতিবার স্ট্র-হ্যাট খুলে মাথা দুলিয়ে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানালেন আমাদের।

বললেন—'অজ্ঞাত জগতে প্রথমে পা রাখার কৃতিত্ব দাবী করছি আমি—পরে ঐতিহাসিক ছবি আঁকবার উপযুক্ত উপাদান হয়ে থাক আমার প্রথম পদার্পণ।'

বলে যেই পা বাড়িয়েছেন ব্রীজের দিকে, অমনি পেছন তাঁর কোট টেনে ধরলেন লর্ড জন।

বললেন—'মাই ডিয়ার চ্যাপ, আমি তাতে রাজী নই।'

'রাজী নন!' বলতে বলতে বিরাট মাথাটা হেলে পড়ল পেছনে, বিশাল আসীরিয় দাড়ি উদ্ধত হল সামনে।

'বিজ্ঞানের দপ্তরে আপনার নেতৃত্ব মে.ন নিয়েছি—কেন না আপনি বিজ্ঞান জানেন, কিন্তু আমার দপ্তরে আপনাকে আমার নেতৃত্ব মানতে হবে।'

'আপনার দপ্তর!'

'আমরা প্রত্যেকেই যে-যার নিজের পেশায় দক্ষ। লড়াই করাটাও আমার পেশা। ঢুকতে যাচ্ছি একটা সম্পূর্ণ নতুন দেশে—অনেক রকমের বিপদ আপদ ওৎ পেতে থাকতে পারে যেখানে। অন্ধের মত অসহিষ্ণু-ভাবে সহজ বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাওয়ার রণ-কৌশলে আমি অভ্যস্ত নই।

যুক্তিটা অতিশয় সঙ্গত—অগ্রাহ্য করা যায় না কোন মতেই। মাথা দুলিয়ে বৃষস্কন্ধ ঝাঁকিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন—'বেশ তো, মতলবটা কি খুলে বলুন না।'

ব্রীজের ওপারে চোখ রেখে বললেন লর্ড জন—'যদ্দুর মনে হয় একদল নরখাদক ওপারে ঝোপের মধ্যে ওৎ পেতে রয়েছে দুপুরের খাওয়ার থালা সাজিয়ে। কড়া চাপানোই আছে—আমরা গেলেই হয়। কাজেই যতক্ষণ না নিশ্চিন্ত হচ্ছি এ ব্যাপারে, সত্যিই কোনো উৎপাত আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে কিনা যতক্ষণ না তা জানতে পারছি, ততক্ষণ ধরে নেওয়া যেতে পারে বিপদ নিশ্চয় আছে ওপারে। ম্যালোন আর আমি আবার নামব নিচে। চারটে রাইফেল, গোমেজ আর তার স্যাঙাৎটাকে নিয়ে উঠে আসব। তারপর একজন যাবে ওপারে,

বাকী সবাই এপার থেকেই রাইফেল বাগিয়ে তাকে আগলাব। চার দিক দেখে শুনে সে যদি বলে সব ঠিক হ্যায়—তখনি বাকী তিনজনে পেরিয়ে যাব ব্রীজ।'

কাটা গুঁড়িটার ওপর ধপাস করে বসে পড়ে গ্যাঁই গুঁই করতে আরম্ভ করলেন চ্যালেঞ্জার। আর যে তর সইছে না তাঁর। আমি আর সামারলি এ ধরনের বাস্তব কর্মপন্থার ব্যাপারে একবাক্যে লর্ড জনকেই নেতা বলে মেনে নিলাম। খাড়াই পাহাড়ের সবচেয়ে এবড়োখেবড়ো দিক বরাবর দড়িটা ঝুলে থাকার ফলে পর্বতারোহণ এখন আর তেমনি কষ্টকর মনে হল না। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই শটগান আর রাইফেলগুলো নিয়ে উঠে এলাম চুড়োয়। দো-আঁশলা দুজনও লর্ড জনের নির্দেশ মত গাঁটরীভর্তি খাবার দাবার বয়ে নিয়ে এল ওপরে—বলা তো যায় না কদ্দিন থাকতে হবে—খাবারের সংস্থান থাকা ভালো। কার্তুজের মালা ঝুলতে লাগল আমাদের দুজনের সারা গায়ে।

সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার পর বললেন লর্ড জন—'চ্যালেঞ্জার, একান্তই যদি অজ্ঞাত জগতে প্রথম পদার্পণের সম্মান গ্রহণ করতে চান, তাহলে এগোতে পারেন।'

চ্যালেঞ্জার তখন রাগে ফুটিফাটা হয়ে রয়েছেন। কারও খবরদারি সইবার ধাত তো তাঁর নেই। সহিষ্ণুতার বাঁধ যখন এই ভাঙে সেই ভাঙে অবস্থায় পৌঁছেছে, ঠিক তখনি লর্ড জনের প্রস্তাব শোনা মাত্র ভিসুভিয়াসের চূড়া উড়ে গেল যেন।

'আপনার অশেষ দয়া আর এই অনুমতির জন্যে কৃতার্থ বোধ করছি। পারমিশান দেওয়ার মত মহত্ত্ব যখন দেখিয়েছেন, তখন এ ব্যাপারে অগ্রণী হওয়ার সুযোগ আমি গ্রহণ করলাম।'

গুঁড়ির দুপাশে পা ঝুলিয়ে বসে হপাৎ হপাৎ করে বসে বসেই লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার—কুডুলটা ঝুলতে লাগল কাঁধে। অপর পারে পৌঁছেই হাঁচড় পাঁচড় করে উঠে পড়লেন মালভূমি-শীর্ষে এবং দু-হাত নাড়তে লাগলেন মাথার ওপরে।

'এসে গেছি! এসে গেছি!'

একেবারেই ছেলেমানুষ!

এর পরেই রওনা হলেন সামারলি। অস্থিসার ছিবড়ে-মার্কা শরীরটার আগাগোড়া যেন তার দিয়ে তৈরী। প্রাণশক্তিতে ঠাসা। কারো কথা না শুনে পিঠে ঝুলিয়ে নিলেন একজোড়া রাইফেল—অজ্ঞাত দেশে

যেন দুই প্রফেসরই সমান সশস্ত্র থাকতে পারেন। তারপর গেলাম আমি। ভয়ের চোটে পায়ের তলায় ব্যাদিত গভীর খাদটার দিকে চাইবার সাহসও হল না। সামারলি রাইফেলের কুঁদো বাড়িয়ে ধরতেই খপাৎ করে চেপে ধরে উঠে পড়লাম মালভূমিতে। লর্ড জন এলেন হেঁটে। হ্যাঁ, সটান হেঁটেই চলে এলেন—কোনো কিছু না ধরেই! বাস্তবিকই লৌহ-স্নায়ুর অধিকারী।

ম্যাপল হোয়াইট আবিষ্কৃত অজ্ঞাত দেশে চার মূর্তি মুখোমুখি দাঁড়ালাম—এই সেই স্বপ্নের দেশ। সেই মুহূর্তের বিপুল বিজয়ানন্দকে চরম বিপর্যয় যে এ-ভাবে গ্রাস করবে, তখন কিন্তু কেউ তা কল্পনাও করতে পারিনি। সংক্ষেপে বলা যাক দুর্দৈব ঘনিয়ে এল কি ভাবে।

কিনারা থেকে পঞ্চাশ ফুটের মত ভেতর দিকে যেতে না যেতেই একটা ভয়ংকর দুমদাম মড়মড় মড়াৎ শব্দ শুনলাম পেছনে। পলকের মধ্যে ছুটে এলাম কিনারায়। দেখলাম, ব্রীজটা নেই!

অনেক নিচে পাহাড়ের গোড়ায় দেখলাম ডালপালাসমেত ভাঙাচোরা বীচগাছটাকে। শাখা এবং গুঁড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পিছলে পড়ে গেল নাকি? প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। তার পরেই শঙ্কুর মত পর্বত চূড়ার ওদিক থেকে বেরিয়ে এল একটা মুণ্ড—দো-আঁশলা গোমেজের মুণ্ড। কিন্তু সেই বিনীত হাসি আর নেই—মুখোশের মত মুখে গনগনে দুই চোখে দেখলাম উৎকট উল্লাস—প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ বিকৃত করে তুলেছে সর্ব অবয়বকে।

বললে চিৎকার করে—'লর্ড জন রক্সটন! লর্ড জন রক্সটন!'

'এই তো আমি!'

উন্মত্ত অট্টহাসি ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির লহরী তুলে দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল খাদের মধ্যে।

'ইংরেজ কুত্তা—ঐ খানেই থাক এখন থেকে। সুযোগ খুঁজছিলাম এত বছর ধরে—এবার তা পেয়েছি। উঠতে জিভ বেরিয়ে গেছিল—প্রাণটা বেরিয়ে যাবে নামবার সময়ে। মূর্খের দল! নরকের কীট! দল শুদ্ধ ফাঁদে ফেলেছি তোদের!'

বিষম হতভম্ব হয়ে যাওয়ায় কেউ কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে রইল হতবাক পুতুলের মত। ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা একটা বড় ভাঙা কাঠ দেখে বুঝলাম কিসের চাড় মেরে গুঁড়িটাকে গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে খাদের মধ্যে। অদৃশ্য হয়ে গেছিল মুখখানা, ক্ষণপরেই

তার পুনরাবির্ভাব ঘটল—আগের চাইতেও ক্ষিপ্ত, বিকৃত, উৎকট, বিকট!

বললে গলার শির তুলে বীভৎস স্বরে—'গুহা থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়েছিলাম আমরাই—এক চুলের জন্যে বেঁচে গেছিলি। এখন কিন্তু মৃত্যুটা হবে আরো ভালো ভাবে—তিলতিল করে, আরো ভয়ংকর ভাবে। তোদের হাড়গুলো সাদা হয়ে পড়ে থাকবে—কেউ জানতেও পারবে না আছিস কোন্ চুলোয়—হাড় দেখতেও কেউ আসবে না। মরবার সময়ে লোপেজের কথাটা একবার মনে করে নে রে ইংরেজ কুত্তা! পাঁচ বছর আগে পুটোমায়ো নদীর ওপর যাকে গুলি করে মেরেছিলি—আমি তারই মায়ের পেটের ভাই—এতদিনে শোধ নিলাম।' শূন্যে মুষ্টি আন্দোলিত হল একবার, তারপর আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

দো-আঁশলা হারামজাদা যদি শুধু প্রতিহিংসা নিয়েই চম্পট দিত, তাহলে পরিণতিটা এতটা নাটকীয় হত না। মূর্খের মত ল্যাটিন অহমিকায় মত্ত হয়ে নাটক করতে গিয়ে ডেকে আনল নাটকীয় ক্লাইম্যাক্স। তিন দেশে যিনি 'ঈশ্বরের ডাণ্ডা' নামে পরিচিত, সেই লর্ড জন রক্সটনকে বিদ্রূপ করে এত সহজে পার পাওয়া যায় না। দড়ি ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে যখন নেমে যাচ্ছে গোমেজ, লর্ড রক্সটন তখন মালভূমির কিনারা বরাবর দৌড়োচ্ছেন। পাহাড়ের গোড়ায় গোমেজকে দেখতে পেয়েই উনি রাইফেল তাগ করলেন। ক্লিক শব্দটাই কেবল শুনলাম—আর কিছু দেখলাম না। কানে ভেসে এল কেবল একটা মরণ-আর্তনাদ আর ধুপধাপ দুমদাম করে লাশ গড়িয়ে যাওয়ার একটা শব্দ। গ্র্যানাইট-কঠিন মুখে ফিরে এলেন লর্ড জন।

বললেন তিক্ত স্বরে—'দোষটা আমারই। আহাম্মকের মত কাজ করে ফেলেছি। আমার জানা উচিত ছিল এরা কিছু ভোলে না—রক্তের বদলে রক্ত নেয়। আরও পাহারার বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল।'

'আর এক ব্যাটা গেল কোথায়? দুজনে মিলে চাড় না দিলে গুঁড়ি তো ফেলা যেত না।'

'ছেড়ে দিলাম। হয় তো ও নির্দোষ। গুলি করলেও হত, হাত তো লাগিয়েছিল।'

অনেক রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল এই ঘটনার পর। তাঁবুতে গোমেজ কেন আড়ি পেতেছিল, কেন বিদ্বেষ বিষ মাখানো চোখে আমাদের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে ধোঁকায় ফেলেছিল প্রত্যেককেই—সব বোঝা গেল। এই সব নিয়েই কথা বলছি, এমন সময়ে আকৃষ্ট হলাম আর একটা অত্যাশ্চর্য

দৃশ্যের দিকে।

যেন স্বয়ং কালান্তক যম পেছনে ধাওয়া করেছে, এমনিভাবে প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছে সাদা পোশাক পরা একটা লোক—দো-আঁশলা স্যাঙাৎটা নিঃসন্দেহে। ঠিক পেছনেই আবলুস-দেহী প্রকাণ্ড একটা লোক তাড়া করেছে তাকে—বিশ্বস্ত অনুচর জাম্বো। দো-আঁশলার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জাম্বো, দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে দুজনেই গড়িয়ে গেল মাটিতে। পরক্ষণেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সোল্লাসে আমাদের দিকে হাত নাড়তে লাগল জাম্বো—ভূমিশয্যা থেকে কিন্তু আর উঠে দাঁড়ালো না বিশ্বাসঘাতক দো-আঁশলাটি।

ধরণী থেকে বিদায় নিল দুজন বিশ্বাসঘাতকই। কিন্তু আমাদের রেখে গেল এমন এক জায়গায় যেখান থেকে আর পরিত্রাণ নেই। ছিলাম সভ্য দেশের মানুষ, এখন থেকে হলাম মালভূমির বাসিন্দা। সুগভীর বিশাল চওড়া ঐ খাদ টপকে যাওয়ার কোনো উপায় মানুষ আর বার করতে পারবে না। প্রান্তরে পৌঁছোলে জঙ্গল ঠেঙিয়ে নদী বেয়ে সভ্য দুনিয়ায় ফেরা যেত—কিন্তু প্রান্তরে নামার পথই তো নেই। একটিমাত্র ঘটনার ফলে বিপন্ন হল আমাদের অস্তিত্ব।

এই রকম সংকটেই আরো ভালভাবে চিনলাম আমার তিন সঙ্গীকে—তাঁরা যে কি ধাতুতে নির্মিত, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। গম্ভীর তিনজনেই—কিন্তু তপোবনের ঋষির মত ধীর, স্থির, প্রশান্ত। ঝোপের মধ্যে চারজনে বসে রইলাম জাম্বোর প্রতীক্ষায়। অচিরেই তার কালো বিশ্বস্ত মুখখানা বেরিয়ে এল পাথরের ফাঁক দিয়ে—চূড়ায় আবির্ভূত হল মসীকৃষ্ণ হারকিউলিস বপু।

'বলুন, হুজুর, বলুন এখন কি করব আমি।'

প্রশ্নটা সোজা, উত্তরটা কঠিন। তবে সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের একমাত্র সংযোগসূত্র এখন সে-ই, সুতরাং তার যাওয়া চলবে না।

'না, না, আমি যাবো না। এখানেই থাকবো—যাই হোক না কেন, আমি যাচ্ছি না। তবে ইণ্ডিয়ানদের আর ধরে রাখা যাবে না। ভয় পেয়েছে। বলছে, কুরুপুরি আছে। হুকুম করুন, ওদের ছেড়ে দিই।'

চেঁচিয়ে বললাম—'জাম্বো, কাল পর্যন্ত আটকে রাখো। আমার একখানা চিঠি নিয়ে যাবে।'

'ভেরী গুড, স্যার। তাই হবে—ওরা থাকবে। কিন্তু আমি কি করব আপনাদের জন্যে?'

করবার তো অনেক কিছুই আছে। একান্ত অনুগতের মত তার সবই করে গেল জাম্বো। প্রথমেই আমাদের নির্দেশ মত দড়িটা গুঁড়ি থেকে খুলে নিল —একটা প্রান্ত ছুঁড়ে দিলে এপারে আমাদের দিকে। হাল্কা দড়ি তো, কিন্তু বিলক্ষণ মজবুত, ব্রীজ হিসেবে ব্যবহার করতে না পারি, পর্বতারোহণের কাজে অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। দড়ির অপর প্রান্তে খাবারদাবারের প্যাকেট বেঁধে দিতেই টেনে নিয়ে এলাম এপারে। হপ্তাখানেক এখন নতুন খাবার না পেলেও পেটপূজা বন্ধ থাকবে না। আবার নেমে গিয়ে ওপরে নিয়ে এল কিছু গুলিবারুদ আর জামাকাপড়—দড়িতে বেঁধে টেনে আনলাম এপারে। সন্ধ্যে নাগাদ নেমে গেল ইণ্ডিয়ানদের কাল সকাল পর্যন্ত ধরে রাখার জন্যে।

মালভূমিতে আমার প্রথম রজনী অতিবাহিত হল লেখা নিয়ে। সারারাত ধরে লিখলাম এই কাহিনী একটিমাত্র মোম-লণ্ঠনের আলোয়।

খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছিলাম মালভূমির কিনারাতে বসেই। দু-বোতল অ্যাপোলিনারিস মিটিয়েছিল তৃষ্ণা। জলের খোঁজ করা একান্তই দরকার। কিন্তু লর্ড জনের মত পুরুষও একদিনের এই অ্যাডভেঞ্চারে কাহিল হয়ে পড়েছেন। কারোরই ইচ্ছে নেই রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত দেশের গভীরে প্রবেশ করার। আগুন জ্বালানোর সাহস হল না—আওয়াজ পর্যন্ত করলাম না।

ভোর হতে চলেছে। এখনও লিখছি। অজ্ঞাত দেশে এবার ঢুকবো। জানি না আর লেখবার সুযোগ পাবো কিনা। ইণ্ডিয়ান দুজনকে এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে—জাম্বো ওদের আগলে রেখেছে। আশা করি এ চিঠি ওদের হাতে ঠিক জায়গায় পৌঁছোবে।

পুনশ্চ—যতই ভাবছি ততই দেখছি পরিস্থিতি অতীব সঙীন। ফেরবার কোনো সম্ভাব্য পথ আর নেই। মালভূমির কিনারায় আর একটা উঁচু গাছ থাকলে না হয় আর একটা পোল বানিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু পঞ্চাশ গজের মধ্যে তেমন কোনো গাছ তো দেখছি না। চারজনে মিলে সে-রকম একটা গুঁড়ি বয়ে আনার ক্ষমতাও আমাদের নেই। দড়িটাও খাটো—দড়ি ধরে নেমে যাওয়ার আশা তাই বাতুলতা। না, না, কোনো আশাই আর দেখছি না—নৈরাশ্যের তমিস্রা-নিমজ্জিত হয়ে সমাপ্ত করলাম এই চিঠি—বোধহয় আমার শেষ চিঠি।

১০ ॥ অত্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনার পর ঘটনা

অত্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল, এখনও ঘটছে এবং আরো ঘটবে বলেই আমার বিশ্বাস। অঘটনও বলা যায়। চিত্তি চড়কগাছ হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা। কাগজ বলতে আমার কাছে রয়েছে এখন পাঁচটা পুরোনো নোটবই আর একগাদা আজেবাজে ছেঁড়া কাগজ। লেখনীর মধ্যে তো একখানা স্টাইলোগ্রাফিক পেন্সিল। লেখার এই সামান্য সরঞ্জাম দিয়েই লিখে যাব অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যতক্ষণ হাত চলে—তা নাহলে ভুলে যেতে পারি এবং যেহেতু সভ্যমানুষের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আশ্চর্য এইসব ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী শুধু আমরাই, সুতরাং অমোঘ নিয়তির করাল খপ্পরে আমরা নিকেশ হয়ে যাওয়ার আগেই সব কিছুর ধারাবাহিক বিবরণের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে বৈকি। জাম্বো-ই নিয়ে যাক এই চিঠি, কি আমিই কোনো রকমের অলৌকিক পন্থায় সঙ্গে নিয়ে যাই পত্ররাশি, অথবা ডেয়ার ডেভিল কোনো অভিযাত্রী মনোপ্লেনে এসে তুলে নিয়ে যাক পাণ্ডুলিপির এই বাণ্ডিল—লিখে আমি যাবোই। কেন না, আমি তো বুঝতেই পারছি নির্জলা অ্যাডভেঞ্চারের ধ্রুপদী দলিল হিসেবে এ লেখা অমর হয়ে থাকবে পৃথিবীর ইতিহাসে।

শয়তান-সহচর গোমেজের বিটলেমির ফলে যে রাতে মালভূমিতে আটকা পড়লাম আমরা, তার পরের দিন সকাল থেকে সম্মুখীন হয়ে চলেছি নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার। শুরু হয়েছে বিচিত্র বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার মহা-পর্ব। প্রথম ঘটনাটা তেমন কিছু নয়, কাজেই ঘটনাস্থলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। সারারাত কলম চালনা করার পর ভোরের দিকে তন্দ্রার মত এসেছিল। এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠতেই চোখ পড়ল পায়ের ওপর। ট্রাউজার্স সরে গিয়ে পায়ের খানিকটা বেরিয়ে পড়েছিল। মোজার ওপর ইঞ্চি কয়েক অনাবৃত চামড়ার ওপর সেঁটে থাকতে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা বেগুনি রঙের আঙুর। দেখেই তো চক্ষু চড়কগাছ আমার। হেঁট হয়ে যেই তুলে ফেলতে গেছি অমনি আমার তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মধ্যেই ফট্ করে ফেটে গেল আঙুর সদৃশ বস্তুটা এবং সভয়ে দেখলাম ফিনকি দিয়ে টকটকে লাল রক্ত ছড়িয়ে গেল চারদিকে। বিকট চিৎকার করে উঠতেই দৌড়ে এলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন সামারলি—'ইন্টারেস্টিং! অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং! এত বড় রক্তপায়ী কীট কখনো দেখিনি—জীব জগতের ইতিহাসে এর শ্রেণী বিভাগও হয়নি আজ পর্যন্ত।'

পাণ্ডিত্যাভিমান দেখানোর সুযোগ পেলে চ্যালেঞ্জার কখনো ছাড়েন না। অমনি স্বভাবসুলভ বজ্রনাদে মন্তব্য করলেন—'এত পরিশ্রমের প্রথম সার্থক ফলটা তাহলে পাওয়া গেল। *Ixodes Maloni* নামকরণ করা যাক জোঁকটার। ছোট্ট বন্ধু, সামান্য একটু কামড় বই তো নয়, অসুবিধে একটু হল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তোমার নামটাও যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেল প্রাণীবিজ্ঞানের মৃত্যুহীন ইতিহাসে—গৌরবোজ্জ্বল এই সুযোগ দানের জন্যে পোকাটাকে তোমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে ক্ষণিক আত্মতুষ্টির প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলে না—এমন সূক্ষ্ম নমুনাটাকে পিষে খতম করে দিলে!'

'জঘন্য কৃমি কীট কোথাকার!' বললাম ঘৃণিত কণ্ঠে।

প্রতিবাদস্বরূপ বিশাল ভুরুযুগল উর্ধ্বে উত্তোলন করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং সান্ত্বনা সূচক একখানা থাবা রাখলেন আমার স্কন্ধে।

বললেন—'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তির চর্চা করো হে, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা পৃথক করে নিতে শেখো। আমার মত দার্শনিক মেজাজী মানুষের কাছে ছুরির মত ধারালো শুঁড়ওয়ালা আর বেলুনের মত ফুলেওঠা পেটওয়ালা রক্তপায়ী কীট প্রকৃতির উৎকৃষ্ট সৃষ্টি ময়ূর অথবা অরোরা বোরিয়ালিসের মতই নয়নমনোহর। বিষয়টা সম্বন্ধে তাই তোমার এই ভাবে কথা বলাটা আমার কাছে বড়ই পীড়াদায়ক। একটু অধ্যবসায় ব্যয় করে নিঃসন্দেহে আর একটা নমুনা সংগ্রহ করে নিতে পারব।'

'নিঃসন্দেহে পারবেন,' মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে বললেন সামারলি—'এই মাত্র একটা নমুনা আপনার শার্টের কলারের ভেতরে অদৃশ্য হল।'

বিশাল বলীবর্দের মত প্রকাণ্ড লাফ মেরে শূন্যে উঠে পড়লেন চ্যালেঞ্জার—ক্ষিপ্তের মত টান মেরে কোট আর শার্ট খুলতে গিয়ে বোতাম, টোতাম ছিঁড়ে সে এক হাস্যকর কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলেন। হাসতে হাসতে আমি আর সামারলি তখন গড়িয়ে পড়ি আর কি, ওঁকে সাহায্য করবার মত অবস্থায় রইলাম না। অবশেষে দানবিক ধড়টা অনাবৃত করা গেল কোনমতে (দরজির ফিতের মাপে যার পরিধি চুয়ান্ন ইঞ্চি)। সারা গা কালো হয়ে রয়েছে ঘন লোমে। চামড়া কামড়ে গ্যাঁট হয়ে বসবার আগেই লোমের জঙ্গল থেকে টেনে বার করলাম অতিকায় জোঁকটাকে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম ঝোপের মধ্যে কিলবিল করছে অগুন্তি রক্তপায়ী, সুতরাং অকুস্থল পরিত্যাগ করে চটপট অন্যত্র শিবির স্থাপন করাই শ্রেয় স্থির করলাম।

কিন্তু সবার আগে বিশ্বস্ত অনুচর নিগ্রোটির সঙ্গে বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করা দরকার। বেশ কিছু কোকো আর বিস্কুটের টিন বহন করে অচিরেই পর্বতচূড়ায় আবির্ভূত হতে দেখলাম তাকে। একটার পর একটা টিন ছুঁড়ে পাঠিয়ে দিল আমাদের কাছে। নিচে যা রসদ রইল, তা থেকে দু-মাস চলার উপযোগী জিনিসপত্র রাখতে বললাম নিজের হেপাজতে। বাকী নিয়ে যাক ইণ্ডিয়ানরা পরিশ্রমের পুরস্কার এবং আমাজনে চিঠি বয়ে নিয়ে যাওয়ার বেতন বাবদ। ঘন্টা কয়েক পরেই দেখলাম বহুদূরের প্রান্তরের ওপর দিয়ে সবাই চলে যাচ্ছে একজনের পেছনে আর একজন লাইন দিয়ে। প্রত্যেকের মাথায় চাপানো একটা করে বাণ্ডিল। যে-পথে এসেছি, ফিরে যাচ্ছে সেই পথ ধরেই। পর্বত চুড়োর পাদদেশে খাটানো ছোট্ট তাঁবুটায় একা রয়ে গেল জাম্বো। নিচের জগতের একমাত্র সংযোগসূত্র হিসেবে ঐখানেই সে থাকবে।

এবার ঠিক করতে হবে এখুনি কি করণীয়। রক্তপায়ী কীট অধ্যুষিত অঞ্চলটি থেকে আমাদের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে গেলাম একটা খোলা জায়গায়। চারদিকে গাছ দিয়ে ঘেরা যেন ছোট্ট একটা প্রাঙ্গণ। মাঝখানে খানকয়েক চ্যাটালো পাথর আর চমৎকার একটা কুয়োর পাশে গ্যাঁট হয়ে বসে শুরু করলাম আলোচনা সভা—নবীন দেশে হানা দেওয়ার প্রথম পরিকল্পনা নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করে ফেললাম চারজনেই। শাখাপল্লবের মধ্যে দিয়ে সমানে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল বিহঙ্গকুল—বিশেষ করে খক্ খক্ করে হুপিং কাশির ডাকের মত অদ্ভুত একটা ডাক বেশ মনে আছে অমন অদ্ভুত পক্ষীকূজন ইতিপূর্বে শোনবার সৌভাগ্য হয়নি বলে—ঐ শব্দ ছাড়া আর কোনো প্রাণের লক্ষণ দেখলাম না কোথাও।

প্রথম প্রয়োজন আমাদের ভাঁড়ারজাত জিনিসপত্রের একটা ফর্দ—যাতে বুঝতে পারি কোন্-কোন্ জিনিসটার ওপর ভরসা রাখা যাবে। সঙ্গে করে নিজেরা যা এনেছি এবং জাম্বো যা দড়িতে বেঁধে চালান করেছে, তার সব মিলিয়ে মোটামুটিভাবে কোনো বস্তুর অভাব আমাদের হবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চারখানা রাইফেল আর একখানা শটগান সমেত এক হাজার তিনশ বুলেট, কিন্তু মাঝারি সাইজের বডি-কার্তুজ আছে মোটে পঞ্চাশটা। খাবার দাবার যা আছে, কয়েক হপ্তা হেসে খেলে চলে যাবে। তামাকও রয়েছে

বিস্তর। আর আছে বেশ কয়েকটা বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম—একটা বড় টেলিস্কোপ আর একটা দূরবীনও আছে তার মধ্যে। খোলা চত্বরের ঠিক মাঝখানে সাজিয়ে রাখলাম যাবতীয় জিনিসপত্র আর কুড়ুল। ছুরি দিয়ে কাঁটা ঝোপ কেটে পনেরো গজ ব্যাসের বৃত্তাকারে ঘিরে রাখলাম ভাঁড়ার ঘর। আপাততঃ এই হোক আমাদের সদর দপ্তর। অকস্মাৎ বিপদ দেখা দিলে যেন এখানেই আশ্রয় নিতে পারি—ভাঁড়ারের জিনিসপত্রও যেন সুরক্ষিত থাকে। চ্যালেঞ্জারের নামানুসারে নামকরণ হল এই হেডকোয়ার্টারের।

দুপুর নাগাদ নিজেদের নিরাপত্তার আয়োজন সম্পূর্ণ হল। রোদের তাত তেমন অসহ্য নয়। মালভূমির তাপমাত্রা আর গাছগাছড়া দুটোই মাঝারি ধরনের। চারপাশের গাছপালার মধ্যে বীচ, ওক, এমন কি বার্চ গাছও চোখে পড়ল। সদ্যনির্মিত দুর্গের ওপর সবুজ শাখা পল্লবের চন্দ্রাতপ মেলে ধরেছিল একটা বিরাট জিঙ্গকো বৃক্ষ—এ অঞ্চলের সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে তার মগডাল। তারই ছায়ায় বসে চালিয়ে গেলাম আলোচনা। কর্মব্যস্ততার এই মুহূর্তটিতেই নেতৃত্ব দিলেন লর্ড জন—জানিয়ে দিলেন এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কি-কি হওয়া উচিত।

বললেন—'মানুষ অথবা পশু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের আওয়াজ পাচ্ছে বা আমাদের দেখে ফেলছে, ততক্ষণ কিন্তু আমরা নিরাপদ। আমরা আছি, এটা টের পেলেই শুরু হবে বিপদ। এখনো পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব কেউ টের পেয়েছে, এমন লক্ষণ দেখিনি। কাজেই নিঃসাড়ে গুপ্তচরগিরি করে যেতে হবে। আশপাশের অঞ্চলটা ভালভাবে দেখব—দূরে যাব তারপর।'

'কিন্তু এগোতে তো হবেই,' বলে উঠলাম নেতার মুখের ওপরেই।

'দুষ্টু ছেলে, এগোবো তো বটেই। কিন্তু একটু কমন সেন্স খাটিয়ে। চট করে ঘাঁটিতে ফিরে আসা যায় না—এতটা দূরত্বে যাবো না। সবচেয়ে বড় কথা, শুধু জীবনরক্ষার প্রয়োজন না হলে, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করব না একেবারেই।'

'গতকাল কিন্তু আপনিই করেছেন,' বললেন সামারলি।

'না করে উপায় ছিল না। অবশ্য তখন জোরালো হাওয়া বইছিল বাইরের দিকে। মালভূমির ভেতরে আওয়াজ পৌঁছোনোর সম্ভাবনা কম। ভাল কথা, জায়গাটার কি নাম দেওয়া যায় বলুন তো? ওটা কিন্তু আপনাদের এখতিয়ারে পড়ে।'

ভাল মন্দ কয়েকটা নাম প্রস্তাবের পর চ্যালেঞ্জারের দেওয়া নামটাই

নেওয়া হল শেষ পর্যন্ত।

বললেন—'একজনের নামেই নামকরণ হতে পারে—ম্যাপল হোয়াইটের—অজ্ঞাত জগতের প্রথম আবিষ্কর্তার নামানুসারে তাই আমি বলব এ দেশের নাম হোক ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইট ল্যাণ্ড।'

ম্যাপে এই নামই লিখেছি আমি। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মানচিত্রে আশা করি এই নামই থাকবে।

শান্তিপূর্ণ ভাবে ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের অন্দরমহলে প্রবেশ করাটাই এখন আশু প্রয়োজন। স্বচক্ষে দেখেছি অনেক অজ্ঞাত প্রাণীর বিচরণ ঘটছে এ দেশে—ম্যাপল হোয়াইটের নিজের স্কেচবুক থেকেও জেনেছি আরও বিপজ্জনক, আরও ভয়াবহ প্রাণীরও সমাগম ঘটতে পারে। পাঁজর ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা বাঁশ আর সেই শ্বেত নরকঙ্কালটাও হিংস্র নিষ্ঠুর ক্রূর কুটিল মানব সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের চাক্ষুস প্রমাণ—ওপর থেকে তাকে ফেলে না দিলে তার দেহ ফুঁড়ে ঐভাবে বাঁশ ঢুকে যেতে পারত না। এ দেশ থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা নেই, চারিদিকে জিঘাংসা-নিষ্ঠুর অজ্ঞাত প্রাণী—কাজেই অবস্থা যে বেশ সঙীন, সেটা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন লর্ড জন। অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন সেই কারণেই। তা সত্ত্বেও যাদের প্রতিটি কোষ উন্মুখ হয়ে রয়েছে অজ্ঞাত জগতের চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখে আসার দুর্দমনীয় আকাঙ্খায়, তাদের বেশীক্ষণ ধরে রাখাও অসম্ভব।

কাঁটা ঝোপ পরিবৃত কেল্লার প্রবেশপথ ঢেকে দিলাম আরও কিছু কাঁটা ঝোপ দিয়ে—পুরোপুরি সুরক্ষিত হল দুর্গ এবং ভেতরকার জিনিসপত্র। তারপর সন্তর্পণে হুঁশিয়ার চরণে অগ্রসর হলাম ঝর্ণার পাড় বেয়ে অজানার উদ্দেশে—যাতে এই পথের নিশানা ধরেই আবার ফিরে আসতে পারি মূল ঘাঁটিতে।

রওনা হতে না হতেই এমন লক্ষণ পেলাম যাতে আর কোনো সন্দেহই রইল না যে বাস্তবিকই বিস্তর বিস্ময় অভিমুখে চলেছি আমরা। প্রথম কয়েক-শ গজ শুধু নিবিড় জঙ্গল। বহু বৃক্ষই আমার অচেনা। কিন্তু উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিসাবে সামারলি মুখে মুখে বলে গেলেন কোন্‌টা সরলবর্গীয় দেবদারু জাতীয় আর কোন্‌টা ফার্ণ আর পাম বৃক্ষের অনুরূপ সরলবর্গীয় বৃক্ষ। বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে এরা পেছনে ফেলে আসা নিচের জগৎ থেকে। তারপর ঢুকলাম একটা পাঁকে ভরা অঞ্চলে—ঝর্ণার জল চওড়া হয়ে বাদার আকার নিয়েছে। অদ্ভুত-আকৃতি সুদীর্ঘ নলখাগড়ায় সমাকীর্ণ পুরো

অঞ্চলটা। ইকুইসটেসিয়া—বললেন সামারলি—পাতাহীন বৃক্ষ—অথবা বলা যায় মেয়ারস টেল—মানে ঘোড়ার ল্যাজ। মাঝে মধ্যে ফার্ণ বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচিয়ে। হাওয়ায় দুলছে ফার্ণ, দুলছে ইকুইসটেসিয়া। আগে আগে যাচ্ছিলেন লর্ড জন—সহসা শূন্যে হাত তুলে আমাদের থামিয়ে দিলেন।

বললেন—'দেখেছেন! আরে সর্বনাশ! এ তো দেখছি রাক্ষুসে পাখীর পায়ের ছাপ! পাখীদের বাবা নাকি?'

সামনের নরম কাদায় প্রকাণ্ড তিন-আঙুলে একটা পদচিহ্নের ছাপ ফুটে রয়েছে। পদচিহ্নের অধিকারী প্রাণী মহাশয় বাদা পেরিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেছেন। পলায়িত দানবিক প্রাণীর পদচিহ্ন পানে নির্বাক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলাম আমরা। সত্যিই যদি পাখী হয়, তাহলে তার আয়তনটা কি হওয়া উচিত? অস্ট্রিচ পাখীর পায়ের ছাপের চাইতেও ছাপটা বড়—উচ্চতাও তাহলে বিপুল। ব্যগ্র চোখে চারপাশ দেখে নিয়ে হাতী-মারা বন্দুকে দুটো কার্তুজ পুরে নিলেন লর্ড জন।

বললেন—'শিকারী হিসেবে বাজী ফেলে বলতে পারি দাগটা টাটকা। মিনিট দশেক আগে গেছে এখান দিয়ে। দেখছেন না, ছাপ যেখানে গভীর, এখনও সেখানে জল চুঁয়ে চুঁয়ে উঠছে! আরে! এ যে দেখছি আরেকটা ছাপ—অনেক ছোট ছাপ!'

একই তিন-আঙুলে পদচিহ্নের অনেকগুলো ক্ষুদে সংস্করণ বৃহৎ পদচিহ্নের সমান্তরালে অগ্রসর হয়েছে অরণ্য অভিমুখে।

বিজয়োল্লাসে প্রায় নৃত্য করে উঠলেন সামারলি—'এ দাগটা তাহলে কিসের মশায়?' আঙুল দিয়ে দেখালেন তিন-আঙুলের মাঝে একটা পাঁচ-আঙুলে মানুষের হাতের বিরাট ছাপ।

'উইলডেন!' বিপুল হর্ষোচ্ছ্বাসে যেন সমাধিস্থ হয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার—'এ ছাপ আমি দেখেছি উইলডেন কাদামাটিতে! চিহ্ন এঁকে গেছে যে জীবটি, সে কিন্তু সোজা হয়ে হাঁটে তিন-আঙুলে পায়ে ভর দিয়ে, মাঝে মাঝে পাঁচ-আঙুলে সামনের থাবার একটা রাখে মাটির ওপর। পাখী নয়, মাই ডিয়ার রক্সটন—এ ছাপ পাখীর পায়ের ছাপ নয়!'

'জানোয়ারের?'

'না, সরীসৃপের—ডাইনোসরের। ডাইনোসর ছাড়া এমন পায়ের ছাপ পড়তেই পারে না। নব্বই বছর আগে ঠিক এমনি ভাবেই এই পদচিহ্ন দেখে ধোঁকায় পড়েছিলেন সাসেক্সের এক খ্যাতিমান ডাক্তার। থাক সে কথা··· এ দুনিয়ার কেউ কি আশাও করতে পেরেছিল এ-দৃশ্য দেখতে হবে

আমাদের ?'

বলতে বলতে ফিসফিসানিতে এসে ঠেকল তাঁর বজ্রনাদ কণ্ঠস্বর। নিস্পন্দ দেহে নীরব বিস্ময়ে পুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম চারজনে। পদচিহ্ন অনুসরণ করলাম অবশেষে, বাধা ছাড়িয়ে প্রবেশ করলাম ঝোপঝাড় আর গাছগাছড়ার আবরণের মধ্যে দিয়ে জঙ্গলে। জঙ্গলের পর এক টুকরো ফাঁকা ঘাসছাওয়া মাঠ। অত্যন্ত অসাধারণ পাঁচটি প্রাণী বিচরণ করছে সবুজ তৃণভূমিতে—জীবনে এ রকম সৃষ্টিছাড়া জীব আমি দেখিনি। ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম সেই দৃশ্য।

পাঁচটা প্রাণীর মধ্যে দুটো পূর্ণবয়স্ক, তিনটে বাচ্চা। আয়তনে প্রকাণ্ড। এমন কি বাচ্চা তিনটের প্রত্যেকেই এক-একটা হাতীর সমান। বড় দুটোর মত অতিকায় প্রাণী আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি। গিরগিটির আঁশের মত আঁশযুক্ত স্লেট-রঙীন চামড়া। সূর্যের আলো যেখানে-যেখানে পড়ছে চকচক করছে সেই জায়গা। বিশাল চওড়া শক্তিশালী ল্যাজ আর তিন-আঙুলে পেছনের পদযুগলে ভর দিয়ে বসে পাঁচ মহাপ্রভুই সামনের পাঁচ-আঙুলে পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে টেনে নামিয়ে মুখে পুরছে। দানব-সদৃশ কাঙারু বললে দেশের মানুষ হয়তো আকৃতিগুলো আরো ভালভাবে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। লম্বায় বিশ ফুট, চামড়া কালো কুমীরের মতন।

মার্ভেলাস এই দৃশ্যের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে কতকক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে হিসেব আমি রাখিনি, জোর হাওয়া বইছে আমাদের দিকেই। লুকিয়েও রইছি নিবিড় ঝোপের মধ্যে। কাজেই ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মাঝে মাঝে বাপ-মা'কে ঘিরে নেচে কুঁদে খেলা করছে বাচ্চা তিনটে। কিন্তু ভারী গতরের দরুন নর্তন কুর্দন যে সহজ সাধ্য হচ্ছে না—তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। শূন্যে লাফিয়ে উঠেই ধপ্ ধপাস্ করে এসে পড়ছে মাটিতে। বাপ-মায়ের দৈহিক শক্তি যেন সীমাহীন। কেন না, দুজনের একজন একটা বেজায় উঁচু গাছের ওপর দিকের একটা পাতাওলা ডালের নাগাল না পেয়ে গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে গোটা গাছটাকেই অক্লেশে উপড়ে শুইয়ে দিল মাটিতে—পাটকাঠি ভাঙল যেন। কাণ্ডটা কিন্তু দুটো ব্যাপার স্পষ্ট করে দিল। পেশী শক্তি ওদের অসীম, কিন্তু মগজের শক্তি অতি নগণ্য—কেন না গোটা গাছটা এসে পড়ল তার মাথাতেই। যন্ত্রণায় কাৎরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। শুনে বুঝলাম, গায়ে যত জোরই থাকুক না কেন—সহ্যের সীমা একটা আছে এদের। এই ঘটনা থেকে মনে হল আশপাশের জায়গাটা বিপজ্জনকও বটে। কেন না, আহত জীবটি

মন্থর গতিতে হেলে-দুলে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে—পেছন পেছন গেল তার সঙ্গী আর বিরাট দেহী বাচ্চা তিনটে। গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল স্লেট-রঙীন চামড়ার চেকনাই—ঝোপঝাড়ের ওপরে দোদুল্যমান মুণ্ডগুলো। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারেই।

দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম সাথীদের পানে। হাতী মারা বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন লর্ড জন। শিকারী-অন্তরের উদগ্র ব্যগ্রতা চিক্‌চিক্ করছে ভীষণ দুটি চোখে। অ্যালবেনিতে তাঁর কক্ষে ম্যান্টল-পিসের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখা দাঁড দুটোর মাঝখানে এ-হেন একটি মুণ্ড ঝুলিয়ে রাখার জন্যে সর্বস্ব দিতেও যেন প্রস্তুত! তা সত্ত্বেও সংযত রাখলেন নিজেকে। কেন না অজ্ঞাত দেশে অনেক বিস্ময় ভরা এই অভিযানের সার্থকতা নির্ভর করছে আমাদের লুকিয়ে থাকার ওপর—জাহির করার মধ্যে নয়। এ অঞ্চলের বাসিন্দারা যেন টের না পায় অনাহূতদের প্রবেশ ঘটেছে তাদের দেশে। অতলান্ত হর্ষোচ্ছ্বাসে যেন ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন প্রফেসর দুজন। নিবিড় উত্তেজনায় নিবিষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে অজ্ঞাতসারে দুজনে দুজনের হাত ধরে আছেন। আশ্চর্য ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যেন দুটি খোকা। নির্মল হাসিতে গুটিয়ে গেছে চ্যালেঞ্জারের গাল, বিস্ময় আর শ্রদ্ধায় কোমল হয়ে এসেছে সামারলির বিদ্রূপ কঠিন মুখাবয়ব।

'*Nunc dimitis*!' বিস্ময়: চকিত উল্লাসে ফেটে পড়লেন হঠাৎ—'বলুন দিকি এই দৃশ্যের বর্ণনা শুনে কি বলবে ইংলণ্ডের মানুষ?'

জবাবটা দিলেন চ্যালেঞ্জার। বললেন—'মাই ডিয়ার সামারলি, সংগোপনে বলতে পারি ঠিক কি বলবে ইংলণ্ডের মানুষ। বলবে, আপনি একটা জঘন্য মিথ্যুক আর বিজ্ঞান মহলের ধাপ্পাবাজ—ঠিক যেভাবে আপনি অন্যান্যদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছিলেন আমাকে।'

'ফটোগ্রাফ দেখবার পরেও?'

'জাল ফটো, সামারলি! আনাড়ি হাতে জাল করা ফটো!'

'নমুনা দেখবার পরেও?'

'হ্যাঁ, ঐ একটা জায়গায় ঘায়েল করতে পারবেন বাছাধনদের! ফ্লীট স্ট্রীটের সব কটা নোংরা সাংবাদিক আর ব্যালোন গলা মিলিয়ে প্যাঁক প্যাঁক করে আমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। আটাশে অগাস্ট—ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের তৃণভূমিতে দর্শন করেছি পাঁচ-পাঁচটা সজীব ইগুয়ানোডন। ডাইরীতে লিখে রাখো হে ছোট্ট বন্ধু—ছেঁড়া কাঁথামার্কা তোমার ঐ কাগজের দপ্তরে পাঠিয়ে দিও।'

সামনের পাঁচ-আঙুলে পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে টেনে নামিয়ে মুখে পুরছে পৃ ১২৬

'সেই সঙ্গে তৈরী থেকো সম্পাদকীয় বুটের লাথি খাওয়ার জন্যে,' বললেন লর্ড জন, 'ছোকরা, লণ্ডনের অক্ষাংশে বসে সব জিনিসই অন্য রকম মনে হয়। বিশ্বের অনেক অ্যাডভেঞ্চারিস্ট তাই তাঁদের অদ্ভুত বৃত্তান্ত কাকপক্ষীকেও শোনান না—পাছে কেউ অবিশ্বাস করে। দোষ কি তাঁদের? আরে, দু-একমাস পরে এই দৃশ্যও তো স্বপ্নের মত অলীক মনে হবে আমাদের মনে। ওদের নামটা কি বললেন যেন?'

'ইগুয়ানোডন,' বললেন সামারলি। 'হেস্টিংস বালি, কেন্ট আর সাসেক্সের সর্বত্র এদের পায়ের ছাপ দেখতে পাবেন। দক্ষিণ ইংলণ্ডে যখন সবুজ গাছ-পালার অভাব ছিল না, পেট ভরে খাওয়ার ভাবনা ছিল না, তখন পুরো অঞ্চলটায় কাতারে কাতারে এরা টহল দিয়েছিল এক সময়ে। পরিবেশ পালটে যেতেই মৃত্যু হল এদেরও। দেখা যাচ্ছে, পরিবেশ পালটায়নি এখানে—তাই ওরা বেঁচে আছে।'

লর্ড জন বললেন—'জ্যান্ত যদি কখনো সটকান দিতে পারি এ তল্লাট থেকে, সঙ্গে একটা মাথা আমি নিয়ে যাবোই, অ'রে মশাই, ঐ একখানা মুণ্ডু। কাছে সোমালিল্যাণ্ড উগাণ্ডার সমস্ত জানোয়ারের মুণ্ডুই তো মটরদানার সমান! জানি না কি ভাবছেন মনে মনে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে আমাদের প্রত্যেকেরই।'

একই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল আমার ভেতরেও—রহস্য আর বিপদের অনুভূতি। থমথম করছে চারদিক। সবুজ গাছপালার ছায়াঘন তমিস্রায় নিরন্তর ওৎ পেতে আছে যেন রক্ত-জল-করা জিঘাংসা, মাথার ওপরকার ঘন শাখাপল্লবের মধ্যে থেকে অবয়বহীন আতংক রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলেছে সর্বদেহে। দানবদেহী যাদের এইমাত্র দেখলাম, তারা মন্থরগতি নিরীহ পশু সন্দেহ নেই, কারও ক্ষতি করবে না। কিন্তু এই আশ্চর্য দুনিয়ায় আজও যারা বংশরক্ষা করে চলেছে, তাদের মধ্যে ভয়ংকর বিভীষিকাও তো থাকতে পারে। পাহাড় অথবা ঝোপঝাড়ের আলয় থেকে তারা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে চার-চারটে জ্যান্ত খাবার ছাড়বে কেন? প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আমার নিতান্তই নগণ্য। তবে একটা বইতে পড়েছিলাম, বেড়াল যেমন ইঁদুর ধরে খায়, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরাও তেমনি সিংহ আর বাঘ দিয়ে ফলার করে। ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের অরণ্যে এদের দেখা পেলেই তো গেছি!

বিধিলিপি অনুযায়ী আশপাশের বিচিত্র বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলাম নতুন দেশে আমাদের প্রথম দিবসেই—সকালবেলাই। অ্যাডভেঞ্চারটা নিরতিশয়

লোমহর্ষক—এবং অতিশয় জঘন্য। ভাবলেও এখনো গা ঘিন ঘিন করে। লর্ড জন বলেছিলেন, ইগুয়ানোডনদের তৃণভূমি স্বপ্ন হয়ে থাকবে মনের মধ্যে—তাই যদি হয় তো বলব টেরোড্যাকটিলদের জলাভূমি দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকবে চিরকাল। ঠিক যে ভাবে ঘটেছিল পরপর ঘটনাগুলো, এবার তা লিপিবদ্ধ করা যাক।

মন্থর চরণে অতিশয় ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলাম বনতল দিয়ে। হচ্ছিলাম খানিকটা লর্ড জনের হুঁশিয়ারির জন্যে—স্কাউট তো তিনিই। আগে আগে যাচ্ছেন—পথ পরিষ্কার থাকলে তবে আমাদের এগোতে বলছেন। দেরী হওয়ার আর একটা কারণ, পদে পদে এক একটা বিস্ময় দেখে উল্লাস ধ্বনি করছেন দুই প্রফেসরের একজন না একজন। কখনো ফুল, কখনো পোকা—সবই নাকি একেবারে নতুন জাতের। স্রোতস্বিনীকে বাঁদিকে রেখে খুব জোর মাইল দু-তিন যাওয়ার পর গাছের জটলার মধ্যেই বেশ একটা খোলামেলা জায়গায় এসে পড়লাম। ঝোপঝাড়ে ঘেরা বড় বড় গোলাকার পাথরের চাঁই সমাকীর্ণ একটা প্রশস্ত মালভূমি। কোমর পর্যন্ত উঁচু ঝোপ ঠেলে সন্তর্পণে পাথরের এই চাঁইগুলোর দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ কানে ভেসে এল অদ্ভুত চাপা একটা প্যাঁক প্যাঁকানি আর শিস্ দেওয়ার আওয়াজ। বাতাস আলোড়িত হচ্ছে সেই কলরবে এবং তার উৎস আমাদের ঠিক সামনেই। শূন্যে হাত তুলে আমাদের দাঁড়িয়ে যেতে ইসারা করে লর্ড জন হেঁট হয়ে দ্রুত দৌড়ে গেলেন পাথর সারির কিনারায়। উঁকি মেরে কি দেখে যেন তাজ্জব হয়ে গেলেন। তারপর যেন আমাদের অস্তিত্বই ভুলে গেলেন। সিধে:হয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। তারপর অবশ্য হাত নেড়ে আমাদের ডাকলেন—সেই সঙ্গে ইসারায় বুঝিয়ে দিলেন—হুঁশিয়ার! ওঁর দীর্ঘ ছিপ ছিপে বপুর প্রতিটি বর্গইঞ্চি থেকে যেন বিচ্ছুরিত হল বিস্ময়বোধ আর বিপদাশংকা—যার উৎস ওঁর ঠিক সামনেই।

পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ালাম পাশে, পাথর সারির ওপর দিয়ে উঁকি মারলাম সামনে। দেখলাম একটা গর্ত। সুদূর অতীতে হয়ত ছিল মালভূমির তলা থেকে আগ্নেয় ধারা নিঃসৃত হওয়ার ছোট ছোট গর্তের অন্যতম। আকারে গামলার মত। আমরা যেখানে ঘাপটি মেরে আছি, সেখান থেকে কয়েক-শ গজ দূরে গামলার তলদেশে থকথকে সবুজ পাঁক আর বদ্ধ জল—কিনারা বরাবর নলখাগড়া শরের জঙ্গল। পরিবেশটা এমনিতেই যেন অতি-প্রাকৃতিক—অলৌকিক—দেখলেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

তার চাইতেও কুটিল ভয়ংকর হল বাসিন্দারা—দান্তে বর্ণিত সেভেন সার্কেলস থেকে তুলে ধরা যেন একটা নারকীয় দৃশ্য তৈরী হয়ে গেছে শুধু ওদের উপস্থিতির ফলেই। এ হল টেরোড্যাকটিলদের ঘিঞ্জি বাসা। কয়েক-শ টেরোড্যাকটিলকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে মাত্র কয়েক-শ গজ দূরে। জলা জায়গার চারদিকেই পিলপিল করছে বাচ্চা টেরোড্যাকটিল—কদাকার মায়েরা তা দিচ্ছে কর্কশ চামড়ার মতন হলদেটে ডিমগুলোয়। কিলাবিলে কুৎসিত এই সরীসৃপদের ডানা আছড়ানির শব্দই রক্ত জমানো কলরব সৃষ্টি করেছে বাতাসে —সেই সঙ্গে ভয়ংকর পচা নাড়ি ভুঁড়ি পর্যন্ত গুলিয়ে ওঠা দুর্গন্ধে প্রাণপাখী বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে চারজনেরই। এদের মাথার ওপর এক-একটা পাথরে আসীন এক-একটা মূর্তিমান বিভীষিকা। পুরুষ টেরোড্যাকটিল। নিথর, নিস্পন্দ, দীর্ঘ, ধূসর, চামসিটে—জ্যান্ত বলে মনেই হয় না—যেন নিষ্প্রাণ নমুনা। ভয়ংকর আকৃতি, নড়ছে না একটুও, ঘূর্ণ্যমান রক্তচক্ষু দেখেই বোঝা যাচ্ছে কত হুঁশিয়ার প্রত্যেকে—মাঝে মধ্যে ঘপাৎ করে ইঁদুর ধরা যাঁতি কলের মত চঞ্চুজোড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কাছ দিয়ে উড়ে যাওয়া ফড়িং দেখলেই—আহার এবং প্রহরা চলছে একসাথে। সামনের হাত দুটো ভাঁজ করে থাকার ফলে বিরাট ঝিল্লীময় ডানা দুটো আবৃত করে রেখেছে সারা দেহটাকে। ঠিক যেন কদাকার মাকড়শার-জাল-রঙীন আলোয়ানে গা ঢেকে বসে আছে সারি সারি দানবী বুড়ি—ভীষণাকার মুণ্ডগুলো কেবল বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। ছোট বড় মিলিয়ে হাজার খানেকেরও বেশী এই ধরনের গা-ঘিনঘিনে জীব হট্টগোল জুড়েছে সামনের দেবে যাওয়া গামলার মত জায়গাটায়।

প্রফেসর দুজন তো পারাদিন সেখানে বসে থাকতে পারলেই কৃতার্থ বোধ করতেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগীয় প্রাণচাঞ্চল্য দর্শন করবার এমন সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে তাঁরা যেতে রাজী নন কোথাও। পাথরের আনাচে কানাচে ছড়ানো রাশি রাশি মাছ আর পাখী দেখালেন আঙুল তুলে—অজ্ঞাত দেশের আজব চিড়িয়াদের উদর পূজা হয় কি-কি উপকরণ দিয়ে—এই তার প্রমাণ। শুনলাম, একটা রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন দুজনে। কেম্ব্রিজ-গ্রীন স্যাণ্ডের মত বিশেষ কয়েকটা জায়গায় এই উড়ুক্কু ড্রাগনদের হাড়গোড় এত বেশী কেন পাওয়া গেছে, এ নিয়ে আর দ্বিমত নেই কারোর মধ্যে। দেখাই তো যাচ্ছে, পেন্‌গুইনদের মত এরাও যূথপ্রিয়—দলবদ্ধভাবে বসবাসে অভ্যস্ত।

মতৈক্যের অনতিবিলম্বেই ঘটল কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে মতানৈক্য।

সামারলির কথা মানতে চাইলেন না চ্যালেঞ্জার। ঝাঁ করে মাথা তুললেন পাথরসারির ওপরে এবং আমাদের চারজনকেই প্রায় খতম করে আনলেন। পলক ফেলার আগেই সবচেয়ে কাছের পুরুষ টেরোডাকটিলটা হেঁকে উঠল কানের পর্দাফাটানো আতীক্ষ্ণ শিস্ দেওয়া শব্দে। বিশ ফুট বিস্তৃত কড়া চামড়া মোড়া বিশাল ডানা ঝাপটে সোঁ করে উঠে গেল শূন্যে। মাদী আর বাচ্চাগুলো একসঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে রইল জলের কিনারায়। মদ্দা-গুলো একের পর এক শিলাসন ছেড়ে সজাগ প্রহরীর মতই উড়ে যেতে লাগল আকাশে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! প্রায় একশ বিরাটকায় কদাকার প্রাণী চড়ুইপাখীর মত ডানা ঝাপটে ঝড় বইয়ে দিচ্ছে আমাদের চারপাশে। অচিরেই অবশ্য বুঝলাম অভূতপূর্ব এই দৃশ্য নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আর তন্ময় হয়ে থাকা যাবে না। প্রথম প্রথম চক্রাকারে উড়ছিল বিশাল পক্ষীরূপী সরীসৃপ বাহিনী—বিশাল বলয়াকারে উড়তে উড়তে যেন যাচাই করে নিচ্ছিল বিপদটা ঠিক কি ধরনের। তারপর আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল উড়ুক্কু বিভীষিকারা। ছোট হয়ে এল চক্র, সাঁই সাঁই শব্দে বিশাল ডানায় হাওয়া তোলপাড় করে ঘুরতে লাগল আমাদের ঘিরে। স্লেট-রঙীন প্রকাণ্ড ডানার ঝাপটানিতে সে কি বিকট আওয়াজ—কান ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল—মনে হল যেন হেনডন এরোড্রোমে উড়ন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে!

রাইফেল আঁকড়ে ধরে হেঁকে উঠলেন লর্ড জন—'জঙ্গলের ভেতরে দৌড়ে যান—একসঙ্গে থাকুন—শয়তানের বাচ্চাদের মতলব ভাল নয়!'

চম্পট দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আমাদের মতলব আঁচ করেই যেন ঠিক সেই মুহূর্তে চক্রটা নিবিড়তর হল আমাদের চতুর্দিকে। এত কাছে এসে গেল শেষ পর্যন্ত যে সবচেয়ে কাছের উড়ুক্কু আতংকদের ডানার ডগা ঘসটে গেল আমাদের মুখে। বন্দুকের বাঁট দিয়ে দমাদম মেরে গেলাম বটে, কিন্তু প্রহার করার মত নিরেট তো কিছু নেই যে পিটিয়ে শায়েস্তা করা যাবে। স্লেট রঙীন চক্র বিকট কর্ণবধিরকারী শব্দে এগিয়ে এল আরো কাছে···আরো···আরো···তারপরেই আচম্বিতে একটা ভয়ানক চঞ্চু ঠিকরে এল আমাদের লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মারল আর একটা···পরক্ষণেই আবার একটা। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে মুখে হাত চাপা দিলেন সামারলি—আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল রক্ত। ঘাড়ের পেছনে একটা বিষম খোঁচা খেতেই চোখে ধোঁয়া দেখলাম আমি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার। হেঁট হয়ে যেই তাঁকে তুলতে গেছি, অমনি আবার একটা রাম-ঠোকর খেলাম পেছন থেকে এবং মুখ থুবড়ে

পড়লাম ওঁর দেহের ওপরেই। ঠিক সেই মুহূর্তে শুনলাম রাইফেলের নির্ঘোষ। হাতী-মারা বন্দুক ছুঁড়েছেন লর্ড জন। চোখ তুলে দেখলাম, ভাঙা ডানা নিয়ে একটা উড়ুক্কু বিভীষিকা আছড়ে পড়ল মাটিতে। হাঁ করা চঞ্চুটা কিন্তু বাড়িয়েই রইল আমাদের দিকে। কুলকুচো করার মত আওয়াজের সাথে রক্ত আর লালা গড়িয়ে পড়ল দাঁতালো চঞ্চুর কষ বেয়ে—রক্ত-লাল ঘূর্ণিত চক্ষুদুটি যেন বিদ্বেষ-গরল বর্ষণ করে চলল আমাদের লক্ষ্য করে মৃত্যুর মুহূর্তেও—মধ্যযুগীয় চিত্রে নরক-গুলজারের এরকম দৃশ্য আমি দেখেছি—দেখেছি শিল্পী-কল্পিত মূর্তিমান শয়তানকে। আচমকা আওয়াজে চমকে গিয়ে কমরেড টেরোড্যাকটিলগুলো সাঁ-সাঁ শব্দে উঠে গেল অনেক উঁচুতে এবং চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে লাগল আমাদের মাথার ওপর।

শুনলাম লর্ড জনের নিনাদী নির্দেশ—'দৌড়োন এবার—যদি প্রাণে বাঁচতে চান।'

দৌড়োলাম তো বটেই। প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড় কাকে বলে, হাড়ে হাড়ে সেদিন তা টের পেলাম। কতবার যে ঝোপঝাড়ের মধ্যে হোঁচট খেলাম, তার ইয়ত্তা নেই। টলতে টলতে পাদপশ্রেণীর কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই আবার নরকের দূতগুলো ছোঁ মারল আমাদের লক্ষ্য করে। এক ঠোক্করেই ঠিকরে গেলেন সামারলি। টেনে হিঁচড়ে তাঁকে নিয়ে ঢুকে গেলাম জঙ্গলের মধ্যে। সারি সারি বৃক্ষকাণ্ডগুলোই পরম বন্ধুর মত বাঁচিয়ে দিল আমাদের সে-যাত্রা—ওপরকার শাখাপল্লবের মধ্যে বিশাল ডানা সঞ্চালনের জায়গা তো নেই। বিষণ্ণচিত্তে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘাঁটি অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময়ে দেখলাম ঊর্ধ্ব গগনে দ্রিমি-দ্রিমি বাদল বাজনার মত বুক কাঁপানো শব্দে চক্রাকারে তখনো উড়ছে টেরোড্যাকটিল বাহিনী। ঘন নীল আকাশের বুকে ঠিক যেন এক ঝাঁক কবুতর। যত উঁচুতেই উঠুক না কেন, ওদের নজর যে আমাদের দিকেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরও ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতেই ওরা রণে ভঙ্গ দিল অবশ্য—ধাওয়া করতে আর দেখলাম না।

স্রোতস্বিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ফোলা হাঁটুতে জল দিতে দিতে চ্যালেঞ্জার বললেন—'অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হল যা হোক—এমনই এক অভিজ্ঞতা যার ফলে তিলমাত্র অবিশ্বাসও আর রইল না কারো। সামারলি, টেরোড্যাকটিল ক্ষেপে গেলে কি মূর্তি ধারণ করে, তার একটা অত্যন্ত বিশদ তথ্যচিত্র জীবন্ত হয়ে রইল মনের মধ্যে।'

সামারলি তখন জবাব দেবেন কি, কপালের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ধুতেই ব্যস্ত। ধারালো চঞ্চুর ঠোক্করে আমার ঘাড়ের পেছনে মাংস বেরিয়ে পড়েছিল—চ্যালেঞ্জারের সহর্ষ মন্তব্যের জবাব না দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগলাম। লর্ড জনের কাঁধের কোট ছিঁড়ে ফালি হয়ে ঝুলছে—তবে দাঁতের কামড় চামড়ায় বসেনি—সামান্য আঁচড়ে গেছে।

জের টেনে ফের বললেন চ্যালেঞ্জার—'আক্রমণের ধরনগুলো হরেক রকম এবং প্রণিধান যোগ্য। নিঃসন্দেহে চঞ্চুবিদ্ধ হয়েছে ছোট্ট বন্ধুটি, কিন্তু কামড়ানিতে ছিঁড়ে গেছে কেবল লর্ড জনের কোট। ডানার প্রহার চলেছে কিন্তু আমার এই মূল্যবান মাথাটার ওপর। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, শত্রুর ওপর চড়াও হওয়ার নানারকম রণকৌশলে এরা পোক্ত।'

গম্ভীরবদনে লর্ড জন মন্তব্য করলেন—'বেঁচে গেছি এক চুলের জন্যে। জঘন্য কৃমিকীটের মত এ-হেন আততায়ীদের খপ্পরে প্রাণটা যাচ্ছিল ভাবতেই গা কিরকম করছে আমার। রাইফেল ছোঁড়ার জন্য দুঃখিত। কিন্তু ও ছাড়া আর পথও যে ছাই ছিল না।'

'আপনি না থাকলে এখান অবধি আর পৌঁছোতে হত না,' বললাম আন্তরিকভাবেই।

'বন্দুকের আওয়াজের মত অনেকরকম আওয়াজ শোনা যায় পাথর ফেটে যাওয়ার দরুন অথবা গাছ আছড়ে পড়ার ফলে। তাই বলব, বন্দুকবাজির ফলটা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর নাও হতে পারে। যাক গে, আমার কথা যদি শোনেন তো ফিরে চলুন ক্যাম্পে—একদিনের এই অ্যাডভেঞ্চার হজম করি আগে—কাটাছেঁড়া গুলোয় কার্বলিক লাগানো দরকার এখুনি। কুৎসিত ঐ চোয়ালে কি ধরনের বিষ থাকলেও থাকতে পারে, তা তো কেউ জানি না।'

ঠিক কথাই বলেছেন লর্ড জন। ঢের হয়েছে—আজকে আর না। হ্যাঁ, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এমন অভিজ্ঞতা লাভ কারো অদৃষ্টে ঘটেনি। তা সত্ত্বেও কিন্তু আরো অনেক চমক লেখা ছিল আমাদের কপালে। স্রোতস্বিনীর পাড় বরাবর কাঁটাঝোপের বেড়া দেওয়া ক্যাম্পে পৌঁছে ভেবেছিলাম, অ্যাডভেঞ্চার বুঝি বা শেষ হল অবশেষে। কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার আগে মস্তিষ্ককে ঘর্মাক্ত করতে হয়েছিল গভীরতর বিষয় নিয়ে। ফোর্ট চ্যালেঞ্জারের গেট কেউ স্পর্শও করে নি, কাঁটা-ঝোপের ব্যারিকেডও অটুট, তা সত্ত্বেও আমাদের অনুপস্থিতিতে শিবির পরিদর্শন করে গেছে বিচিত্র এবং বলবান কোনো প্রাণী। পায়ের

ছাপ কোথাও নেই—কাজেই জীবটা কি ধরনের তা আঁচ করা গেল না। তবে প্রকাণ্ড জিঙ্কো বৃক্ষের শাখা প্রশাখা যে-ভাবে আনত রয়েছে শিবিরের ওপর, তা থেকে অনুমান করে নেওয়া গেল কি কৌশলে আবির্ভাব এবং তিরোধান ঘটেছে বিচিত্র আগন্তুকের। সে যে বিপুল হিংস্র শক্তির অধিকারী তার বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রমাণ রয়ে গেছে ভাঁড়ারের জিনিসপত্রের অবস্থার মধ্যে। পুরো জায়গা জুড়ে এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যাবতীয় বস্তু। একটা টিনের কৌটো থেঁৎলে ফেলা হয়েছে ভেতরকার মাংস লুঠ করার লালসায়। দেশলাইয়ের বাক্সর মত খান্ খান্ করে দেওয়া হয়েছে কার্তুজভর্তি একটা বাক্স। পাশেই পড়ে আছে একটা ফাঁপা তামার গোলা—ফালি ফালি করে ফেলে রেখে দিয়েছে ছত্রাকার কার্তুজের মধ্যে। দেখে শুনে আবার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে গেল অস্পষ্ট আতংক অনুভূতিতে। ভয়ার্ত চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম চারদিকের তমিস্রাঘন গাঢ় ছায়াপুঞ্জের পানে। মনে হল যেন সব কিছুর মধ্যেই ওৎ পেতে রয়েছে রক্ত হিম করা একটা না একটা নারকীয় আকৃতি। ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম জাম্বোর চিৎকারে। দৌড়ে গেলাম মালভূমির কিনারায়। বসে থাকতে দেখলাম তাকে ওপারের পর্বত চূড়োয়।

'মাসা চ্যালেঞ্জার, সব ঠিক আছে! সব ঠিক আছে! আমি আছি এখানে! ভয় নেই। যখন চাইবেন, পাবেন আমাকে।'

ওর নির্মল কৃষ্ণবর্ণ মুখচ্ছবি আর তারও পেছনে আমাজন পর্যন্ত বিস্তৃত ধূ ধূ গিরি, প্রান্তর, অরণ্য আবার আশ্বস্ত করে তুলল আমাদের প্রত্যেককেই। মনে পড়ে গেল, না, আমরা কোনো দুর্দান্ত আন্‌কোরা নতুন গ্রহের আদিম বন্য পরিবেশের বাসিন্দা নই—আমাদের বাড়ীঘরদোর আত্মীয় পরিজন রয়েছে ঐ দূরে—দিগন্তরেখারও ওপারে—আদিম যুগের আরণ্যক আমরা নই—আমরা এই বিংশ শতাব্দীর মানুষ। যাদুমন্ত্রবলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে উপনীত হইনি—এসেছি স্বেচ্ছায় অজানাকে জানার অভিলাষ নিয়ে। দূর দিগন্তের ঐ বেগুনি রেখার ওপারে সুবৃহৎ নদীর জল কেটে ভেসে চলেছে স্টীমারের পর স্টীমার, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতম প্রসঙ্গ নিয়ে মুখর হয়ে রয়েছে ওখানকার মানুষ—আর আমরা আটকা পড়েছি লুপ্ত যুগের প্রাণীদের মধ্যে। সুদূরের সেই নিত্যকার দৃশ্য আর কথোপকথন কল্পনা করে শুধু নির্নিমেষে চেয়েই রইলাম—

হু হু করে উঠত, বুকের ভেতরটা !

চমকপ্রদ এই দিবসটির আর একটি স্মৃতি জাগরূক রয়েছে আমার মনের মধ্যে—তা লিপিবদ্ধ করেই শেষ করব এই চিঠি। জখম হওয়ার ফলেই বোধ-হয় মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে গিয়েছিল প্রফেসর দুজনের। আততায়ীরা কোন প্রজাতিভুক্ত, এই নিয়ে তুমুল তর্ক লেগেছে দুজনের মধ্যে—টেরোড্যাকটিল, না, ডাইমোরফোডন। চড়া চড়া মন্তব্য বিনিময় চলছে দু-তরফেই। খিচির-মিচির থেকে দূরে সরে গিয়ে নিরিবিলিতে একটা ধরাশায়ী গাছের গুঁড়িতে বসে আনমনে ধূমপান করছি, এমন সময়ে মন্থর চরণে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন লর্ড জন।

বললেন—'ম্যালোন, জানোয়ারগুলোর আস্তানাটা মনে পড়ছে ?'

'ছবির মত।'

'আগ্নেয়গিরির গর্ত, তাই না ?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'মাটিটা দেখেছো ?'

'পাথর।'

'কিন্তু জলের ধারে—নলখাগড়া শরবন যেখানে ?'

'নীলচে মাটি। কাদামাটির মত দেখতে।'

'এগজ্যাক্টলি। নীল কাদামাটি ভর্তি একটা আগ্নেয়গিরির নল।'

'তাতে কী ?'

'কিসসু না, কিসসু না !' বলে বিবদমান দুই বিজ্ঞান-তপস্বী অভিমুখে পাদচারণা করলেন লর্ড জন। দূর থেকেই শুনলাম তুঙ্গে পৌঁছেছে দ্বৈরথ সমর, সামারলির উচ্চনিনাদী কাংস্যকণ্ঠ চাবুক হেনে চলেছে চ্যালেঞ্জারের নিম্নগ্রামের মঞ্জিল ঠন্ ঠনে স্বরগ্রামের ওপর। লর্ড জনের কথাগুলো ভুলেই যেতাম যদি না সেই রাতেই ফের কানে ভেসে আসতো তাঁর স্বগতোক্তি—'নীল কাদামাটি—আগ্নেয়গিরির নলে নীল কাদামাটি !' ক্লান্তিকর নিতল সুপ্তির গহনে তলিয়ে যাওয়ার আগে ওঁর সেই শেষ কথাগুলো এখনো কানে ঝংকার তুলে চলেছে।

১১ ॥ নায়ক হলাম ঐ একবারই

ঠিকই আঁচ করেছিলেন লর্ড জন রক্সটন। হানাদার কদাকার বীভৎস প্রাণীগুলোর দাঁতে বিষ থাকা বিচিত্র নয়। প্রথম দিবসের সেই লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের পরের প্রত্যুষে বিষম যন্ত্রণা আর জ্বরে কাবু হলাম আমি আর সামারলি, হাঁটুর ব্যথায় ল্যাংচাতে লাগলেন চ্যালেঞ্জার। সারাদিন

তাই শিবিরেই রইলাম। যতটা পারলাম লর্ড জনকে সাহায্য করলাম—উনি কাঁটাঝোপের ব্যারিকেড আরো ঘন এবং উঁচু করে তুলছিলেন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়তর করার অভিপ্রায়ে। বেশ মনে আছে, সারাদিন কিন্তু গা ছমছম করছিল অদ্ভুত অনুভূতির জন্যে। কে বা কারা যেন সমানে নজর রেখে চলেছে আমাদের ওপর—কিন্তু তারা কারা, লুকিয়ে আছে কোথায় —তা বোঝা যাচ্ছে না।

অনুভূতিটা এত বেশী অস্বস্তির সৃষ্টি করে চলেছিল যে চ্যালেঞ্জারকে না বলে পারিনি। উনি কারণটা ব্যাখ্যা করে দিলেন তৎক্ষণাৎ। জ্বরের প্রকোপে গুরুমস্তিষ্কে উত্তেজনার সঞ্চার ঘটেছে। খিলেনের মত ছড়িয়ে পড়া বিশাল মহীরুহদের সুমহান রন্ধ্রসম তমিস্রা ছাড়া আর কিছুই চক্ষু গোচর হল না। তা সত্ত্বেও অনুভূতিটা প্রখরতর হয়ে উঠতে লাগল শনৈঃ শনৈঃ—জিঘাংসা-কুটিল সজাগ-দৃষ্টি কোনো একটা সত্তার নির্নিমেষ চাহনি যেন নিবদ্ধ রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের ওপর অত্যন্ত কাছ থেকেই। স্মরণ পথে উদিত হল কুরুপুরি সম্পর্কে ইণ্ডিয়ানদের কুসংস্কার। ভয়াবহ বনের দেবতা—অরণ্যের অন্তরালে যার নিবাস। প্রত্যন্ত প্রদেশের তার এই গোপন ও পবিত্র বিবরে প্রেতচ্ছায়ার মত অশরীরী-উপস্থিতি উপলব্ধি করলাম আমার সমগ্র সত্তা দিয়ে।

সেই রাতেই, মানে, ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডে আমাদের তৃতীয় রজনীতে বুক কাঁপানো একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম কাঁটা ঝোপের বেড়া দুর্ভেদ্যতর করে তুলে লর্ড জন আমাদের কতখানি উপকার করেছেন। অকাতরে ঘুমোচ্ছিলাম। উঠে বসলাম ধড়মড় করে উপর্যুপরি কয়েকটা অত্যন্ত আতংকজনক চীৎকার আর আর্তনাদে—জীবনে এরকম আর্ত হল্লাবাজি শুনিনি। শব্দটার উৎস আমাদের ক্যাম্পের কয়েক-শ গজের মধ্যেই এবং বিস্ময়কর সেই তুমুল হট্টগোলের সঙ্গে তুলনীয় কিছুর উল্লেখ করতে আমি অক্ষম। শব্দটা রেলইঞ্জিনের মত কর্ণপটহবিদারী তীক্ষ্ণ হুইসল্ ধ্বনির মত অনেকটা—হুইসল্-য়ের আওয়াজ হয় সুস্পষ্ট, যান্ত্রিক এবং শাণিত—কিন্তু বিচিত্র এই নিনাদ নিঃসীম বিভীষিকা আর কাৎরানিতে গুরু গুরু গম্ভীর শব্দে যেন থরথর করে কাঁপছে। স্নায়ুমণ্ডলী যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেল অপার্থিব সেই চাপা মরণান্তক কাতর হু-হুংকারে—হাত দিয়ে তাই কান চেপে ধরলাম। কুলকুল করে হিমশীতল স্বেদধারায় সিক্ত হল সর্বাঙ্গ—শব্দকারীর দুর্দশা কল্পনা করে শিহরিত হল হৃৎপিণ্ড। ঐ একটিমাত্র ভয়াবহ যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হল যেন অসীম

দুঃখ, উর্ধ্বাকাশের উদ্দেশে আত্যন্তিক অভিযোগ আর নিপীড়িত প্রাণ-স্ফুলিঙ্গের যাবতীয় দুর্দশা। উচ্চনিনাদী ঝংকারময় এই হাহাকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে শোনা গেল আর একটা রক্তজলকরা চাপা হাসি। যেন নাভিমূল থেকে, বক্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে, গুরুগুরু নিনাদ থেমে থেমে উঠে আসছে উৎকট উল্লাসে সেই ঘরঘরে গার্গল করার মত অট্টহাসি—চাপা-গলায় গজরে ওঠার মত বিকট হাসি কিম্ভূত সংমিশ্রণ রচনা করে চলেছে আতীক্ষ্ণ আর্তনাদের সঙ্গে। মিনিট তিন-চার অব্যাহত রইল লোমহর্ষক সেই যুগ্ম শব্দলহরী—পত্রপল্লবের মধ্যে মুখর হয়ে উঠল চমকিত বিহঙ্গকুল। তারপরেই আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল শব্দযুগল—শুরু হয়েছিল যেমন অতর্কিতে—শেষও হল তেমনি আচম্বিতে। বেশ কিছুক্ষণ রোমাঞ্চিত কলেবরে নিঃশব্দে বসে রইলাম চারজনে। তারপর অগ্নিকুণ্ডে একবোঝা কাঠকুটো নিক্ষেপ করলেন লর্ড জন। প্রদীপ্ত আগুনের আভায় উদ্ভাসিত হল চারজনের মুখাবয়ব—আগুনের আভা পৌঁছোলো মাথার ওপরকার পত্রপল্লব শাখা প্রশাখাতেও।

বললাম ফিসফিস করে—'কিসের শব্দ বলুন তো?'

লর্ড জন বললেন—'কাল সকালে জানা যাবে। খুব কাছেই ঘটল ব্যাপারটা—ঘাসজমি থেকে বেশী দূরে নয়।'

চ্যালেঞ্জার বললেন—'প্রাগৈতিহাসিক ট্র্যাজেডী আড়ি পেতে শোনবার সৌভাগ্যলাভ ঘটল এই অধমদের—এ নাটক দেখা যেত জুরাসিক উপহ্রদের কিনারায় নলখাগড়া বনের মধ্যে—পাঁকের মধ্যে পিষে মেরে ফেলত ছোট ড্রাগনকে বড আকারের ড্রাগন,' বললেন এমন মর্যাদা-মন্থর কণ্ঠে যা আমি কখনো তাঁর কণ্ঠে শুনিনি। 'সৃষ্টি শুরু হওয়ার অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিল বলেই মানুষ জাতটা বেঁচে গেছে। দৈহিক শক্তি অথবা যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে অতীতের সেই ভয়াবহ শক্তিকে পরাভূত করার ক্ষমতা ছিল না মনুষ্য নামক এই দ্বিপদ কীটের। আজ রাতে শক্তির যে নমুনা শ্রবণ করলেন, লাঠি, তীর আর গুলতি দিয়ে কি তা বাগে আনা যেত? আধুনিক রাইফেল দিয়েও কি এই দানবকে ঘায়েল করা যায়?'

এক্সপ্রেস রাইফেলটায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে লর্ড জন বললেন—'ছোট্ট বন্ধুর কথাতেই বরং সায় দেব আমি। শিকার করার সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে না—অধিকারটা পশুদেরও আছে বৈকি।'

হাত তুলে চাপা গলায় সামারলি বললেন—'চুপ। শুনতে পাচ্ছেন?'

নিথর নিস্তব্দতা ভেদ করে সহসা জাগ্রত হল একটা গভীর নিয়মিত

ছন্দের ধুপ-ধাপ শব্দ। পা ফেলে ফেলে অগ্রসর হচ্ছে কোনো প্রাণী—সন্তর্পণে ভারী কোমল থাবা তালে তালে পড়ছে মাটিতে। ধীর গতিতে পা টিপে টিপে প্রদক্ষিণ করে এল শিবির প্রাঙ্গণ—তারপর স্তব্ধ হল প্রবেশপথের সামনে। শোনা গেল চাপা সোঁ-সোঁ হিস্-হিস্ শব্দ—শব্দটা উঠছে এবং নামছে—বাড়ছে এবং কমছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। নিশীথরাত্রের এই বিভীষিকা আর আমাদের মধ্যে রয়েছে কেবল একটা কাঁটা ঝোপের সামান্য ব্যারিকেড। রাইফেল আঁকড়ে ধরলাম প্রত্যেকেই—অগ্নিবর্ষণের সুবিধের জন্যে ঝোপের খানিকটা ফাঁক করে নিলেন লর্ড জন।

বললেন ফিসফিস করে—'আরে সর্বনাশ! দেখতে পাচ্ছি যে!'

ওঁর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ফাঁকের মধ্যে চোখ চালিয়ে দিলাম আমি। দেখতে আমিও পেলাম। গাছের গাঢ় ছায়ার মধ্যে গাঢ়তর একটা কালো ছায়া ঘনীভূত হচ্ছে আস্তে আস্তে—অস্পষ্ট আকারের দানা বাঁধা এখনো যেন সম্পূর্ণ হয়নি। মূর্তিমান জিঘাংসা আর প্রাণশক্তি যেন গুঁড়ি মেরে রয়েছে শব্দহীন নিথরতায়। ঘোড়ার চাইতে উঁচু নয়—কিন্তু অস্পষ্ট বহিঃরেখা থেকে আন্দাজ করে নেওয়া যায় আয়তন তার বিপুল, এবং অপরিমেয় শক্তির অধিকারী। ইঞ্জিনের বাষ্প বেরিয়ে যাওয়ার মত নিয়মিত ছন্দের হিস্-হিস্ শব্দের শ্বাস-প্রশ্বাস শুনে বোঝা যায় দেহযন্ত্র তার দানবিক আকারের। নিঃশব্দ সঞ্চার ঘটল একবারই—আগুনের আভায় ঝলসে উঠতে দেখলাম দুটো ভীষণাকৃতি সবুজ চোখ। শোনা গেল একটা শিহরণ জাগানো খচ্‌মচ্ শব্দ—যেন ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে সামনে।

রাইফেলের ট্রিগার তুলে দিয়ে বললাম—'লাফাবে মনে হচ্ছে।'

'খবরদার। গুলি চালিও না!' চাপা গলায় তেড়ে উঠলেন লর্ড জন—'নিস্তব্ধ জঙ্গলে বন্দুকের আওয়াজ পৌঁছোবে বহু মাইল দূরে। নিরুপায় না হলে রাইফেল চালিও না।'

'ঝোপ টপকে এলেই তো গেছি,' নার্ভাস গলায় হাসতে গিয়ে বেসুরো বিকট আওয়াজ বেরুলো সামারলির গলা দিয়ে।

'না, না, ঝোপ পেরোতে আমি দেব না। কিন্তু গুলি এখন ছুঁড়বেন না—ওটা মুলতবি থাক শেষ মুহূর্তের জন্যে। দেখাই যাক না কি করতে পারি।'

কোনো মানুষের বুকের পাটা যে এরকম হতে পারে জানতাম না। হেঁট হয়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে একটা জলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে তীরবেগে লর্ড জন। ধেয়ে গেলেন স্বরচিত ঝোপের ফাঁক দিয়ে। ভীষণ দংষ্ট্রা বিকাশ করে যুদ্ধে হবে করা চিৎকার ছেড়ে নিশীথ রাতের মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন এগিয়ে এল করা যাক।'

সংকল্প-কঠিন কণ্ঠে লর্ড জন সায় দিলেন—'তা তো বটেই। তবে প্রহরা মোতায়েন না করে আর ঘুমোচ্ছি না। এ রকম একটা সৃষ্টিছাড়া দেশে কারও হাতে সুযোগ তুলে দেওয়ার শর্মা আমি নই। প্রত্যেককে এখন থেকে দু-ঘণ্টা জাগতে হবে।'

'তাহলে আমিই আগে পাইপটা শেষ করে নিই,' বললেন প্রফেসর সামারলি। সেই থেকে নৈশ প্রহরীর বন্দোবস্ত না করে কেউ আর নিদ্রা দেবীর আরাধনা করার সাহস পাইনি।

পরের দিন সকালে আবিষ্কার করলাম গত রাতের বীভৎস আর্তনাদ আর অট্টরোলের অকুস্থল। ভয়াবহ কশাইখানায় পরিণত হয়েছে ইগুয়ানোডনদের সবুজ-সুন্দর বিচরণভূমি। সমগ্র তৃণভূমি জুড়ে ছড়িয়ে থাকা খণ্ডবিখণ্ড বড় বড় মাংসের টুকরো দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি বা বেশ কয়েকটা হতভাগ্য নিহত হয়েছে। খুঁটিয়ে দেখবার পর আবিষ্কার করলাম খতম হয়েছে শুধু একটা ইগুয়ানোডন—কিন্তু ঘাতক প্রাণীর আকার আয়তন তার চাইতে ক্ষুদ্রকায় হওয়া সত্ত্বেও নিঃসীম নৃশংসতার দরুন বেচারীকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে রেখেছে সবুজ ঘাসজমির চারিদিকে।

প্রতিটা মাংসখণ্ডই আকারে প্রকাণ্ড। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন প্রফেসর দুজন। তন্ময় হয়ে বচসা চালিয়ে গেলেন বর্বর দাঁত আর প্রকাণ্ড থাবার চিহ্নগুলো সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য মারফৎ।

একটা বিরাট সাদাটে মাংসখণ্ড হাঁটুর ওপর রেখে বললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—'রায় দান এখন স্থগিত থাকুক। দাঁতালো বাঘের কামড়ের দাগও তো হতে পারে। কিন্তু কাল রাতে যাকে দেখেছি, সে আকারে আরো বড়—সরীসৃপজাতীয় প্রাণী। আমি তো বলব অ্যালোসরাস।'

'অথবা মেগালোসরাস,' মন্তব্য জাহির করলেন সামারলি।

'ঠিক, ঠিক। দুটোই বড় সাইজের মাংসাশী ডাইনোসর—দুটোর যে কোনো একটাই এসেছিল কাল টহল দিতে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী আরও অনেক শ্রেণীর অনেক ভয়ংকর পশু-জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে এ অঞ্চলে—একদা যারা অভিশপ্ত করে তুলেছিল পৃথিবীকে, অথবা এই মুহূর্তে যারা সাজানো রয়েছে মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে।' বলতে বলতে চ্যালেঞ্জার হাসতে লাগলেন আত্ম-শ্লাঘায় স্ফীত হয়ে। কৌতুকবোধ তাঁর অল্প থাকলেও ওঁর মেঘমন্দ্রে ধ্বনিত স্থূলতম কৌতুকরসও উল্লাস-মুখর স্বীকৃতি পেয়ে যায়—বরাবর ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি ওঁর সান্নিধ্যে থেকে। হো-হো করে হেসে উঠলেন নিজেই নিজের রসিকতায়। কাঁটছাট গলায়

দাবড়ানি দিলেন লর্ড জন—'আঃ! কতবার আর বলব, যত কম আও করতে পারেন, ততই আমরা নিরাপদ। কাছাকাছি কি অথবা কে আছে, এখনো কিন্তু তা জানি না। প্রাতরাশের লোভে ব্যাটাচ্ছেলে ফিরে এসে আমাদের ওপর চড়াও হলে কেঁদে কূল পাবেন না—হাসি বেরিয়ে যাবে তখন। ভাল কথা, ইগুয়ানোডনের চামড়ায় এই দাগটা কিসের বলুন তো?'

ম্যাড়মেড়ে, আঁশযুক্ত, স্লেট-রঙীন চামড়ার ওপর ঘাড়ের কাছে অদ্ভুত চাকার মত একটা কালচে দাগ—জিনিসটাকে দেখতে অনেকটা পিচের মত। কিসের দাগ কেউ বলতে না পারলেও সামারলি বললেন, দু-দিন আগে একটা বাচ্চা ইগুয়ানোডনের ঘাড়ে প্রায় এমনি দাগই উনি দেখেছেন। চ্যালেঞ্জার মুখে কিছু না বললেও এমন একখানা জমকালো আত্মগৌরবে স্ফীত ভাব নিয়ে রইলেন যেন ইচ্ছে করলেই তিনি দাগ রহস্য ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন। লর্ড জন শেষকালে জিজ্ঞেস করলেন এ-ব্যাপারে তাঁর কি অভিমত।

ব্যস, আর যায় কোথা! বহুমুখী ছুরির মত শাণিত বিদ্রূপ যেন ফ্যাঁস করে অনেকগুলো ফলা একসঙ্গে মেলে ধরলো চারপাশে—'হুজুর অনুমতি না দিলে তো আমার মতামত ব্যক্ত করতে পারি না। হুজুরের ঐ চোখরাঙানিতে অভ্যস্ত নয় এই শর্মা। নির্দোষ রসিকতায় হেসে ওঠার আগে যে আপনার অনুমতি নেওয়ার দরকার, এটা তো জানা ছিল না।'

লর্ড জন ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত শান্ত করা গেল না ক্ষুব্ধ চ্যালেঞ্জারকে। তারপর অবশ্য একটা ধরাশায়ী গাছের গুঁড়ির ওপর জাঁকিয়ে বসে চিরাচরিত অভ্যেস মত ভাষণ প্রদান শুরু করলেন এমন ভঙ্গিমায় যেন হাজার ছাত্র জমায়েৎ হয়েছে তাঁর সামনে।

বললেন—'দাগটা পিচের—সতীর্থ এবং বন্ধুবর প্রফেসর সামারলির সঙ্গে আমি একমত। অতীত অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন এ-অঞ্চলে হরবখৎ দেখা যাচ্ছে। পাতাল-শক্তিদের সঙ্গে পিচের সম্পর্ক কারও অজানা নয়, নিশ্চয় তরলাবস্থায় পিচ আছে কোথাও। ইগুয়ানোডনদের গায়ে সেই পিচই লেগেছে। তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কিন্তু :কাল রাতের মাংসাশী জন্তুটাকে নিয়ে—তার হিংসাবৃত্তির নমুনা ঘাস জমিতে তো দেখাই যাচ্ছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, গড়পরতা মাপে একটা ইংলিশ জেলার চাইতে বড় নয় এই মালভূমি। সঙ্কীর্ণ এই পরিসরে অসংখ্য বছর ধরে এমন সব জানোয়াররা সহাবস্থান করে চলেছে যাদের অস্তিত্ব অনেক আগেই লোপ

পেয়েছে নিচের পৃথিবী থেকে। এ থেকেই আমার মনে হচ্ছে সুদীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে মাংসাশী জীবগুলোর বংশবৃদ্ধি বাধাহীনভাবে এগিয়ে চললে খাবারের ভাঁড়ার অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। ফলে হয় মাংস খাওয়ার অভ্যেস ত্যাগ করত, না হয় স্রেফ খিদের জ্বালায় অক্কা পেত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা হয় নি। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রয়েছে এখানে—ফলে, ভয়ংকর হিংস্র এই জীবগুলো সংখ্যায় অগুন্তি হয়ে ওঠেনি। আমাদের সামনে এখন যে কটা কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যা আশু সমাধানের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তার অন্যতম হল এই প্রাকৃতিক ভারসাম্যের রহস্য-সূত্র উদ্ঘাটন করা—কি কি প্রক্রিয়া প্রয়োগে প্রকৃতি দেবী রাশ টেনে বেধড়ক বংশবৃদ্ধি রোধ করে রেখেছেন—তা আবিষ্কার করা। সবিনয় শুধু এই টুকুই আপাততঃ নিবেদন করতে পারি যে অদূর ভবিষ্যতে মাংসাশী ডাইনোসরদের আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুবর্ণ সুযোগ আমরা পাবই পাব।'

'সবিনয়ে আমিও নিবেদন করে রাখি, ঐ রকম সুবর্ণ সুযোগ যেন কক্ষনো না পাই,' ফস্ করে বলে উঠলাম আমি।

প্রত্যুত্তরে চ্যালেঞ্জার মহাশয় শুধু তাঁর বিশাল ভুরু যুগল ঊর্ধ্বে উত্তোলন করলেন—দুষ্টপ্রকৃতি ছাত্রের অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যশ্রবণে স্কুল শিক্ষক যা করেন—অবিকল সেই ভঙ্গিমায়।

বললেন—'প্রফেসর সামারলির সম্ভবতঃ কোনো বক্তব্য থাকতে পারে এ-ব্যাপারে।'

সঙ্গে সঙ্গে দুরূহ বিজ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন হলেন বিজ্ঞান-তপস্বী দু-জন। ঊর্ধ্ব-লোকের বৈজ্ঞানিক কচকচানি বিন্দু বিসর্গ বুঝলাম না। শুধু আঁচ করলাম, একটা সম্ভাবনা নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধ লেগেছে দুই মহারথীর মধ্যে। টিঁকে থাকার সংগ্রামে খাবার ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই কি শেষ পর্যন্ত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উন্নততর কোনো সংস্করণ রূপে বংশবৃদ্ধি ঠেকিয়ে রেখেছে?

সকালবেলা মালভূমির অল্প খানিকটার মানচিত্র রচনা করলাম। এড়িয়ে গেলাম টেরোড্যাকটিলদের আস্তানা। স্রোতস্বিনীর পশ্চিম দিক বর্জন করে পর্যবেক্ষণ চালালাম পূর্বদিকে। এদিকে বনজঙ্গল বেশ নিবিড়। ঝোপ-ঝাড় আগাছা গুল্ম এত বেশী যে শ্লথ হয়ে গেল আমাদের অগ্রগতি।

ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের আতংক চিত্রের বর্ণনাই এতাবৎকাল দিয়ে এসেছি। কিন্তু আশ্চর্য এই দেশের সৌন্দর্যটুকু একবারও ভুলে থাকিনি। সারা সকালটা হেঁটে গেলাম অপূর্ব ফুল ঝোপের মধ্যে দিয়ে। বেশীর ভাগই সাদা

আর হলদে রঙের। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বললেন, সবই নাকি আদিম যুগের ফুল কোথাও কোথাও ফুলঝোপ এত নিবিড় যে মাটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না—কোমর অবধি উঁচু পুষ্পকানন ঠেলে এগোতে এগোতে মন মাতাল হয়ে উঠল অপূর্ব সৌরভে। ফুলের গন্ধ যে এত তীব্র অথচ এত মিষ্টি হয়, কে জানত। পায়ের তলায় মনে হল যেন ফুলের গালিচা পাতা রয়েছে। চার পাশেই বোঁ-বোঁ শব্দে উড়ছে ঘবোয়া ইংলিশ মধুমক্ষিকা। আনত বৃক্ষশাখার তলা দিয়ে যাওয়ার সময়ে চেনা এবং অচেনা অনেক ফল দেখলাম। পাখী ঠোকরাচ্ছে কোন্ কোন্ ফলগুলো, সেই দেখে বিষফল এড়িয়ে গিয়ে অনেক সুস্বাদু ফল সংগ্রহ করলাম পেটপূজার অভিপ্রায়ে। বিস্তর জলা জায়গা রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে—এ-রকম একটা জলার কাদায় ইগুয়ানোডনদের পদচিহ্ন চোখে পড়ল। ভারী জন্তুর হেঁটে যাওয়ার ফলে শক্ত পথ রেখাও দেখেছিলাম সেদিন। এক জায়গায় বেশ কয়েকটা ইগুয়ানোডনকে চরতে দেখে দূরবীন চোখে লাগালেন লর্ড জন। বললেন, একই রকম পিচের কালো দাগ দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের গায়ে, কিন্তু নানা জায়গায়। দাগটা যে কিসের, তা কিন্তু কেউ বুঝিয়ে বলতে পারলেন না।

সজারু এবং আঁশযুক্ত পিঁপড়ে-খেকোর মত ছোট ছোট জানোয়ারও দেখলাম বিস্তর। দেখলাম একটা দাঁতালো চিত্রবিচিত্র বর্ণান্বিত বন্য শূকর—দাঁতদুটো হাতীর দাঁতের মত লম্বা এবং বাঁকানো। একবার গাছ পালার ফাঁক দিয়ে কিছু দূরে চোখে পড়ল সবুজ পাহাড়ের খানিকটা—গা বেয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল পিঙ্গল-বর্ণ একটা প্রাণী। এত জোরে ধেয়ে গেল যে ভাল করে দেখাও গেল না চেহারাটা। লর্ড জন বললেন, নিশ্চয় হরিণ। তাই যদি হয় তো বলব আকারে সে দানবিক আইরিশ এল্ক্-য়ের সমান—আমার জন্মভূমির কাদামাটির ভেতর থেকে আজও মাঝে মাঝে যাদের খুঁড়ে বার করা হচ্ছে।

মূল ঘাঁটিতে সেই রহস্যময় আগন্তুকের আবির্ভাবের পর থেকেই প্রতিবারই ফিরে আসতাম নতুন কিছু নষ্টামি দেখার প্রত্যাশায়। প্রত্যাশা বিফল হয়নি কোনোবারেই। এবার কিন্তু হতাশ হলাম। যেখানকার জিনিস, সেখানেই আছে। সন্ধ্যানাগাদ বসলাম বিরাট আলোচনা সভায়। আলোচনা বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কিত। বিশদ বিবরণ দেওয়া দরকার এই কারণে যে এই আলোচনার ফল শ্রুতি স্বরূপ ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের অনেক খবরাখবর পাওয়া গিয়েছিল—পরের কয়েক সপ্তাহের অভিযানে যা বিশেষ কাজে লেগে-

ছিল। বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন প্রফেসর সামারলি। সারাদিন খ্যাঁক খ্যাঁক করে গেছেন কলহপ্রিয় মেজাজে। আগুনে ঘি পড়ল লর্ড জনের একটি প্রস্তাবে—উনি জানতে চেয়েছিলেন আগামীকাল আমাদের করণীয় কী।

সামারলি তিড়বিড়িয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে—'আজ, কাল, পরশু এবং তার পরের দিনগুলিতেও আমাদের করণীয় কেবল একটাই—এই ফাঁদ থেকে কেটে পড়ার পথ খোঁজা। আপনারা সকলেই চাইছেন তল্লাটের আরো ভেতরে ঢুকতে—আমার ব্রেন চাইছে বাইরে চম্পট দিতে।'

খানদানী দাড়ি চুমড়োতে চুমড়োতে বজ্রনাদে তৎক্ষণাৎ হেঁকে উঠলেন চ্যালেঞ্জার—'কোনো বিজ্ঞান-সাধকের মাথার মধ্যে যে এ-হেন ইতর ধারণা বাসা নিয়ে থাকতে পারে ভাবতেও অবাক হচ্ছি। যে দেশে এসেছেন, সে দেশে আসবার সুযোগ ক'টা প্রকৃতিবিদ্ পায় বলতে পারেন? ক'টা উচ্চাভিলাষী প্রকৃতিবিদ্ এ প্রলোভন সামলে থাকতে পারে? সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমরা ছাড়া এ সুযোগ আর কেউ পেয়েছে? তা সত্ত্বেও ভাসা-ভাসা সামান্য কিছু জ্ঞান আহরণ করেই আপনি পাত-তাড়ি গুটোনোর অভিলাষ ব্যক্ত করছেন? প্রফেসর সামারলি, এর চাইতে আর একটু মহান মন্তব্য আপনার কাছে আশা করেছিলাম।'

তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন সামারলি—'মহাশয়ের মনে রাখা উচিত যে লণ্ডনে বিরাট একপাল ছেলে মেয়ের ক্লাশ নিতে হয় আমাকে—এই মুহূর্তে তারা অপটু হাতে শিক্ষিত হয়ে চলেছে। আপনার পরিস্থিতি আর আমার পরিস্থিতি তাই এক নয়। কেন না, আজ পর্যন্ত কোনো দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষকতার ভার আপনার ওপর চাপানো হয়নি।'

'হক্ কথাই বলেছেন মাই ডিয়ার সামারলি। ছোটখাট বিষয়ের পেছনে আমার এই নিখাদ মগজের শক্তি ব্যয় করতে চাই না বলেই উচ্চতম মৌলিক-গবেষণায় ব্যাপৃত থাকি—ছোট ব্যাপার নিয়ে মগজ অপবিত্র করতে চাই না বলেই তো জ্ঞান বিতরণের অনেক বড় প্রস্তাব পায়ে মাড়িয়ে গেছি বারংবার।'

'যেমন?' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন সামারলি অসীম অবজ্ঞায়—কিন্তু তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন লর্ড জন।

বললেন—'আমি তো বলব এ অঞ্চলের আরো খবরাখবর না নিয়ে লণ্ডনে ফিরে যাওয়াটা একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

ধুয়ো ধরলাম আমিও—'ম্যাকআর্ডল বুড়োর মুখের সামনে গিয়ে

দাঁড়ানোর মত বুকের পাটাও আমার থাকবে না (স্যার, অকপট প্রতিবেদনের জন্যে ক্ষমা করছেন তো ?)আধাখ্যাঁচড়া রিপোর্টের জন্যে তুলোধোনা করবেন চিরটা কাল। তাছাড়া, ইচ্ছে থাকলেও চম্পট দেওয়ার পথটা কোথায় ?'

চ্যালেঞ্জার বললেন—'ছোট্ট বন্ধুর আদিম কমন সেন্স ওর অপরিহার্য মানসিক ঘাটতিগুলোকে দিব্বি ধামাচাপা দিয়েছে দেখা যাচ্ছে। ওর জঘন্য পেশার স্বার্থ গোল্লায় যাক—আমাদের কোনো আগ্রহই নেই। কিন্তু কথাটা বলেছে ঠিকই—চম্পট দেওয়ার পথ যখন নেই, তখন তা নিয়ে আলোচনা করা মানে প্রাণশক্তির অপব্যয়।'

পাইপ টানতে টানতে সামারলি গরগর করে উঠলেন—'যাই করুন না কেন, সেটাই এখন প্রাণশক্তির অপব্যয়। লণ্ডন প্রাণীবিজ্ঞান সমিতি বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে আমাদের—দয়া করে তা স্মরণ করুন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বিবৃতির সত্যতা যাচাই করতে এসেছি এবং স্বীকার না করে পারছি না—বিবৃতি অনুমোদন করার মত পরিস্থিতিতে পৌঁছেও গেছি। অতএব কর্তব্য সুসম্পাদিত হয়েছে—লক্ষ্যে উপনীত হয়েছি। মালভূমির বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা ছোট এই অভিযাত্রীদলের কর্ম নয়—এজন্যে চাই আরও লোক, আরও বিশেষ ধরনের সরঞ্জাম। কিন্তু আমরা যদি তা করতে যাই, তাহলে বিজ্ঞান-দুনিয়াকে উপহার দেওয়ার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে-টুকু তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাও আর কোনোদিন সভ্য জগতে পৌঁছোবে না। মালভূমি যখন দুরারোহ মনে হয়েছিল, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তখন তার সমাধান করে আমাদের এখানে ফেলেছেন। কাজেই বেরিয়ে যাওয়ার সমস্যা সমাধানের ভারটুকুও তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার ওপর ছেড়ে দিতে চাই।'

স্বীকার করছি, সামারলির যুক্তি অকাট্য বলেই মনে হয়েছিল আমার কাছে। এমন কি চ্যালেঞ্জার শুদ্ধ হৃদয়ঙ্গম করলেন, সত্যিই তো শত্রুদের একহাত নিতে হলে সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে লণ্ডনে না ফিরে গেলেই নয়—যদি না ফেরেন, ওঁর মিথ্যেবাদী প্রবঞ্চক বদনাম তো কোনোদিন ঘুচবে না। বৈরী বৈজ্ঞানিকদের তো মুখ চুন করা যাবে না।

তাই বললেন—'এখান থেকে নিচে নামার সমস্যাটা আপাতঃ দৃষ্টিতে ভয়ংকর কঠিন মনে হলেও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তা সমাধান করা যাবে বলেই মনে হয় আমার। সতীর্থ বন্ধুর সঙ্গে আমি একমত। ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডে দীর্ঘদিন অবস্থান করা বর্তমান পরিস্থিতিতে বিধেয় নয়—অচিরে

এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করা কর্তব্য। তবে পুরো তল্লাটটার একটা মোটামুটি সরেজমিন তদন্ত না করে এবং মানচিত্র জাতীয় কিছু একটা হাতে না নিয়ে ফিরতে আমি রাজী নই একেবারেই।'

অসহিষ্ণু নাসিকাগর্জন করলেন প্রফেসর সামারলি।

'দু-দুটো দিন অভিযান চালানোর পরেও জায়গাটার সঠিক ভূগোল জ্ঞান এখনো অর্জন করতে পারিনি। জঙ্গলঠাসা এ-অঞ্চল ভেদ করে সমস্ত জায়গায় যেতে মাস কয়েক লাগবে—একটা জায়গার সঙ্গে আর একটা জায়গার সম্পর্ক বার করা চাট্টিখানি কথা নয়। পাহাড় চূড়া থাকলে ওপর থেকে পুরো জায়গাটার চেহারা দেখে নেওয়া যেত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চারদিক থেকে মালভূমি ঢালু হয়ে মাঝখানে নেমে গেছে। কাজেই যেখানেই যাই না কেন, একই চেহারা চোখে পড়বে।'

অকস্মাৎ প্রেরণায় উদ্বেলিত হলাম ঠিক এই মুহূর্তটিতে। চোখ পড়ল মাথার ওপর বিশাল ডালপালার চাঁদোয়া মেলে ধরা প্রকাণ্ড জিঙ্কো বৃক্ষের খাঁজকাটা গুঁড়িটার ওপর। যে গাছের গুঁড়ি অন্য সব গাছের গুঁড়ির চাইতে মোটা, নিশ্চয় তার উচ্চতা অন্য সব গাছের চাইতে বেশী হবে। মালভূমির কিনারাটাই এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু জায়গা, এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। সুতরাং গাছটার মগডালে উঠতে পারলেই তো ওয়াচ-টাওয়ারের শীর্ষদেশ থেকে বহু দূর পর্যবেক্ষণ করার মত গোটা মালভূমির চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আয়ার্ল্যাণ্ডে বালক বয়েসে দুষ্টুমি করে অনেক গাছে উঠেছি। গাছে-চড়া বিদ্যেয় আমি যে-রকম পোক্ত, বিদ্যের জাহাজ এই তিনজনের কেউ তার ধারকাছ দিয়েও যেতে পারবে না। পর্বতারোহণে এঁরা দক্ষ হতে পারেন—বৃক্ষারোহণে নয়। একদম নিচের ডালখানা যদি পাকড়াও করতে পারি কোনমতে—মগডাল পর্যন্ত উঠে যেতে পারব অনায়াসেই। আইডিয়াটা শুনে আনন্দে প্রায় নেচে উঠলেন তিন কমরেড।

গালের আপেল জোড়া কুঞ্চিত করে বললেন চ্যালেঞ্জার—'ছোট্ট বন্ধুটির চাইতে আমাদের চেহারা যতই নিরেট আর প্রভুত্বব্যঞ্জক হোক না কেন, ওর পক্ষে যে জিমন্যাস্টিক দেখানো সম্ভব, আমাদের কারোর পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই সানন্দে হাততালি দিয়ে গ্রহণ করলাম ওর সিদ্ধান্ত।'

ধাঁই করে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে লর্ড জন বললেন—'আরে ছোকরা, তুমি তো দেখছি ভারী সেয়ানা—ঠিক পথ বাৎলে ফেলেছো! আইডিয়াটা আমাদের মাথায় আগে কেন এল না ভেবে অবাক হচ্ছি! যাক গে, দিনের

আলো ফুরোতে আর মোটে এক ঘণ্টা বাকী। নোটবই পকেটে নিয়ে যদি উঠে যেতে পারো, এইটুকু সময়ের মধ্যেই একটা খসড়া নক্সা এঁকে নিতে পারবে। গুলিবারুদের এই তিনখানা বাক্স ওপর-ওপর রেখে তার ওপর দাঁড়িয়ে আমিই তোমাকে তুলে দিচ্ছি।'

বাক্সর ওপর দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে লর্ড জন শূন্যে তুলতে লাগলেন আমাকে—আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম গুঁড়ির দিকে। আচমকা ভীমবেগে ধেয়ে এসে খাঁ করে বিশাল হস্তের এক ধাক্কায় চ্যালেঞ্জার প্রায় শূন্যে নিক্ষেপ করলেন আমাকে। ঠিক যেন কামানের গোলার মত ঠিকরে গেলাম ওপর দিকে। খপাৎ করে দু-হাতে ডালটা আঁকড়ে ধরে পায়ের জোরে আগে হাঁটু তুললাম ডালের ওপর, তারপর দেহটা। মাথার ঠিক ওপরেই দেখলাম মইয়ের ধাপের মত পর-পর তিনটে চমৎকার প্রশাখা—তারও ওপরে ঘন শাখা-প্রশাখা—ঝপাঝপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম তার মধ্যে। এত তাড়াতাড়ি উঠতে লাগলাম যে অল্পক্ষণের মধ্যেই জমি আর দেখতে পেলাম না পায়ের তলায়—শুধু ডাল আর পাতার নিবিড় আবরণ। মাঝে বাধা পেলাম বটে, একবার আট দশ ফুট লম্বা একটা লতা বেয়েও উঠতে হল। তা সত্ত্বেও রীতিমত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল বৃক্ষারোহণ পর্ব—চ্যালেঞ্জারের মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর শুনলাম যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। গাছটা সত্যিই বিরাট। মাথার ওপর তাকিয়ে পত্রপল্লব ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। এক-জায়গায় একটা যেন ঝোপের মত ঝাড় দেখলাম—পরজীবী গুল্মাদি বলেই মনে হল। আমি যে ডাল বেয়ে উঠছি, চাপ বাঁধা ঝাড়টা রয়েছে সেই ডালেই। পাশ দিয়ে তাকিয়েছিলাম ওপাশে কি আছে দেখবার জন্যে। ফলটা হল ভয়াবহ। আর একটু হলেই বিষম বিস্ময়ে আর আতংকে হাত ফসকে পড়ে যেতাম নিচে।

মাত্র ফুটখানেক কি ফুটদুয়েক তফাতে একটা মুণ্ড কটমট করে চেয়ে আছে আমার পানে। মুণ্ডটা যার, বিচিত্র সেই প্রাণীটাও সেই মুহূর্তেই পরজীবীর ওপাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেছিল কার আগমন ঘটেছে এ-পাশে। মুখটা মানুষের—নিদেনপক্ষে আজ পর্যন্ত যত বাঁদরের মুখ দেখেছি—তাদের চাইতে অনেক বেশী মানবিক। লম্বাটে, সাদাটে মুখ ভর্তি ব্রণ, নাকটা চ্যাপ্টা, নিচের চোয়ালটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে, থুৎনি ঘিরে খোঁচা খোঁচা ঝাঁটার কাঠির মত দাড়ি। পুরু আর নিবিড় ভুরুযুগলের নিচে চোখ দুটো পাশবিক এবং ভয়াবহ—আমাকে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে হুংকার ছাড়তেই দেখলাম ধারালো, বাঁকানো কুকুরে-দাঁত।

ক্ষণেকের জন্যে ক্রুর দুই চোখে দেখলাম ঘৃণা আর বিদ্বেষের স্ফুরণ। পর-মুহূর্তেই যেন বিদ্যুৎ চমকের মতই জিঘাংসার জায়গা জুড়ে বসল অপরিসীম আতংকবোধ। সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্যে ক্ষিপ্তের মত গোঁৎ মারতেই কানে ভেসে এল ডালপালা ভাঙার মড়মড় শব্দ। চকিতের জন্যে দেখলাম লালচে শূকরের মত একটা লোমশ দেহ—পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল দুলন্ত পাতা আর শাখা-প্রশাখার মধ্যে।

'ব্যাপার কী?' নিচ থেকে ভেসে এল লর্ড জনের চিৎকার—'ঝামেলায় পড়লে নাকি?'

আমি তখন জবাব দেব কী, সারা শরীর কাঁপছে স্নায়বিক উত্তেজনায়। কোন মতে ডালটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে বললাম চিৎকার করে—'দেখেছেন?'

'দুমদাম একটা আওয়াজ শুনলাম বটে, পা পিছলে গেল নাকি? ব্যাপার কি খুলে বলো ছোকরা!'

বানর-মানুষের অকস্মাৎ এবং অদ্ভুত আবির্ভাবে তখন এমন মানসিক ধাক্কা খেয়েছি যে দ্বিধায় পড়লাম আর ওপরে ওঠাটা ঠিক হবে কিনা ভেবে। নেমে গিয়ে বলব ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত? কিন্তু এতটা উঁচুতে ওঠবার পর হাতের কাজ শেষ না করে নেমে যেতেও আত্মসম্মানে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে দম-আটকানো ভাবটা কাটিয়ে উঠলাম, সাহস ফিরিয়ে আনলাম এবং আবার বৃক্ষারোহণ পর্ব চালিয়ে গেলাম। একবার একটা পচা ডালে পা পড়ায় দু-হাতে শূন্যে ঝুলে রইলাম কয়েক সেকেণ্ড—এ ছাড়া মোটামুটি ভাবে খুব একটা বেগ পেতে হল না। আস্তে আস্তে পত্র-পল্লব বিরল হয়ে আসতে লাগল চারপাশে। মুখে হু-হু হাওয়ার ঝাপটা অনুভব করলাম। বুঝলাম, জঙ্গলের সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে এসেছি। মগডালে না পৌঁছোনো পর্যন্ত আশপাশে তাকাবো না মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম বলেই উঠতে লাগলাম আরো ওপরে—শেষকালে এমন একটা জায়গায় পৌঁছোলাম যেখানকার ডাল নুয়ে পড়তে লাগল আমার দেহের ভারে। এইখানে একটা দু-ফেঁকড়া ডালের মাঝে গ্যাঁট হয়ে বসে দৃষ্টিপাত করলাম নিচের আশ্চর্য দেশের মণ্ডলাকারে বিস্তৃত অপরূপ চিত্রপটের মত দৃশ্যের দিকে।

পশ্চিম দিগ্‌রেখার ঠিক ওপরে তখন তপনদেব আবির্ভূত হয়েছেন। উজ্জ্বল গোধূলি-আভায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পায়ের তলায় পুরো মালভূমির চেহারা। ডিমের মত যেন একটা মানচিত্র। প্রতিটি আবয়বিক বাহু-

রেখা সুস্পষ্ট। প্রতিটি অঞ্চলের সীমা আর উচ্চাবচতা সুচিহ্নিত। লম্বায় প্রায় তিরিশ মাইল—চওড়ায় প্রায় কুড়ি। মোটামুটি আকারটা অগভীর ফানেলের মত। কিনারা থেকে জমি ঢালু হয়ে নেমে এসে মিশেছে মাঝের বিরাট সরোবরে। লেকটার পরিধি সম্ভবত: দশ মাইল। সন্ধ্যালোকে ঘন সবুজ এবং ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে। কিনারা ঘিরে নলখাগড়া শরের নিবিড় বেড়। জলের হেথায় হোথায় মাথা তুলেছে কয়েকটা হলুদবর্ণ বালির চড়া। নরম সূর্যালোকে চক্‌চক্ করছে সোনার মত। বালির কিনারায় পড়ে আছে অনেকগুলো লম্বা গাঢ়বর্ণ বস্তু—অ্যালিগেটর অত বড় হয় না, ক্যানো অত লম্বা হয় না। দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখলাম বস্তুগুলো সজীব—কিন্তু ঠিক কি জিনিস, তা ঠাহর করেও আন্দাজ করতে পারলাম না।

মালভূমির যেখানে আমরা রয়েছি, সেইখান থেকে ঢালু অরণ্যভূমি প্রায় পাঁচ ছ-মাইল নেমে গিয়ে লেকের ধারে শেষ হয়েছে। ঢালু জঙ্গলের মাঝে মাঝে রয়েছে সবুজ তৃণভূমি। পায়ের ঠিক তলায় দেখলাম ইগুয়ানোডনদের তৃণভূমি। দূরে গাছপালার মাঝে একটা গোলাকার খোলা জায়গা—টেরোড্যাকটিলদের জলাভূমি। মুখ ফিরিয়ে রয়েছি যে পাশে, সেদিকে মালভূমি কিন্তু অন্য রকম চেহারা নিয়েছে। বাইরে যে-রকম ব্যাসাল্ট পাথরের খাড়াই পাঁচিল দেখেছি, ভেতরেও অবিকল তাই। প্রায় দু-শ ফুট উঁচু। ঠিক যেন দুর্গের প্রবণভূমি—চট করে চড়াও হতে পারবে না শত্রু। তলদেশে বনজঙ্গল ছাওয়া ঢালুজমি। জমি থেকে কিছুদূরে লাল পাথরের প্রাচীর-সদৃশ পাহাড়ের পাদমূলে সারি সারি অনেকগুলো অন্ধকার গর্ত দেখলাম। দূরবীন চোখে মনে হল যেন গুহামুখ। একটা গুহামুখের সামনে সাদামত কি যেন চক্‌চক্ করছিল—কিন্তু বোঝা গেল না জিনিসটা কী। সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত বসে বসে পুরো তল্লাটটার একটা ম্যাপ এঁকে ফেললাম। তারপর এমন অন্ধকার নামল যে খুঁটিয়ে আর কিছু দেখতে পেলাম না। নেমে এলাম সঙ্গীদের কাছে। উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে বসেছিল তিনজনে গুঁড়ির গোড়ায়। অভিযানে এই একবারই নায়ক হতে পারলাম—নায়কোচিত সম্বর্ধনা লাভ করলাম। মতলবটা ভেবেছি একা, রূপায়নও হল আমার একার দ্বারা। এখন থেকে আর অন্ধের মত মাসের পর মাস ঝোপঝাড় হাতড়ে বেড়াতে হবে না—ম্যাপ তো হাতে। আর অজ্ঞাত বিপদের মোকাবিলা করতে হবে না—ম্যাপই বলে দেবে কোথায় যাওয়া দরকার, আর কোন জায়গাটা এড়িয়ে যাওয়া শ্রেয়। ম্যাপ-প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়ার আগেই অবশ্য আমি শুনিয়ে রাখলাম ডালপালার মধ্যে বানর-মানুষের

সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত বসে বসে পুরো তল্লাটটার একটা ম্যাপ এঁকে ফেললাম। পৃ ১৫১

সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারের কাহিনী।

বললাম—'ব্যাটা ওখানে রয়েছে গোড়া থেকে।'

'তুমি জানলে কি করে?' শুধোলেন লর্ড জন।

'ক্রুর কুটিল কিছু একটা সমানে আমাদের ওপর নজর রেখে চলেছে, এই অনুভূতিতে প্রথম থেকেই গা-শিরশির করেছে আমার। বলেও ছিলাম প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে।'

'ছোট্ট বন্ধুটি এ-ধরনের কথাবার্তা বলেছিল বটে। প্রাচীন মানব কেল্টদের বংশধররা আজও তো আছে আয়ার্ল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের উত্তরদিকে, বেল্‌স্ প্রভৃতি অঞ্চলে। তাদের মন মেজাজের অধিকারী হয়েছে আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুটিও—ঈশ্বরদত্ত এ ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আর কারো নেই বলেই আমাদের মনে এই জাতীয় অনুভূতি জাগে না।'

'টেলিপ্যাথি তত্ত্ব—' পাইপ ঠাসতে ঠাসতে শুরু করলেন সামারলি।

কিন্তু তাঁকে তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিয়ে সংকল্প-কঠিন কণ্ঠে বললেন চ্যালেঞ্জার—'তত্ত্বটা এতই বিরাট যে এখন তা আলোচনা করার সময় নয়।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন এমন স্নেহার্দ্র কণ্ঠে যেন রবিবাসরীয়-বিদ্যালয়ে ভাষণ প্রদান করছেন যাজক মশায়—'হাতের চেটোর ওপর বুড়ো আঙুলটা আড়াআড়িভাবে রাখতে পারে কিনা দেখেছো? যাকে দেখে এলে, সেই জীবটার কথা বলছি।'

'না, একেবারেই না।'

'ল্যাজ ছিল কী?'

'না।'

'গুঁড়ি আঁকড়ে ধরবার উপযুক্ত কি পায়ের গড়ন? বাঁদরদের যেমন থাকে?'

'পা দিয়ে আঁকড়ে ধরতে না পারলে অত তাড়াতাড়ি ডালপালার মধ্যে দিয়ে পালাতে পারত বলে মনে হয় না।'

'প্রফেসর সামারলি, স্মৃতিচারণ করছি—ভুল হলে শুধরে দেবেন। যদ্দূর মনে পড়ে দক্ষিণ আমেরিকায় ছত্রিশটা প্রজাতির বাঁদর আছে। কিন্তু নরদেহী বানর আজও অজ্ঞাত। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ-অঞ্চলে অস্তিত্ব রয়েছে তাদের। কিন্তু তারা লোমশ গরিলা শ্রেণীর নয়—এ শ্রেণীর নরবানরদের আফ্রিকা বা প্রাচ্যদেশ ছাড়া দেখা যায় না।' (ওঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে অভিমতটায় নিজস্ব মতামত প্রক্ষিপ্ত করার প্রলোভন সম্বরণ করে নিলাম—আফ্রিকান গরিলার তুতো ভাইকে তো কেনসিঙটনেই দেখে এসেছি)।

'এ হল শ্মশ্রু-বিশিষ্ট বিরঙ শ্রেণীর নরবানর—যা থেকে একটাই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—শাখামৃগ-মানবটি নিরালা-নিকুঞ্জনিবাসী। এখন প্রশ্ন হল এই : বৃক্ষবাসী মহাশয়ের কতখানি অংশ মানুষ, আর কতখানি অংশ বাঁদর—কেমন, তাই না? শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইতর ব্যক্তিরা যাকে 'মিসিংলিঙ্ক' বলে—সে হল তাই। এই সমস্যাটার আশু সমাধানই এখন আমাদের কর্তব্য হোক।'

অতর্কিতে সামারলি বলে উঠলেন—'মোটেই না। মিস্টার ম্যালোনের বুদ্ধিমত্তা আর তৎপরতার ফলে ম্যাপটা যখন হাতে পাওয়া গেছে' (শব্দগুলো হুবহু উদ্ধৃত না করে পারলাম না, স্যার), 'তখন আমাদের একমাত্র এবং আশু কর্তব্য হওয়া উচিত বিকট এই তল্লাট ছেড়ে আস্ত শরীর আর প্রাণগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়া।'

'অহো! ইন্দ্রিয়পরায়ণ সভ্যতার কি জলন্ত উদাহরণ!' যেন বিলাপ করে উঠলেন চ্যালেঞ্জার।

'আজ্ঞে না, স্যার! লেখনী-পরায়ণ সভ্যতার জলন্ত উদাহরণ! আজ পযন্ত যা দেখেছি, তা লিপিবদ্ধ করা আমাদের প্রথম কর্তব্য। অভিযানের পরবর্তী পর্যায়টুকু মুলতবি থাক অন্যদের জন্যে। মিস্টার ম্যালোন ম্যাপটা এঁকে আনার আগে এ-ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম আমরা।'

চ্যালেঞ্জার বললেন—'বেশ তো, অভিযানের ফলাফল বন্ধুবর্গের হাতে পৌঁছে গেলে আমিও তো অনেক মানসিক নিশ্চিন্তি পাই। কিন্তু এ অঞ্চল থেকে নামব কি করে, এখনো তা ভেবে পাচ্ছি না, তবে কি জানেন, আজ পর্যন্ত এমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন আমি হইনি যার সমাধান আমার এই উদ্ভাবনী মগজটা করে উঠতে পারে নি। আজকের দিনটা যাক। কথা দিচ্ছি, কাল আমার মস্তিষ্ক শক্তি কেন্দ্রীভূত করব এই সমস্যার সমাধানে।'

ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটে গেল এইখানেই। সন্ধ্যা হল। অগ্নিকুণ্ড আর একটিমাত্র মোমবাতির আলোয় নোট বইতে টুকে আনা খসড়া মানচিত্র থেকে একটা ম্যাপ বানিয়ে নিলাম। যেখানে যা দেখেছি, তা বসিয়ে দিলাম। লেকের বিরাট ফাঁকা জায়গাটায় পেন্সিল রাখলেন চ্যালেঞ্জার।

বললেন—'কি নাম দেওয়া যায় বলুন।'

ছোবল মেরে গরল ঢেলে দেওয়ার সুযোগ পেলে সামারলি কখনো ছাড়েন না। ভদ্রলোক প্রকৃতই কটুভাষী। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? নিজের নামটাকেই অমর করে রাখুন না কেন!'

কঠোর কণ্ঠে জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার—'উত্তরকালে আমার এই নাম-

খানার ওপর অন্য অনেক এবং আরও ব্যক্তিগত দাবীদার থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। পাহাড় অথবা নদীর নামে অপদার্থ স্মৃতিকে জিইয়ে রাখতে চায় কেবল জ্ঞানাভিমানী নির্বোধরাই। এ ধরনের কোনো স্মৃতিস্তম্ভের প্রয়োজন আমার নেই।'

বক্র হেসে সামারলি আর একটা আক্রমণ চালাবার তোড়জোড় করছেন দেখে ঝটিতি কথার মধ্যে কথা বলে উঠলেন লর্ড জন।

বললেন—'ওহে ছোকরা, লেকটাকে প্রথম তুমিই দেখেছো। নামকরণের ভারটাও তুমি নাও না কেন। 'লেক ম্যালোন' নামও যদি দাও, কারো আপত্তি হবে না।'

তৎক্ষণাৎ ধুয়ো ধরলেন চ্যালেঞ্জার—'খাঁটি কথা। ছোট্ট বন্ধুই নাম দিক লেকটার।'

স্বীকার করছি, জবাব দিতে গিয়ে মুখ-টুখ লাল হয়ে গেছিল আমার। বলেছিলাম—'নাম হোক 'লেক গ্ল্যাডিস'।'

'সেন্ট্রাল লেক নামটা আরও অর্থব্যঞ্জক হত না কি?' বললেন সামারলি।

''লেক গ্ল্যাডিস' নামটাই কিন্তু আমার বেশী পছন্দ।'

সহানুভূতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন চ্যালেঞ্জার। তারপর, নামটা যেন পছন্দ হয় নি, এমনি ভান করে বিশাল মাথাখানা নাড়তে নাড়তে শুধু বললেন—'নেহাৎই ছেলেমানুষ! লেক গ্ল্যাডিস নামটাই তাহলে থাক।'

১২ ॥ বিভীষিকাময় অরণ্যের মধ্যে

স্মৃতিশক্তি আজকাল বড়ই নষ্টামি জুড়েছে আমার সঙ্গে—পেরে উঠছি না এই লুকোচুরি খেলার রঙ্গরসে। তাই ঠিক মনে করতে পারছি না গাছে চড়ে ম্যাপ এঁকে উপহার দেওয়ার পর সঙ্গীদের তারিফ শুনে আমার অহংকারে স্ফীত হওয়ার বর্ণনা এর আগে লিখেছিলাম কিনা। পরিস্থিতির বিলক্ষণ উন্নতি ঘটিয়ে ছেড়েছিল ঐ একখানা মানচিত্র—বাঁচিয়েও দিয়েছিল বলা যায়। শুরু থেকেই বয়স, অভিজ্ঞতা, চরিত্র, জ্ঞান এবং যা-কিছু মানুষকে দশজনের মধ্যে একজন করে তোলে—সেই সব ব্যাপারেই আমি ওঁদের থেকে পেছিয়ে থাকায় কিছুতেই নাগাল ধরে উঠতে পারছিলাম না ওঁদের—নিজেকে বড় ছোট, নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছিল ওঁদের তুলনায়। গাছে ওঠার পর থেকেই, আমি যেন সত্যিই একটা কিছু হয়ে উঠেছিলাম। হেঁজি-পেঁজি আর নই—তালে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতা আমারও আছে বৈকি।

ভাবতে ভাবতেই মাথা গরম হয়ে উঠল—আত্মগৌরবে মট্‌ মট করতে লাগলাম। হায়রে! অহংকার থেকেই তো পতন ঘটে মানুষের! এই আপ্তবাক্যটা তখন কিন্তু মাথায় আসেনি আত্মশ্লাঘায় গ্যাসভরা বেলুনের মত ফুলে থাকার দরুন। আত্মতুষ্টির এই স্ফুলিঙ্গটাই বাড়তে বাড়তে আত্ম-প্রত্যয়ের দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আমার অণুপরমাণুতে। ফলে, সেই রাতেই অর্জন করলাম আমার জীবনের ভয়ংকরতম অভিজ্ঞতা—যে অভিজ্ঞতার অন্তে পেলাম প্রচণ্ড মানসিক আঘাত। সে আঘাতের কথা নতুন করে যতবার মনে করি, ততবারই যেন বিকল হয়ে আসে আমার হৃদ্‌যন্ত্র।

ঘটনার সূত্রপাত হল ঠিক এইভাবে। বৃক্ষারোহণের অ্যাডভেঞ্চার অযথা উত্তেজিত করে তুলেছিল আমাকে—তাই ঘুমোতে পারছিলাম না। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখলাম অসম্ভব। নৈশ প্রহরায় আগুনের পাশে বসে ঢুলছিলেন সামারলি। অস্থিসার দেহখানা দুলে দুলে উঠছে ঢুলে পড়ার তালে তালে। কিম্ভূতকিমাকার ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ অপদার্থ রাতের প্রহরী। ছাগুলে-দাড়িটা ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে ঢুলুনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। দক্ষিণ আমেরিকার পোঞ্চো গায়ে জড়িয়ে নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছেন লর্ড জন। চ্যালেঞ্জারের ঘোঁঘোর-ঘোঁ গ্যাঁ-গোঁ গ্যাঁ-গোঁ নাসিকাগর্জনে গমগম্‌ করছে রাতের অরণ্য, প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরে। পূর্ণচন্দ্র কিরণসুধা বিলিয়ে মায়াময় করে তুলেছে বনভূমি। বাতাস হিমশীতল। এমন রাতেই তো বেড়াতে ইচ্ছে যায়! ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণ থেকে থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে ঢুকে পড়ল মাথার মধ্যে। 'মন্দ কী?' চুপি চুপি সেন্ট্রাল লেকটা দেখে এসে প্রাতরাশের আসরে যদি নতুন নতুন জায়গার খবর পরিবেশন করতে পারি, তাহলে আর একদফা হিরো হওয়া তো যাবে—ওঁদের চেয়ে কোনো অংশে যে খাটো নই চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেওয়া যাবে। কল্পনায় আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করে উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম সেই মুহূর্তেই। তারপর? তারপর সারা দিন খবরদারি করে যান না কেন সামারলি, মালভূমি থেকে চম্পট দেওয়ার পথও বার করে দিন না কেন, লণ্ডনে ফিরে যেতে পারব অজ্ঞাত দেশের কেন্দ্রীয় রহস্যের বিশেষ প্রতিবেদন বগলে করে—যে প্রতি-বেদনের রচয়িতা হব কেবল আমিই—কেন না, আমি—একা আমিই—রহস্যভেদ করে আসতে পারবো দুর্গম ঐ অঞ্চলের। মনে পড়ে গেল গ্ল্যাডিসের কথা, তার সেই প্রেরণাদায়ক উক্তিটা জল জল করতে লাগল মনের মধ্যে—'বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমাদের চারদিকে।' ঠিক যে ভাবে বলেছিল কথাটা, হুবহু সেইভাবেই তার অনুরণন জাগল

আমার কোষে কোষে, অস্থিমজ্জায়, প্রতিটি রক্তবিন্দুতে। মনে পড়ল ম্যাক-আর্ডলের মুখখানাও। কাগজের খোলতাই চেহারাখানা কল্পনা করেই আনন্দে শিউরে উঠলাম—তিন কলম জোড়া বিশাল একটা প্রবন্ধ। অহো! অহো! কর্মজীবনের ভিত্তিপ্রস্তর এমন ভাবে গাঁথা হয়ে যাবে যে আমাকে আর আটকায় কে। এরপরের বিশ্বযুদ্ধেই যুদ্ধক্ষেত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হওয়ার সুযোগ এসে যাবে হাতের মুঠোয়! বন্দুক বাগিয়ে, এক পকেট কার্তুজ নিয়ে কাঁটা ঝোপের ফটক সরিয়ে বেরিয়ে এলাম পা টিপে টিপে। আড চোখে দেখে নিলাম বদখৎ কলের পুতুলের মত ধূমায়িত আগুনের ধারে বসে সমানে ঢুলে চলেছেন সামারলি—নৈশপ্রহরী হিসেবে একেবারেই বরবাদ হওয়া উচিত ভদ্রলোকের।

একশগজ যেতে না যেতেই আপশোষের আর অন্ত রইল না—হঠকারিতার জন্যে মুষড়ে পড়লাম ভীষণভাবে। কাজটা কি ভাল হল? এই প্রতিবেদনের আগে এক জায়গায় লিখেছিলাম মনে পড়ছে, আমি এতই কল্পনাপ্রবণ যে দুঃসাহসী হওয়া আমাকে সাজে না। অথচ আমি যে কাপুরুষ, ভীতু—এটাও কাউকে বুঝতে দিতে চাই না। এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়ে গেল এই শক্তিটাই, বাহ্বা লোটার মত কিছু একটা না করে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারলাম না। যেমন পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই যদি ফিরে যাই—কমরেডরা কেউ যদি জানতেও না পারেন যে বাহাদুরি নিতে গিয়ে অন্ধকারেই পালিয়ে এসেছি রামভীতুর মত—তাহলেও আত্ম-ধিক্কারের খপ্পর থেকে তো রেহাই পাবো না। তা সত্ত্বেও কিন্তু আশপাশের পরিবেশ আমার আপাদমস্তকে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলল এমন বিপুল মাত্রায় যে সর্বস্ব দিয়েও সেই মুহূর্তে সসম্মানে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন হঠকারিতার হাত থেকে রেহাই পেতে পারলে বর্তে যেতাম।

জঙ্গলের সেকী চেহারা? বিভীষিকা ওৎ পেতে রয়েছে যেন প্রতিটি পত্রপল্লব, ধূলিকণা ছায়াচ্ছন্ন তমিস্রার মধ্যে। দুর্ভেদ্য অরণ্য যে কাকে বলে, জ্যোৎস্না রাতে তা টের পেলাম হাড়ে হাড়ে। গাছপাতার ঘন বুনটের চাঁদোয়া ভেদ করে অমন সুন্দর পূর্ণ চন্দ্রকে দেখাই যাচ্ছে না। চাঁদের আলো তো নয়ই। অনেক উঁচুতে ডালের পাতায় পাতায় রুপোলি আলোর আভাসটুকু আর নক্ষত্রখচিত আকাশের দু-একটা কণা মাত্র চোখে পড়ছে। অন্ধকারের অস্পষ্টতায় চোখ সয়ে যাওয়ার পর বুঝলাম গাছের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন মাত্রার তমিস্রা বিরাজমান—কোনোটা দৃশ্যমান আবছাভাবে, আবার এদের মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে গুহা-মুখের

মত কয়লা-কালো চাপ-চাপ অন্ধকার—পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখা মাত্র আতংকে হিম হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। আপনা থেকে পায়ের গতি বেড়ে গেল এই সব জায়গায়। মনে পড়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে ইগুয়ানোডনের সেই রক্ত জল করা মরণ-হাহাকার—জঙ্গলের মাথা দিয়ে দূর হতে দূরে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে-হাহাকারের প্রতিধ্বনি। মনে পড়ে গেল লর্ড জনের হাতে ধরা মশালের আভায় সেই বিকট মুখখানা—ব্যাঙের মত গোটা গোটা আঁচিলে ভরা, কষ বেয়ে গড়াচ্ছে রক্তমিশোনো লালা। চলেছি তো তারই শিকার ধরার জায়গা দিয়ে। যে কোনো মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে নামহীন ভয়ংকর এই দানব ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমার ওপর। থমকে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা কার্তুজ বার করে বন্দুকের ব্রীচ খুলে ফেললাম গুলি ভরব বলে। লিভারে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা ডিগবাজি খেয়ে এসে ঠেকল গলার কাছে। সর্বনাশ। করেছি কী? ভুল করে শটগান এনেছি রাইফেলের বদলে!

পেছন ফিরেই চম্পট দানের অভিলাষটা আবার মাথা চাড়া দিল মনের মধ্যে। এই তো সুযোগ—ফিরে গেছি অপদার্থ বন্দুক সঙ্গে এনেছিলাম বলে—এমন একটা অজুহাত দেখালে আর তো কেউ আমাকে কাপুরুষ বলবে না—আত্মধিক্কারেও মরমে মরে যাবো না। কিন্তু মন বড় বিচিত্র জিনিস! পলায়নের ইচ্ছেটা মনের মধ্যে উঁকি মারা মাত্রই আবার সেই নির্বোধ অহংকারটা ঠেলাঠেলি আরম্ভ করে দিল মনের মধ্যে। না, না, বিফল হব না—হতে পারি না—কিছুতেই না। ভয়াবহ এই জঙ্গলে যে-সব রাক্ষুসে জানোয়াররা হাজার বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে আমাকে, রাইফেল হাতে থাকলেও সে-সবের মোকাবিলা করতে পারতাম কি? বন্দুক পালটাতে ক্যাম্পে যদি ফিরি, কেউ তো দেখেও ফেলতে পারে—বার বার কি চোখে ধুলো দেওয়া যায়? তখন তো সব ফাঁস হয়ে যাবে—বেইজ্জতের একশেষ হতে হবে। দরকার কি বাবা, একটু দ্বিধা করে হৃত সাহসটাকে আবার চাড়া দিয়ে নিলাম এবং অপদার্থ বন্দুকটা বগলদাবা করে এগিয়ে চললাম।

অরণ্যের অন্ধকারে গা-ছম ছম করতে লাগল ঠিকই, কিন্তু তার চাইতেও বেশী শিউরে উঠলাম চন্দ্রালোকিত ইগুয়ানোডনদের বিচরণ ভূমিটা দেখে। চাঁদের আলোয় সাদা হয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু নামহীন আতংক সহস্র নাগের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরতে লাগল আমার এমনিতেই কাপুরুষ

সত্তাটাকে। ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে চেয়ে রইলাম খোলা চত্বরটার দিকে। বিরাটকায় জন্তুগুলোর কাউকেই দেখতে পেলাম না। একজনের ঐ শোচনীয় পরিণতির পর হয়ত আহার্য-বোঝাই তল্লাট ছেড়ে চম্পট দিয়েছে দলের বাকী সবাই। আবছা, রুপোলী রাতে প্রাণের স্পন্দন কোথাও দেখলাম না। সাহসে বুক বেঁধে তাই এক দৌড়ে পেরিয়ে গেলাম তৃণভূমি, ওদিকের জঙ্গলে ঢুকে পৌঁছে গেলাম স্রোতস্বিনীর পাড়ে। ঠিক করলাম, এখন থেকে এই ছোট্ট নদীটাই হোক আমার পথ প্রদর্শক। ফুর্তিবাজ সঙ্গীও বটে। কলকল শব্দে খিলখিল করে হাসতে হাসতে যেন ছুটে চলেছে মায়াময় রহস্যাবৃত আতংকঘন অজ্ঞাত দেশের বুক চিরে। ওয়েস্ট কাউণ্টিতে ছেলেবেলায় ট্রাউট মাছ ধরতাম এই রকমই একটা আমুদে ছোট্ট নদীর পাড়ে বসে গভীর রাতে। এই নদীর পাড় বরাবর গিয়ে লেকে পৌঁছোব, ফিরেও আসব ক্যাম্পে নদীর পাড় ধরে। মাঝে মাঝে চাপ চাপ ঝোপঝাড়ের জন্যে দূরে সরে যাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু কলকল খিলখিল শব্দ শুনে আবার ফিরে আসছিলাম পাড়ে।

ঢালু জমি বেয়ে নামতে নামতে দেখলাম বনজঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে। ঝোপঝাড় আর মাঝে মাঝে দু-একটা মহীরুহ দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। কাজেই এগিয়ে চললাম বেশ দ্রুত বেগে—ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকায় আমাকে কেউ দেখতে না পেলেও আমার নজর রইল সবদিকেই। টেরোড্যাকটিলদের জলাভূমি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় আমার খুব কাছ থেকে বিশফুট চওড়া ডানা ঝটপটিয়ে শূন্যে উড়ে গেল কর্কশ, শুকনো, চামড়াওলা একটা উড়ুক্কু দানব। চাঁদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঝিল্লীআবৃত ডানার মধ্যে দিয়ে শুভ্র চন্দ্রকে দেখা গেল স্পষ্ট এবং মনে হল নিরক্ষীয় শ্বেত দ্যুতির পটভূমিকায় ঝুলছে একটা উড়ুক্কু কঙ্কাল। দেখামাত্র ঝোপের মধ্যে হাঁটু গেড়ে মাথা গুঁজে বসে পড়লাম। কেন না, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তো জেনেছি, একটা মাত্র হাঁক দিয়ে শ-খানেক যমদূত-সদৃশ নারকীয় স্যাঙাৎকে আমার মাথার ওপর এনে ফেলতে পারে ঐ একজনেই। তাই যতক্ষণ না নৈশ-রোঁদ সম্পূর্ণ করে আবার স্বস্থানে ফিরে গেল ঘৃণিত জীবটা, ততক্ষণ ঝোপের মধ্যে বসে রইলাম প্রাণটাকে মুঠোয় নিয়ে।

নিথর রাতের সেই নৈঃশব্দ্যের বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। সূচীভেদ্য স্তব্দতা বিরাজমান দিক হতে দিগন্তে। তারই মাঝে শুনলাম একটা অদ্ভুত চাপা, গুরুগুরু শব্দ। একটা বিরামবিহীন মর্মরধ্বনি···

কলকলানি। শব্দটা আসছে সামনের দিক থেকে। এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল আওয়াজটার মাত্রা—তারপর বুঝলাম এসে গেছি শব্দের খুব কাছেই। থমকে দাঁড়ালাম। আওয়াজটা কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভেসে এল কানের পর্দায়। বুঝলাম শব্দটা আসছে এমন কিছু থেকে যা স্থির—নড়ে চড়ে সরে সরে যাচ্ছে না। যেন একটা কেটলিতে জল ফুটছে বগ্‌বগ্‌ করে। অথবা, মস্ত কড়া চাপানো রয়েছে উনুনে—জল ফুটেই চলেছে। অচিরেই দেখলাম শব্দের উৎস। এক টুকরো ফাঁকা জায়গার ঠিক মাঝখানে রয়েছে যেন ছোট্ট একটা হ্রদ। হ্রদ না বলে ডোবা বলাই উচিত—আকারে লণ্ডনের ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারের ফোয়ারার চাইতে বড় নয়। ডোবার মধ্যে পিচের মত কালো একটা পদার্থের উপরিভাগ উঠছে আর নামছে—বড়বড় গ্যাসের বুদবুদ বিরাট ফোস্কার আকারে ফেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ডোবার ওপর-কার বাতাস থির থির করে কাঁপছে উত্তাপে—চারপাশের জমিও এত গরম যে হাত দিলেই ছ্যাঁকা লাগছে। বেশ বুঝলাম, সুদূর অতীতে যে আগ্নেয়-গিরিটি অগ্ন্যুৎপাৎ ঘটিয়ে মালভূমিকে ঠেলে তুলে দিয়েছিল, আজও তার জঠর শূন্য হয়নি—শক্তি এখনো ঘাপটি মেরে রয়েছে পাতাল বিবরে। জঙ্গলের মধ্যে ঝোপঝাড় আগাছা গুল্ম ঢাকা কালচে রঙের পাথর আর জমাট বাঁধা লাভা দেখেছি বিস্তর, কিন্তু প্রাচীন জ্বালামুখের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলাম এই প্রথম—যে জ্বালামুখ টইটুম্বুর হয়ে রয়েছে ফুটন্ত পিচে। বেশীক্ষণ পর্যবেক্ষণ চালানো সম্ভব হল না, কেন না, ভোরের আগেই তো শিবিরে ফিরতে হবে।

সারা গায়ে কাঁটা দিয়েছিল হেঁটে যাওয়ার সময়ে—রোমাঞ্চকর সেই নৈশ ভ্রমণ দুঃস্বপ্ন হয়ে জেগে থাকবে আমার মনের মণিকোঠায় চিরটা কাল। যখনি চন্দ্রালোকিত খোলা চত্বরের সামনে পৌঁছেছি, কিনারার ঝোপঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে এগিয়েছি চোরের মত পা টিপে টিপে। পৃথিবীপৃষ্ঠে এ-যেন এক অপার্থিব জগৎ—এখানে আমি রবাহুত, অনাহুত, অনিমন্ত্রিত আগন্তুক। এখানে আমায় কেউ চায় না—তাই ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে তটস্থ হয়ে অগ্রসর হয়েছি ছায়া আর অন্ধকারকে আশ্রয় করে। জঙ্গলের মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হতে বহুবার হৃৎপিণ্ড উত্তাল হয়ে উঠেছে ডালপালা ভাঙার মড়মড় শব্দে—খুব কাছ দিয়েই উধাও হয়েছে বনের পশু। মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়েছে বিরাট ঘনীভূত মসীকৃষ্ণ ছায়া—যেন নিরেট তমালপুঞ্জ নিঃশব্দ চরণে থাবায় ভর দিয়ে টহল দিয়ে ফিরছে নিষিদ্ধ এই অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশকারীর ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ার ফিকিরে। বহুবার থমকে দাঁড়িয়ে ভেবেছি, চুলোয় যাক বাহাদুরি নেওয়া—চম্পট দেওয়া যাক এখান থেকেই। কিন্তু প্রতিবারেই সেই নির্বোধ অহংকারটা ভয়ের কণ্ঠরোধ করে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সামনের দিকে, ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে।

ঘড়িতে যখন দেখলাম রাত একটা, তখন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল চকচকে জলের আভাস। দশ মিনিট লাগল সেন্ট্রাল লেকের কিনারা বরাবর নলখাগড়া শরবনে পৌঁছোতে। ভয়ে আর পরিশ্রমে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আকণ্ঠ পান করেছিলাম হ্রদের সুপেয় শীতল জল। যেখানে আমি জল পান করলাম জন্তুর মত, ঠিক ঐ জায়গায় নিশ্চয় জলপান করতে আসে বন্য জন্তুরাও। কেন না, চওড়া পথটার ওপর চারদিক থেকে এসে মিলেছে আরও অনেক বন্য জন্তুর পায়ে মাড়ানো পথরেখা। জলের ঠিক ধারেই একটা প্রকাণ্ড লাভার চাঁই নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। উঠে পড়লাম তার ওপর। চূড়ায় পৌঁছে উপুড় হয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম চারদিকের অপূর্ব বর্ণনাতীত নিশীথ-নিসর্গ।

প্রথম যে জিনিসটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আমার, তা তাজ্জব করার মতই বটে। বিশাল মহীরুহের মগডাল থেকে বহুদূরের খাড়াই প্রাচীরের মত পাহাড়ের গায়ে কতকগুলো অন্ধকার গর্ত দেখেছিলাম—মনে হয়েছিল গুহার মুখ। এখন দেখলাম প্রতিটি গর্ত লালচে আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে। ঠিক যেন তমিস্রার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে জাহাজের একসারি আলোকিত পোর্টহোল। প্রথমে ভেবেছিলাম আগ্নেয়গিরির নিতল কারসাজি—লাভার দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে গুহার মুখ দিয়ে। কিন্তু তা তো নয়। আগ্নেয়গিরির ক্রিয়া তো চলে পাতালের গহ্বরে—পাহাড়ের ওপর দিকে পাথরের গর্ত দিয়ে তো নয়। তাহলে আর কি হতে পারে? দৃশ্যটা ওয়াণ্ডারফুল নিঃসন্দেহে—কিন্তু অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনাটা তো উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। লালচে ঐ দাগগুলো গুহার ভেতরে জ্বলা আগুনের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়—যে আগুন অবশ্যই জ্বলেছে মানুষের হাতে। মানুষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো জীব তো আগুন জ্বালতে শেখেনি। তাহলে মানুষও আছে এই মালভূমিতে। সার্থক হল আমার রাতের অভিযান—গর্বে দশ হাত হয়ে উঠল বুকখানা। লণ্ডনে নিয়ে যাওয়ার মত খবর পাওয়া গেল বটে একখানা।

বহুক্ষণ উপুড় হয়ে শুয়ে চেয়ে রইলাম থির থির করে কাঁপা লালচে আলোগুলোর দিকে। মাইল দশেক দূরে থাকলেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

মাঝে মাঝে আলোগুলো তারার মত মিটমিট করে উঠছে অথবা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ঠিক যেন সামনে দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে। যাবো নাকি এই দশ মাইল পথ ঠেঙিয়ে? মালভূমির অজ্ঞাত মানব কুলের চেহারা এবং চরিত্রের বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর খবর সংগ্রহ করে চমকে দেব কাল সকালে কমবেডদের? অদ্ভুত এই অঞ্চলের মানব সম্প্রদায়ের আকৃতি এবং স্বভাবও নিশ্চয় পিলে চমকে দেওয়ার মত হবে! না, এই মুহূর্তে অতটা সাহস দেখানো ঠিক হবে না। তবে এটাও ঠিক যে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্যাবলী হাতে না নিয়ে মালভূমি থেকে যাওয়াটাও সমীচীন হবে না।

পারদ-পৃষ্ঠের মত চকচকে মসৃণ লেক গ্ল্যাডিসের ঠিক মাঝখানে প্রতি-ফলিত চাঁদের দিকে চেয়ে রইলাম মন্ত্রমুগ্ধের মত। এ-যে আমার একার লেক—আমার মনের মানুষ গ্ল্যাডিসের নামে নামকরণ করা লেক। ঝকঝকে চাঁদের আলোয় পারদ-পৃষ্ঠ বিশাল মুকুরের মত চন্দ্ররশ্মি বিচ্ছুরণ করে চলেছে—চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। দর্পণের বুকে স্থির চাঁদের প্রতিবিম্বের এ-হেন শোভা ধরাপৃষ্ঠে অন্য কোন মানব আজ পর্যন্ত দেখে নি বলেই আমার বিশ্বাস। এ দৃশ্য যে কোনো অ-কবিকেও কবি বানিয়ে তুলতে পারে। অগভীর জল থেকে বহু জায়গাতেই বালির চড়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। স্থির জল কিন্তু একেবারেই নিষ্কম্প নয়—ভাল করে ঠাহর করার পর তা প্রতীয়মান হল। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে প্রাণের চাঞ্চল্য। কোথাও বলয়া-কারে জল ছলকে উঠে তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে, কোথাও বিশাল রজত-শুভ্র মৎস্য শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, কোথাও চলমান জল-দানবের ধনুকাকৃতি স্লেট-রঙীন পৃষ্ঠদেশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। একবার একটা হলুদবর্ণ বালুকাচড়ার ওপর দেখলাম বিশাল রাজহংসের মত একটা প্রাণী। বদখৎ কিম্ভূত-কিমাকার চ্যাপসা আকৃতি। নমনীয় সুউচ্চ লম্বা গলা। বালুকাচড়ার কিনারায় ঝটপট করছে। ডুব দিল পরমুহূর্তেই। জল পৃষ্ঠে কিছুক্ষণ দেখা গেল ধনুকের মত বাঁকানো লম্বা গলাখানা—জল বলয়াকারে ছড়িয়ে গেল দূরে দূরে। তারপর গোঁৎ খেয়ে হারিয়ে গেল জলের তলায়, আর তাকে দেখলাম না।

দূরের এই সব দৃশ্যাবলী থেকে মনোযোগ এবার সরে এল আমার পায়ের ঠিক তলায়। আর্মাডিলোর মত দুটো বিরাটকায় প্রাণী জলের ধারে থেবড়ে বসে জলপান করছে লাল ফিতের মত লম্বা, লিকলিকে জিভ বার করে। জিভ দিয়েই সড়াৎ সড়াৎ করে জল টেনে নিচ্ছে মুখ-গহ্বরে। ডালপালার মত শিং মেলে ধরে প্রকাণ্ড একটা হরিণ তার বউ আর দুটো বাচ্চাকে

নিয়ে আর্মাডিলো দুটোর পাশে এসে জল খাচ্ছে লেকের। অপূর্ব দেহশোভা কর্তা মশায়ের—রাজার মতই চালচলন। ধরাপৃষ্ঠে এমন হরিণের অস্তিত্ব আর কোথাও নেই—বাজি ফেলে বলতে পারি। মুস অথবা এল্‌ক্ হরিণের মত বিরাটকায় হরিণ যুগলও এর কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছোবে কিনা সন্দেহ। অচিরেই সতর্কতাসূচক ধ্বনি ছেড়ে সপরিবারে হরিণ-নৃপতি উধাও হল নলখাগড়া শরবনের মধ্যে—খড়মড় শব্দে চম্পট দিল আর্মাডিলো দুটোও। কেন না, পথ বেয়ে গজেন্দ্রগমনে নেমে আসছে নবাগত এক প্রাণী—অত্যন্ত দানবিক আকারের বিদঘুটে এক প্রাণী।

বিপুল বিস্ময় বোধে স্মৃতির মণি কোঠা হাতড়াতেই গেল খানিকটা সময়। কোথায় যেন দেখেছি এই বদখৎ আকৃতির প্রাণীটাকে—পিঠে যার ত্রিকোণ-ঝালরের শোভা ল্যাজ থেকে মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত—যার অদ্ভুত বিহঙ্গ-সদৃশ মুণ্ডটি ঝুলে পড়েছে জমির খুব কাছে। তারপরেই মনে পড়ে গেল বিদ্যুৎ চমকের মত। এই তো সেই স্টিগোসরাস—যার ছবি স্কেচবুকে এঁকে নিয়ে গিয়েছিল ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইট এবং এই বস্তুটিই প্রথম মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল চ্যালেঞ্জারের! ঐ তো সে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পদতলে—হয়তো সেই বিশেষ প্রাণীটিই যার ছবি ক্ষিপ্তের মত স্কেচবুকে এঁকে নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকান শিল্পীটি। মাটি থর থর করে কাঁপছিল তার বিপুল পদভারে—চক্ চক্ করে জলপানের শব্দটাকেও ছড়িয়ে দিল নিস্তব্ধ রাতের দিক হতে দিগন্তে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে রাতের নৈঃশব্দ্য যেন খান্ খান্ হয়ে গেল! পাঁচমিনিট এইভাবেই তৃষ্ণা নিবারণ করে গেল কদাকার অতিকায় এই প্রাণীটা আমার এত সন্নিকটে থেকে যে ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে তার পৃষ্ঠদেশের কুৎসিত ঝালর স্পর্শ করতে পারতাম। উদকগ্রহণ সমাপ্ত করে পশুরাজের মতই মন্থর চরণে ভারী গতরখানাকে হেলিয়ে দুলিয়ে টেনে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বিশাল বিশাল গোলাকৃতি পাথরখণ্ডর অন্তরালে।

ঘড়ি দেখলাম। রাত আড়াইটে। আর দেরী করা যায় না—এবার ফেরা যাক। মুস্কিল কিছু নয়। ছোট্ট নদীটাকে আগাগোড়া বাঁদিকে রেখে এতটা পথ এসেছি। যে পাথর চাঁইখানায় লম্বমান হয়ে এতক্ষণ প্রাগৈতিহাসিক দৃশ্যাবলী দর্শন করে গেলাম, সেখান থেকে সামান্য দূরেই সেই ছোট্ট নদী কলকলিয়ে খিলখিলিয়ে যেন ডাক দিচ্ছিল আমাকে পুরোনো বন্ধুর মত—রাতের খেলার সঙ্গীকে যেন ডাকছে খেলা শেষ করে যাওয়ার জন্যে। উৎফুল্ল মনে তাই রওনা হলাম। মনটা ভরপুর হয়ে রইল তরতাজা সংবাদের

কদাকার অতিকায় প্রাণীটা আমার এত সন্নিকটে থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করে গেল যে ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে তার পৃষ্ঠদেশের কুৎসিত ঝালর স্পর্শ করতে পারতাম।

পৃঃ ১৬৩

ভাবে—কমরেডদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেওয়ার মত বিস্তর খবর সংগ্রহ করা গেছে এই একটিমাত্র নৈশ-অভিযানে। সব খবরের সেরা খবর অবশ্য আগুনের আভায় প্রদীপ্ত সারি সারি ঐ গুহামুখগুলি—নিঃসন্দেহে আদিম গুহামানবরা নিবাস রচনা করে রয়েছে সেখানে। এ ছাড়াও সেন্ট্রাল লেকে আমার অভিজ্ঞতার সরস বর্ণনা শুনলে চক্ষু চড়কগাছ হবে তিন মহারথীর। লেকের জল যে প্রাণময়, সজীব প্রাণীতে চঞ্চল এবং তাদের এমন অনেককেই স্বচক্ষে দর্শন করে এসেছি যাদের সঙ্গে এর আগে মোলাকাৎ ঘটেনি কারুরই—প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী-দর্শনের সেই বর্ণনাও ওঁদের স্তম্ভিত করে দেবে নিঃসন্দেহে। হাঁটতে হাঁটতে তাই আবিষ্ট হয়েছিলাম আত্ম-প্রসাদের এই সুখচিন্তায়—সত্যিই তো, আজ রাতে আমি যা দেখলাম, পৃথিবীর কটা মানুষের তা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, রজনী অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতা কজনের বরাতে জুটেছে, এহেন তথ্যাবলী সংগ্রহ করার দুঃসাহস কজন দেখিয়েছে।

তন্ময় হয়ে অর্ধেক পথ এসেই পারিপার্শ্বিক জগত সম্বন্ধে অ চাম্বতে সচেতন হলাম। অদ্ভুত একটা শব্দছন্দ শোনা যাচ্ছে আমার পেছনে। চাপা গভীর নাসিকা গর্জন আর ঘোঁৎ ঘোঁতানির সংমিশ্রণ জাতীয় একটা শব্দ—এমনই একটা শব্দ যা নিরতিসীম ভয়ংকর—গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে কোনো নিশাচর প্রাণী রয়েছে আমার পেছনে। কিন্তু তার দর্শনলাভ ঘটছে না। অগত্যা দ্রুত পদসঞ্চারে ধাবিত হলাম শিবির অভিমুখে। আধ মাইল-টাক যেতে না যেতেই শব্দটা পুনরুত্থিত হল আমার আরও কাছে—আগের চাইতে আরো জোরে, আরো লোমহর্ষক গজরানির শব্দতরঙ্গ নিস্তব্ধ যামিনীকে শিহরিত করে তুলছে। হৃৎপিণ্ড বেচারী মনে হল যেন ডিগবাজি খেয়ে এসে ঠেকল গলার কাছে—অজ্ঞাত প্রাণী মহাশয় নিশ্চয় আমার পাছু নিয়েছে—তাই গজরাতে গজরাতে দূরত্ব কমিয়ে আনছে আমার চাইতেও দ্রুতবেগে। কুল কুল করে স্বেদধারা বইতে লাগল শীতার্ত রাতেও, খাড়া হয়ে গেল লোম। অস্তিত্ব বজায় রাখার দ্বন্দ্বে এরা নিজেদেরকে টেনে কামড়ে ছিঁড়ে আঁচড়ে টুকরো টুকরো করে করুক, কিন্তু আধুনিক মানব সম্প্রদায়ের একজনের পেছন পেছন ধাওয়া করবে কোন দুঃসাহসে? যে মানব আজ পৃথিবীর অধীশ্বর, প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবার এক বংশধর সেই মানব কুলেরই একজনকে ফলার করার জন্যে পেছন পেছন আসছে—এই কল্পনাতেই আমার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল লর্ড জনের মশালের আভায় উদ্ভাসিত আঁচিল ভরা, রক্ত আর লালা মাখা সেই মুখখানা যা দান্তে বর্ণিত নরক বর্ণনাতেই শোভা

পায়। ঠক্ ঠক্ করে হাঁটু কাঁপতে লাগল আমার। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গিয়ে পেছন ফিরে চন্দ্রালোকিত পথপানে চেয়ে রইলাম নিবাত নিষ্কম্প দেহে। স্বপ্নলোকের নিসর্গ-দৃশ্যের মত নিবিড় প্রশান্তি কিন্তু নিথর স্তব্দতায় থমথমে। আচমকা ঘোঁ-ঘোঁ গর্-গর্ আওয়াজটা বেসুরো বিকট শব্দলহরী জাগিয়ে তুলল বেখাপ্পাভাবে। রুপোলী চন্দ্রকিরণে স্নাত ঝোপঝাড় আর পথরেখা ছাড়া এতক্ষণ কিছু দেখতে পাইনি। শব্দটা কিন্তু যেন আরও কাছে শোনা গেল—চাপা গলায় খকখকে হাসির মত বীভৎস রক্ত জল করা শব্দটা আরো নিকটতর হয়েছে—হয়ে চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। না, আর কোনো সন্দেহই নেই। আমার পেছন ধাওয়া করছে অজ্ঞাত অঞ্চলের ভয়াবহ কোনো টহলদার—নিকটবর্তী হয়ে চলেছে পলকে পলকে।

পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অনড় অবশ দেহে জ্যোৎস্নার সুষমামণ্ডিত ফেলে আসা পথটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। পরক্ষণেই আচম্বিতে আবির্ভূত হতে দেখলাম তাকে। ফাঁকা জায়গাটার ওপরে ঝোপঝাড় সহসা আন্দোলিত হল ভীষণভাবে—যে-ঝোপ ঠেলে আমি খোলা মাঠ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছি—সেই ঝোপটাই দুলে উঠল যেন চলমান পর্বতের সংঘাতে। প্রকাণ্ড মসীকৃষ্ণ একটা ছায়াপুঞ্জ আচমকা ঝোপ থেকে তড়াক করে লাফ মেরে এসে পড়ল খোলা চত্বরে। চাঁদের আলোয় এখন তাকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। লাফ দিল ঠিক ক্যাঙারুর মত—সামনের দুটি পা সামনে বেঁকিয়ে ধরে শক্তিশালী পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে তুরুক করে লাফ মেরে বেরিয়ে এল ঝোপের মধ্যে থেকে—খাড়া অবস্থায়। সাইজ আর শক্তিতে খাড়াই ঐরাবতের সমান হলেও তেড়ে আসার ধরন দেখে মনে হল সতর্কতায় হার মানায় যে কোনো হস্তীকে। ঐ রকম বিপুল চেহারা নিয়ে এত চটপটে হওয়া যে সম্ভব না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অনভিজ্ঞ চোখে প্রথমে মনে হয়েছিল নিরীহ-প্রকৃতি ইগুয়ানোডন—পরক্ষণেই বুঝলাম একেবারেই ভিন্নশ্রেণীর জীব চলমান আগুয়ান মূর্তিমান ঐ আতংক। তিন-আঙুলে পাতাখেকো শান্ত-প্রকৃতি ইগুয়ানোডন সে নয়—এর মুখ চওড়া, থ্যাবড়া, ব্যাঙের মত—ঠিক যেমনটি দেখেছি ক্যাম্পে লর্ড জনের মশালের আলোয়। বীভৎস হুংকার শুনে আর ভয়াবহ প্রাণশক্তি দেখেই হাড়ে হাড়ে টের পেলাম এই সেই অতিকায় মাংসাশী ডাইনোসর—অত্যন্ত ভয়ংকর যে জীবের সমতুল্য জীব ধরাতলে আজও দেখা যায় নি। এক এক লাফে বিশ ফুট এগিয়ে এসে নাক নামিয়ে আনছে জমির ওপর। বুঝলাম, আমার গন্ধ শুঁকছে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে

এগুচ্ছে। শুধু একবারই দেখলাম ভুল করে ফেলল—ঘ্রাণ শক্তি ব্যর্থ হল। পরক্ষণেই আবার ফিরে পেল গন্ধরেখা এবং আমার মাড়িয়ে আসা পথ বেয়ে ক্যাঙ্গারু-লাফ মেরে এগিয়ে এল বিপুল বেগে।

আজও সেই দুঃস্বপ্ন মনের মধ্যে উঁকি দিলে কপাল ঘেমে যায় আমার, কি করব ভেবে পেলাম না, পাখী-মারা অপদার্থ বন্দুকটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম হতভম্ব হয়ে, এ বন্দুক তো কাজেই আসবে না। উদভ্রান্তের মত আশপাশে দৃষ্টিপাত করলাম পাথর বা বড় গাছের আশায়—কিন্তু চারা গাছের মত সামান্য উঁচু গাছপালা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বিকটাকৃতি ডাইনোসর মহাপ্রভুর অসুর শক্তির নমুনা তো এর আগেও পেয়েছি—মামুলি গাছকে এক নিমেষে উপড়ে আনতে পারে সামান্য নলখাগড়ার মত। কাজেই পলায়ন ছাড়া আর পথ নেই আমার। কিন্তু এবড়ো-খেবড়ো কংকরাকীর্ণ বন্ধুর পথে দ্রুত পলায়নও তো সম্ভব নয়। ক্ষিপ্তের মত ইতিউতি দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা সুস্পষ্ট শক্তমাটির পথরেখা—এ রকম পথরেখা এর আগেও দেখেছি জঙ্গলের মাঝে—বিবিধ বন্যজন্তুর অরণ্যবিহারের রাজপথই বলা যায়। দৌড়বাজ হিসেবে আমার সুনাম আছে, শরীরও বিলক্ষণ মজবুত। কাজেই পরিত্রাণের একমাত্র সড়ক এখন ঐটাই। পাখী-মারা বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আধমাইল-টাক পথ এমন চোঁ-চাঁ দৌড়োলাম যে-দৌড় অলিম্পিক রেসেও কেউ কখনো দৌড়েছে বলে মনে হয় না। ও রকম দৌড় আগেও কখনো দৌড়োইনি—তারপরেও আর দৌড়োতে পারিনি। পা চাড়িয়ে গেল, বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল—তবুও দৌড় থামালাম না। কি করে থামাই? পেছনে যে তেড়ে আসছে চলমান বিভীষিকা! শেষকালে এমন অবস্থা হল যে না দাঁড়িয়ে পারলাম না—বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল। পা আর চলছিল না। মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলাম মূর্তিমান শয়তানটাকে বুঝি হারিয়ে দিতে পেরেছি। পেছনের পথ প্রশান্ত, স্থির, নিস্তব্ধ, পরক্ষণেই আবার মড় মড় দুমদাম শব্দে ঝোপঝাড় তছনছ করে—পদভারে মেদিনী কাঁপিয়ে, সৃষ্টিছাড়া জানোয়ারটা দানবিক ফুসফুসের হু-হুংকারে বাতাস তোলপাড় করে এসে পড়ল আমার ওপর। নাগাল ধরে ফেলে আর কি! বুঝলাম সব শেষ—এ যাত্রা আর প্রাণ নিয়ে ফেরা যাবে না!

ভয়ের চোটে মাথা খারাপ না হয়ে গেলে অতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেউ! আগেই তো পাঁই পাঁই করে দৌড়োনো উচিত ছিল! এতক্ষণ ব্যাটাচ্ছেলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে পেছন ধাওয়া করেছিল,

তাই অগ্রগতি ছিল মন্থর। কিন্তু এখন তো দেখে ফেলেছে আমার এই শ্রীহীন বপুটাকে! লালসায় চক্‌চক্‌ করছে দুই চক্ষু—লালা গড়িয়ে পড়ছে জিঘাংসা-বিকট দুই কষ বেয়ে! ফলে, খিদের জ্বালায়, অথবা শিকার ধরার লোভে, অথবা হিংস্র তাড়নায় লম্বা লম্বা লাফ মেরে ভীম বেগে ধেয়ে এল আমার পানে। মোড় ঘুরেই সে-কী একখানা লাফ! লাফের পর লাফ! যেন একটা বীভৎস অতিকায় ক্যাঙ্গারু কল্পনাতীত লম্ফ প্রদানে নগণ্য একটা দ্বিপদ শিকার কুক্ষিগত করতে চলেছে—স্যার, কল্পনা করে নিন দৃশ্যটা—গায়ের লোম নিশ্চয় খাড়া হয়ে যাচ্ছে! আমার অবস্থা তখন লোমখাড়া হওয়ার চাইতেও শোচনীয়—চাঁদের ঝকঝকে সাদা আলোয় জ্বলজ্বল করছে তার ভাঁটার মত ঠেলে বেরিয়ে আসা ড্যাবডেবে দু-দুখানা চোখ, ঝলসে উঠছে ব্যাদিত মুখ-গহ্বরের সারি সারি বল্লমের মত প্রকাণ্ড দাঁতের সারি। এমন কি শক্তিতে ফেটে পড়া সামনের দুই বাহুর থাবা-প্রান্তের সূচাগ্র নখগুলোও খোলা ছুরির ফলার মত ঝিকমিকিয়ে উঠছে জ্যোৎস্নালোকে! অহো! সেকী দৃশ্য! এ-দৃশ্য কল্পনা করতে গিয়ে আপনার যে হাল হচ্ছে, আমার হল তার সহস্রগুণ অধিক। সীমাহীন আতংকে গগনভেদী আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। অবশ হাত-পায়ের খিল ছেড়ে গেল চক্ষের নিমেষে। চকিতে পেছন ফিরেই উন্মাদের মত পলায়নপর হলাম শক্ত মাটির পথ বেয়ে। পেছনে শুনলাম কদাকার উদ্ভট মাংসলোভী প্রাণীটার স্টীম ইঞ্জিনের মত সঘন নিঃশ্বাস এবং মুহুর্মুহু হুংকার—রক্ত জল করা সেই অবর্ণনীয় নিনাদ-পরম্পরা উচ্চ থেকে উচ্চতর স্বরগ্রামে পৌঁছোচ্ছে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে। গুরুভার ধুপধাপ দুমদাম পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি একদম কানের পাশে। প্রতি মুহূর্তেই ভাবছি—সব শেষ—এই বুঝি ক্যাঁক করে নখরাঘাতে বিদ্ধ করে সারি সারি ছুরিকা-শোভিত ঐ চোয়ালের ফাঁকে ঝুলিয়ে নিল আমাকে! আর ঠিক সেই সময়ে মড মড় মচ মচাৎ শব্দে আমি ধেয়ে গেলাম শূন্যপথে পাতাল অভিমুখে—তারপর সব অন্ধকার এবং পরম নিশ্চিন্তি-বোধে লুপ্ত হয়ে গেল চেতনা।

চৈতন্য ফিরে পেলাম মনে হয় কয়েক মিনিটের মধ্যেই। একটা অত্যান্ত ভয়াবহ আর উগ্রতম দুর্গন্ধই বোধহয় সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল অত চটপট—স্মেলিংসল্টে যেভাবে জ্ঞানহীনের জ্ঞান ফিরে আসে। অন্ধকারে হাত বাড়াতেই হাতে ঠেকল একডেলা প্রকাণ্ড মাংস খণ্ড—আরেক হাতে ঠেকল একটা মোটাসোটা বিরাট হাড়। মাথার ওপর দেখলাম বৃত্তা-

কারে নক্ষত্রখচিত আকাশের একটা টুকরো—যা দেখে বুঝলাম আমি রয়েছি একটা গভীর কূপের তলদেশে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বোলালাম সর্বাঙ্গে। আপাদমস্তক টনটন করছে, কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনড় নয়, অস্থিগুলোও আড়ষ্ট নয়। গর্তের মধ্যে আছড়ে পড়ার আগের ঘটনাটা স্মৃতিতে জাগরুক হতেই সভয়ে চাইলাম ওপরদিকে নক্ষত্র-খচিত আকাশের পটভূমিকায় ভয়াবহ মুখটার কালো ছায়া দেখবার প্রত্যাশায়। কিন্তু কোন চিহ্নই দেখলাম না সচল বিন্ধ্যাচল-সম সেই ভয়ংকর দানব-টার—হু-হুংকার আর সঘন নিঃশ্বাসের শব্দও শুনলাম না। তাই ধীরপদে চারদিকে পায়চারী করে অনুভব করতে লাগলাম কোথায় এসে পড়েছি—এ-কোন্ অদ্ভুত গহ্বরে পরম কারুণিক আমাকে নিক্ষেপ করে বাঁচিয়ে দিলেন এ-যাত্রা।

গহ্বরের দেওয়াল ঢালু হলেও প্রায় খাড়াই অবস্থায় উঠে গেছে ওপর দিকে। তলদেশ সমতল—লম্বায় চওড়ায় বিশ ফুটের মত। বড় বড় মাংসের ডেলায় ভরাট—বেশীর ভাগই পচে গলে এসেছে। বাতাস তাই বিষাক্ত এবং ভয়াবহ। পচা গলা দুর্গন্ধযুক্ত এই সব মাংস খণ্ডর ওপর হুমড়ি খেতে খেতে হঠাৎ হাতে ঠেকল একটা সটান উঠে যাওয়া খুঁটি—বেশ শক্ত ভাবে পোঁতা রয়েছে মাটিতে। খুব উঁচু খুঁটি—হাত বাড়িয়ে ডগার নাগাল পেলাম না। তবে হাত বুলিয়ে মনে হল আগোগোড়া হড়হড়ে চর্বি মাখানো।

হঠাৎ মনে পড়ল, পকেটের মধ্যে টিনের বাক্সে মোমের দেশলাই কাঠি আছে। একটা কাঠি জ্বালাতেই জায়গাটা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেল। কূপটার কাজ কি, সে-বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ আর রইল না। মানুষের হাতে গড়া একটা ফাঁদ। ন'ফুট লম্বা, ডগার দিকে ছুঁচোলো, একটা কাঠের শূল বসানো ঠিক মাঝখানে—বাসি রক্তে কালো হয়ে রয়েছে—হতভাগ্য যে প্রাণীরা শূলে চড়ে প্রাণ দিয়েছে, তাদের রক্ত। চার-পাশে খণ্ডবিখণ্ড মাংসগুলো তাদেরই। শূলের গা থেকে কেটে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পরবর্তী শিকারের মহাপ্রয়াণের পথ প্রশস্ত করার জন্যে। মনে পড়ল চ্যালেঞ্জারের সেই উক্তি—পলকা অস্ত্র নিয়ে দানবশত্রুদের সঙ্গে টক্করে টিঁকে থাকা সম্ভব নয় বলেই মালভূমিতে মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে না। কিন্তু এখন তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দানব-শত্রুদের খতম করে কিভাবে তারা টিঁকে রয়েছে স্রেফ বুদ্ধির জোরে। সরু-মুখ গুহার মধ্যে নিবাস রচনা করেছে যাতে ডাইনোসররা ঢুকতে না পারে। কিন্তু

চাঁদের ঝকঝকে সাদা আলোয় জলজল্ করছে তার ভাঁটার মত ঠেলে বেরিয়ে আসা ড্যাবড়েবে দু-দুখানা চোখ, ঝলসে উঠছে ব্যাদিত মুখ-গহ্বরের সারিসারি বল্লমের মত প্রকাণ্ড দাঁতের সারি। পৃঃ ১৬৮

উন্নত মগজের শক্তি প্রয়োগ করে ডালপাতা দিয়ে ঢাকা গহ্বর বানিয়ে রেখেছে বন্য জন্তুদের চলাফেরার পথে অতর্কিতে তাদের ফাঁদে ফেলে বধ করার মতলবে। মানুষ জাতটা চিরকালই প্রভুত্ব চালিয়ে এসেছে এ পৃথিবীতে—স্মরণাতীতকাল থেকে—বুদ্ধিমত্তায় সে সকলেরই প্রভু। ছিল রয়েছে, থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি বাঁচি কি করে?

গহ্বরের ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া কষ্টকর নয়। তবে যার তাড়া খেয়ে এখানে এসে পড়েছি, যেচে তার মুখের সামনে গিয়ে পড়ার সাহস আমার হল না। তাই দ্বিধাশংকিত চিত্তে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। কাছাকাছি কোনো ঝোপে আমার পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় হারামজাদা ওৎ পেতে বসে আছে কিনা জানি না তো! ডাইনোসরদের স্বভাব প্রকৃতি সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জার আর সামারলির কথা কাটাকাটির খানিকটা মনে পড়ায় সাহস ফিরে এল মনে। অন্ততঃ একটি বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল দুজনের মধ্যে। ডাইনোসর-দের আকার বৃহৎ, কিন্তু সেই তুলনায় করোটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র—করোটি মধ্যস্থ মগজও এত কম যে পর্বত প্রমাণ নির্বুদ্ধিতার জন্যেই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে তারা লোপ পেয়েছে ধরাধাম থেকে।

দুম করে কোথায় উধাও হয়ে গেলাম, এটা বোঝবার জন্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে গেলে দরকার কার্য-কারণ বিচার করবার মত জ্ঞানবুদ্ধি। কিন্তু মস্তিষ্কহীন ঐ রকম একটা প্রাণীর পক্ষে এত ভাবনা চিন্তা বিচার বিশ্লেষণ করা কি সম্ভব? শিকারী প্রাণীর সোঁয়াটে সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে খুব জোর কিছুক্ষণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে বসে থাকবে। পলায়মান দু পেয়েটার অকস্মাৎ অন্তর্ধানে শেষ পর্যন্ত পিছু-ধাওয়া ত্যাগ করে উধাও হবে অন্য উৎকৃষ্টতর শিকারের অন্বেষণে—এমনটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। তাই হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে এলাম গর্তের কিনারায়—জুল জুল করে তাকালাম চারিদিকে। আকাশের তারা ফিকে হয়ে আসছে, আকাশ সাদা হয়ে আসছে, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে উৎকণ্ঠিত মুখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। বিকটাকার শত্রু মহাশয়ের ল্যাজের ডগাটাও দেখা গেল না আশে পাশে। আওয়াজ-টাওয়াজও ভেসে এল না কানে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বসলাম গর্তের কিনারায়, বেগতিক দেখলেই টুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ব গর্তে। কিন্তু অরণ্যমর্মর ছাড়া আর কোনো শব্দই কানে ভেসে এল না—বিপজ্জনক শব্দ-টব্দ কিস্‌সু শোনা গেল না। আলো ফুটছে দেখে প্রাণেও ভরসা পেলাম। যে-পথ বেয়ে অলিম্পিক-দৌড় দৌড়ে এসেছিলাম, সেই পথেই হাতে-পায়ে ভর দিয়ে জানোয়ারের মত গুটি গুটি ফিরে গিয়ে বন্দুকটা সংগ্রহ করলাম।

আর একটু হেঁটে যেতেই ছোট্ট নদীটাকে পেয়ে গেলাম। বারংবার সন্ত্রস্ত চাহনি পেছনে নিক্ষেপ করতে করতে পাড বেয়ে রওনা হলাম শিবির অভিমুখে।

ঠিক তখনি এমন একটা ঘটনা ঘটল যে চকিতে মনে পড়ে গেল অনুপস্থিত সঙ্গীদের কথা। নিথর উষালগ্নের নীরবতা খান্ খান্ হয়ে গেল দূর থেকে ভেসে আসা রাইফেল-নির্ঘোষে। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে উৎকর্ণ হলাম—কিন্তু আর শোনা গেল না রাইফেল-নির্ঘোষ। প্রথমটা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিলাম। নিশ্চয় ভয়ানক বিপদে পড়েছেন—নইলে কেউ রাইফেল চালায়? বিশেষ করে যখন আমরা ঠিক করেছি, সাংঘাতিক বিপদাশঙ্কা না থাকলে বন্দুকবাজির ধার দিয়েও কেউ যাবো না! তারপরেই মনকে প্রবোধ দিলাম এই বলে যে আমার অন্তর্ধান-রহস্যই নিশ্চয় ওঁদের উদ্বিগ্ন এবং আতংকিত করে তুলেছে। সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি মনে করেই গুলিবর্ষণ করে আমাকে অভয় দিচ্ছেন। কাজেই চটপট ফিরে গিয়ে ওঁদের আশ্বস্ত করা দরকার।

বেদম ক্লান্ত থাকার দরুণ তাড়াতাড়ি যেতেও পারছিলাম না। যাই হোক, অচিরেই পৌঁছে গেলাম চেনা জানা অঞ্চলে। বাঁদিকে টেরোড্যাকটিলদের সেই নচ্ছার জলাভূমি, সামনেই ইগুয়ানোডনদের বিচরণভূমি। শেষ বৃক্ষসারি অবধি অবশেষে পৌঁছে গেলাম—এটা পেরোলেই দর্শন পাবো চ্যালেঞ্জার প্রমুখ সবাইয়ের। ওঁদের আশংকা দূর করার মানসে গলা ছেড়ে ফূর্তিসে একবার চেঁচিয়েও উঠলাম। কিন্তু চারদিকের থমথমে স্তব্ধতার মধ্যে ডুবে গেল আমার উল্লসিত কণ্ঠস্বর। আপনা থেকেই দ্রুততর হল পদক্ষেপ—শেষে পাঁই পাঁই করে দৌড়োলাম শিবির লক্ষ্য করে। কাঁটাঝোপের বেড়া যেমন ছিল, তেমনিই উঁচু হয়ে রয়েছে—কিন্তু খোলা রয়েছে ফটক। তীরবেগে ঢুকলাম ভেতরে। ভোরের শীতল আলোকে দেখলাম এক শিহরণ-জাগানো দৃশ্য। জিনিসপত্র বিক্ষিপ্ত চতুর্দিকে। অদৃশ্য হয়েছেন আমার তিন কমরেড। অগ্নিকুণ্ডের কাছেই ধূমায়িত ছাইয়ের পাশে ঘাস লাল হয়ে গেছে টকটকে লাল টাটকা রক্তে—বীভৎস সেই রক্তের পুকুর দেখামাত্র গা-হাত-পা হিম হয়ে গেল আমার।

আকস্মিক আঘাতে পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় বুদ্ধিশুদ্ধিও নিশ্চয় লোপ পেয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে শিবিরের চারদিকে ক্ষিপ্তের মত দৌড়েছিলাম আর ডাকাডাকি করেছিলাম—এই ধরনের অস্পষ্ট একটা স্মৃতি এখনো ভাসছে মনের মধ্যে। জঙ্গলের আনাচে কানাচে

প্রতিটা গুঁড়ির আড়ালে আবডালে খুঁজেছিলাম বিভ্রান্তের মত, কাণ্ড-জ্ঞানহীন উন্মাদের মত, যুক্তিবুদ্ধিহীন আহাম্মকের মত। নিথর নিস্তব্দ ছায়াঘন অন্ধকার থেকে কেউ সাড়া দেয়নি, কেউ নড়ে ওঠেনি, কোনো শব্দ ভেসে আসেনি। একদা যে দেশ অজেয় ছিল, এখনও যা আংশিক অজ্ঞাত, ভয়াবহ সেই বিজনপুরী থেকে ইহজন্মের মত যে বেরিয়ে যেতে পারব না, লোকালয়ে ফিরতে পারব না, অভিযাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না, বাকী জীবনটা নিঃসঙ্গ বন্য পরিবেশে একাই কাটিয়ে দিতে হবে এবং আমার নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হবে পাণ্ডব-বর্জিত এই অঞ্চলেই—ভয়াবহ এই চিন্তাপরম্পরায় এবং অসীম নৈরাশ্য-বোধে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ইচ্ছে হল জামাকাপড় ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলি, মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে উপড়ে ফেলি। ওঁরা এখন কাছে নেই, তাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম কি অসীম ভরসা ছিল ওঁদের ওপর, কি পরিমাণে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম চ্যালেঞ্জারের প্রশান্ত আত্ম-প্রত্যয় আর লর্ড রক্সটনের কৌতুকরসে টলমল কর্তৃত্বব্যঞ্জক শীতল অটলতার ওপর। ওঁরা সঙ্গে না থাকলে আমি যে কতখানি শিশুর মত অসহায় এই অজানা রহস্যময় দেশে, কতখানি শক্তিহীন দুর্বল। এবং দেহে মনে পঙ্গু—তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম সেই মুহূর্তে। ভেবে পেলাম না তখন আমার কি করা উচিত, কোন্ দিকে যাওয়া উচিত!

বেশ কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে অথর্বের মত বসে থাকার পর সঙ্গীদের অন্ত-র্ধান রহস্য আবিষ্কারে তৎপর হলাম—কি বিপদের সম্মুখীন হয়ে সদলবলে উধাও হয়ে গেলেন, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে বসলাম। ক্যাম্পের তছনছ অবস্থা দেখে বুঝলাম, হঠাৎ আক্রান্ত হয়েছিলেন ওঁরা—একবারই গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন—ঘটনাটা ঘটেছে রাইফেল নির্ঘোষের সময়টিতেই। মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেছে—গুলিবর্ষণ ঘটেছে ঐ একবারই। রাইফেলগুলো ছত্রাকার অবস্থায় বিক্ষিপ্ত চারদিকে—লর্ড জনের রাইফেলটার ব্রীচের মধ্যে রয়েছে কার্তুজের ফাঁপা খোল। অগ্নিকুণ্ডের পাশে পড়ে রয়েছে সামারলি আর চ্যালেঞ্জারের কম্বল—তার মানে ওঁরা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। গুলিবারুদ আর খাবারদাবারের বাক্স-গুলো যেন তাণ্ডব লীলায় বিক্ষিপ্ত হয়েছে চতুর্দিকে—ক্যামেরা আর ফটোপ্লেটের ক্যারিয়ারগুলোরও একই হাল হয়েছে দেখলাম—কিন্তু হারায়নি কিছুই। পক্ষান্তরে, যে সব খাবারদাবার খোলা অবস্থায় ছিল,

তার কিছু নেই। বেশ মনে আছে, এমনি খাবার ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। তাহলে জন্তুরাই চড়াও হয়েছিল—মানুষ নয়। মানুষ হলে কিছুই এভাবে ফেলে ছড়িয়ে যেত না।

কিন্তু জন্তুই যদি হয়, বিশেষ করে ভয়ংকর হিংস্র জন্তু—তাহলে সঙ্গী তিনজনের পরিণামটা কি ধরনের হয়েছে ভাবতে গিয়েও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। নৃশংস হিংস্র জন্তুরা তো ওঁদের ছিঁড়ে কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে যাবে। রক্ত থই থই করছে অবশ্য এক জায়গায়—তার মানে লড়াই হয়ে গেছে একচোট—আক্রান্ত না হলে রাইফেল বর্ষণের পাত্র নন লর্ড জন। কাল রাতে যে দানবটা তাড়া করেছিল আমাকে, তার পাল্লায় যদি পড়েন ওঁরা, তাহলে তো বেড়াল যেভাবে ইঁদুরকে দাঁতে কামড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়—সেইভাবেই নিয়ে গেছে লর্ড জনকেও। সে ক্ষেত্রে অন্য দুজন পেছনে তাড়া করে গেছেন নিশ্চয়। কিন্তু রাইফেল নিয়ে গেলেন না কেন—রাইফেল ফেলে রেখে শুধু হাতে ডাইনোসরের পেছন পেছন কি কেউ দৌড়োয়? ভাবতে ভাবতে এমনি-তেই ক্লান্ত মস্তিষ্ক আরো গুলিয়ে গেল—অন্তর্ধান রহস্যে বিন্দুমাত্র আলোক-পাত করতে পারলাম না। আশপাশের জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যায় উপনীত হওয়ার মত কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারলাম না। একবার তো জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললাম। ঘন্টাখানেক উদ্‌ভ্রান্তের মত দৌড়োদৌড়ি করবার পর স্রেফ কপাল জোরে ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

আচম্বিতে একটা কথা মনে পড়ায় শোকার্ত মনটা আশ্বস্ত হল খানিকটা। বিচিত্র এই জগতে সত্যিই তো একেবারে একা আমি নই। খাড়াই পাহাড়ের তলদেশে খুঁটি গেড়ে বসে আছে বিশ্বস্ত অনুচর জাম্বো। আমার চিৎকার তার কানে পৌঁছোবেই। মালভূমির কিনারায় গিয়ে ঝুঁকি মেরে তাকালাম নিচের দিকে। ঐ তো আমাদের ছোট্ট ক্যাম্প। ঐ তো ধুনি জ্বলছে। ঐ তো কম্বল পেতে থেবড়ে বসে রয়েছে জাম্বো। কিন্তু আরও একজনও তো রয়েছে সঙ্গে! এ আবার কী! তবে কি তিনসঙ্গীর একজন কোনমতে নেমে গেছে নিচে? মুহূর্তের জন্যে বিপুল আনন্দে ময়ূরের মত নেচে উঠল আমার হৃদয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভাল করে তাকাতে গিয়েই মিলিয়ে গেল আনন্দ—নিভে গেল আশার দীপ। সূর্য উঠছে পূবে। রাঙা আলো পড়েছে লোকটার লাল চামড়ায়। যাচ্চলে! এ তো দেখছি রেড ইণ্ডিয়ান! গলা ছেড়ে পরিত্রাহি রবে চেঁচিয়ে গেলাম, রুমাল নাড়লাম।

অচিরেই মুখ তুলে তাকালো জাম্বো। হাত নেড়ে ইসারা করে উঠতে লাগল শকু পর্বতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে দাঁড়ালো আমার খুব কাছেই—মাত্র চল্লিশ ফুট দূরে। কালো মুখখানা করুণ হয়ে গেল আমার কাহিনী শুনতে শুনতে।

বললে—'মাসা ম্যালোন, শয়তানে নিয়ে গেছে ওঁদের। শয়তানের দেশে ঢুকেছেন—আপনাকেও নিয়ে যাবে এখুনি। আমার কথা শুনুন মাসা ম্যালোন, এখুনি নেমে আসুন—শয়তান আবার আসবার আগেই পালিয়ে আসুন।'

'কিন্তু যাবো কি করে, জাম্বো?'

'গাছ থেকে লতা নিয়ে আসুন। ছুঁড়ে দিন আমার কাছে। গুঁড়িতে কষে বেঁধে দিচ্ছি। ব্রীজ বানিয়ে দিচ্ছি।'

'জাম্বো, ও-কথা আগেও ভেবেছি সবাই। ভার সইবার মত কোনো লতা এখানে নেই।'

'দড়ি আনতে পাঠান, মাসা ম্যালোন।'

'কাকে পাঠাবো? কোথায় পাঠাবো?'

'ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে পাঠান। গাঁয়ে চামড়ার দড়ি আছে। অনেক। নিচেই যে ইণ্ডিয়ানটা রয়েছে, ওকে পাঠান।'

'কে ও?'

'আমাদেরই একজন কুলি। আর সবাই ওকে মেরে ধরে ওর মাইনে কেড়ে নিয়েছে। তাই ও ফিরে এসেছে। চিঠি নিয়ে যেতে রাজী আছে, দড়ি নিয়েও ফিরে আসবে—যা বলবেন তাই করবে।'

চিঠি নিয়ে যাবে! সাবাস! এর চাইতে সুখবর আর কিছু আছে নাকি! চিঠি যদি নিয়ে যেতে পারে, সাহায্য নিয়েও ফিরে আসতে পারে। তার আগে পৃথিবীটাকে জানানো দরকার যে বৃথা জীবনদান করিনি আমরা—বিজ্ঞানের স্বার্থে জীবন বলি দিয়েও যা কিছু অর্জন করেছি—স্বদেশের বন্ধুবান্ধবের হাতে তা পৌঁছে যাক। দুটো চিঠি তো সম্পূর্ণ হয়েই রয়েছে। সারাদিন ব্যয় করব তৃতীয়টা লিখতে—অভিযানের সর্বশেষ সংবাদও থাকবে তার মধ্যে। শোচনীয় এই সংবাদ দুনিয়ার সামনে বহন করে নিয়ে যাক রেড ইণ্ডিয়ানটা। জাম্বোকে সেই ভাবেই হুকুম দিলাম। সন্ধ্যে নাগাদ যেন আবার আসে পর্বত চূড়ায়। সারাদিন ধরে বসে বসে লিখলাম গত রাতের অ্যাডভেঞ্চার বৃত্তান্ত। সেই সঙ্গে একটা চিঠিও দিলাম—চরম বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করলাম সেই চিঠিতে। পথিমধ্যে যদি কোনো শ্বেতকায় সওদাগর

অথবা স্টীমবোটের ক্যাপ্টেনের দেখা পায়—এই চিঠি যেন তাদের হাতে দেয়। চিঠিতে আমি লিখলাম, কিছু দড়ি যেন পত্রপাঠ দেওয়া হয় রেড ইণ্ডিয়ানের হাতে—কেন না আমাদের জীবন নির্ভর করছে ঐ দড়ির ওপর। সন্ধ্যে নাগাদ চিঠিগুলো ছুঁড়ে পাঠিয়ে দিলাম জাম্বোর কাছে—সেইসঙ্গে ছুঁড়ে দিলাম আমার মানিব্যাগ—তিনটে ইংলিশ স্বর্ণমোহর ছিল তার মধ্যে। রেড ইণ্ডিয়ানকে যেন এই তিনখানা মোহর দিয়ে দেয় জাম্বো—দড়ি নিয়ে ফিরে এলে পাবে ওর ডবল মোহর।

মাই ডিয়ার মিস্টার ম্যাকআর্ডল, এবার বুঝছেন তো কিভাবে এই পত্র বিবরণী পৌঁছোচ্ছে আপনার শ্রী-হস্তে। আপনার এই হতভাগ্য সাংবাদিকের আর কোনো সংবাদ যদি না পান, তাহলে বাকীটাও নিশ্চয় আঁচ করে নিতে পারবেন। আজ রাতে আমি এত ক্লান্ত আর বিমর্ষ যে কোনো পরিকল্পনাই মাথায় আনতে পারছি না। কাল ভাবব কি করে যুগপৎ নিচের ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং ভাগ্যহীন নিখোঁজ বন্ধুদের খুঁজে বার করা যায়—সে অন্বেষণের অন্তে যদি ওঁদের নশ্বর দেহাবশেষগুলোও পাওয়া যায়—তবে তাই হোক!

১৩ ॥ যে-দৃশ্য জীবনে বিস্মৃত হব না

সূর্য যখন ডুবছে, বিষাদঘন রজনীর আবির্ভাব ঘটতে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে অনেক নিচে দেখলাম বিশাল প্রান্তরের ওপর রেড ইণ্ডিয়ানটার একক মূর্তি। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার বিলীয়মান আকৃতির দিকে। এই ফাঁদ থেকে মুক্তির একমাত্র আশা এখন সে—ক্ষীণ আশা যদিও। গোধূলির অবসানে গোলাপী আভায় অদ্ভুত সুন্দর ঘনায়মান কুয়াশার মধ্যে ধীরে ধীরে একসময়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনের চোখে ভাসতে লাগল বহুদূরের বনানী পারের বিশাল নদীর ছবিটি—যে-নদীবক্ষ থেকে সে সংগ্রহ করে আনবে মুক্তির সরঞ্জাম—শক্ত, মোটা একটা কাছি।

যখন বেশ অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক, ফিরে এলাম লণ্ডভণ্ড শিবিরে। আসবার সময়ে শেষবারের মত দেখলাম জাম্বোর ধুনির লাল আগুন। আমার শেষ ভরসা। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আমার একমাত্র যোগসূত্র। বিষাদ-অন্ধকারে নিমজ্জিত আমার চিত্তাকাশের একমাত্র উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—বিশ্বস্ত কৃষ্ণকায় ঐ অনুচরটি। তার উপস্থিতিই মনে বল সঞ্চার করল তমসাময় নৈরাশ্যের মধ্যেও। ওর দৌলতেই আমাদের অভিযানের ফলাফল পৌঁছে যাচ্ছে বহির্জগতে। অজ্ঞাত জগতের ধুলোয় হয়ত একদিন মিশে যাবে

আমাদের পঞ্চভূতে গড়া নশ্বর দেহাবশেষ, কিন্তু সেই শোচনীয় পরিণতির আগেই যে আমাদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলশ্রুতি স্বদেশবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলাম, এই সান্ত্বনা পরম সুখের সঞ্চার করল আমার মনে ম্লান বিষণ্ণ সেই সন্ধ্যালোকে।

দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটে গেছে যে ক্যাম্পে, নিদ্রাদেবীর আরাধনা সেখানে একটা প্রকৃতই ভয়াবহ ব্যাপার। জঙ্গলে ঘুমোনোর কথা ভাবতে গিয়ে আরো বেশী শিউরে উঠলাম। কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা জায়গা ছাড়া ঘুমোই কোথায়? দূরদর্শিতা বললে, সাবধান ম্যালোন, বিপদের জন্যে তৈরী থেকো—ঘুমের কথা পরে ভেবো। আবার অবসন্ন শরীরটা বললে, গোল্লায় যাক বিপদ—আগে শরীরটাকে জিরেন দাও। জিঙ্কো গাছে উঠে ঘুমের আয়োজন করতে গিয়ে দেখলাম সে এক ভারী বিদ্‌ঘিচ্ছিরি ব্যাপার। ঘুমের ঘোরে মোটা মোটা গোল ডাল থেকে নির্ঘাৎ গড়িয়ে পড়ে যাব। ঘাড় মটকে মরবার সাধ নেই বলেই তরতর করে নেমে এসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলাম—কি করা যায়। শেষকালে কাঁটা ঝোপ পরিবৃত কেল্লার ফটক বন্ধ করে দিয়ে ত্রিকোণ আকারে তিনদিকে তিনটে ধুনি জ্বালিয়ে একপেট খেয়ে মাঝখানে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম মড়ার মত। ঘুম ভাঙল পরম স্বস্তির মধ্যে—উষালগ্নে। আকাশ সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে। কে যেন হাত রাখল আমার বাহুতে। আঁৎকে উঠে তৎক্ষণাৎ দু-চোখ মেললাম আমি এবং হাত বাড়িয়ে দিলাম রাইফেলের দিকে। স্নায়ুর অবস্থা যে কি অবস্থায় পৌঁছেছিল, এই ঘটনা থেকেই তা অনুমান করা যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম বিপুল আনন্দে। দেখেছিলাম, শীতল ধূসর আলোয় লর্ড জন হাঁটু গেড়ে বসে আছেন আমার পাশে।

হ্যাঁ, লর্ড জনই বটে—অথচ যেন লর্ড জন তিনি নন। শেষ যখন দেখেছিলাম, তখন তাঁর হাবভাব ছিল ধীরস্থির প্রশান্ত, আপাদ মস্তক নিখুঁত, ব্যক্তিত্ব সংযত, পোশাক ফিটফাট। কিন্তু এখন তিনি ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে, দুই চোখ বিস্ফারিত, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, না, খাবি খাচ্ছেন বোঝা মুস্কিল—যেন অনেক···অনেক দূর থেকে তীরবেগে দৌড়ে এসেছেন। চামড়া ঢাকা হাড়সর্বস্ব মুখখানায় অজস্র আঁচড়ের দাগ—রক্তে মাখামাখি। পোশাক ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত। মাথার টুপি উধাও। সবিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম এ-হেন রুধিররঞ্জিত মুখাবয়ব এবং হতশ্রী দেহাকৃতির পানে। কিন্তু প্রশ্ন করার এতটুকু সময় আমাকে দিলেন না ভদ্রলোক। তড়বড় করে কথা বলতে বলতে খামচা খামচা করে জিনিস-

পত্র কুড়োতে লাগলেন মাটির ওপর থেকে।

'কুইক, ইয়ংম্যান! কুইক! প্রত্যেকটা সেকেণ্ড এখন অমূল্য। রাইফেল-গুলো নাও—ওঁদের দুটোও নাও। বাকী দুটো আমি নিয়েছি। ঠিক আছে। যত পারো কার্তুজ নাও সঙ্গে। পকেট ভরে নাও। ঠিক আছে। এবার কিছু খাবার নাও। খান চয়েক টিনের খাবার হলেই চলে যাবে। ঠিক আছে, ওতেই হবে। কথা বলার বা ভাবনা চিন্তার সময় আর নেই। চলো, বেরিয়ে পড়ি—নইলে আর রক্ষে নেই!'

আধ-জাগরণ অবস্থায় কি কাণ্ড হয়ে চলেছে ভাববার ক্ষমতাও তখন ছিল না। উন্মাদের মত দৌড়োলাম তাঁর পেছন পেছন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। দু-বগলে দুটো রাইফেল। দু-হাত ভর্তি নানারকম জিনিসপত্র, খাবার দাবার। সবচেয়ে নিবিড় আগাছার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে দৌড়ে এসে গা-ঢাকা দিলেন ঘন চাপের মত এক ঝাঁক ঝোপের মধ্যে। কাঁটার পরোয়া করলেন না। তীরবেগে ভেতরে ঢুকে একদম মাঝখানে এসে বসে পড়লেন মাথা নিচু করে, হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলেন পাশে।

বললেন হাপরের মত হুস-হুস্ করে হাঁপাতে হাঁপাতে—'এইখানেই আমরা নিরাপদ। ওরা যাবে ক্যাম্পে—এ ছাড়া আর কিছু মাথায় আসবে না। না দেখে ধোঁকায় পড়বে।'

মেল-ট্রেনের মত আচমকা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসায় আমারও দম ফুরিয়ে গেছিল। সেকেণ্ড কয়েক পরে কথা বলার মত অবস্থা ফিরে পেলাম। বললাম—'কি ব্যাপার বলুন তো? প্রফেসররা কোথায়? কাদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এলেন?'

'বানর-মানুষ! বানর মানুষ!' নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললেন লর্ড জন—'জানোয়ার! জানোয়ার কোথাকার! একদম গলা চড়িয়ে কথা বলবে না ছোকরা—ওদের কানে কিচ্ছু এড়োয় না—চোখেও কিছু ফাঁকি যায় না—তবে হ্যাঁ, যদ্দূর জেনেছি, গন্ধ শুঁকে শুঁকে পেছন নেওয়ার ক্ষমতাটাই কেবল নেই। সেইদিক দিয়েই এখানে আমরা নিরাপদ। কিন্তু ছোকরা, তুমি কোন চুলোয় হাওয়া হয়ে গেছিলে বলো তো? গায়ে আঁচটুকুও লাগেনি সেই জন্যেই অবিশ্যি—কিন্তু গেছিলে কোথায়?'

সংক্ষেপে ফিস্ ফিস্ করে বিবৃত করলাম আমার নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। ডাইনোসর আর গহ্বরের ব্যাপারটা শোনার পর বললেন—'খুবই খারাপ ঝুঁকি নিয়েছিলে ইয়ংম্যান। হাওয়া খাওয়ার জায়গা এটা নয়। শয়তানের বাচ্চাদের হাতে পড়ার আগে আমিও কি ছাই ভাবতে পেরে-

ছিলাম জায়গাটা এত জঘন্য ? নরখাদক পাপুয়ানদের হাতে একবার পড়েছিলাম, কিন্তু এই জানোয়ারগুলোর কাছে যেভাবে কাটিয়ে এলাম, সে তুলনায় পাপুয়ানদের কাছে নরম আরামকেদারায় শুয়ে ছিলাম বলা চলে।'

'ধরা পড়লেন কি ভাবে ?'

'তখন সবে ভোর হয়েছে। বিশ্বের জাহাজ দু-জন সবে আড়মোড়া ভাঙছেন—কথার লড়াই আরম্ভ হওয়ার আগেই আচমকা বানর-মানুষরা বৃষ্টির মত ঝপাঝপ করে এসে পড়ল আমাদের ওপর। আপেল ভর্তি গাছ থেকে যেন টুপটাপ দুমদাম ধুপধাপ করে আপেল বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। সারারাত ধরে ব্যাটাচ্ছেলেরা অন্ধকারে গা ঢেকে মাথার ওপরকার গাছ বোঝাই করে ফেলেছিল নিশ্চয়। এক হারামজাদার পেটে গুলি চালালাম বটে, কিন্তু কি যে হচ্ছে বোঝবার আগেই চারজনকেই মাটিতে চিৎপটাং করে চেপে ধরল হাত আর পা। বানর-মানুষ বললাম বটে, কিন্তু প্রত্যেকের হাতে ছিল লাঠিসোঁটা আর পাথর। কথাও বলছিল ব্যাজার ব্যাজার করে। এত দেশ ঘুরেছি, এমন জানোয়ার কখনো দেখিনি বাপু। গাছের লতা দিয়ে হাত পাগুলো পর্যন্ত কষে বেঁধে ফেলল চক্ষের নিমেষে। কাজেই ওদের নিছক জানোয়ার বলা চলে কি ? বাঁদরদের এত বুদ্ধি থাকে কি ? না হে না, বাঁদরদের চেয়ে উঁচু জাতের জীব—নরবানর বলতে পারো—মিসিংলিঙ্ক তো নিশ্চয়ই—এতদিন তাই 'মিসিং' ছিল হারামজাদারা—খুঁজেও পাওয়া যায়নি, যে রাস্কেলটা গুলি খেয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছিল, তাকে তো কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেল ক'জনে। বাকী সবাই ঘিরে বসল আমাদের—কটমটে চোখে দেখলাম খুনের সংকল্প। মরতে আমাদের হবেই—বাঁচিয়ে রাখবে না কাউকেই। মানুষের মত বিরাট সাইজ প্রত্যেকের—তবে অনেক বেশী শক্তিমান। লালচে গুটলি পাকানো ভুরুর তলায় অদ্ভুত কাঁচের মত ধূসর চোখে আমাদের দিকে সমানে তাকিয়ে থেকে গ্যাজর গ্যাজর করে কি যে ছাই নিজেদের মধ্যে বকে গেল ঈশ্বর জানেন। চ্যালেঞ্জারকে তো চেনো—ভয়ে কেঁচো হয়ে যাওয়ার পাত্র নন—কিন্তু তাঁর মত মানুষও যেন জুজু দেখে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে রইলেন। এক সময়ে তো তেড়েফুঁড়ে চিৎপটাং অবস্থা থেকে তড়াক করে দু-পায়ে খাড়াও হয়ে গেলেন—গলার শির তুলে হম্বিতম্বি করতে লাগলেন—দেরী কেন ? অত কথা আর দেখার কি আছে ? যা দরকার করে ফ্যাল না শয়তানের বাচ্চারা ! আমার মনে হয় ঘুম-চোখ মেলতে না মেলতেই আচমকা ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় ওঁর মাথাও একটু খারাপ হয়ে

গেছিল। তা না হলে ঐ অবস্থায় পাগলের মত ঐ ভাবে কেউ চেঁচায়! রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে কি গালিগালাজ হে ছোকরা! মাথাটা একেবারে বিগড়ে না গেলে অমন কাণ্ড করতে পারতেন না। বাজী ফেলে বলতে পারি, ওরা যদি বানর-মানুষ না হয়ে চ্যালেঞ্জারের প্রাণপ্রিয় সাংবাদিকের দল হ'ত তাহলেও এমন শাপশাপান্ত করতেন না।'

অদ্ভুত কাহিনীটা শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে বলতে লর্ড জন শাণিত চোখে কিন্তু দেখছিলেন চারদিকেই—হাত ট্রিগার তোলা রাইফেলের ওপর। চোখের পাতা ফেলবার আগেই গুলি চালিয়ে দিতে পারেন সন্দেহজনক কিছু দেখলেই। লর্ড জনের সেদিনকার সেই শিকারী মূর্তি ভোলবার নয়।

বললাম চাপাগলায়—'তারপর কি হল?'

'ভেবেছিলাম, খেল্ খতম হয়ে গেল বুঝি বা। প্রাণ নিয়ে আর দেশে ফেরা যাবে না। কিন্তু ঘটল কিন্তু একেবারে অন্য কাণ্ড। ব্যাজর-ব্যাজর গ্যাজোর-গ্যাজোর করতে করতে চ্যালেঞ্জারের তর্জন গর্জন লম্পঝম্প দেখল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ ওদের মধ্যে থেকে একজন উঠে এসে দাঁড়াল চ্যালেঞ্জারের পাশে। হেসো না, ছোকরা, হেসো না—কিন্তু বাজি ফেলে বলব, পাশাপাশি দুজনকে দেখে মনে হল নিশ্চয় রক্তের সম্পর্ক আছে দুজনের মধ্যে—যেন দুই জ্ঞাতিভাই দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। আরে ছোকরা নিজের চোখে না দেখলে আমিও কি ছাই বিশ্বাস করতাম! বুড়ো বানর-মানুষটা দলের সর্দার—এক কথায় বলা যায় আর একখানা চ্যালেঞ্জার—লাল চ্যালেঞ্জার। চ্যালেঞ্জারের যেখানে-যেখানে যা কিছু বিউটি আছে, সব রয়েছে বুড়ো লাল চ্যালেঞ্জারের মধ্যেও—বরং আর এক কাঠি বেশী। মাথায় খাটো, কাঁধ চওড়া, গোল বুক, ঘাড়ে গর্দানে সমান, এক মুখ লাল দাড়ির জঙ্গল, পুঁটলি পাকানো দুটো ভুরু, 'কিরে বেল্লিক! কি চাই?' গোছের চাহনি—কত আর ফিরিস্তি দেব—একই ছাঁচে তৈরী আর একখানা চ্যালেঞ্জার! পাশে দাঁড়িয়ে পালের গোদা বাঁদর-মানুষ বুড়ো ব্যাটা চ্যালেঞ্জারের ঘাড়ে থাবার মত একখানা হাত রাখতেই যে-টুকু বাকী ছিল, তাও সম্পূর্ণ হয়ে গেল। সামারলিকে যেন তড়কায় পেয়ে বসল—হাসতে হাসতে শেষকালে চোখে জল এসে গেল। হাসতে লাগল বাঁদর-মানুষ ব্যাটা-ছেলেরাও হাসি। মানে ঐ আর কি—কোঁকর-কোঁ আর প্যাঁক প্যাঁক শব্দের একটা জগাখিচুড়ি। তারপর, অবশ্য হিড় হিড় করে আমাদের টেনে নিয়ে

চলল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। বন্দুক-টন্দুকগুলোয় হাতই দিল না—নিশ্চয় বিপজ্জনক ভেবেই হাত দেওয়ার সাহস হয়নি—তবে খোলা খাবার যা কিছু ছিল, সমস্ত নিয়ে চলল সঙ্গে করে। সামারলির আর আমার অবস্থা হল শোচনীয়—জামাকাপড় আর মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছ—কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেছিল দুজনকেই। কাঁটায় রক্তারক্তি হয়ে গেল আমাদের আপাদমস্তক—ওদের কিছুই হল না—হবে কি করে? চামড়া তো জানোয়ারের চামড়ার মত পুরু। কিন্তু তোফায় রইলেন চ্যালেঞ্জার। রোমান সম্রাটের মত মহা আড়ম্বরে চললেন চার ব্যাটাচ্ছেলের কাঁধে বসে। ও কী!'

অনেক দূরে শোনা গেল অদ্ভুত একটা টিকটিক আওয়াজ। শক্ত কাঠ বা হাতীর দাঁতে তৈরি ছোট করতাল বাজানোর মত আওয়াজও বলা চলে।

আওয়াজটা শোনামাত্র আর একটা দোনলা 'এক্সপ্রেস' রাইফেলে কার্তুজ ঠুসতে ঠুসতে লর্ড জন বললেন—'ঐ চলেছে হারামজাদারা! ছোকরা, সব কটায় গুলি ভরে রাখো—জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে আর দিচ্ছি না—ও কথাটাও মনে এনো না! উত্তেজিত হলে শয়তানের বাচ্চা-দের ঠিক ঐরকম আওয়াজ করতে শুনেছি। আরে ছোকরা, সামনা-সামনি হলে উত্তেজনা কাকে বলে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে ছাড়তাম বাছাধনদের। তুমিও একটা খাসা খবরের তোফা শিরোনামা পেয়ে যেতে—'চারপাশে গোল হয়ে পড়ে মড়া আর আধমরার দল—মাঝখানে আড়ষ্ট বগলে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে দুই বীরপুরুষ'। কি হে, শুনতে পাচ্ছো এখন?'

'অনেক দূরে।'

'ওটা একটা ছোট্ট দল—কচু করবে আমাদের। তবে কি জানো, শয়তানের বাচ্চারা নিশ্চয় এতক্ষণে জঙ্গলময় ছড়িয়ে পড়েছে। যাকগে, আমার দুঃখের কাহিনীটা শুনে রাখো। টেনে হিঁচড়ে তো নিয়ে গেল ওদের আস্তানায়। ঐ যে খাড়াই পাঁচিলের মত পাহাড়টা দেখেছিলে, তার ধারে অনেকগুলো বিরাট বিরাট গাছের সে এক বিরাট নিকুঞ্জ। তার ওপর হাজারখানেক কুঁড়েঘর—পাতা আর ডাল দিয়ে তৈরী। এখান থেকে মাইল তিন-চার তো বটেই। নোংরার ডিপো ব্যাটাচ্ছেলেরা আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত টিপে টিপে দেখল এমন ভাবে যে নোংরায় গা ঘিন ঘিন করতে লাগল আমার—গা থেকে সে-নোংরা

ইহজীবনে আর উঠবে বলে মনে হয় না। কষে বেঁধে ফেলে চিৎপটাং করে ফেলে রাখল মস্ত একটা গাছের তলায়—এক ব্যাটা একটা কাঠের মুগুড় নিয়ে পাহারা দিতে লাগল মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। সেকী বাঁধুনি ইয়ংম্যান—হাড় পর্যন্ত টনটনিয়ে গেছে। আমার আর সামারলির দু-জনের হল ঐ একই অবস্থা। বুড়ো চ্যালেঞ্জার রইলেন রাজার হালে। গাছের ডালে বসে পাইন খেতে খেতে জুল জুল করে দেখতে লাগলেন আমাদের অবস্থাটা। তবে হাঁা, খানকয়েক ফল দিয়েছিলেন আমাদেরকেও, হাত-পায়ের বাঁধনও একটু ঢিলে করে দিয়ে গেছিলেন—নিজের হাতে করেছিলেন—বুকের পাটা আছে বটে বুড়োর। ছোকরা, তুমি যদি দেখতে সেই দৃশ্য, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত। গাছের উঁচু ডালে বসে যমজ ভাইয়ের সঙ্গে সেকী গ্যাজোর গ্যাজোর ব্যাজার ব্যাজার কচকচানি—সেই সঙ্গে হেঁড়ে গলায় গানের গিটকিরি—ঐ যে সেই গানটা—'বাজা, বাজা, ঘন্টা বাজা, জোরসে বাজা হারামজাদা' —গান শুনলে শয়তানের বাচ্চাদের মেজাজ শরীফ থাকে বলেই চ্যালেঞ্জারের গানের গুঁতো সইতে হচ্ছিল আমাদেরকেও। হাসছো? হাসবার মত মেজাজ তখন আমাদের ছিল না ভায়া। চ্যালেঞ্জারের ক্ষেত্রে একটু লাগাম ঢিলে দিয়েছিল ঠিকই—লেকচার আর গান দুটোই শুনেছে—যা করতে চেয়েছেন—খুব একটা বাধা দেয়নি—কিন্তু আমাদের দুজনের টঁ্যা-ফুঁ করার উপায় ছিল না—নড়লেই ডাণ্ডস পড়ত মাথায়। ঐ অবস্থাতেও মনটা হাল্কা লাগছিল তোমার কথা ভেবে— ঐতিহাসিক নথিপত্র নিয়ে ভাগ্যিস চম্পট দিয়েছিলে। ঐ টুকুই ছিল সান্ত্বনা পটল তুলতে আর দেরী নেই জেনেও।

'ইয়ংম্যান, এরপরের ঘটনাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাজ্জব হয়ে যাবে। মানুষের চিহ্ন, আগুনের আভাস, ফাঁদ—এইসব দেখে এসেছো বলছিলে না? স্বচক্ষে দেখলাম তাদের। বেচারাদের দেখলেও প্রাণ কেঁদে ওঠে হে। ছোটখাট চেহারা, হেঁট মুখে হাঁটুনি দেখেই বোঝা যায় মারের চোটে আধমরা হয়ে রয়েছে। দেখে শুনে মনে হল, দূরের ঐ খাড়াই পাহাড়ের দিকটায় দখল রয়েছে মানুষের—গুহায় থাকে, আগুন জ্বালায়। আর এদিকটা দখলে রেখেছে বাঁদর-মানুষরা—গাছে থাকে, জানোয়ার আর মানুষের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়ে গেছে। দু-দলে কিন্তু যুদ্ধ চলে বারোমাস—রক্তের গঙ্গা বয়ে যায়। আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়েছে। গত কাল জনাবারো মানুষকে বন্দী করে আনে বাঁদর-মানুষরা। জীবনে

এরকম ব্যাজার ব্যাজার আর পর্দা ফাটানো ক্যাঁ-কোঁ গলাবাজি শুনিনি হে ছোকরা। বন্দীরা মাথায় খাটো, গায়ের চামড়া লালচে, সারা গা আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত—হাঁটবে কি, এক পা যায় আর টলে পড়ে যায়। দুজনকে চোখের সামনেই সাবাড় করল শয়তানের বাচ্চা বাঁদর-মানুষরা—একজনের হাত দুটো স্রেফ হ্যাঁচকা টানে পটাং করে ধড় থেকে খসিয়ে আনলো—সে এক বীভৎস দৃশ্য ভায়া—রক্ত হিম হয়ে যায়। জানোয়ার, একেবারে জানোয়ার! ছোটখাট লাল মানুষগুলোর মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরোনোর আগেই প্রাণপাখী উড়ে গেল খাঁচা থেকে। সহ্যশক্তি আছে বটে, কিন্তু আমাদের তো নেই—গা পাক দিয়ে উঠল সেই কারণেই। সামারলি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। চ্যালেঞ্জার পর্যন্ত মনে হল আর সইতে পারছেন না। সরে পড়েছে মনে হচ্ছে, তাই না?'

কান খাড়া করলাম। নিস্তব্ধ অরণ্যানীর নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হচ্ছিল কেবল বিহঙ্গ-কূজনে। ফের কাহিনী শুরু করলেন লর্ড জন।

'ছোকরা, প্রাণে বেঁচে গেলে এ-যাত্রা। ইণ্ডিয়ানদের পাকড়াও করা নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলেই তোমার কথা খেয়াল ছিল না শয়তানের বাচ্চাদের—নইলে ক্যাম্পে ফিরে এসে বেঁধে নিয়ে গিয়ে ফেলত আস্তানায়। ঘুমোচ্ছিলে তো মড়ার মত। হক্ কথাই বলেছিলে কিন্তু, গোড়া থেকেই ব্যাটাচ্ছেলেরা গাছের ওপর থেকে নজর রেখেছিল আমাদের প্রত্যেকের ওপর—হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল আমরা একেবারে অন্য জাতের একটা জানোয়ার। ইণ্ডিয়ানদের ওপর ঝাঁপাই জুড়তে গিয়ে তোমার কথা খেয়াল ছিল না বলেই গাছ থেকে তোমার ঘাড়ে কেউ লাফিয়ে পড়েনি—আমি গিয়ে জাগিয়েছি তোমাকে। তারপর কি হল শোনো। সে আর একখানা বীভৎস ব্যাপার। উফ্! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! ছুঁচোলো বেতের সেই জঙ্গলটা মনে পড়ে? খাড়াই পাহাড়ের একদম তলায়? যেখানে আমেরিকানটার কঙ্কালটা পেয়েছিলাম? জায়গাটা বাঁদর-মানুষদের শহরের ঠিক তলায়—বন্দীদের ফেলে দ্যায় ঐখানেই। খুঁজলে কঙ্কালের পাহাড় পাওয়া যাবে। পাহাড়ের মাথায় যেন কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে গেল ব্যাটাচ্ছেলেরা—যেন একটা মহোৎসব ঘটতে চলেছে আর কি। অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান জাতীয় কি যেন সব করতে দেখলাম। বন্দী বেচারাদের একে একে লাফিয়ে পড়তে হল নিচে—মজা দেখবার জন্যে সে কি হুড়োহুড়ি—স্রেফ আছড়ে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে গেল, না পাঁজর-টাঁজর ফুটো করে ছুঁচোলো বাঁশগুলো পড়পড় করে বেরিয়ে

এল—এই মজাটাই দেখবার জন্যে শয়তানের বাচ্চারা ঠেলাঠেলি হুটোপাটি করে ঝুঁকে রইল পাহাড়ের মধ্যে ঢেকে। আমাদেরকেও হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল মজার খেলাটা দেখানোর জন্যে—হাজার হাজার শয়তানের বাচ্চা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাহাড়ের মাথায়। চারজন রেড ইণ্ডিয়ান নিঃশব্দে ঝাঁপ দিল নিচে—বর্শার ফলার মত বেতের ডগাগুলো দেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল এমন ভাবে যেন মাখনের মধ্যে দিয়ে উল বোনার কাঁটা চালিয়ে দেওয়া হল ফুসফুস করে। ঐ জন্যেই ইয়াঙ্কি বেচারার পাঁজরার মধ্যে বেত গজিয়ে উঠতে দেখেছিলাম। দৃশ্যটা বীভৎস—কিন্তু দারুণ ইন্টারেস্টিংও বটে। হাড়ে হাড়ে বুঝছি ঝাঁপ দেওয়ার পালা আসবে আমাদেরও—তা সত্ত্বেও একে একে চারজনের ডাইভ দেওয়ার দৃশ্য দেখতে লাগলাম চোখ বড় বড় করে।

'কিন্তু আমাদের পালা আর এল না। ছ-জন ইণ্ডিয়ানকে মনে হয় আজকের সার্কাস দেখানোর জন্যে টিঁকিয়ে রেখেছে—তবে সেরা বাজিকর হব আমরাই—নতুন আমদানী তো! চ্যালেঞ্জার হয় তো রেহাই পেয়ে যাবেন। পরিত্রাণ নেই আমার আর সামারলির। লিস্টে নিশ্চয় নাম আছে আমাদের। ওদের ভাষা বোঝা খুব শক্ত নয়—বেশীর ভাগই তো অঙ্গভঙ্গী ইসারা ইঙ্গিতে বোঝায়। দেখেশুনে ঠিক করলাম, আর নয়—এবার চম্পট দেওয়া দরকার। প্ল্যানটা মাথার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। কি করব ঠিক করেও ফেলেছিলাম। ফন্দী মাফিক কাজ করতে হবে শুধু আমাকেই—সামারলি একেবারেই অপদার্থ —চ্যালেঞ্জারও প্রায় তাই। একবারই দু-জন কাছাকাছি এসেছিলেন—তাও দারুণ একটা তর্কাতর্কির মেজাজ নিয়ে। লালচুলো শয়তানের বাচ্চাদের বিজ্ঞানসম্মত কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যায়, এই নিয়ে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল দুই মক্কেলের মধ্যে। একজন বললেন, জাভার ডায়য়োপিথিকাস, আরেকজন বললে—পিথিকানথ্রোপাস। পাগল, পাগল—বদ্ধ উন্মাদ দুটোই। কিন্তু আমি তো দু-একটা পয়েন্ট আগে থেকেই পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম মাথার মধ্যে। একটা পয়েন্ট এই—খোলা জায়গায় মানুষের মত পাঁই পাঁই করে দৌড়োতে পারে না শয়তানের বাচ্চারা। খাটো পা, হাঁটুর কাছ থেকে বেঁকে গেছে বাইরের দিকে, ভারী গতর। বুঝলে? আরে ভায়া, একশ গজ ফ্ল্যাট রেসে চ্যালেঞ্জারও ওদের পেছনে ফেলবেন—তুমি আর আমি হলে তো একদম হাওয়া হয়ে যাবো। আর একটা পয়েন্ট এই: বন্দুক কি জিনিস, একেবারে জানে না হারামজাদারা। যে-ব্যাটার পেটে গুলি করেছিলাম, কি করে যে জখম হল সে—আজও তা

বুঝে উঠতে পারেনি বলেই মনে হয় আমার। তাই ফন্দা আঁটলাম, একবার যদি রাইফেলগুলো হাতে পাই, মরণ খেলায় মজা কি, হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব প্রত্যেককে।

'তাই আজ ভোরবেলাই পাহারাদার ব্যাটাচ্ছেলের পেটে ঝাড়লাম এক লাথি। ঠিকরে পড়ল শয়তানের বাচ্চা। আমিও পাঁইপাঁই করে ক্যাম্পে ফিরে এসে বন্দুক-টন্দুক নিয়ে এসে বসলাম এখানে।'

যুগপৎ বিস্ময় আর আতংকে বললাম চাপা গলায়—'কিন্তু প্রফেসর দু-জন!'

'এই তো এক্ষুনি ফিরে যাবো ওঁদেরই জন্যে। সঙ্গে করে আনা তো সম্ভব ছিল না। চ্যালেঞ্জার তো গাছে উঠে ঘুমোচ্ছিলেন, সামারলির এক পাও হাঁটবার ক্ষমতা ছিল না। উপায় ছিল একটাই—বন্দুক নিয়ে ফিরে গিয়ে ওঁদের উদ্ধার করা। তবে হ্যাঁ, প্রতিশোধ ওঁদের ওপর নিতে পারে, এমন সম্ভাবনা যে নেই তা বলছি না। কিন্তু চ্যালেঞ্জারকে ছোঁবে বলে বলে মনে হয় না—সামারলির কথা বলতে পারব না। আরে ছোকরা, আমি পালিয়ে না এলেও কি সামারলি রেহাই পেতেন? মোটেই না। তাই বলছি, পালিয়ে এসে পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তুলেছি, এমনটা ভেবো না। কিন্তু এবার ফিরে যাবো, ওঁদের উদ্ধার করবো। ছোকরা, মনে সাহস আনো—আজ সন্ধ্যের আগেই—এসপার কি ওসপার একটা কিছু হবেই।'

ঝাঁকি মেরে মেরে লর্ড রক্সটনের ছোট-বড় বাক্য ধারার চিত্রকল্প তুলে ধরার চেষ্টা করে গেলাম মাত্র। জানি না হুবহু অনুকরণ করতে পারলাম কিনা। প্রতিটি শব্দের মধ্যে বিচ্ছুরিত হল কিন্তু কিছুটা কৌতুক, আর কিছুটা হঠকারিতা—পরিণাম সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন বেপরোয়া মানুষ যে ভাবে কথা বলে মরিয়া ঢঙে—চেষ্টা করলাম কাহিনী-কথনের মধ্যে তা ফুটিয়ে তুলতে। তা সত্ত্বেও কিন্তু বলব, জন্ম ইস্তক উনি নেতা। অথবা, নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যেই যেন ওঁর জন্ম।

বিপদ যত ঘনিয়ে আসে, ওঁর ফুর্তি যেন তত বেড়ে যায়—মন তত হাল্কা হয়ে যায়—কথাবার্তা হাব ভাবে তার অদ্ভুত বিচ্ছুরণ ঘটে। কথা বলতে থাকেন আরো তড়বড় করে, প্রাণশক্তি নক্ষত্র-রোশনাই বিতরণ করে শীতল দুই চক্ষুতে, মজারু উত্তেজনায় খাড়া হয়ে যায় ডন কুইকসোট মার্কা গোঁফ জোড়া। বিপদকে উনি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন, অ্যাডভেঞ্চারের নাটকে কোণঠাসা অবস্থায় পৌঁছোলে তুরীয় আনন্দে ফেটে পড়েন, জীবনের প্রতিটি সংকটকে এক-এক রকমের চিত্ত-বিনোদনের খেলা হিসেবে দেখেন,

ভয়ংকর খেলায় হেরে গেলে প্রাণটা বাজেয়াপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও আনন্দে ফুটিফাটা হয়ে থাকেন—সব মিলিয়ে এই সব ভয়ংকর যমে-মানুষে লড়াইয়ের মুহূর্তে ওঁর মত ওয়াগুারফুল দোসর আর হয় না। বিত্তের জাহাজ দুই সঙ্গীর পরম বিপদাশংকায় মনটা উতলা হয়ে না থাকলে এ সব ব্যাপারে লর্ড জনের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-নাটকে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্যে নির্জলা আনন্দে আমিও মত্ত হতে পারতাম। ঝোপের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি দুজনে, এমন সময়ে আবার বাহু খামচে ধরলেন উনি।

'মারে গেল যা! এদিকেই যে আসছে শয়তানের বাচ্চারা!'

দূরে দেখতে পেলাম একটা সবুজ পত্রপল্লবের চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা আর দু-পাশে সারি সারি গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরা একটা বাদামী পথ—গির্জের স্তম্ভশ্রেণীর পাশে, আসন শ্রেণীর মাঝে যে-রকম পথ অথবা আইল্ থাকে—অনেকটা যেন সেইরকম। এই পথে চলেছে বানর-মানুষদের একটা বাহিনী। চলেছে লাইন দিয়ে—একজনের পেছনে আর একজন। বেঁকা পা, মাথা ঝুঁকে রয়েছে মাটির দিকে পিঠ কুঁজো হয়ে থাকার দরুন, দু-হাত মাঝে মাঝে মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে—হেলে দুলে চলেছে এইভাবে। ঝুঁকে চলার ফলে মাথায় অনেকটা খাটো মনে হলেও সোজা হয়ে দাঁড়ালে পাঁচ ফুট কি তারও একটু বেশী হবে, হাত জোড়া বেজায় লম্বা, বুক কপাটের মত বিশাল। লাঠিসোঁটা রয়েছে বেশ কয়েকজনের হাতে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন অত্যন্ত লোমশ আর বিকৃতদেহী একদল মানব চলেছে বদখৎ ভঙ্গিমায়। মুহূর্তের জন্য সুস্পষ্ট দেখলাম সেই দৃশ্য। পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল তারা মহাবনের মধ্যে।

রাইফেল বাগিয়ে ধরেছিলেন লর্ড জন। এখন বললেন ফিস্ ফিস্ করে—'না হে, এখন যাওয়া যাবে না। আগে ওরা জঙ্গল ঢুঁড়ে বেদম হোক, তারপর সটান হানা দেব ওদের আসল ঘাঁটিতে। ঘণ্টাখানেক সবুর করে যাওয়া যাক।'

এই একটা ঘণ্টা টিনের খাবার খেয়ে ব্রেকফাস্ট সারলাম। গত সকাল থেকে খান কয়েক ফল ছাড়া লর্ড জনের পেটে কিছু পড়েনি—খেলেন তাই রাক্ষসের মত। তারপর পকেট বোঝাই কার্তুজ আর দু-হাতে দুটো রাইফেল নিয়ে রওনা হলাম অভীষ্ট সাধন করতে। তার আগে গাছপালায় এমন দাগ দিয়ে রাখলাম যাতে জায়গাটা ফের খুঁজে নেওয়া যায়—ফোর্ট চ্যালেঞ্জার কোন্‌দিকে, সে নিশানাও রেখে গেলাম। লুকোবোর এমন

জায়গা হাতছাড়া করতে রাজী নই কেউই। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মহাবন অতিক্রম করে এলাম খাড়াই পর্বত-প্রাচীরের ঠিক ধারটিতে—আমাদের পুরোনো ঘাঁটির একদম কাছে। ঐখানেই থমকে দাঁড়িয়ে লর্ড জন ওঁর ফন্দীর কিছুটা শোনালেন আমাকে।

বললেন—'ঘন জঙ্গলে ওরাই কিন্তু আমাদের মাস্টার। আমাদের দেখতে পাবে, আমরা কিন্তু ওদের দেখতে পাব না। খোলা জায়গায় কিন্তু তা হবে না। খোলা অঞ্চলে ওদের চাইতেও জোরে যেতে পারব। কাজেই যতটা পারবো খোলা জায়গা দিয়ে যাবো। মালভূমির কিনারায় বড় গাছ খুব কমই আছে—ভেতর দিকে আছে বেশী। সুতরাং এইদিক দিয়েই এগোবো আমরা। আস্তে যাবে, চোখ খোলা রাখবে, রাইফেল রেডী রাখবে ছোকরা. শেষ কথাটা বলে রাখি. পকেটে একটা কার্তুজও যতক্ষণ থাকবে—জ্যান্ত ধরতে না পারে আমাদের।'

মালভূমির কিনারায় পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম অনেক নিচে পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে ধূমপান করছে আমাদের বিশ্বস্ত অনুচর জাম্বো। চিৎকার করে বলতে পারতাম কি ঝামেলায় পড়েছি—কিন্তু বিরত রইলাম খামোকা বিপদ ডেকে আনব বলে। মহাবন যেন ছেয়ে গেছে বাঁদর-মানুষে—প্রায়ই কানে ভেসে আসছে তাদের অদ্ভুত কাঁ্যা-কোঁ ক্যাট-ক্যাট কথাবার্তা। আওয়াজ শুনলেই ঝোপে গা ঢেকে বসে গেছি গ্যাজোর-গ্যাজোর ব্যাজার-ব্যাজার শব্দলহরী দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। এই কারণেই হড়বড় করে এগিয়ে যেতে পারছিলাম না। ঘণ্টা দুয়েক পরে লর্ড জনের সতর্ক আচরণ দেখে বুঝলাম গন্তব্যস্থানের কাছে এসে গেছি। ইসারায় আমাকে চুপচাপ ঘাপটি মেরে থাকতে বলে নিজে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেলেন সামনে—ফিরে এলেন মিনিট খানেকের মধ্যেই—উদগ্র ব্যগ্রতায় থিরথির করে কাঁপছে মুখের পেশী।

'এসো! তাড়াতাড়ি এসো! ভগবান বাঁচিয়েছেন! খুব দেরী করিনি!'

আমি নিজেও স্নায়বিক উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেলাম পাশাপাশি—ঝোপের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিচালনা করে অদূরে দেখলাম একটা প্রশস্ত উন্মুক্ত চত্বর।

দৃশ্যটা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে আমার মনের মধ্যে। অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃতিক, অলৌকিক—তিন জাদুকরী ডাইনির যেন বিকট লীলার উল্লোল মত্ততা চলছে চোখের সামনে। কি করে যে সে দৃশ্য আপনার সামনে উপস্থাপিত করব, তাও ভেবে পাচ্ছি না। স্যাভেজ ক্লাবে বসে টেম্স্

নদীর অববাহিকার পানে যখন তাকিয়ে থাকব বছর কয়েক পরে, তখনও এ-দৃশ্য সত্যিই দেখেছিলাম কিনা, এ সংশয়ও মনে জেগে থাকবে। হলফ করে বলতে পারি, তখন কিন্তু মনে হবে আজকের এই দৃশ্য নিশ্চয় দুঃস্বপ্নে দেখেছিলাম, জ্বরের ঘোরে প্রলাপের প্রকোপে মনে মনে রচনা করে নিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও স্মৃতিটা টাটকা থাকতে থাকতেই লিখে যাব—আমার পাশে উপুড় হয়ে যিনি শুয়ে আছেন—সাক্ষী দেবেন তিনি।

প্রায় কয়েক-শ গজ জায়গা নিয়ে একটা প্রশস্ত উন্মুক্ত চত্বর দেখলাম চোখের সামনে। ঘাস সবুজ বিস্তৃত প্রান্তর। দূরে খাড়াই পর্বত-প্রাচীরের গা ঘেঁসে ছোট ছোট ঝোপ। প্রান্তর ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে বিরাট বিরাট মহীরুহের ডালে ডালে পাতা দিয়ে তৈরী অদ্ভুতাকৃতি কুটিরের পর কুটির—একটার ওপর আর একটা। মোটা মোটা ডাল বোঝাই হয়ে রয়েছে এই ধরনের পত্র-কুটিরে। পাখীর বাসা যদি বাড়ীর মত দেখতে হয়, তাহলে যা দাঁড়ায়—অনেকটা তাই—বোঝবার সুবিধের জন্যে দিলাম উপমাটা। কুঁড়ের সামনে খোলা জায়গায় আর ডালে ডালে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে বাঁদর-মানুষ। বাঁদরকে যদি শাখামৃগ বলা যায়, এদের বলা উচিত শাখা-মানব। তিলধারণের জায়গা নেই কোনো ডালে। সবই কিন্তু মাদী আর বাচ্চা। অপূর্ব দৃশ্যের এই গেল পটভূমিকা। এদের প্রত্যেকেই স্থির নয়নে দৃকপাত করে রয়েছে, অসীম ব্যগ্রতায় চোখের পাতা ফেলতেও যেন ভুলে যাচ্ছে যে-দৃশ্যের প্রতিটি অংশ দেখবার জন্যে—এবার আসা যাক সেই দৃশ্য-বর্ণনায়। আগেই বলে রাখি, দৃশ্যটা এমনই লোমহর্ষক যে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম একবার তাকিয়েই। সেই কারণে বর্ণনায় যদি সাবলীলতার অভাব লক্ষিত হয়, আমি যেন ক্ষমার্হ হই।

খোলা জায়গায় আর খাড়াই পর্বত প্রাচীরের সন্নিকটে সমবেত হয়েছে কয়েক শ লালচুলো লোমশ প্রাণী—বাঁদর-মানুষ। আকার আয়তনে প্রত্যেকেই বিপুলকায়। ভয়ংকর চেহারা—দেখলেই শিহরণ জাগ্রত হয় প্রতিটি লোমকূপে। অরণ্যাচারী বন্যবর্বর হলেও বেশ শৃঙ্খলাবোধ লক্ষ্য করলাম—সারবন্দী দাঁড়িয়েই আছে—লাইন থেকে ছিটকে যাওয়ার প্রচেষ্টা নেই কারো মধ্যে। এদের সামনে বলির পাঁঠার মত জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে একদল রেডইণ্ডিয়ান। খর্বকায়, লোমশদেহী মোটেই নয়, চড়া রোদে পালিশ করা ব্রোঞ্জের মত ঝক-ঝক করছে লাল চামড়া। এদের পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় শীর্ণাকৃতি এক শ্বেতকায় পুরুষ। মাথা হেঁট করে, দু-হাত ভাঁজ করে বুকের

ওপর রেখে এমন ভাবে স্থির নিষ্কম্প দেহে দাঁড়িয়ে আছেন যে দূর থেকেই ভাবভঙ্গী দেখে বোঝা যায় বিভীষিকায় রোমাঞ্চিত হয়েছে অবয়ব—এ-দৃশ্য আর যেন সইতে পারছেন না। অস্থিসর্বস্ব ঐ মূর্তি এক পলকেই চেনা যায়—প্রফেসর সামারলি।

বন্দীদের ঘিরে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন বাঁদর-মানুষ। পলায়নের কোনো পথ নেই। সজাগ চক্ষু নিবদ্ধ ম্রিয়মান মৃত্যু-পথের পথিক ক'জনের ওপর। এদের থেকে বেশ দূরে, খাড়াই পর্বত প্রাচীরের কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে দুটি মূর্তিকে। অদ্ভুত আকৃতি সম্পন্ন দুটি মূর্তি। অন্য পরিস্থিতিতে ঐ আকৃতি আর ঐ মূর্তি দেখলে হাস্যের উদ্রেক ঘটত সন্দেহ নেই—কিন্তু সেই অবস্থায় হাসতে পারলাম না। আমার সমস্ত সত্তা, সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হল বিচিত্র ঐ দুটি আকৃতির ওপর। আবিষ্ট হয়ে চেয়েই রইলাম মন্ত্রমুগ্ধের মত। দুজনের একজন আমাদের কমরেড—প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। ছেঁড়া কোটের অবশিষ্টাংশ শার্টখানা ফর্দাফাঁই হয়ে উড়ে গেছে গা থেকে—বিশাল কালো দাড়ির জঙ্গল মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে প্রকাণ্ড বুকের কালো লোমের জঙ্গলের সঙ্গে। টুপি উধাও হয়েছে মাথা থেকে। মাথার ওপর দিয়ে একদিনের তাণ্ডব-লীলার স্বাক্ষরস্বরূপ লম্বালম্বা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে বিশাল ঘন ঝোপের মত ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে—লটপট করছে হাওয়ায়। মাত্র একটা দিনেই পালটে গিয়েছে মানুষটা। ছিলেন আধুনিক সভ্যতার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি—এখন হয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত আদিম বর্বর। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ওঁর প্রভু—বাঁদর মানুষদের নৃপতি। লর্ড জন ঠিক যে-রকম বলে ছিলেন, রাজামশায়কে হুবহু চ্যালেঞ্জারের মতই দেখতে—তফাৎ শুধু চুলের রঙে। একজন কালো, অপরজন লাল। মাথায় সেই রকমই খাটো, বৃষস্কন্ধ, কপাটের মত বুক, হাত ঝুলছে সামনের দিকে, খাড়াখাড়া দাড়ি লুটোপুটি জুড়েছে লোমশবুকে। তফাৎ ধরা যায় কপালের সাইজ দেখলে—ভুরুর ওপরে একজনের কপাল ঢালু এবং অপ্রশস্ত, আরেকজনের উন্নত প্রশস্ত ললাটে মেধার ঝিকিমিকি। লাল চ্যালেঞ্জারের করোটি গোল এবং ছোট্ট, কালো চ্যালেঞ্জারের করোটি খাঁটি ইউরোপীয় করোটির মতই অপূর্ব সুন্দর। কপাল আর করোটি—এই দুইদিক দিয়েই দারুণ অমিল দুজনের মধ্যে—বাদবাকী ব্যাপারে হুবহু এক। প্রফেসরের বিদ্রূপাত্মক গম্ভীর অনুকরণ ঐ রাজামশায়! হাস্যকর, কিন্তু হাসতে পারলাম কই?

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের শার্টখানা ফর্দাফাঁই হয়ে উড়ে গেছে গা থেকে—বিশাল কালো দাড়ির জঙ্গল মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে প্রকাণ্ড বুকের কালো লোমের জঙ্গলের সঙ্গে। পৃঃ ১৮৯

কেন না, এই যে এতক্ষণ ধরে বিরাট এই দৃশ্যটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করে গেলাম, তার সবটুকুই পর্যবেক্ষণ করলাম মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। ঐ কয়েক সেকেণ্ডের বেশী এ ব্যাপারে কালক্ষেপ করার মত সময় হাতে ছিল না। পরক্ষণেই মাথা ঘামাতে হল সম্পূর্ণ অন্য একটা বিষয় নিয়ে। অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর একটা নাটক অনুষ্ঠিত হতে চলেছিল সামনের চত্বরে। দুজন বাঁদর-মানুষ দল থেকে একজন রেড ইণ্ডিয়ানকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল খাড়াই পর্বত-প্রাচীরের কিনারায়। হাত তুলে ইসারা করল রাজামশায়। দুজনে দুদিক থেকে লোকটাকে চাংদোলা করে ধরে ভীষণ জোরে সামনে পেছনে দুলিয়ে নিল তিনবার, তারপর এমন বেগে ছুঁড়ে দিল বাইরের দিকে যে নিচে ছিটকে যাওয়ার আগে বেচারার দেহটা সাঁ করে উঠে গেল অনেক উঁচুতে। তারপর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা ছাড়া বাকী সব্বাই ধেয়ে গেল খাদের কিনারায়—বেশ কিছুক্ষণ সূচীভেদ্য স্তব্ধতার পরেই উন্মত্ত উল্লাসের বিস্ফোরণ ঘটল যেন। দীর্ঘ লোমশ বাহু শূন্যে উৎক্ষেপ করে বিকট আনন্দের অট্টরোল তুলে নেচে উঠল তাথৈ তাথৈ করে। তাণ্ডব নৃত্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ফিরে এল লাইনে যে-যার জায়গায়—উন্মুখ হয়ে রইল পরবর্তী মৃত্যুপথযাত্রীর শূন্যে উৎক্ষেপণ এবং বাঁশবনে এফোঁড়-ওফোঁড় হওয়ার দৃশ্য দেখার প্রতীক্ষায়।

এবার কিন্তু সামারলির পালা। দুজন পাহারাদার ওঁর কব্জি খামচে ধরে পাশবিক শক্তিবলে হ্যাঁচকা টান মেরে নিয়ে চলল সামনের দিকে। খাঁচা থেকে মুরগী বার করার সময়ে যেমন ঝটপটানি দেখা যায়, ওঁর শীর্ণ আকৃতি তেমনি ঝটপট করতে লাগল বৃথাই। সরু সরু হাত পায়ে বৃথাই লাথি ঘুসি চালানোর চেষ্টা করলেন—নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। রাজামশায়ের দিকে ফিরে চ্যালেঞ্জার ক্ষিপ্তের মত হাত নাড়তে লাগলেন। অনুরোধ, উপরোধ কাকুতিমিনতি—সব কিছুর মাধ্যমেই প্রাণভিক্ষা চাইলেন কমরেডের। বাঁদর-মানুষদের রাজামশায় এক ধাক্কায় তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মাথা নাড়তে লাগল জোরে জোরে। ধরাতলে সজ্ঞানে সেই তার শেষ অঙ্গ-চালনা। বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল লর্ড জনের রাইফেলে; কুণ্ডলী পাকানো একটা লাল বস্তুর মত গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল রাজামশায়।

লর্ড জনের আতীক্ষ্ণ চিৎকার শুনলাম কানের কাছে—'চালাও গুলি! ভীড়ের মধ্যে চালাও হে ছোকরা! চালাও! চালাও! দমাদম

চালিয়ে যাও!'

খুব সাধারণ মানুষের আত্মার অন্তস্তলেও অদ্ভুত লোহিত একটা স্তর থাকে। নরম প্রকৃতির মানুষ আমি ছেলেবেলা থেকেই—রক্তাক্ত জখম খরগোশের আর্তনাদ শুনেও চক্ষু সজল হয়েছে কতবার। কিন্তু সেই মুহূর্তে রক্তলোলুপ হয়ে গেলাম আমি। মনে আছে লীডারের ফায়ারিং অর্ডার পাওয়া মাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। একটার পর একটা গুলিভর্তি ম্যাগাজিন খালি করে গেছিলাম। খটাস্ করে ব্রীচ খুলে গুলি ভরে নিয়ে খটাং করে ফের বন্ধ করে প্রাণী হত্যার বিকট আনন্দে উল্লোল হয়ে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেধড়ক গুলি চালিয়ে গিয়েছিলাম। চার-চারটে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আমরা দুজনেই নরক কুণ্ড বানিয়ে চললাম চোখের সামনে—আকাশ বাতাস থরথর করে কাঁপতে লাগল উপর্যুপরি গুলিবর্ষণের নিরন্তর নির্ঘোষে—আকাশের অজস্র বজ্র যেন মর্তে নেমে এসে মহাপ্রলয় ঘটিয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। যে দুজন বাঁদর-মানুষ সামারলিকে দুদিকে থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল হিড়হিড় করে, তারা দুজনেই একযোগে ধরাশায়ী হওয়া সত্ত্বেও হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে মাতালের মত টলতে লাগলেন সামারলি—মুক্তি পেয়ে গেলেন ভাবতেও যেন পারছিলেন না। মৃত্যু-ঝঞ্ঝার আবির্ভাব কোত্থেকে, এর মানেই বা কী—কিছুই না বুঝতে পেরে হতচকিত বাঁদর-মানুষরা কাতারে কাতারে দৌড়োতে লাগল যে-যেদিকে পারে। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে এদিকে সেদিকে হাত নেড়ে দেখিয়ে, তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়োতে গিয়ে দমাদম করে আছড়ে পড়তে লাগল ভূপাতিত লাশগুলোর ওপর। তারপরেই যেন সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে বুঝে নিলে বাঁচতে হলে গাছে গিয়ে ওঠা দরকার—খোলা জায়গা আর নিরাপদ নয়—তাই সহসা একযোগে বিকট আর্তনাদ করতে করতে হতাহত সঙ্গীদের মাঠের ওপর ফেলেই দল বেঁধে দৌড়োলো গাছের নিরাপদ আশ্রয় লক্ষ্য করে। খোলা চত্বরের ঠিক মধ্যিখানে ক্ষণেকের জন্যে দাঁড়িয়ে রইল কেবল বন্দীরা।

বলিহারি যাই চ্যালেঞ্জারের ব্রেনকে। ক্ষিপ্র বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চকিতে বুঝে নিয়েছিলেন অ-নরমেধ যজ্ঞের হোতা কারা এবং উৎসটা কোথায়। লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে এসে বিমূঢ় সামারলিকে হ্যাঁচকা টান মেরে দৌড়ে এলেন আমাদের দিকে। দুজন পাহারাদারও পেছন পেছন ধাওয়া করতেই লর্ড জনের রাইফেলের দুটো বুলেট তাদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়ে ছাড়ল তৎক্ষণাৎ। খোলা জায়গায় দৌড়ে বেরিয়ে এসে দুই প্রফেসরের হাতে

একটা করে রাইফেল গছিয়ে দিলাম আমি আর লর্ড জন। কিন্তু সামারলির গায়ে শক্তি বলে আর কিছুই ছিল না তখন। টলমল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও নেই। এদিকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই আকস্মিক আতংক কাটিয়ে উঠেছে বাঁদর-মানুষরা। ঝোপের মধ্যে দৌড়ে এসে আমাদের ঘেরাও করার মতলবে রয়েছে। আমি আর চ্যালেঞ্জার সামারলিকে দুদিক থেকে ধরে দৌড়োতে লাগলাম—লর্ড জন পেছনে থেকে সমানে গুলি চালিয়ে গেলেন—ঝোপের মাথায় লাল মাথা দেখলেই খুলি উড়িয়ে দিলেন অব্যর্থ লক্ষ্যে। মাইলখানেক কি তারও একটু বেশী পথ কটর-কটর আওয়াজে মহীতল বিদীর্ণ করে শয়তানের বাচ্চারা দৌড়ে এল পেছন পেছন। তারপর মন্থর হল পাছু নেওয়া—হাল ছেড়ে দিলে অবশেষে। শক্তির মহিমা বুঝতে পেরে, অব্যর্থ রাইফেলের সামনে এগোনোর সাহস হল না কারুরই। ক্যাম্পে পৌঁছে পেছন ফিরে দেখলাম কেউ আর নেই পেছনে।

প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। ভুলটা ভাঙল অচিরেই। কাঁটাঝোপের ফটক বন্ধ করে পরস্পরের হাত চেপে ধরে, হাঁপাতে হাঁপাতে যেই ধড়াধ্বড় করে শরীর এলিয়ে দিয়েছি ঝর্ণাটার পাশে, অমনি প্রবেশ পথের বাইরে শুনলাম ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ, সেইসঙ্গে কান্নাজড়ানো করুণ আর্তনাদ। লর্ড রক্সটনের লোহার শরীর বলেই তৎক্ষণাৎ স্প্রিংয়ের মত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে এক ঝটকায় খুলে ফেললেন বেড়ার দরজা। দেখলাম, ওঁর পায়ের সামনে উপুড় হয়ে দণ্ডবতের ভঙ্গিমায় শুয়ে চারজন ইণ্ডিয়ান—দলটার মধ্যে থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে ঐ চার-জনেই—ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে আমাদের দেখে—অথচ প্রাণপাত হয়ে আশ্রয় চাইছে আমাদের কাছেই। চারজনের একজন অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলে আশপাশের মহাবনে মহাবিপদরা কিলবিল করছে। পরক্ষণেই ঠিকরে এগিয়ে এসে দু-হাতে লর্ড জনের দু-পা জড়িয়ে ধরে মুখ রগড়াতে লাগল পায়ের পাতার ওপর হাউমাউ করে।

রীতিমত হকচকিয়ে গিয়ে গোঁফে তা দিতে দিতে লর্ড জন বললেন—'আরে গেল যা! এদের নিয়ে হবেটা কি আমাদের? এই···আরে এই ক্ষুদে বিটলে—উঠে দাঁড়া না—বুটের ওপর থেকে মুখটা সরা আগে!'

উঠে বসেছিলেন সামারলি। প্রাণপ্রিয় ব্রায়ার পাইপে তামাক ঠাস-ছিলেন।

বললেন—'ওদের নিরাপত্তার ভার তো এখন থেকে আমাদেরই! কি কাণ্ডটা করে এলেন বলুন তো? যমের মুখ থেকে টেনে আনলেন সব কটাকে!

চার-চারটে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আমরা দুজনেই নরককুণ্ড বানিয়ে চললাম চোখের সামনে—আকাশ বাতাস থরথর করে কাঁপতে লাগল উপর্যুপরি গুলিবর্ষণের নিরন্তর নির্ঘোষে।
পৃঃ ১৯২

বলিহারি যাই আপনাকে !'

বজ্রনাদে প্রশংসামুখর হলেন চ্যালেঞ্জার—'সাবাস ! হাজারখানা সাবাস প্রাপ্য আপনার ! শুধু আমাদের তরফ থেকে নয়—গোটা ইউরোপীয় বিজ্ঞান-মহল একযোগে কৃতজ্ঞ রইল আপনার কাছে—সোনার অক্ষরে বিজ্ঞান-অভিযানের ইতিহাসে লেখা থাকবে আপনার কীর্তিকাহিনী ! নির্দ্বিধায় বলতে পারি, প্রাণীবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা বিরাট ফাঁক থেকে যেত যদি আমি আর সামারলি অদৃশ্য হয়ে যেতাম। ছোট্ট বন্ধু আর আপনি দুজনে মিলে যা করে এলেন, তা এক কথায় তোফা ! অপূর্ব ! অতুলনীয় !'

বলতে বলতে ওঁর সেই পিতৃসুলভ মার্কা-মারা হাসিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। কিন্তু ইউরোপীয়-বিজ্ঞান মহল তাঁদের আদরের দুলালকে দেখে সেই মুহূর্তে তাজ্জব হয়ে যেতেন। ভবিষ্যতের আশা ভরসা যাঁর ওপর নির্ভর করছে, কি খোলতাই চেহারাখানাই না বাগিয়ে এনেছেন তিনি একদিনের অভিযানে। মাথার জটা তো কাকের বাসার মত ছত্রাকার হয়ে রয়েছেই, সেই সঙ্গে খোলা চ্যাটালো বুকের ওপর ঝুলছে ন্যাকড়ার ফালির মত কোটের ছিন্ন অংশ। এহেন অপরূপ চিত্তমনোহর অবস্থায় দু-হাঁটুর মধ্যে ধরে রেখেছেন একটা মাংসের খোলা টিন এবং দু-আঙুলে খামচে আছেন একটা সুবৃহৎ শীতল অস্ট্রেলিয়ান ভেড়ার মাংসখণ্ড। ইণ্ডিয়ানরা উপুড় অবস্থায় মাথা তুলে জুল জুল করে সেই দৃশ্য দেখামাত্র বিকট আর্তনাদ করে উঠে পরক্ষণেই মাটিতে মুখ রগড়াতে রগড়াতে পা জড়িয়ে ধরল লর্ড জনের।

ধুলো বালিতে জটপাকানো একটা মাথা সস্নেহে চাপড়াতে চাপড়াতে লর্ড জন বললেন—'দূর বোকা, এত ভয়ের কি আছে ? চ্যালেঞ্জার, আপনার চেহারাটা পছন্দ হচ্ছে না বেচারাদের ! আরে মশাই, আমারই কি হচ্ছে ? ওদের হাড় হিম তো হবেই !—ঠিক আছে রে, ঠিক আছে। ঘাবড়াসনি—আমাদের মতই মানুষ উনি—বাইরেটা একটু যা আলাদা।'

'তাই নাকি !' মেঘগর্জন করলেন প্রফেসর।

'চ্যালেঞ্জার, আপনার কপাল ভালো আপনি আর পাঁচজনের মত মামুলি চেহারার নন। রাজামশায়ের মত যদি দেখতে না হত আপনাকে—'

'লর্ড জন রক্সটন, আপনি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন !'

'কি মুস্কিল ! যা ঘটনা, তাই তো বলছি।'

'দয়া করে প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করুন। আপনার মন্তব্যগুলো অপ্রাসঙ্গিক তো বটেই, দুর্বোধ্যও বটে। আমাদের আশু সমস্যা হল এই ইণ্ডিয়ান ক'টার

কি ব্যবস্থা করা যায়। সমাধান একটাই—ওদের বাড়ী কোথায় যদি জানতে পারি—সেইখানেই ফিরিয়ে দিয়ে আসা যাক।'

জবাবটা দিলাম আমি—'ওটা কোনো সমস্যা নয়। এরা থাকে সেন্ট্রাল লেকের ওপাড়ের গুহায়।'

'ছোট্ট বন্ধু তাহলে জানে ওদের আস্তানার ঠিকানা। কিন্তু জায়গাটা যে বেশ দূরে হয়ে গেল।'

'বিশ মাইল তো বটেই!' বললাম আমি।

গুঙিয়ে উঠলেন সামারলি।

'আমি অন্ততঃ আর যেতে পারবো না। জানোয়ারগুলোর হল্লাবাজি এখান থেকেই কানে আসছে।'

দূর বনের মধ্যে থেকে ভেসে এল বাঁদর-মানুষদের সম্মিলিত কটর কটর ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর চেঁচামেচি। শুনেই তো ফের কুঁই-কুঁই করে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল ইণ্ডিয়ান চারজন।

দ্রুত কণ্ঠে হুকুম চালিয়ে গেলেন লর্ড জন—'আর এক মুহূর্তও দেরী নয়—এখুনি সরে পড়তে হবে এখান থেকে। ছোকরা, তুমি সামারলিকে ধরে নিয়ে চলো। ইণ্ডিয়ানরা জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাক। এসো, এসো, ওদের চোখে পড়ার আগেই গা-ঢাকা দিতে চাই।'

আধঘন্টাও গেল না—ঝোপের মধ্যে সেই লুকোনো ঘাঁটিতে এসে জড়ো হলাম সবাই। সারাদিন ধরে শুনলাম ক্যাম্পের দিকে বাঁদর-মানুষদের উত্তেজিত হল্লাবাজি—কিন্তু এদিক মাড়ালো না কেউই। ফলে, লাল এবং সাদা পলাতক ক'জন কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় কাটিয়ে দিল দিনটা। ক্লান্তিতে অস্থিসন্ধিগুলো পর্যন্ত যেন খুলে আসবার উপক্রম হয়েছিল—তাই সন্ধ্যে নাগাদও যখন ঢুলছি, চ্যালেঞ্জারকে দেখলাম আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন।

বললেন মর্যাদা-গম্ভীর স্বরে—'মিষ্টার ম্যালোন, সব ঘটনার বৃত্তান্ত তুমি টুকে রাখছ—পরে ছাপবার ইচ্ছেও নিশ্চয় আছে।'

'আমি তো এসেইছি খবরের কাগজের মাল মশলা সংগ্রহ করতে।'

'ঠিক, ঠিক। লর্ড জন রক্সটনের কয়েকটা মূঢ়ের মত উক্তি নিশ্চয় কানে গেছে তোমার—মানেটা—মানেটা—আমার সঙ্গে নাকি সাদৃশ্য আছে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কানে গেছে আমার।'

'এ রকম ধরনের আইডিয়া নিয়ে ঢাক ঢোল পেটা হোক—এটা আমি চাই না। তোমার বিবরণীতে চপলতা প্রকাশ পাক, এটা তুমিও নিশ্চয় চাও না। ঐ ধরনের চ্যাংড়ামি যদি দেখি ছাপা হয়েছে, ব্যাপারটা কিন্তু

অত্যন্ত আপত্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।'

'সত্যের অপলাপ করব না কথা দিচ্ছি।'

'মাঝে মাঝে লর্ড জনের পর্যবেক্ষণে কল্পনার ভেজাল অতিরিক্ত মাত্রায় ঢুকে যায়—বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। ব্যক্তিত্ব আর চরিত্রর সামনে অত্যন্ত অনুন্নত জাতিও যে মাথা হেঁট করতে পারে, সম্মান দেখাতে চায়—এই সহজ সত্যটার কদর্থ খাড়া করে ফেলেন—মা'নীর মান কেউ যদি রাখে, সেটা কি অন্যায়? কি বলতে চাই, বুঝেছো নিশ্চয়?'

'একেবারে।'

'বিষয়টা তোমার বিচার বুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিলাম।' বলে, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বললেন—'বাঁদর-মানুষদের রাজাটার চেহারা বাস্তবিকই সম্ভ্রান্ত—অত্যন্ত অসাধারণ রকমের দেহশ্রীর অধিকারী—ব্যক্তিত্বও তুলনা-বিহীন। লক্ষ্য করেছো কী?

'অত্যন্ত অসাধারণ প্রাণী নিঃসন্দেহে,' মন্তব্য করলাম আমি।

মনটা হাল্কা হয়ে যেতেই ফের লম্বমান হলেন প্রফেসর এবং ঘুমিয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।

১৪ ॥ সত্যিকারের যুদ্ধজয় বলতে যা বোঝায়

ভিত্তিহীন কল্পনার আত্মপ্রসাদে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলাম ঝোপের মধ্যে লুকোনো ঘাঁটিতে—ভেবেছিলাম বাঁদর-মানুষরা বুঝি আমাদের নাগাল ধরতে পারে নি—এখানকার ঠিকানাও জানে না। কিন্তু মহাভ্রমটা আবিষ্কৃত হল অচিরেই এবং বড় মারাত্মক ভাবে। বনতল নিস্তব্ধ ঠিকই, কোথাও কোনো শব্দ নেই, গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। নিবিড় প্রশান্তি বিরাজমান চারিদিকে। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বোঝা উচিত ছিল, এরা কি পরিমাণ ধূর্ত। সেয়ানার শিরোমণি এক-একজন। ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে থাকে চারিদিকে, খর নজর রাখে পত্রপল্লবের আড়াল থেকে—সুযোগ না আসা পর্যন্ত নিথর দেহে বসে থাকে ডালে ডালে। সেদিন সকালে তাই মৃত্যুর চোয়ালের ফাঁকে গিয়ে পড়েছিলাম বললেই চলে—এভাবে কালান্তকের করাল খর্পরে ইহজীবনে আর আমাকে পড়তে হয়নি। কিন্তু এভাবে নয়, গুছিয়ে লেখা যাক ঘটনা পরম্পরা—ঠিক যে ভাবে ঘটেছিল—সেই ভাবে।

গত দিনের আধপেটা খাওয়া আর অমানুষিক পরিশ্রমের পর ঘুম থেকে উঠলাম অসীম ক্লান্তি নিয়ে—প্রত্যেকেরই সেই একই অবস্থা। গা-গতরে সেকী টাটানি! বিশেষ করে সামারলির। ভদ্রলোক এত কাহিল হয়ে পড়ে-

ছিলেন যে অনেক কসরৎ করে কোনমতে খাড়া হতে পারছিলেন দু-পায়ে। কিন্তু খেঁকী মেজাজ তাতেও যায়নি। হার স্বীকারের পাত্র নন। তেড়ে তেড়ে উঠছেন কথায় কথায়—ভাবখানা, আমি কি ডরাই কভু—ভিখারী রাঘবে? যাই হোক, মিটিং করে ঠিক করলাম ঘণ্টাখানেক কি দুয়েক ঝোপেই থাকব, ব্রেকফাস্ট সেরে নেব, তারপর মালভূমি বরাবর এগিয়ে সেন্ট্রাল লেক প্রদক্ষিণ করে ওদিককার ইণ্ডিয়ানদের গুহায় গিয়ে উঠব। প্রাণে যাদের বাঁচিয়েছি, তাদের জ্ঞাতিগুষ্টিরা খাতির করে ঠাঁই দেবে নিশ্চয়। তারপর ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের গুপ্তরহস্যের বিশদ বিবরণ বগলে করে এখান থেকে চম্পট দেওয়ার পথ খোঁজা যাবে। চ্যালেঞ্জার পর্যন্ত বললেন, ঢের হয়েছে, আর না। যা করতে আসা, তা তো হয়েই গেল। এখন খবর টবর গুলো সভ্য দুনিয়ায় পৌঁছে দিয়ে সবার চক্ষু চড়কগাছ করে দেওয়া যাক বিস্ময়কর আবিষ্কারের পর আবিষ্কারের বর্ণনা শুনিয়ে।

ইণ্ডিয়ানদের চেহারাগুলো এবার ধীরে সুস্থে দেখা গেল। আকারে খাটো হলেও দিব্বি মজবুত গড়ন প্রত্যেকের, ক্ষিপ্র এবং কষ্ট সহিষ্ণু। চামড়ার পটি দিয়ে মাথার কালো চুল ঝুঁটি বাঁধা পেছন দিকে। পরনেও চামড়ার কৌপিন। মুখ লোমশ নয়, বেশ সুগঠিত মুখশ্রী এবং পরিহাসপটুও বটে। কানের লতি ছিঁড়ে ঝুলছে—রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে—যা দেখে বোঝা যায় কর্ণভূষণের রেওয়াজ আছে—বাঁদর-মানুষরা টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে। ভাষা দুর্বোধ্য, কিন্তু সাবলীল। পরস্পরকে দেখিয়ে বারবার 'আকালা' শব্দটা উচ্চারণ করায় বুঝলাম 'আকালা' ওদের জাতির নাম। মাঝে মাঝে ভয়ে আর ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে মুঠো পাকিয়ে জঙ্গল দেখিয়ে 'ডোডা! ডোডা!' বলে তর্জনগর্জন করায় বুঝলাম, 'ডোডা' ওদের শত্রুদের নাম।

সামারলি বললেন—'চ্যালেঞ্জার, কি বুঝলেন বলুন তো? মাথার সামনের দিকটা কামানো ছোঁড়াটা নিশ্চয় এদের সর্দার।'

কথাটা সত্যি। ছোঁড়া যাকে বলা হল, সে কিন্তু অন্য ইণ্ডিয়ানদের গায়ে গা ঘেঁসিয়ে দাঁড়াচ্ছে না একবারও। দল ছাড়া গোড়া থেকেই। সঙ্গীরা সম্বোধন করছে সসম্ভ্রমে, গভীর শ্রদ্ধায়। বয়েসে সবচেয়ে ছোট হলেও মেজাজ বেশ উত্তপ্ত এবং অহংকৃত। চ্যালেঞ্জার একবার তাঁর কাঁধে হাত রেখে লেকচার দিতে গেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পেটে বুটের লাথি খাওয়া তেজী ঘোড়ার মত ছিটকে সরে গেল দূরে কালো চোখের বিদ্যুৎ ঝলক হেনে। তাতেও ক্ষান্ত হল না। দূরত্ব বজায় রেখেই বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে রেখে 'মারেতাস' শব্দটা উচ্চারণ করল বার কয়েক। প্রফেসর অবশ্য তাতে বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না

হয়ে হাত রাখলেন সবচেয়ে কাছে যে ইণ্ডিয়ানটা দাঁড়িয়েছিল, তার কাঁধে এবং ক্লাশরুমের টবে রাখা নমুনা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ঢংয়ে শুরু করে দিলেন বাগাড়ম্বর।

বললেন অর্গ্যান-বাজনার সুরলহরী মন্দ্রিত কণ্ঠস্বরে—'করোটির সাইজ, মুখাবয়ব অথবা অন্য যে কোনো রকমের পরীক্ষায় এদের নিচু শ্রেণীর মানুষ বলা যায় না। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ আমেরিকার অনেক উন্নত উপজাতিদের চেয়েও এরা বিলক্ষণ উচ্চস্তরের। এই রকম একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এই ধরনের উপজাতির বিবর্তনের কোনো ব্যাখ্যা কোনো দিক দিয়েই সম্ভব নয়। দেখাই তো যাচ্ছে এখানকার প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে বাঁদর-মানুষদের ফারাক নেহাৎ কম নয়। সেই তুলনায় সমুন্নত এই উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে মালভূমিতেই, এ তত্ত্ব মেনে নেওয়া যায় না কিছুতেই।'

মুখফোঁড় লর্ড জন অমনি বললেন—'তাহলে মক্কেলরা এল কোত্থেকে? আকাশ থেকে খসে পড়ল নাকি?'

'ইউরোপ আর আমেরিকার তাবৎ বিজ্ঞানীরা একদিন এই প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদে মত্ত হবে—কোনো সন্দেহই নেই তাতে,' জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার। তারপর ফানুসের মত ছাতিখানা ফুলিয়ে আশেপাশে স্পর্ধিত দৃষ্টিশর নিক্ষেপ করতে করতে বললেন—'আমার নিজের যা সিদ্ধান্ত, তা হল এই: সৃষ্টিছাড়া এই মালভূমিতে প্রাণের অভ্যুত্থান ঘটবার পর বিবর্তনের অগ্রগতি মেরুদণ্ডী শ্রেণী পর্যন্ত এগিয়ে থাম্বা খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—সেকাল আর একাল পাশাপাশি সহাবস্থান ঘটিয়ে চলেছে—পুরোনো জীবরা যেমন টিঁকে আছে, তেমনি রয়ে গেছে নতুন জীবরাও। সেই কারণেই টেপিরের মত আধুনিক জীবকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে—টেপিরের বংশগতি সুদীর্ঘ এবং সম্মানীয়—কথাটা দয়া করে খেয়াল রাখবেন। বিরাট হরিণ আর পিপীলিকাভুকরাও পাশাপাশি রয়ে গেছে জুরাসিক যুগীয় সরীসৃপ প্রাণীদের সঙ্গে। এই পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট—বুঝতে অসুবিধে নেই। এরপর আসা যাক বাঁদর-মানুষ আর রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রসঙ্গে। এদের এখানে উপস্থিতির বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা কি হতে পারে বলুন তো? একটা ব্যাখ্যাই এসেছে আমার মগজে—এরা বহিরাগত হানাদার। খুব সম্ভব সুদূর অতীতে বনমানুষের অস্তিত্ব ছিল দক্ষিণ আমেরিকায়—তাদের কিছু অংশ হয়তো ছিটকে এসে ঢুকে পড়েছিল মালভূমিতে। তারপর ক্রমবিবর্তনের ধারাপথে এমন এক শ্রেণীর প্রাণীতে পর্যবসিত হয়েছে যাদের কেউ কেউ'—এই পর্যন্ত বলে কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন

আমার পানে—'আকার আয়তনের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে যদি বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটাতে পারতো করোটির খোলে, তাহলে পৃথিবীর যে কোনো প্রাণবন্ত মনুষ্য জাতির ওপর দাপট চালিয়ে যেতে পারত—নির্দ্বিধায় আমার এই মতবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব যে ইণ্ডিয়ানদের আবির্ভাব ঘটেছে তারও পরে নিচের দুনিয়ার কোনো উপজাতিদের মধ্যে থেকে। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় অথবা নতুন দেশ জয়ের নেশায় কোনো একটা পথ বার করে নিয়ে সেই পথ বেয়ে উঠে এসেছে ওপরে। নতুন দেশে প্রবেশের পর ভয়ংকর হিংস্র দানবিক জন্তু জানোয়ার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সরু-মুখ গুহার মধ্যে—যে-গুহার ছবির মত বর্ণনা শুনিয়েছে আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুটি—কিন্তু গুহায় আশ্রয় নিয়েও রক্ষে পায়নি। বন্য জন্তুদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, লড়তে হয়েছে বাঁদর-মানুষদের সঙ্গেও। নবাগত রেড ইণ্ডিয়ানদের হানাদার হিসেবেই দেখেছে বাঁদর-মানুষরা—রবাহুতদের সঙ্গে নিষ্করুণ নির্মম যুদ্ধ চালিয়ে গেছে বছরের পর বছর এমন ধূর্ততার সঙ্গে যা বৃহত্তর জন্তুদের মগজে নেই। জেণ্টলমেন, এবার বলুন দিকি, প্রহেলিকাটার যথার্থ সমাধান করতে পারলাম কিনা? জিজ্ঞাসা থাকলে বলতে পারেন স্বচ্ছন্দে।'

প্রফেসর সামারলি তখন এমনই মুষড়ে পড়েছেন যে তর্ক করার মত গলায় জোরও নেই। কিন্তু তাই বলে কি বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর বাগবৈদগ্ধ্য? সজোরে মস্তক সঞ্চালন করে নীরবে তিনি জানিয়ে দিলেন যে অভিমতটা তাঁর মনোমত হয়নি। বিরল কেশ মস্তক কণ্ডুয়ন করে লর্ড জন শুধু মন্তব্য করলেন এই বলে যে বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো অভিপ্রায়ই তাঁর নেই, কেন না তিনি সমপর্যায়ের নন পাণ্ডিত্যের ওজনে অথবা শ্রেণীতে। আমি গুরুগম্ভীর পরিবেশটাকে ধূলিসাৎ করে দিলাম আমার চিরকেলে গদ্যময় কায়দায়। ঊর্ধ্ব-স্তরের বিজ্ঞান-দর্শনকে এক হ্যাঁচকায় নামিয়ে আনলাম বাস্তবের ধুলোয় একটি মাত্র কথায়। বললাম, চারজন রেডইণ্ডিয়ানের একজনকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

'ওকে আমিই পাঠিয়েছি জল আনতে,' বললেন লর্ড জন রক্সটন। 'গোমাংসের একটা খালি টিন হাতে গছিয়ে দিতেই ছুটেছে জলের সন্ধানে।'

'পুরোনো ক্যাম্পের দিকে নাকি?' সভয়ে প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

'না হে না। ছোট্ট সেই নদীটার দিকে। বেশী দূরে তো নয় এখান থেকে—খুব জোর দু-শ গজ। তবে বড্ড দেরী করছে দেখছি হতভাগা।'

'আমি যাই। দেখি কোথায় গেল,' বলে রাইফেল ঘাড়ে রওনা

হলাম ছোট্ট নদী অভিমুখে—ব্রেকফাস্ট নিয়ে ব্যস্ত রইলেন বন্ধুবর্গ। ভাবছেন বুঝি এমন হঠকারিতা দেখানোর দুর্বুদ্ধি হল কেন আমার। নিবিড় ঝোপের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ছেড়ে হুট করে বেরিয়ে পড়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হল? কিন্তু বাঁদর-মানুষদের নগর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে লুকিয়ে ছিলাম তো আমরা। আমাদের গোপন-ঘাঁটির সুলুক সন্ধানও পেয়েছে বলে জানতাম না। তাছাড়া, সঙ্গে যখন রাইফেল রয়েছে, তখন ভয়টা কিসের? ভুলটা করেছিলাম সব দিক দিয়েই। ধড়িবাজ বাঁদর-মানুষদের পুরো শক্তির নমুনা তখনো আমি পাইনি।

ছোট্ট নদীর কলকলানি শুনতে পাচ্ছিলাম সামনের দিকে। কিন্তু মাঝে রয়েছে ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছের একটা জটলা। এর মধ্যে দিয়েই চললাম নদীর আওয়াজ লক্ষ্য করে। যেখান দিয়ে ঢুকলাম গাছপালার মধ্যে, সেখান থেকে আমাদের গোপন ঘাঁটি দেখা যায় না—ঘাঁটি থেকেও এ-জায়গাটা নজরে পড়ে না। হঠাৎ গাছতলায় ঝোপের মধ্যে দলাপাকানো লালমত কি যেন দেখলাম। এগিয়ে যেতেই আঁৎকে উঠলাম। এ যে সেই নিখোঁজ রেডইণ্ডিয়ানের মৃতদেহ! পাশ ফিরে পড়ে আছে হাত-পা গুটিয়ে. মুণ্ডুটা পুরোপুরি প্যাঁচ খেয়ে গেছে পেছন দিকে এমন বীভৎসভাবে যেন পিঠের ওপর মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এ হেন অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় মুণ্ড মুচড়ে পেছনে তাকানো কোনো মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। দেখামাত্র তারস্বরে চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম বন্ধুবর্গকে। দৌড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিলাম দেহটার ওপর। আমার যে অদৃশ্য সহায়টি পদে পদে বিপদ আপদ থেকে রক্ষে করেন আমাকে, নিঃসন্দেহে তিনি তখন আমার পাশেই ছিলেন। কেন না, স্রেফ ভয়ের চোটেই হোক, কি, অস্পষ্ট পত্রমর্মর শুনেই হোক তাকিয়েছিলাম ওপরপানে। দেখেছিলাম, ঠিক ওপরে সবুজ পত্রপল্লবের মধ্যে থেকে লাল লোমে ঢাকা দুটো সুদীর্ঘ পেশীপুষ্ট বাহু ধীরে ধীরে নেমে আসছে আমার দিকে। আর এক মুহূর্ত দেরী হলেই বিশাল নিঃশব্দসঞ্চারী দুই হাতের মুষ্টি চেপে বসত আমার গলায়। ছিটকে পেছিয়ে গেলাম বটে, কিন্তু হাত দুটো আমার চাইতেও অনেক ক্ষিপ্র। আচমকা তড়াক করে লাফিয়ে পেছিয়ে যাওয়ায় প্রথমবার হাত ফস্কে গেলেও পরক্ষণেই একহাত খামচে ধরল আমার ঘাড়ের পেছন দিক, আরেক হাত চেপে বসল আমার মুখে। দু হাত তুলে গলা বাঁচাতে যেতেই থাবার মত বিশাল হাতটা মুখ থেকে হড়কে নেমে এসে চেপে বসল গলায়।

হাল্কা সোলার মত আমাকে টেনে শূন্যে তুলে নিল হাত দুটো। অসহ্য চাপে মুখখানা বেঁকিয়ে দিতে লাগল পেছন দিকে—মনে হল গ্রীবার কাছে মেরুদণ্ড এবার বুঝি মটাৎ করে ভেঙেই যাবে। ভয়াবহ সেই চাপ আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। মাথা ঘুরতে লাগল, চোখে ধোঁয়া দেখলাম। তা সত্ত্বেও প্রাণপণে হাতটা সরিয়ে দিলাম থুৎনির ওপর থেকে। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম একটা বুক-কাঁপানো ভীষণ মুখ চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। একজোড়া হিমশীতল নির্দয় হাল্কা নীল রঙের চক্ষু অনিমেষে তাকিয়ে আছে আমার পানে। যেন সম্মোহনী শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে ভয়ংকর সেই চক্ষুযুগল থেকে। ধস্তাধস্তি করার ক্ষমতা লোপ পেল সেই স্থির নির্মম পৈশাচিক চাউনির সামনে। মুঠির মধ্যে আমার দেহটা এলিয়ে পড়তেই বিকট মুখের দু-পাশে ক্ষণিকের জন্যে ঝলসে উঠল দুটো সূচাগ্র কুকুরে-দাঁত—থুৎনির ওপর হাতের চাপ বেড়ে গেল আগের চাইতেও—মাথাটাকে ক্রমশঃ ঠেলে তুলতে লাগল পেছন দিকে। মুক্তা রঙীন হাল্কা কুয়াশা দুলে উঠল চোখের সামনে—কানে বাজতে লাগল যেন ছোট্ট ছোট্ট রুপোর নূপুর নিক্কণ। শিঞ্জিনী শব্দের মধ্যে দিয়ে শুনলাম বহুদূরে রাইফেলের চাপা নির্ঘোষ। আবছাভাবে মনে আছে যেন মাটিতে আছড়ে পড়লাম এবং পড়েই রইলাম নিঃসাড়ে লুপ্ত চৈতন্য কলেবরে।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখলাম ঝোপের মধ্যে খাঁটির ঘাসের ওপর শুয়ে আছি আকাশের দিকে মুখ করে। নদী থেকে জল আনা হয়েছে। লর্ড জন মাথায় জল ছিটোচ্ছেন। চ্যালেঞ্জার আর সামারলি আমাকে বসিয়ে দিচ্ছেন—দুজনেরই মুখে উদ্বেগ আর শংকার ছাপ। বৈজ্ঞানিক মুখোশ জোড়ার অন্তরালে পলকের জন্যে লক্ষ্য করলাম মানবিক দ্যুতি, বিপুল মমত্ববোধ আর স্নেহকোমল সুষমা। জখম তেমন হইনি—মানসিক আঘাতেই পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম। তাই আধঘন্টার মত শুয়ে রইলাম তৃণ শয্যায়। তারপর যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাওয়া মাথা আর ব্যথায় আড়ষ্ট ঘাড় নিয়ে উঠে বসলাম।

লর্ড জন বললেন—'ছোকরা, প্রাণে বেঁচে গেলে এ-যাত্রা। চিৎকার শুনেই দৌড়েছিলাম। গিয়ে তো দেখি শূন্যে লাথি ছুঁড়ছো, মাথাখানা আদ্ধেক পেছনে বেঁকে রয়েছে। ভাবলাম বুঝি, একজন কমে গেল চারজনের মধ্যে। তাড়াহুড়োয় শয়তানের বাচ্চার গায়ে গুলিটা লাগাতে পারলাম না। তবে ব্যাটাচ্ছেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিয়ে বিদ্যুতের মত মিলিয়ে গেল গাছের মধ্যে। আঃ! পঞ্চাশটা লোক যদি পেতাম

রাইফেল সমেত! শয়তানের বাচ্চাদের সব কটাকে যমালয়ে পাঠিয়ে জায়গাটাকে খানিকটা সাফসুতরো করে দিয়ে যেতে পারতাম।'

বেশ বোঝা গেল, যে-ভাবেই হোক, বাঁদর-মানুষরা আমাদের হদিশ বার করে ফেলেছে—চারদিক থেকে নজরে রেখেছে। দিনের বেলা সামনে আসার সাহস না হলেও রাতের অন্ধকারে দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কাজেই যত সত্বর এ-তল্লাট থেকে সটকান দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। তিন দিকের মহাবন অতীব বিপজ্জনক—গাছের ওপর থেকে টপাটপ লাফিয়ে পড়বে মাথায়। কিন্তু সেন্ট্রাল লেকের দিকে গাছপালা বেশী নেই, নিচু ঝোপঝাড় বিস্তর—মাঝে মাঝে খোলা ঘাসজমি—এই দিককার ঢালু পথটাই পলায়নের পক্ষে প্রশস্ত। ঠিক এই পথ ধরেই কিন্তু রাতের অভিযানে গিয়েছিলাম আমি এবং এই পথে গেলেই পৌঁছোনো যাবে রেডইণ্ডিয়ানদের গুহায়, সুতরাং পাততাড়ি গুটিয়ে রওনা হওয়া যাক এই পথেই।

পরিতাপ হল কেবল পুরোনো ক্যাম্প ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে। শুধু যে জিনিসপত্রই ফেলে যাচ্ছি, তা তো নয়। বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র জাম্বোর কাছ থেকেও দূরে সরে যেতে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে কার্তুজ আছে বিস্তর, বন্দুকগু'লাও রয়েছে। পরে সুযোগ সুবিধে মত ফিরে এসে জাম্বোর সঙ্গে মোলাকাৎ করা যাবে'খন। ও যখন কথা দিয়েছে ঘাঁটি ছেড়ে নড়বে না—তখন ওখানেই ওকে পাওয়া যাবে—কথার খেলাপ করার পাত্র সে নয়।

অপরাহ্নের প্রারম্ভেই যাত্রা শুরু হল আমাদের। তরুণ সর্দার পথ দেখিয়ে চলল আগে—কিন্তু অবজ্ঞায় নাক কুঁচকিয়ে সরে গেল মাল বওয়ার সময়ে—ও কাজ তার দ্বারা হবে না। মাল তো সামান্যই—অন্য দুজন রেডইণ্ডিয়ান কাঁধে করে নিয়ে চলল পেছন পেছন। আমরা চারজনে রাইফেল বাগিয়ে চললাম সবার পেছনে। ঝোপ ছেড়ে যাত্রা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিককার নিস্তব্ধ অরণ্যভূমি থেকে ভেসে এল বাঁদর-মানুষদের বিরাট কটর কটর হল্লাবাজি। অর্থটা দ্ব্যর্থক। পালাচ্ছি বলে হয়তো টিটকিরি দিচ্ছে, অথবা জয়োল্লাসে অট্টরোল তুলেছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে ঘনবনের নিরেট দেওয়াল ছাড়া কিছুই দেখলাম না কিন্তু হল্লাবাজি থেকে আন্দাজ করে নিলাম কি বিপুল সংখ্যক দ্বিপদ পশু ঘাপটি মেরে আছে সেখানে। পেছন নেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা অবশ্য লক্ষ্য করলাম না। অচিরেই এসে পড়লাম আরো উন্মুক্ত অঞ্চলে—যে অঞ্চলে ওদের জারিজুরি আর চলে না।
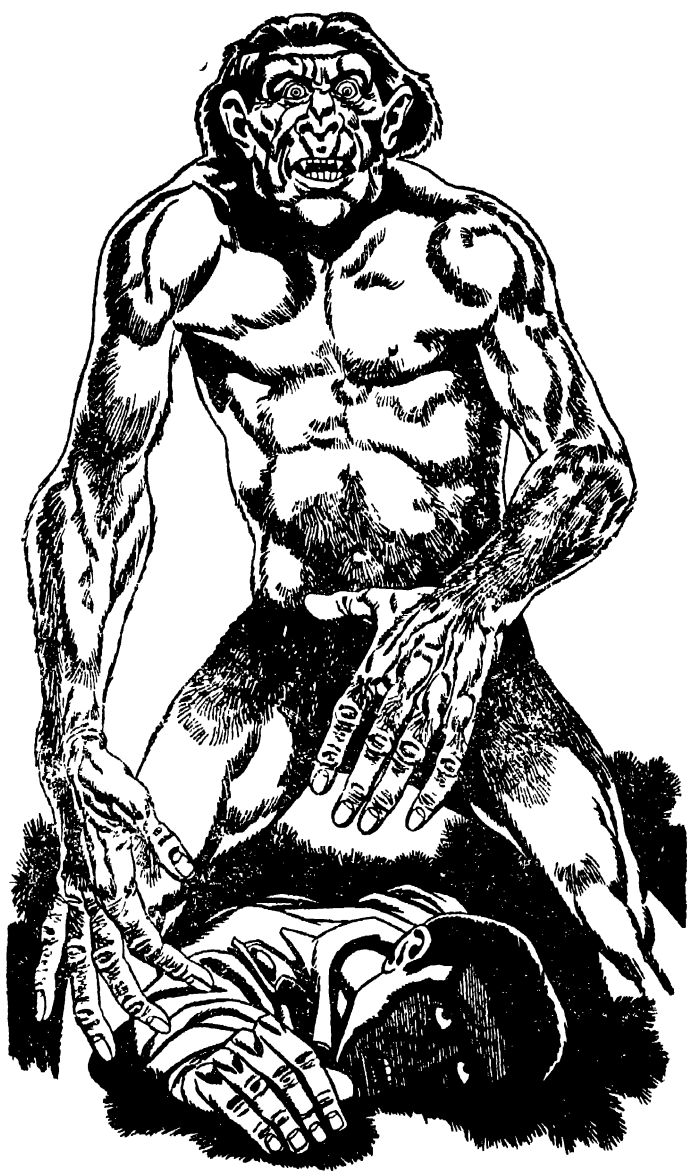
শিঞ্জিনী শব্দের মধ্যে দিয়ে শুনলাম বহুদূরে রাইফেলের চাপা নির্ঘোষ। আবছা ভাবে মনে আছে যেন মাটিতে আছড়ে পড়লাম এবং পড়েই রইলাম নিঃসাড়ে লুপ্ত চৈতন্য কলেবরে। পৃ ২০২

পা টেনে টেনে যেতে যেতে আমার সামনের তিন সঙ্গীর চেহারা দেখে হাসি সামলাতে পারলাম না। পারস্যদেশীয় গালিচা, দুষ্প্রাপ্য অতিসুন্দর ছবি আর গোলাপী দ্যুতিসমৃদ্ধ অ্যালবেনির বিলাসবহুল কক্ষে একটি সন্ধ্যায় যে মানুষটিকে দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম. ইনিই কি সেই লর্ড জন রক্সটন? এনমোর পার্কের বিপুলায়তন পাঠকক্ষে বিশালাকৃতি টেবিলের পাশে উপবিষ্ট আত্মম্ভরিতায় বিস্ফোরিত-প্রায় এই কি সেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার? প্রাণী-বিজ্ঞান সমিতির সভাকক্ষে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন যে তাপসিক ফিটফাট মানুষটি – উনিই কি সেই প্রফেসর সামারলি? সারি লেনের তিনটে ভবঘুরেও ঢের বেশি মনোহর! এ রকম ছন্নছাড়া সহায়সম্বলহীন আকৃতি বিশ্বের কোনো টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজারেরও হয় না! মালভূমিতে অতিবাহিত হল মাত্র একটি সপ্তাহ। কিন্তু এই সাত দিনের প্রতিদিনে যা ধকল গিয়েছে ওঁদের ওপর দিয়ে, তা কহতব্য নয়। আমার ওপর দিয়ে অবশ্য ততটা যায় নি। বাঁদর-মানুষের হাতে নিগ্রহ পোহাতে হয়নি। বাড়তি পরিচ্ছদও সব পড়ে আছে ক্যাম্পে। বাঁদর-মানুষদের নির্যাতনে তিনসঙ্গীর কারো মাথায় টুপি নেই—রুমাল দিয়ে মাথা বেঁধেছেন। লম্বা লম্বা ফিতের মত শতচ্ছিন্ন পরিধেয় ঝুলছে সর্বাঙ্গে, দাড়ি না কামানোর ফলে শ্রীমুখ দেখে চেনাও মুস্কিল। চ্যালেঞ্জার আর সামারলি দুজনেই ভীষণভাবে খোঁড়াচ্ছেন। সকালের খুনে মুষ্টির চাপে আমার ঘাড় টাটিয়ে পাটাতনের মত শক্ত হয়ে রয়েছে কাহিল হয়ে যাওয়ায় এগোতে হচ্ছে পা ঘসটে ঘসটে। চারজনেই চার-চারটে কাকতাড়ুয়া মূর্তি যেন। রেডইণ্ডিয়ানরা তাই বোধহয় ঘাড় ফিরিয়ে বার বার আমাদের দেখছে সভয়ে এবং সবিস্ময়ে।

বিকেল যখন গড়িয়ে এল, পৌঁছোলাম লেকের পাড়ে। ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে দূর বিস্তৃত জলপৃষ্ঠ চোখে পড়তেই নেটিভ বন্ধুরা সহর্ষে বিপুল চেঁচিয়ে উঠে, সাগ্রহে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখালো সামনের দিকে। দৃশ্যটা বাস্তবিকই ওয়াণ্ডারফুল। লেকের কাঁচমসৃণ জল কেটে তরতর করে এগিয়ে আসছে অগুন্তি ক্যানোর একটা বিরাট বাহিনী। আসছে সটান আমাদের দিকেই। অত্যন্ত তীব্র বেগে—তীরের মত গতিবেগে। দেখতে দেখতে তাই কাছে এসে গেল। দাঁড়িরা চিনতে পেরেছে আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে হাজার বজ্রধ্বনির মত উন্মত্ত উল্লাসধ্বনি ভেসে এল জলের ওপর দিয়ে। দাঁড় হাতে উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত নাড়তে লাগল শূন্যে—এক হাতে দেখা গেল বর্শা। পরক্ষণেই যে-যার আসনে বসে পড়ে ভামবেগে দাঁড় বেয়ে বাকী জলটুকু পেরিয়ে এসে লাফিয়ে নেমে পড়ল হাঁটুজলে—ক্যানো টেনে তুলল

বালির চড়ায় এবং হৈ-হৈ করতে করতে দৌড়ে এসে মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়ল তরুণ সর্দারের পদতলে। সবশেষে সামনে দৌড়ে এল একজন বয়স্ক পুরুষ। গলায় খুব চকচকে কাঁচের পুঁতির মালা। হাতে সেই জিনিসেরই বালা। কাঁধ থেকে ঝুলছে বহুবর্ণের ফুটকি-কাটা হলুদরঙের ভারী সুন্দর পশুচর্ম। সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরল তরুণ সর্দারকে। তারপর ফিরে দাঁড়াল আমাদের দিকে। কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পর একে-একে আমাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করল অত্যন্ত সসম্ভ্রমে। হুকুম দিতেই পুরো দলটা ভূমিশয্যা গ্রহণ করল আমাদের সামনে—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মাটিতে মুখ ঘসে। এ ধরনের পূজো পাওয়ায় অভ্যস্ত নই আমি—তাই বড় অপ্রস্তুত বোধ করলাম। একই অনুভূতি জাগ্রত হতে দেখলাম সামারলি আর লর্ড জনের মুখেও। কিন্তু রৌদ্রকিরণে প্রদীপ্ত পুষ্পের পাপড়ি মেলে ধরার মত ফুলে উঠলেন চ্যালেঞ্জার।

দাড়ি চাপড়াতে চাপড়াতে চারদিক দেখে নিয়ে বললেন গাম্ভীর্য চালে —'অনুন্নত জাতি হতে পারে এরা, কিন্তু উন্নততর মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে মানীর মান রাখতে হয় কি ভাবে, তা জানে—যা অত্যন্ত প্রগতিশীল কিছু ইউরোপবাসীর ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রদ হতে পারে। স্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যে এত সঠিক হতে পারে, ভাবতেও অদ্ভুত লাগে!'

দেখেই বোঝা গেল, যুদ্ধ করার অভিলাষ নিয়েই এসেছে নেটিভ-বাহিনী। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে তীক্ষ্ণাগ্র বল্লম—বাঁশের ডগায় ছুঁচোলো হাড়। কাঁধে ঝুলছে তীর ধনুক আর পাথরের ডাণ্ডা বা রণকুঠার জাতীয় হাতিয়ার। জঙ্গলের দিকে ক্রুদ্ধ চাহনি হেনে বারবার 'ডোডা' নামে হুংকার ছাড়ায় বোঝা গেল তরুণ সর্দারকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই এসেছে যুদ্ধ-সাজে। প্রতিহিংসা নেবে যদি জীবন্ত ফিরে না পায়। বৃদ্ধ সর্দারের ছেলে নিশ্চয় এই তরুণটি—মুখচোখ দেখে তাই মনে হল। গোল হয়ে তৎক্ষণাৎ মিটিংয়ে বসল পুরো দলটা—আমরা বসে রইলাম কাছেই ব্যাসাল্ট পাথরের চাঁইয়ের ওপর—দেখতে লাগলাম জল কদ্দুর গড়ায়। প্রথমে ভাষণ দান করল দু-তিনজন যোদ্ধা—তারপর উঠে দাঁড়াল তরুণ সর্দার। সুঠাম শরীরের অঙ্গভঙ্গী করে রক্তে-আগুন-ধরানো এমন একখানা বক্তৃতা দিল যার প্রতিটি কথাই সুস্পষ্ট বুঝলাম ভাষা না জানা সত্ত্বেও।

বললে—'ফিরে যাবো? কেন? লাভ কি তাতে? এখুনি হোক, কি পরেই হোক—যা করতে হবেই তা করে ফেলা যাক। জীবন নিয়ে আমার ফিরে যাওয়াটাই কি বড় কথা হল? খুন হয়েছে তো তোমাদের

বন্ধুরা। এ রকমভাবে প্রাণ দিয়েছে আরো অনেকে। কাজেই, নিরাপদ নই আমরা কেউই। আজ আমরা লড়বো বলেই তো জড়ো হয়েছি।' এই পর্যন্ত বলে হাত দিয়ে দেখালো আমাদের—'এই আগন্তুকরা আমাদের বন্ধু। বিরাট যোদ্ধা। বাঁদর-মানুষদের আমাদের চেয়েও ঘেন্না করে।' আকাশের পানে হাত তুলে দেখিয়ে—'আকাশের বজ্রবিদ্যুৎ এদের কথা শোনে, এদের হুকুমে চলে। এ সুযোগ কি আর পাবো? এগিয়ে চলো—হয় লড়ে মরো, না হয় ভবিষ্যতের নিরাপদ-জীবনের পথ এখনই বানিয়ে নাও। মেয়েদের কাছে নইলে মুখ দেখাবো কি করে?'

তন্ময় হয়ে তরুণ নেতার প্রতিটি কথা শুনে গেল যোদ্ধারা। ভাষণ শেষ হতেই স্থূল অস্ত্রশস্ত্র শূন্যে নাড়তে নাড়তে একযোগে চেঁচিয়ে উঠল আকাশফাটা রবে। বৃদ্ধ সর্দার এগিয়ে এসে বনের দিকটা দেখাতে দেখাতে কয়েকটা প্রশ্ন করল আমাদের। ইসারায় লর্ড জন বললেন, জবাব পেতে হলে একটু দাঁড়া'তে হবে। তারপর ফিরে দাঁড়ালেন আমাদের দিকে।

বললেন—'বলুন এখন কি করবেন। আমি কিন্তু শোধ নিতে চাই—পৃথিবীর বুক থেকে বাঁদর-মানুষরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কারও আক্ষেপের অন্ত থাকবে বলে তো মনে হয় না আমার। কাজেই এদের সঙ্গে আমি যাবো—লড়ে যাবো শেষ পর্যন্ত। ছোকরা, তুমি কি করবে?'

'আমি তো আছিই আপনার সঙ্গে।'

'চ্যালেঞ্জার, আপনি?'

'অবশ্যই সহযোগিতা করব।'

'সামারলি, আপনি?'

'লর্ড জন, অভিযানের মূল লক্ষ্য থেকে কিন্তু আরো দূরে সরে যাচ্ছি। লণ্ডনের অধ্যাপনা ছেড়ে আসবার সময়ে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি বনমানুষ-বাঁদরদের কলোনি ধ্বংস করার জন্যে এক দল বর্বরের নেতা হতে হবে আমাকে।'

হাসলেন লর্ড জন—'জানি আমাদের খুবই জঘন্য কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু উপায়ও নেই। কি করবেন বলুন?'

শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তর্ক চালিয়ে গেলেন সামারলি—'এক কথায় মেনে নেওয়া যায় না আপনার যুক্তিকে। তবে সবাই যদি যান, আমিই বা পেছনে পড়ে থাকি কেন?'

'তাহলে সবাই একমত হওয়া গেল,' বলে সর্দারের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে

বাতাসে মাথা ঠুকে রাইফেল চাপড়ে ইসারায় আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন লর্ড জন। বৃদ্ধ সর্দার একে-একে আমাদের চারজনের হাত জড়িয়ে ধরলেন। আগের চাইতে বিপুল হর্ষে জয়ধ্বনি করে উঠল নেটিভ-বাহিনী। তখন বেশ রাত হয়েছে। এত রাতে যুদ্ধাভিযান সমীচীন নয় বলে তাঁবু না খাটিয়ে খোলা জায়গাতেই রাত্রিযাপন করল রেডইণ্ডিয়ানরা। চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল ধূমায়িত অগ্নিকুণ্ড। কয়েকজন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে একটা বাচ্চা ইগুয়ানোডনকে তাড়িয়ে নিয়ে এল বাইরে। এর গায়েও দেখলাম পিচের কালো দাগ। একজন রেড ইণ্ডিয়ান এগিয়ে গেল তার সামনে। ভাবখানা যেন বাচ্চা ইগুয়ানোডনের মালিক সে-ই। হুকুম দিলে বধ করার। পিচের দাগ-রহস্যও পরিষ্কার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গৃহপালিত পশু এরা। গরু মোষ ভেড়া মুরগীর মত এক-একজনের মালিকানায় এরা চরে বেড়ায় জঙ্গলে। পিচ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে কে কার মালিক বোঝানোর জন্যে। বেচারারা অসহায় জড় প্রকৃতি এবং উদ্ভিদ-ভোজী—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতিকায় হলেও ব্রেনের ছিটেফোঁটাও আছে কিনা সন্দেহ—তাই একটা বাচ্চা ছেলেও রাখাল বালকের মত এদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। এক জায়গায় জড়ো করে বনের গাছপাতা খাওয়াতে নিয়ে যায়। মিনিট কয়েক লাগল বেচারাকে টুকরো টুকরো করতে। ডজন খানেক শিবির-অগ্নিকুণ্ডের ওপরে ঝুলতে লাগল বিরাট বিরাট মাংস খণ্ড। সেই সঙ্গে লেক থেকে বর্শায় বিঁধে তুলে আনা হ'ল অতিকায় গ্যানয়েড মৎস্য, গায়ে চকচকে রুপোলী আঁশ।

বালিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন সামারলি। আমরা তিনজনে লেকের পাড় বরাবর হাঁটতে লাগলাম অদ্ভুত এই দেশ সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহের অভিলাষে। টেরোড্যাকটিলদের জলাভূমিতে নীলচে কাদামাটির যে কূপ দেখেছিলাম, সে-রকম কূপ দেখলাম দুটো। সুপ্রাচীন আগ্নেয়গিরির বহির্গমনপথ নিঃসন্দেহে। কিন্তু কি কারণে জানি না, নীলচে কাদা ভর্তি গর্তগুলো দেখামাত্র আগের মতই বিপুল কৌতূহলী হলেন লর্ড জন রক্সটন—উত্তেজিত হলেন রীতিমত। চ্যালেঞ্জার আকৃষ্ট হলেন অবশ্য একটা কাদার উষ্ণ প্রস্রবণ দেখে। বুদ্‌বুদ্ কাটছিল ভুরভুর করে—শব্দ হচ্ছে গলায় গার্গল করার মত। ওপরে এসে ফটফটাস্ করে ফেটে যাচ্ছে বুদ্‌বুদ্—অদ্ভুত একটা গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে বুদ্‌বুদের মধ্যে থেকে। একটা ফাঁপা নলখাগড়া কুড়িয়ে এনে ধরলেন বুদবুদের ঠিক ওপরে, ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন নলটার এদিককার প্রান্তে—দুম করে একটা বিস্ফোরণ ঘটল, নীলাভ

আগুন দেখা গেল—স্কুলের ছেলের মত মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। আরও পুলকিত হলেন ফাঁপা নলের এদিককার প্রান্তে একটা চামড়ার থলিতে সেই গ্যাস ভরে শূন্যে উড়িয়ে দেওয়ার পর—গ্যাসভর্তি চামড়ার থলি হেলে দুলে বেলুনের মত উঠে গেল উঁচু আকাশে।

'দাহ্য গ্যাস, বায়ুমণ্ডলের চাইতে হাল্কা। নিশ্চয় প্রচুর হাইড্রোজেন আছে এই গ্যাসের মধ্যে। ছোট্ট বন্ধু, গ্রেট জি-ই-সি'র মস্তিষ্কের ভাণ্ডার এখনো নিঃশেষিত হয়নি। প্রাকৃতিক সম্পদকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায়, তাও দেখাতে পারি জেনে রেখো।' বলতে বলতে বুক দশ হাত হয়ে গেল। নিশ্চয় একটা গোপন অভিপ্রায় দানা বেঁধেছে বিরাট ঐ করোটির খোলে। কিন্তু এর বেশী আর ভাঙলেন না।

বিস্তৃত জলরাশির ওপর সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না। জলপৃষ্ঠ জ্যোৎস্নালোকে দেখাচ্ছে কিন্তু অপূর্ব। তুলনাবিহীন। ঠিক যেন একটা ঝকঝকে সুবিশাল দর্পণ। আমাদের উপস্থিতিতে ভয়ে পেয়ে চম্পট দিয়েছে প্রাণীকুল। মাথার ওপর উড়ছে কেবল কয়েকটা শবাহারী টেরোড্যাকটিল—গলিত পচা মাংসের সন্ধানে। ক্যাম্পের চারিদিক নিথর, নিস্তব্ধ। সেন্ট্রাল লেকের গোলাপী রঙশোভিত জলপৃষ্ঠে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্য দৃশ্য। অদ্ভুত প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে—জল যেন ফুটছে—ফেঁপে দুলে উঠছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে বিশাল পাখনা জলপৃষ্ঠ ঠেলে উঠে আসছে। শ্লেট-রঙীন উঁচু উঁচু খাঁজকাটা পৃষ্ঠদেশ রুপোলি জল ভেদ করে ঝাপটা মেরে ফের তলিয়ে যাচ্ছে জলতলে। অনেকদূরে বিরাট বালির চড়ায় বহুবিচিত্র প্রাণীর সমাবেশ। কুৎসিত, কদাকার, গা ঘিনঘিনে আকৃতি তাদের। অতিকায় কাছিম, অদ্ভুতাকৃতি সরীসৃপ-প্রাণী। একটা মস্ত চ্যাটালো প্রাণী গুটি গুটি পিছলে যাচ্ছে জলের দিকে। তেলতেলে কালো চামড়ায় মোড়া পৃষ্ঠদেশ ফুলে ফুলে উঠছে হাপরের মত। এদিকে সেদিকে দেখা যাচ্ছে উঁচুতে ঠেলে ওঠা সরীসৃপদের মাথা। দ্রুত বেগে জল কেটে এগিয়ে যাওয়ার ফলে গলদেশ ঘিরে বলয়াকারে সাদা ফেনা আর পেছনে সাদা তরঙ্গ রেখা দেখা যাচ্ছে দূর থেকেই। রাজহংসের মত মনোরম ভঙ্গিমায় গ্রীবা তুলে এবং নামিয়ে জলক্রীড়া করতে করতে ডুব দিচ্ছে অতলে। কয়েক-শ গজ দূরে একটা বালির চড়ায় হুড়মুড় করে ঠেলে উঠল এদেরই একজন। সুস্পষ্ট দেখা গেল পিপের মত প্রকাণ্ড দেহ। সুদীর্ঘদেহী সর্পের মত গলার দু-পাশে প্রকাণ্ড পাখনা। সামারলি কখন জানি ঘুম থেকে উঠে আমাদের দলে ভিড়েছিলেন। অতিকায় অদ্ভুত প্রাণীটাকে

জল থেকে পিপে-দেহ আর সরীসৃপ-গ্রীবা নিয়ে পাখনা নাড়তে নাড়তে উঠে আসতে দেখেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। বিস্ময় আর প্রশংসার দ্বৈত সঙ্গীত আরম্ভ হয়ে গেল যেন।

'প্লিসিওসরাস! মিষ্টি জলের প্লিসিওসরাস!' সামারলির সরু, তীক্ষ্ণ, বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠনিনাদই শোনা গেল সব কিছু ছাপিয়ে—'কি সৌভাগ্য। কি সৌভাগ্য। এ-দৃশ্য যে জীবনে দেখতে পাবো ভাবতেই পারিনি! মাই-ডিয়ার চ্যালেঞ্জার, সৃষ্টির শুরু থেকে বিশ্বের কোনো প্রাণীবিজ্ঞানীর যে-সৌভাগ্য হয়নি—আজ দেখছি আমাদের কপালে তা নাচছে!'

রাত গভীর হল। বর্বর সঙ্গীদের অগ্নিকুণ্ডের আভায় ছায়া ঘনীভূত হল। আদিম হ্রদের পাড় থেকে দুই বিজ্ঞের জাহাজকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলাম আমি আর লর্ড রক্সটন। বিস্ময়ে বুঁদ হয়ে সমস্ত রজনীটাই সরোবর দর্শন করে অতিবাহিত করার মতলবে ছিলেন দুজনে। অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়েছিলেন। অন্ধকারে বালির ওপর শুয়ে শুয়েও শুনলাম আদিম সরোবরের অতিকায় প্রাণীরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে নাসিকাগর্জন করছে, ঝপ্ ঝপাস্ শব্দে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে। অবিস্মরণীয় সেই রাতের স্মৃতি আমরা কেউ কোনোদিন ভুলব না।

উষালগ্নে প্রাণচাঞ্চল্য জাগ্রত হল শিবিরে। ঘণ্টাখানেক পরেই রওনা হলাম স্মরণীয় অভিযানে। যুদ্ধক্ষেত্রের সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন অনেক দেখেছিলাম। এই ধরনের যুদ্ধ অভিযানের প্রতিবেদন লিখতে হবে অতিবড় দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। রণক্ষেত্র থেকে লেখা আমার প্রথম প্রতিবেদনটা হল এই রকম:

গুহাবাস থেকে আরো যোদ্ধা এসে পৌঁছেছিল রাত্রে। রওনা হওয়ার সময়ে দেখা গেল সংখ্যায় আমরা চার-পাঁচশ'র মত। শক্তিমান, সুঠাম-দেহী প্রত্যেকেই। একদল গুপ্তচর এগিয়ে গেল আগে। সন্ধানী দলের ঠিক পেছনে নিরেট প্রাচীরের মত এগিয়ে চলল গোটা বাহিনীটা। ঝোপঝাড়ে ভরা ঢালু জমি বেয়ে উঠে পৌঁছোলাম গভীর জঙ্গলের কিনারায়। এইখানে এসেই ধনুকধারী আর বল্লমধারী যোদ্ধারা সুদীর্ঘ সারি রচনা করে ছড়িয়ে পড়ল দু-পাশে। রক্সটন আর সামারলি রইলেন ডানদিকের শেষ প্রান্তে—আমি আর চ্যালেঞ্জার রইলাম বাঁদিকের শেষ প্রান্তে। প্রস্তরযুগের এক লড়াইয়ে অংশ নিতে চলেছি আমরা—সঙ্গে রয়েছে কিন্তু সেন্ট জেম্স্ স্ট্রীট আর স্ট্র্যাণ্ডের বন্দুক কারখানায় নির্মিত আধুনিকতম হাতিয়ার।

শত্রুদের প্রতীক্ষায় বেশী কালক্ষেপ করতে হল না। জঙ্গলের দিক

থেকে শোনা গেল ভীষণ তীক্ষ্ণ হট্টগোল—পরমুহূর্তেই আচম্বিতে ডাণ্ডা আর পাথর হাতে ধেয়ে এল একদল বাঁদর-মানুষ। ধেয়ে এল রেডইণ্ডিয়ানদের দীর্ঘ সারির ঠিক মাঝখান লক্ষ্য করে। খুবই বীরোচিত কাজ সন্দেহ নেই—কিন্তু নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া এমন বোকামি কেউ করে? ঐ তো পায়ের গড়ন—বাইরের দিকে বাঁকানো— হাঁটছে হেলে দুলে টলেটলে—পাঁই পাঁই করে দৌড়োনোর ক্ষমতাও নেই। পক্ষান্তরে, রেডইণ্ডিয়ানরা মার্জারের মত ক্ষিপ্র। ফলটা হল ভয়ানক। চোখে দেখা যায় না। গা শিউরে উঠে। পাগলের মত মুখ দিয়ে গাঁ্যাজলা বার করে যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে উল্টোপাল্টা দৌড়োতে লাগল বাঁদর-মানুষরা—শত্রুদের ধারে কাছেও আসতে পারল না—উল্টে ঝাঁকেঝাঁকে তীর এ পক্ষ থেকে শন্ শন্ করে বাতাস কেটে গিয়ে বিঁধতে লাগল ওদের আপাদ মস্তকে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল হতভাগাদের। খাবি খেতে খেতে শরাকীর্ণ দেহে টলে টলে দৌড়ে এসে আছড়ে পড়তে লাগল রণাঙ্গনে। বিকটাকার একটা দানো-সদৃশ বাঁদর-মানুষ বুকে আর পাঁজরায় ডজনখানেক বেঁধা তীর নিয়ে ভীষণ যন্ত্রণায় গজরাতে গজরাতে আমার পাশ দিয়ে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে রাইফেল তাগ করে একটি মাত্র বুলেট নিক্ষেপ করে তার খুলি উড়িয়ে দিলাম—যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলাম—সাধুভাষায় যাকে বলা যায় করুণা-হত্যা—তাই আর কি। লাশটা ধড়াশ করে আছড়ে পড়ল ঘৃতকুমারী ঝোপের ওপর। গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল আমাকে ঐ একবারই। কেন না, আক্রমণ চলছিল সারবন্দী রেডইণ্ডিয়ানদের ঠিক কেন্দ্রস্থিত বিন্দুর দিকে—কাজেই শত্রু সাবাড় করতে আমাদের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন বোধ করছিল না মিত্রপক্ষ। খোলা জায়গায় যে ক'টা বাঁদর-মানুষ তেড়েমেড়ে ধেয়ে এসেছিল, আমার তো মনে হয় না তাদের মধ্যে একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে অরণ্যের আশ্রয়ে!

কিন্তু পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো গাছপালার মধ্যে ঢুকে পড়তেই। ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশী প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছিল মহীরুহের অন্ধকারে। বড় ভয়ংকর লড়াই। দুরাশায় পরিণত হতে চলেছিল যুদ্ধ জয়ের আশা। ডাণ্ডা ঘোরাতে ঘোরাতে ঝোপের মধ্যে থেকে ভীমবেগে ধেয়ে আসছিল একজনের পর একজন বাঁদর-মানুষ—বর্শাবিদ্ধ হয়ে ভূপাতিত হওয়ার আগে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছাতু করে দিচ্ছিল তিন থেকে চারজন রেডইণ্ডিয়ানকে। সেকী ভয়াবহ মার! ডাণ্ডাসের ঘা যেখানে যেখানে পড়েছে, সেখানেই আর কিছু আস্ত থাকেনি—ভেঙে গুঁড়িয়ে থেঁৎলে দলা

নিরেট প্রাচীরের মত এগিয়ে চলল গোটা বাহিনীটা। পৃঃ ২১০

পাকিয়ে গেছে। ডাণ্ডসের এক ঘায়ে দেশলাইয়ের কাঠির মত মচাৎ করে ভেঙে গেল সামারলির রাইফেল—আর এক ঘায়ে মাথাটাও ছাতু হয়ে যেত যদি না ঠিক সেই সময়ে পেছন থেকে একজন ডাকাবুকো রেডইণ্ডিয়ান বল্লম মেরে হানাদারের কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত। অন্যান্য বাঁদর-মানুষরা গাছের ওপর থেকে দমাদম পাথরের চাঁই আর ভাঙা ডাল ছুঁড়ে মারতে লাগল আমাদের মাথা টিপ করে—কেউ কেউ বীরবিক্রমে ঝপাং করে ঝাঁপিয়েও পড়ল ঘাড়ের ওপর—এলোপাতাড়ি ডাণ্ডস হাঁকিয়ে বেশ কয়েকজনকে কুপোকাৎ করার পরেই অবশেষে ধরাশায়ী হল নিজেই। একবার তো রণে ভঙ্গ দিয়েই বসল আমাদের সৈন্যবাহিনী—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অনুসরণ করে দৌড় দিল পেছন ফিরে—বেধড়ক রাইফেল চালিয়ে ফিরিয়ে আনলাম মনোবল। রাইফেল বর্ষণ শুরু না হলে যুদ্ধের ইতি হয়ে যেত ঐখানেই। বুড়ো সর্দারের বুকের পাটা আছে বটে, বাস্তবিকই বীরপুরুষ। রণমূর্তি ধরে জড়ো করল পলায়মান সৈনিকদের এবং এমন ভীমবেগে ধেয়ে গেল যে পিছু হটতে বাধ্য হল বাঁদর-মানুষরা। সামারলি নিরস্ত্র, কিন্তু আমার রাইফেল রয়েছে। ম্যাগাজিন খালি করে চললাম ক্রমাগত—মেসিনগানের ধারাবর্ষণের মত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে গেলাম করালমূর্তি শত্রুব্যূহ লক্ষ্য করে। দূরে, লাইনের অপর প্রান্তেও শুনলাম রাইফেলের উপর্যুপরি নির্ঘোষ। তারপরেই আচমকা বিষম আতংক ছড়িয়ে পড়ল আপামর বাঁদর-মানুষদের মধ্যে—মুহূর্তের মধ্যে উবে গেল বীরত্ব। ভয়ানক আর্তনাদ আর গর্জন করতে করতে পালাতে লাগল ধুপধাপ মড়মড়াৎ শব্দে ঝোপঝাড় ভেঙে—পেছন পেছন বিজয়োল্লাসে আকাশ বিদীর্ণ করে ছুটল মিত্রপক্ষ। উল্লোল হল নির্মম হত্যা নেশায়, অগণন পুরুষ সঞ্চিত ঘৃণা-বিদ্বেষ-আক্রোশ ফেটে পড়ল যেন সেই মুহূর্তে—স্মরণাতীত কাল ধরে যত অত্যাচার সয়েছে, যত নির্যাতন পেয়েছে—তার শোধ নিল ঐ একটি দিনেই। মালভূমিতে আসার পর থেকে তাদের ইতিহাসে বাঁদর-মানুষরা যত বিভীষিকা-কাহিনী রচনা করেছিল—তার পাল্টা কাহিনী রচনা করে গেল এই মহাযুদ্ধে। ঝেড়ে কাপড় পরানো একেই বলে। শেষ মুহূর্তে প্রমাণ করে দিয়ে গেল মানুষই ধরাতলে শ্রেষ্ঠ জীব—মানুষ-পশুর স্থান তার নীচে। বাঁকা পা নিয়ে দৌড়েও পালিয়ে বাঁচল না বাঁদর-মানুষদের কেউ—আশেপাশে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ভেসে এল দ্রুতগতি বর্বর মনুষ্যদের ধনুকের টংকার ধ্বনি, বিকট উল্লাস ধ্বনি, বাঁদর-মানুষদের মরণ আর্তনাদ—গাছের ওপর থেকে তীরবিদ্ধ হয়ে ধুপধাপ করে মাটিতে আছড়ে পড়ার শব্দ।

আচম্বিতে ডাণ্ডস আর পাথর হাতে ধেয়ে এল একদল বাঁদর-মানুষ।

পৃঃ ২`১

বিজয়মত্তদের সঙ্গে আমিও চলেছিলাম রণোন্মাদ সৈনিকের মত—এমন সময়ে দেখলাম লর্ড জন আর সামারলি এগিয়ে আসছেন আমার দিকে।

'খেল খতম হে ছোকরা। বাকীটুকু ওদেরকেই করতে দাও। আমাদের আর এ-দৃশ্য না দেখাই ভাল—ঘুমটা নষ্ট করে কি লাভ বলো। বেশী দেখলে ঘুমোতেও যে পারবে না।'

কশাই-চক্ষুর মত হত্যা-লালসায় চক্‌চক্‌ করছিল চ্যালেঞ্জারের দুই চক্ষু। একে তো ঐ চেহারা—তার ওপরে খুনের নেশায় পাগল। অতি বড় জল্লাদও ভয়ে কেঁচো হয়ে যেত ওঁর তখনকার সেই মূর্তি দেখলে।

লর্ড্‌ য়ে-মোরগের মত তুরুক-তুরুক করে নাচতে নাচতে বললেন—'যুদ্ধ একখানা দেখলাম বটে। কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! পৃথিবীর ভাগ্য স্থির করে দেয় যে-সব যুদ্ধ—এ হল সেই যুদ্ধ—ঐতিহাসিক যুদ্ধ—আমাদের কপাল ভালো এমন একখানা যুদ্ধের সাক্ষী রইলাম। বন্ধুগণ, মানুষে মানুষে যুদ্ধ—এক জাতির সঙ্গে আরেক জাতির যুদ্ধের কোনো মানে হয়? কিন্তু সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে গুহাবাসীদের সঙ্গে যে যুদ্ধ লেগেছিল—বাঘ আর হাতীর সঙ্গে—যে যুদ্ধের পরিণামে সূচিত হয়েছিল মানুষের কর্তৃত্ব পশুর ওপর-- সেই হল গিয়ে আসল যুদ্ধবিজয়—মানুষে মানুষে যুদ্ধজয়ের চাইতে অনেক মহৎ সেই যুদ্ধজয়। ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন—ঠিক সেই ধরনেরই ভাগ্য নিয়ন্ত্রক একটা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ তো করলামই—অংশগ্রহণও করলাম, এখন থেকে এ মালভূমির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবে শুধু মানুষেরাই।'

অভীষ্ট পূরণের পন্থাটা কিন্তু এতই বিয়োগান্তক যে শৈলসম আত্মপ্রত্যয় না থাকলে চ্যালেঞ্জার বর্ণিত নিধন-যজ্ঞের কৈফিয়ৎ মেনে নেওয়া বেশ কঠিন। যাওয়ার পথে দেখলাম রাশি রাশি বাঁদর-মানুষদের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে স্তূপীকৃত অবস্থায়—কারো বুকে বল্লম—কেউ শুয়ে শরশয্যায়, মাঝে মাঝে এদেরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে করোটি-চূর্ণ দু-একজন রেডইণ্ডিয়ানকে—বীর-বিক্রমে শত্রুনিপাত করবার পর প্রাণ দিয়েছে ডাণ্ডসের ঘায়ে। কোথাও তার বিপরীত দৃশ্য। একজন বনমানুষ শরবিদ্ধ আর বল্লমবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে বটে—চারদিকে গড়াগড়ি যাচ্ছে বেশ ক'জন রেডইণ্ডিয়ান—আস্ত শরীর নয় কারোরই। বহুজনকে মেরে তবে প্রাণ দিয়েছে একটি বাঁদর-মানুষ। যতই এগোই, ততই শুনি বিপুল বিজয়োল্লাস আর বিকট হুংকার ধ্বনি—যুদ্ধ কোনদিকে পেছিয়ে যাচ্ছে, আওয়াজ শুনেই তা বোঝা যাচ্ছে। বৃক্ষ নগরীতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বাঁদর-মানুষরা—শেষবারের মত রুখে দাঁড়িয়েছে সেখানেই—ভয়ানক দৃশ্যটা দেখতে পেলাম যথাসময়ে পৌঁছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে গেলাম করাল-মূর্তি শত্রুব্যূহ লক্ষ্য করে।

পৃঃ ২১৩

দু-দিন আগে যে খোলা চত্বরে বাঁদর-মানুষদের ওপর বেধড়ক গুলি চালিয়েছি, যে চত্বরটা শেষ হয়েছে খাদের প্রান্তে—প্রায় আশি থেকে একশ জন বাঁদর মানুষ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সেখানে। বীরপুরুষদের শেষ শুধু ঐ ক'জনই —প্রাণে বেঁচে রয়েছে এতক্ষণ। কিন্তু থাকবে আর কতক্ষণ? আমরা চত্বরে হাজির হতে না হতেই দেখলাম বল্লমধারী রেড ইণ্ডিয়ানরা অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ফেলেছে তাদের—তারপরেই সব শেষ হয়ে গেল বিদ্যুৎ চমকের মত। এক মিনিটও লাগল না। দাঁড়ানো অবস্থাতেই বল্লমবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল তিরিশ চল্লিশজন, বাকীদের বল্লমের ঠেলায় ঠিকরে দেওয়া হল বাইরে—ঠিক যেভাবে বাঁদর-মানুষরা বন্দীদের ফেলে দিয়েছে এতদিন—সেইভাবেই নিজেরাও নিক্ষিপ্ত হল অবশেষে – আর্ত চীৎকার করতে করতে বাতাস খামচে ধরার আপ্রাণ চেষ্টায় ঠিকরে গেল ছ-শ ফুট নিচে তীক্ষ্ণাগ্র বাঁশবনের ওপরে। যথার্থই বলেছিলেন চ্যালেঞ্জার—ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডে মানুষের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হল অবশেষে। পুরুষরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, মেয়ে আর বাচ্চাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল বন্দীদশায় গোলামগিরি করবার জন্যে—বহু শতাব্দী ব্যাপী সুদীর্ঘ রেষারেষির অবসান ঘটল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অন্তে।

যুদ্ধ জয়ে আমাদের লাভ হল বিলক্ষণ। আবার ফিরে গেলাম পুরোনো ক্যাম্পে – নিয়ে এলাম রসদ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র। আবার দেখা হল জাম্বোর সঙ্গে। সে বেচারী প্রাচীর-শীর্ষ থেকে স্খলিত শিলাস্তূপের মত দমাদম করে বাঁদর-মানুষদের ঠিকরে পড়তে দেখে ভয়ে কাঁপছিল ঠক্‌ঠক্ করে।

চোখ দুটো প্রায় ছানাবড়ার মত করে হেঁকে উঠল তারস্বরে – 'নেমে আসুন মাসারা, নেমে আসুন! শয়তানে খেয়ে নেবে আর যদি থাকেন ওখানে!'

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন সামারলি – 'এতক্ষণে একটা সুস্থ মস্তিষ্কের কথা শোনা গেল। অ্যাডভেঞ্চার তো হল অনেক – আমাদের চরিত্র বা সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মত নয় কোনোটাই। চ্যালেঞ্জার যা বলেছিলেন, এবার তাই করুন। এই মুহূর্ত থেকে আপনার সমস্ত প্রাণশক্তি জড়ো করে ভয়ংকর এই দেশ থেকে আমাদের বার করে সভ্যজগতে পৌঁছে দিন।'

১৫ ॥ বিপুল বিস্ময় প্রত্যক্ষ করলাম

রোজনামচা লিখে যাচ্ছি, লেখার উপসংহারে কিন্তু অন্ধকার ভবিষ্যতে আলোকসঞ্চার ঘটবে বলেই আমার বিশ্বাস। পরিত্রাণের উত্তম পন্থা বার করতে পারছি না বলেই আটকে আছি এ-অঞ্চলে—যার জন্যে তিক্ত আমরা প্রত্যেকেই। মেজাজ টং হয়ে রয়েছে সবারই। তবে হ্যাঁ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে

আটক ছিলাম বলেই না আশ্চর্য এই দেশের আরো বিস্ময় দেখতে পেলাম—দেখলাম মালভূমি-নিবাসী আরো বিচিত্র প্রাণীদের।

রেডইণ্ডিয়ানরা যুদ্ধে জেতায় আর বাঁদর-মানুষরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় ভাগ্যের মোড় ঘুরে গেল আমাদেরও। যে হেতু আমরা অদ্ভুত শক্তি প্রয়োগে রেডইণ্ডিয়ানদের বংশগত বৈরী নাশের সংগ্রামে সাহায্য করেছি, তাই ওরা আমাদের ভয় আর শ্রদ্ধার চোখে দেখত। ফলে, কার্যত: মালভূমির আসল মালিক হয়ে বসলাম আমরাই। ওদের প্রত্যেকের চোখে দেখতাম সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। আমরা যদি আমাদের আশ্চর্য অস্ত্রের বজ্রলীলা আরম্ভ না করতাম, তাহলে তো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হত প্রত্যেককেই। অবশ্য এটাও ঠিক যে ওদের নিজেদের স্বার্থে এ ধরনের ভয়ানক শক্তিশালী মানুষদের মালভূমিতে আর থাকতে দেওয়া উচিত নয়। যাদের শক্তির উৎস এখনো দুর্বোধ্য ওদের কাছে, যাদের ক্ষমতা এখনো ওরা মেপে উঠতে পারেনি—তারা যত ঝটপট সরে পড়ে এখান থেকে, ততই ওদের পক্ষে মঙ্গল। তা সত্ত্বেও কিন্তু এরকম প্রস্তাব ইশারা ইঙ্গিতেও কাউকে প্রকাশ করতে দেখিনি—নিচে যাওয়ার পথও কেউ দেখিয়ে দেয়নি। নিচ থেকে আমরা যে সুড়ঙ্গটা দেখেছিলাম, আভাসে ইঙ্গিতে ওরা বলেছে ঐ সুড়ঙ্গ দিয়েই নিচের দেশে পৌঁছোনো যেত। বাঁদর-মানুষ আর রেডইণ্ডিয়ানরা বিভিন্ন যুগে এবং ম্যাপল হোয়াইট তার ইয়াঙ্কি বন্ধুকে নিয়ে নিশ্চয় ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠে এসেছিল অজ্ঞাত এই জগতে। কিন্তু গত বছর দারুণ ভূমিকম্পে স্খলিত শিলাখণ্ডে সুড়ঙ্গের ওপর দিকটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। তাই যতবার নিচে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছি, ততবারই মাথা ঝাঁকিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে ওরা। হয়তো সত্যিই পথ বাৎলে দিতে ওরা অক্ষম অথবা হয়তো ইচ্ছেই নেই—এখান থেকে আমাদের বেরোতে দিতে চায় না।

যুদ্ধজয়ের পর জীবিত বাঁদর-মানুষদের তাড়িয়ে এনে রাখা হয়েছে গুহার সামনে বন্দীদশায়। এখন থেকে তারা ঐখানে থাকবে আর গোলামি করে যাবে। তাড়িয়ে আনবার সময়ে তাদের সেই করুণ হাহাকার আর বিলাপ-আর্তনাদ এখনো কানে জড়িয়ে আছে—কী ভীষণ! গুহার সামনে, মনিব-দের চোখের সামনে থেকে ওরা এখন শুধু জল বয়ে আনে, কাঠকুটো জোগাড় করে আনে। ব্যাবিলনে ইহুদীদের ওপর যেরকম অত্যাচার করা হয়েছিল আদিমকালে, অথবা মিশরে ইজরাইলবাসীদের ওপর যে নিগ্রহ চলেছিল—এ যেন তারই নৃশংস পুনরাবৃত্তি। নিশীথ রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে থেকে ভেসে আসত নিঃসঙ্গ কোনো কোনো বাঁদর-মানুষের একটানা করুণ

আর্তনাদ—হৃতগৌরব মনে পড়ায় বিলাপ করত নিশ্চয়—বাঁদর-মানুষদের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আর বিরাট নগরীর কথা স্মরণ করে আকুল হয়ে কাঁদত।

যুদ্ধের দু-দিন পর মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মালভূমি পেরিয়ে এসে শিবির পেতেছিলাম ওদেরই খাড়াই প্রাচীরের তলদেশে। খুব ইচ্ছে ছিল ওদের যেন ওদেরই গুহায় থাকি। কিন্তু একেবারে বেঁকে বসলেন লর্ড জন। বলা তো যায় না কবে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। তখন তো ওদের কব্জায় চলে যেতে হবে। তাই স্বাধীনতা বজায় রাখলাম, অস্ত্র সবসময়ে প্রস্তুত রাখলাম—কিন্তু বাইরে বেশ বন্ধুত্বের ভাব রক্ষে করে চললাম। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম গুহাগুলো। আশ্চর্য সেই গুহার সারি সৃষ্টি হয়েছে মানুষের হাতে, না প্রকৃতির খেয়ালে—তা কিন্তু বুঝতে পারিনি কোনো দিনই। ওপরে লাগচে আগ্নেয় ব্যাসাল্ট পাথর আর তলায় সুকঠিন গ্র্যানাইট স্তরের মাঝখানে এক লাইনের গুহাগুলি যেন নরম পাথর স্তর কেটে তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক কারণেও নরম পাথরের বুকে অমন চমৎকার সুড়ঙ্গ যে হতে পারে না, তাই বা কে জানে।

সারবন্দী গুহাগুলো রয়েছে মাটি থেকে আশিফুট উঁচুতে। উঠতে হয় খুব সরু আর খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে—যে সিঁড়ি দিয়ে কোনো ভারী জন্তুর পক্ষে ওঠা সম্ভব নয় কিছুতেই। গুহার ভেতর দিক বেশ উষ্ণ এবং শুষ্ক। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত সটান ভেতরের দিকে—সিধে সরল রেখার মত। ধূসর মসৃণ দেওয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা অপূর্ব ছবির পর ছবি—সবই মাল-ভূমির বিবিধ জন্তুর ছবি। কালক্রমে যদি মালভূমি থেকে প্রাণের চিহ্ন মুছে যায়, ভবিষ্যৎ অভিযাত্রীরা গুহাগাত্রের এই ছবি দেখেই আঁচ করতে পারবে কত অদ্ভুত রকমের জীবরা এককালে দাপিয়ে গেছে এখানে—ডাইনো-সর, ইগুয়ানোডন, মাছ-গিরিগিটি—এই সেদিন পর্যন্ত যাদের অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে।

প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মানুষ যে তার শাসন কায়েম করেছে এখানে, তার প্রমাণ এই অতিকায় ইগুয়ানোডনরা। ভেড়ার পালের মত তাদের পুষে রেখে দিয়েছে মালিকরা। পরে অবশ্য ধারণাটা পালটাতে হয়েছিল। মালভূমির সবাই যে এদের ভয়ে জুজু হয়ে আছে, মোটেই তা নয়—বরং জুজু হয়ে থাকতে হয় এদেরকেই। রেডইণ্ডিয়ানদের গুহার সামনে তাঁবু খাটানোর তৃতীয় দিবসে ঘটল ঘটনাটা। সামারলি আর চ্যালেঞ্জার দু-জনেই সেদিন লেকে গেছিলেন। নেটিভরা ওঁদের নির্দেশে

বর্শা দিয়ে গেঁথে বিশালকায় গিরগিটির নমুনা সংগ্রহ করছিল ক'দিন ধরেই। লর্ড জন আর আমি রয়েছি ক্যাম্পে। বেশ কিছু রেডইণ্ডিয়ান এদিকে ওদিকে ঢালু ঘাস জমিতে নানান কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আচমকা শত কণ্ঠে ভীষণ চিৎকার শুনলাম—'স্টোয়া!' 'স্টোয়া!' 'স্টোয়া!' চারদিক থেকে মেয়ে, পুরুষ আর বাচ্চারা পাগলের মত দৌড়োতে লাগল সিঁড়ির দিকে—ধাক্কাধাক্কিতে কতজন ঠিকরে গেল—কতজন তাদের ওপর দিয়েই চলে গেল—আতংকে উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামাল না। হুড়মুড় করে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগল গুহার নিরাপদ আশ্রয়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে ওপরে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, উঁচু চাতাল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের—উঠে আসতে বলছে ওপরে। দুজনেই ম্যাগাজিন রাইফেল বাগিয়ে দৌড়োলাম আসন্ন বিপদটার স্বরূপ দেখতে। আচম্বিতে সবচেয়ে কাছের বৃক্ষসারি ভেদ করে ছুটে বেরিয়ে এল বারো থেকে পনেরোজন রেডইণ্ডিয়ান। প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়োচ্ছে যেন—ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চোখগুলো। তারপরেই দেখা গেল ঠিক পেছন পেছন ধেয়ে আসছে একজোড়া বিকট-দর্শন সেই দৈত্যাকার প্রাণী—যে প্রাণী যামিনীর অন্ধকারে হানা দিয়েছিল ক্যাম্পে—আমার নিশীথ অভিযানে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছিল শূল বসানো কূপের মধ্যে। আকারে তাদের দেখতে ভয়াবহ ব্যাঙের মত। উপর্যুপরি লম্ফ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ভীষণ বেগে। আকৃতি ব্যাঙের মত হলেও আয়তনে অবিশ্বাস্য রকমের বিরাট—বৃহত্তম ঐরাবতের চেয়েও বড়। রাতের অন্ধকার ছাড়া এ-হেন দানবকে দেখবার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য কখনো হয়নি। নিশাচর প্রাণী বলেই দিনের বেলা কখনো দেখা যায় নি। তবে দিনের বেলায় আস্তানায় হানা দিলে আর রক্ষে নেই—এখনও নিশ্চয় তাই ঘটেছে। অজান্তে বোধ হয় রেডইণ্ডিয়ানরা ঘাঁটিয়ে ফেলেছে মূর্তিমান আতংকদের—তাই লম্বা লম্বা লাফ মেরে করাল-আকৃতি নিয়ে তাড়া করে করেছে দু-পেয়ে পুঁচকে প্রাণীগুলোকে উচিত শাস্তি দেওয়ার জন্যে। চেহারা দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম দুজনেই। চামড়া ভর্তি যেন অগুন্তি ফুসকুড়ি আর আঁচিল মাছের গায়ের মত অজস্র রামধনু রঙ বিকিরণ করে চলেছে। চলমান দেহে রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে হাজার রামধনুর মত—একেকটা রামধনু এক-এক রকমের— মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে রামধনুর রঙ আর চেহারা বিশাল দেহ দুটো লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

বেশীক্ষণ অবশ্য অপূর্ব এই দৃশ্য উপভোগ করতে পারলাম না। চোখের পলক ফেলার আগেই পলাতক রেডইণ্ডিয়ানদের নাগাল ধরে ফেলে তারা কশাইখানা বানিয়ে ফেলল সবুজ ঘাসজমির ওপর। আক্রমণের পদ্ধতিটা বিচিত্র। বিপুল লম্ফ দিয়ে দমাস করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একজনের ওপর। তাকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে পিণ্ডি পাকিয়ে লাফাচ্ছে আরেকজনের ওপর। রেডইণ্ডিয়ানরা নিঃসীম আতংকে দিশেহারা হয়ে আতীক্ষ্ণ আর্তনাদে আকাশ বাতাস ফালাফালা করে কেবল ছুটছে সামনের দিক থেকে——তা ছাড়া করবার তো আর কিছুই নেই। ছোটখাট টিলার মত ঐ করাল-মূর্তিদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। চেঁচাচ্ছে, পালাচ্ছে, পরক্ষণেই তালগোল পাকিয়ে হাড়গোড়-মাংসের দলায় পরিণত হচ্ছে। ভয়াবহ সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। শয়তান-দানোদের জিঘাংসা-অনলের নিবৃত্তি নেই তবুও—তেড়ে আসছে সমানে, ধরছে, পিষছে, ছিঁড়েখুঁড়ে নরমেধ যজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। একে একে প্রায় সবাইকেই যখন শেষ করে এনেছে, আর বাকী রয়েছে মাত্র ছ-জন—তখন রুখে দাঁড়ালাম আমি আর লর্ড জন। কিন্তু সাহায্য করতে গিয়ে মারাত্মক বিপদে জড়িয়ে গেলাম নিজেরাই—সাহায্যও যে খুব একটা করতে পারলাম, তা নয়। শ-দুয়েক গজ ব্যবধান বজায় রেখে ম্যাগাজিনের পর ম্যাগাজিন খালি করে ফেললাম, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ করলাম, কিন্তু যেন কাগজের গুটলে ছররা দিয়ে আঘাত হেনে চললাম শরীরী বিভীষিকাদের রামধনু-রঙীন অথচ আঁচিল বোঝাই কদাকার চামড়ার ওপর। মন্থর সরীসৃপ-প্রকৃতির জন্য ক্ষত নিয়ে বিন্দুমাত্র বিব্রত হতে দেখলাম না দুই মহাদানবের একজনকেও। প্রাণের ঝর্ণাধারা তো ওদের মস্তিষ্কে সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে রয়েছে মেরুদণ্ড বরাবর—আধুনিক অস্ত্র দিয়ে তাই সেই ঝর্ণাধারার মুখরুদ্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয়। বন্দুকবাজির ফলে লাভ হল একটাই। রাইফেলের নির্ঘোষ আর অগ্নিচমক দেখে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে গতিবেগ ঈষৎ মন্থর করে ফেলতেই সেই সুযোগে রেডইণ্ডিয়ান সহ আমরা দুজন পাঁই পাঁই করে দৌড়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু বিংশশতাব্দীর মোচাকৃতি বিস্ফোরক বুলেটও যেখানে ব্যর্থ, সেখানে সফল হল নেটিভদের বিষ-মাখানো তীর। স্ট্রোফ্যান-থাস গুল্মের বিষ-মাখানো তীরের ফলা ডুবিয়ে রাখা হয় পচা গলা মাংসরসে। অতীব মারাত্মক সেই তীর বর্ষণ শুরু হতেই পাল্টে গেল চিত্রপট। সামনা সামনি শিকারে এ-তীরেও কাজ হয় না। কেন না, দানবিক এই জানোয়ারদের রক্ত-প্রবাহ এতই অসাড় অবশ যে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ার

আগেই শিকারীকে খতম হয়ে যেতে হয় দানবিক নখরাঘাতে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই বিভীষিকা লম্ফ জুড়েছে সিঁড়ির গোড়ায়—সারি সারি গুহার ঠিক নিচে। ফলে, ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে গেল দুই বিরাটদেহীকে লক্ষ্য করে। শন শন শব্দে তীরের ঝাঁক এসে গায়ে বিঁধছেই তো বিধছেই। এক মিনিটও গেল না সারা গায়ে পালকের মত তীর লেগে রইল। তাতেও কি কমে হামলাবাজি। যন্ত্রণার তিলমাত্র লক্ষণ না দেখিয়ে নিস্ফল আক্রোশে থাবার নখ দিয়ে সিঁড়ি খামচে ধরে ভারী গতর নিয়ে বারবার সোপান বেয়ে উঠতে গেল এবং ধড়াস্ ধুম করে ফের আছড়ে নিচে পড়ে গেল। এইভাবেই কয়েক গজ সোপান আরোহণ এবং শরাকীর্ণ অবস্থায় আছড়ে পড়া চলল কিছুক্ষণ। তারপর শুরু হল বিষক্রিয়া। দুজনের একজন গুরুগম্ভীর নিনাদে মাটি কাঁপিয়ে দিল থরথরিয়ে, গোঙাতে গোঙাতে বিশাল থ্যাবড়া মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। আর একটা শয়তান আতীক্ষ্ণ বংশীধ্বনির মত করুণ আর্তনাদে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে দিয়ে ক্ষিপ্ত ভঙ্গিমায় চর্কিপাক খেতে খেতে আছড়ে পড়ল মাটিতে—মিনিট কয়েক ভূপাতিত অবস্থাতেই অপরিসীম যন্ত্রণায় তেউড়ে দুমড়ে মুচড়ে পাকসাট খেয়ে অবশেষে আড়ষ্ট নিস্পন্দ হয়ে হয়ে গেল। সব শত্রুর সেরা দু-দুটো শত্রু নিপাত করার আনন্দে উন্মাদ হয়ে গেল যেন রেডইণ্ডিয়ানরা। দৌড়ে নেমে এল গুহার সামনে থেকে। তাথৈ তাথৈ নটরাজ নৃত্য শুরু করে দিলে নিষ্প্রাণ দানব-দেহ দুটিকে ঘিরে। জয়োল্লাসের এমন বন্য বর্বর রূপ সভ্য মানুষ কখনো দেখেনি, গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি। সেই রাতেই দানব-দেহ দুটোকে টুকরো টুকরো করে কেটে কুটে পাচার করা হল অন্যত্র—খাওয়ার জন্যে নয়—মড়ক লাগার ভয়ে—বিষের কাজ তো তখনো চলছে মাংসের মধ্যে। পড়ে রইল শুধু দুটো সরীসৃপ-হৃৎপিণ্ড—সাইজে বড়সড় গদার মত প্রতিটাই। দেহ ছাড়াই প্রাণ স্পন্দনে স্বাধীনভাবে স্পন্দিত হয়ে চলল ধীর ছন্দে—ধুক ধুক করে করে ওঠানামা করতে লাগল ভুতুড়ে দেহযন্ত্রর মত। তিনদিনের দিন শক্তি ফুরিয়ে গেল স্নায়ুগ্রন্থিদের—নিথর হয়ে গেল ভয়াবহ জিনিস দুটো।

মাংসের খালি টিনের ওপর সর্বশেষ ছেঁড়াখোঁড়া দোমড়ানো নোটবই পেতে ক্ষয়ে চুন হয়ে আসা পেন্সিল চালনা করে লিখছি এই অত্যাশ্চর্য কাহিনী। কিন্তু একদিন তো এর চাইতেও ভাল টেবিল পাব, লেখার সরঞ্জামও পাব। সেদিন সবিস্তারে লিখব ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডে আকালা ইণ্ডিয়ানদের পূর্ণ বিবরণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেব কিভাবে দিনাতিপাত করেছিলাম তাদের সঙ্গে, দেখেছিলাম অদ্ভুত দেশের অদ্ভুততর দিবস-রজনীর

বিচিত্রতম ঘটনাবলী। ছেলেবেলার প্রতিটি আশ্চর্য ঘটনা যেমন এখনও জলজল করে মনের মধ্যে, ঠিক সেই ভাবেই আশ্চর্য জগতের প্রতিটি পল-অণু-পল-বিপল-দণ্ডের স্মৃতি পাথরে উৎকীর্ণ শিলালিপির মত স্পষ্টাক্ষরে জাগ্রত থাকবে আমার মনের মধ্যে। ভুলবো না, ভুলবো না আমি কিছুই। ইহ-জীবনে বিচিত্র-ভয়াবহ-আশ্চর্য-সুন্দর সেই অভিজ্ঞতার কিছুই আমি ভুলব না। জানি, অনেক নতুন অভিজ্ঞতার ছাপ পড়বে স্মৃতির পর্দায়—কিন্তু এই ক'দিনের স্মৃতি তাতে মুছে যাবে না কোনোদিনই—চাপা পড়ে হারিয়ে যাবে না কোনোক্রমেই। সময় যেদিন আসবে, সেদিন আমি লিখব জ্যোৎস্না বিধৌত বিশাল হ্রদে আকালা ধীবরের জালে কিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল একটা বাচ্চা ইকথিওসরাস—আর একটু হলেই ক্যানো উল্টে যেত—অতি কষ্টে ঠেলেঠুলে ক্যানো তুলে দেওয়া হয়েছিল বালির চড়ায়। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত সেই অপার্থিব মুখখানা যেন একটা বিকট দুঃস্বপ্ন হয়ে জেগে রয়েছে আমার স্মৃতির পর্দায়। চোঙার মত লম্বাটে নাকমুখের দু-পাশে হাড়ে ঢাকা একজোড়া চোখের ঠিক ওপরে মাথায় বসানো তৃতীয় চক্ষুর সেই রক্ত-জল-করা চাহনি ভুলব না মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। অদ্ভুত আকৃতি তার। অর্ধেক নীলমাছ আর অর্ধেক পাখনানাড়া মাছের সমন্বয় যেন। সেই রাতেই জলজ উদ্ভিদের মধ্যে থেকে ছিটকে এসে একটা সবুজ জল-সাপ চ্যালেঞ্জারের ক্যানো থেকে হালধারীকে চক্ষের নিমেষে পাক-সাটে বেঁধে তলিয়ে গেল জলের তলায়। এছাড়াও, চাঞ্চল্যকর বর্ণনা দেব সেই নিশাচর শ্বেতবস্তুটার—আজও জানি না সে জানোয়ার, না, সরীসৃপ—লেকের পূবপাড়ে একটা অতি নচ্ছার জলাভূমিতে তার নিবাস। অসম্ভব চঞ্চল—কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না এক জায়গায়—অন্ধকারেও সঞ্চর-মান দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয় ফসফরাসের দ্যুতির মত আবছা প্রভা। ইণ্ডিয়ানরা আতংকে সিঁটিয়ে যায় এই নিশাচরকে দেখলেই—হাজার প্রলোভনেও জলার ধারকাছ দিয়েও যেতে চায় না। আমরা কিন্তু দু-দুবার নৈশ অভিযানে গিয়েছিলাম। দুবারই দেখেছিলাম তার ভুতুড়ে চেহারা, কিন্তু জলার ভেতরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাইনি—ভৌতিক সত্তার নিবাস যেখানে—জলার সেই গভীরতম অঞ্চলে পৌঁছোতে পারিনি। শুধু দেখে-ছিলাম সাইজে সে গাভীর চেয়েও বড়, গায়ের গন্ধ অদ্ভুত মৃগনাভির মত। আরও তীব্র, আরো বিচিত্র। এ-ছাড়াও সরস বর্ণনা দেব সেই ঘটনাটির যার ফলে চ্যালেঞ্জারের জীবন যেতে বসেছিল অস্ট্রিচের চাইতেও উঁচু একটা চলমান বিভীষিকার মত পাখীর চঞ্চুর আঘাতে। বায়ুবেগে দৌড়ে

এসে চ্যালেঞ্জার সেদিন টপাস্ করে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর উঠে পড়ে-ছিলেন বলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন—কিন্তু ধারালো বাঁকানো চঞ্চুর এক ঠোক্করেই কেটে বাদ হয়ে গিয়েছিল বুটের হীল—ঠিক যেন শাণিত বাটালির এক কোপে নিখুঁত ভাবে উধাও হয়েছিল জুতোর পেছন দিকটা। পাখী যে এত জোরে দৌড়োয়, তা তো জানা ছিল না। গলাখানা শকুনের গলার মত লম্বা। নৃশংস মুণ্ডুখানা দেখলেই হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। চলমান মৃত্যু বলা যায় তাকে। প্রফেসরের পরমায়ু ছিল বলেই বেঁচে গিয়েছিলেন সে-যাত্রা। কিন্তু পরমায়ু ফুরিয়েছিল চলমান পক্ষী-মহারাজের। আধুনিক অস্ত্র কাজ দিয়েছিল সে-যাত্রা। লর্ড রক্সটনের অব্যর্থ বুলেট-বিদ্ধ হয়ে রাশি রাশি পালক চারদিকে উড়িয়ে দুই পা শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে অনু-শোচনাশূন্য নিঠুর হলদে চোখে একদৃষ্টে চেয়েছিল আমাদের পানে। হাপরের মত হুস্-হাস্ করে হাঁপাতে হাঁপাতে কিন্তু বিপুল হর্ষে নৃত্যপর প্রফেসর প্রস্তর খণ্ডের ওপর থেকে নেমে এসে নাম বলেছিলেন কঙ্কাল-আকৃতি বিহঙ্গের—ফোরোর‍্যাকাস্। আশা করি অ্যালিবেনির সেই বিলাসবহুল কক্ষে শিকারে নিহত পৃথিবীর বিবিধ বন্য জন্তুর মাঝে কদাকার এই আতংক-পক্ষীর মস্তকটিও একদিন শোভা পাবে এবং সে-দৃশ্য দেখবার মত পরমায়ুও আমার থাকবে। সবশেষে অতুলনীয় বর্ণনা দেব দানব-গিনিপিগ টোক্সোডোনের—বাটালির মত সারি সারি ঠেলে বার করা দাঁত মেলে বেচারী এক ধূসর প্রভাতে হ্রদের জলপান করতে এসে নিহত হয়েছিল আমাদের হাতে।

এসব কাহিনী একদিন আমি লিখব সবিস্তারে। চাঞ্চল্যকর সেই দিন গুলোর লোমহর্ষক বিবরণীর পাশাপাশি থাকবে সুষমাস্নিগ্ধ আরও অনেক বিবরণী। গ্রীষ্মের সেই অপূর্ব নৈশ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেব মনভরানো ভাষায়। জঙ্গলের মধ্যে লম্বা লম্বা ঘাসের ওপর পাশাপাশি চারজনে শুয়ে-ছিলাম আমরা। মাথার ওপর উদার সুনীল আকাশ। অবাক হয়ে দেখে-ছিলাম কিভাবে ডানা ঝাপটে অদ্ভুত মোরগরা উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। দেখেছিলাম, বিবরের মধ্যে থেকে মুণ্ডু বাড়িয়ে কিম্ভূতকিমাকার নতুন ধরনের প্রাণীরা অবাক-বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছে আমাদের। দেখেছিলাম, ঝোপঝাড়ের মাথার ওপর থেকে সুমিষ্ট রসালো ফলভারে অবনত বৃক্ষ-শাখা। আশপাশের আগাছার মধ্যে থেকে আমাদের দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল যেন বিচিত্র সুন্দর পুষ্পরাজি। লিখব সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাতের অভিজ্ঞতা কাহিনী। দর্পণের মত ঝকঝকে সুবিস্তীর্ণ সরোবরের পাড়ে বহুক্ষণ শুয়েছিলাম আমরা চার বন্ধু। সবিস্ময়ে এবং সভয়ে দেখে-

ছিলাম ফ্যানট্যাসটিক জলদানবদের আচমকা আছড়ানিতে বলয়াকারে মস্ত তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে দূর হতে দূরে। দেখেছিলাম নিতল জলের অন্ধকারে অদ্ভুত এক প্রাণীর সবজেটে দ্যুতি। এই সব নিয়েই ব্যাপৃত হবে একদিন আমার লেখনী এবং মস্তিষ্ক—কিন্তু সেদিন এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে।

কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেন, বাপু হে, দিনরাত এইসব অবাক বিস্ময়ের অভিজ্ঞতায় মশগুল থেকে সময় নষ্ট না করে চার বন্ধু মিলে বহির্জগতে সটকান দেওয়ার পথ বাৎলানোর চেষ্টা করোনি কেন? জবাবে বলব, চারজনের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করেনি—কিন্তু বিফল হয়েছে প্রত্যেকেই। একটা ব্যাপার ঝটপট জানা হয়ে গিয়েছিল আমাদের: রেডইণ্ডিয়ানরা এ সমস্যার সমাধানে কোনো সাহায্যই করবে না আমাদের। সব ব্যাপারেই ওরা আমাদের প্রাণের বন্ধু—জান-মান দিতে পারে আমাদের জন্যে। শুধু বন্ধু বলব না—কেনা গোলাম বললেও চলে, পায়ের জুতো হয়ে রয়েছে যেন। কিন্তু যখনি বলেছি, হে বীরপুঙ্গবগণ, চল্লিশফুট চওড়া খাদটার এপাড় থেকে ওপাড় পর্যন্ত ফেলবার মত ব্রীজ তৈরীর তক্তা জোগাড় করে দেবে? অথবা চামড়ার ফিতে, নিদেন পক্ষে বেয়ে ওঠার মত লতা জুটিয়ে আনতে পারো দড়ি বানাবার জন্যে?—এ সব কথা যখনি বলেছি আভাসে ইঙ্গিতে, তখনি সকৌতুকে কিন্তু দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে আমাদের যাবতীয় আবেদন-নিবেদন। কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও মুচকি হেসে, চোখ মিটমিট করে কেবল মাথা নেড়েছে তার বেশী কিছু নয়। এমনি কি বুড়ো সর্দারও গোঁয়ার গোবিন্দর মত পায়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে আমাদের অনুরোধ উপরোধ—শুধু একজনই সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে মাথা নেড়ে জানিয়েছে আমাদের এই ইচ্ছেপূরণ করতে না পারার জন্য সে একান্তই দুঃখিত। 'মারেতাস'—তরুণ সর্দার--যাকে আমরা প্রাণে বাঁচিয়েছিলাম। বাঁদর-মানুষদের নাকানি চোবানি খাওয়ানোর পর থেকেই এদের ধারণা হয়ে গিয়েছে, আমরা যদ্দিন তাদের সঙ্গে থাকব তদ্দিন বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ তারা পাবেই। আমাদের অদ্ভুত নলের হাতিয়ারের বজ্রগর্জন আর অগ্নিবর্ষণের ফলেই তো চিরশত্রুদের প্রায় নির্বংশ করে আনা গিয়েছে—গোলামও পাওয়া গিয়েছে বিস্তর। সুতরাং আমাদের ছেড়ে দেওয়াটা কি বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে? কক্ষনো না। তাই চম্পট দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে তারা নিতান্তই নারাজ। স্বদেশবাসীদের কথা যদি ভুলে গিয়ে মালভূমিতে থেকে যেতে রাজী হই, তাহলে প্রত্যেককে টুকটুকে একটি করে লাল বউ আর

একটা করে নিজস্ব গুহা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে বহুবার। এই অবধি ভালোয় ভালোয় চলছে সবই—আমাদের আসল ইচ্ছে শিকেয় তুলে রেখে দিয়ে কত রকম প্রলোভনই না দেখাচ্ছে। আমরাও ঠিক করেছি, পলায়নের প্ল্যান একেবারেই গোপন করতে হবে। কেন না, বলা যায় না, শেষ মুহূর্তে—গায়ের জোরেও আমাদের আটকে রাখতে পারে এখানে।

ডাইনোসরের বিপদ থাকা সত্ত্বেও গত তিন হপ্তার মধ্যে দুবার পুরানো ক্যাম্পে গেছিলাম নিগ্রো অনুচরের সঙ্গে দেখা করতে। এখনো খাড়াই পাহাড়ের তলায় ঘাঁটি গেড়ে বসে রয়েছে জাম্বো। ডাইনোসরের ভয় দিনের বেলা ততটা নেই বলেই যাওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিলাম। কেন না, আগেই তো বলেছি, ওরা নিশাচর প্রাণী। যাই হোক, পাহাড়ের মাথা থেকে দিগন্ত-ব্যাপী প্রান্তরের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ টাটিয়ে গেছে, কিন্তু যে সাহায্যের আশায় এত সাগ্রহ-প্রত্যাশা—তার চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি। দড়িদড়া নিয়ে কাউকে আসতে দেখিনি। শুধু দেখেছি ক্যাকটাস-সমাকীর্ণ ধূ-ধূ প্রান্তর বহুদূরে গিয়ে মিশেছে বাঁশবনে—মাঝের তেপান্তরের মাঠে জন প্রাণীর চিহ্ন নেই।

উৎফুল্ল স্বরে জাম্বো কিন্তু অভয় দিয়ে গেছে নিচ থেকে—'ঘাবড়াবেন না, মাসা, ঘাবড়াবেন না। দিন সাতেকের মধ্যেই এসে যাবে রেডইণ্ডিয়ান। দড়ি ছুঁড়ে নামিয়ে আনবো আপনাদের।' বাস্তবিকই, এ রকম অনুচর হয় না। তুলনাবিহীন বিশ্বস্ততার এ-হেন নজির জীবনে বিস্মৃত হব না।

দ্বিতীয়বার ক্যাম্প থেকে ফিরে আসার পর আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা পড়েছিল আর একটা ঘটনা। সেবার রাত কাটিয়েছিলাম ক্যাম্পেই—কাজেই বন্ধুদের সান্নিধ্য পাই নি সেই রাতে। চেনা পথে ফেরার সময়ে টেরোডাকটিলদের জলাভূমি মাইলখানেকের মধ্যে আসতেই দেখলাম একটা অসাধারণ জিনিস এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বাঁকানো বেতের খাঁচার মধ্যে হাঁটছে একটি মানুষ। ঘণ্টার মত বেতের খাঁচা চারদিকে থেকে ঘিরে রয়েছে মানুষটাকে, কাছাকাছি আসতেই তো চক্ষু চড়কগাছ হবার উপক্রম হল! একী! এ যে আমাদের লর্ড জন রক্সটন! আমাকে দেখেই খাঁচার মধ্যে থেকে সুরুৎ করে বেরিয়ে এসে হা-হা করে হাসতে লাগলেন বটে, কিন্তু সে হাসি কাষ্ঠহাসিই বলা যায়—যেন বিষম অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন আমি সামনে পড়ায়।

বললেন—'আরে ছোকরা, তোমাকে এখানে দেখব ভাবিনি তো!'

আমি বললাম—'কি কাণ্ড করতে চলেছেন বলুন দিকি?'

'টেরোড্যাকটিল বন্ধুদের সঙ্গে একটু দেখা সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'আরে গেল যা! এমন ইন্টারেস্টিং পশু আর দেখেছো কোথাও? তবে হ্যাঁ, একটু অসামাজিক ঠিকই! নতুন জীবের সঙ্গে ব্যবহারটা যাচ্ছেতাই ...তোমার অন্তত: তা ভোলার কথা নয়। তাই ঢুকে বসে আছি খাঁচার মধ্যে ...যাতে আদর-টাদরগুলো গায়ে না লাগে।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু জলায় চলেছেন কি মতলবে? কিসের প্রত্যাশায়?'

মুখখানা আস্ত জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত করে আমার পানে চাইলেন লর্ড জন রক্সটন—মুখাবয়বে দেখলাম দ্বিধার জড়তা।

তারপর অবশ্য বললেন—'তোমার কি মনে হয় প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ছাড়া আর কারো কিছু জানবার অধিকার নেই? টেরোড্যাকটিলদের চাঁদপানা চেহারাগুলো কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছি। হয়েছে তো?'

'আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে দুঃখিত—কিছু মনে করবেন না।'

মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকচ্ছটায় আবার উদ্ভাসিত হ'ল লর্ড জনের মুখ। হো-হো করে হেসে বললেন—'আরে ছোকরা, মনে করতে যাবো কেন? যাচ্ছি একটা ক্ষুদে টেরোড্যাকটিল পাকড়াও করতে—উপহার দেব চ্যালেঞ্জারকে। ওটাও তো একটা কাজ—আমারই কাজ। না হে না, তোমার আসার দরকার নেই। খাঁচার মধ্যে আমি নিরাপদ—তুমি কিন্তু নয়। যাও, যাও, এগোও—রাত নামবার আগেই ফিরে আসবো ক্যাম্পে।'

বলে, উনি ওঁর অসাধারণ খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে এগিয়ে গেলেন জলার দিকে—আমি পা চালালাম ক্যাম্পের দিকে।

লর্ড জনের আচরণ অদ্ভুত সন্দেহ নেই, তার চাইতেও বেশী অদ্ভুত কিন্তু চ্যালেঞ্জারের চালচলন। লজ্জার মাথা খেয়েই লিখছি, রেডইণ্ডিয়ান রমণীদের বড় বেশী সুনজরে পড়ে গেছিলেন ভদ্রলোক। দল বেঁধে মেয়েরা অষ্টপ্রহর লেগে থাকতো তাঁর পেছনে। তাই সব সময়ে সঙ্গে রাখতেন তালগাছের একটা ছড়ানো পাতাওলা ডাল। মেয়েরা বেশী কাছে এলেই ঘা কতক বসিয়ে দিতেন। দূর থেকে মনে হত মাছি তাড়াচ্ছেন। অনেক কিম্ভূতকিমাকার মানস-ছবি নিয়ে দেশে ফিরব একসময়ে—সব চাইতে বিদঘুটে এবং উজ্জ্বল হয়ে থাকবে যে ছবিটি, তা এই: বিশাল-নয়না রেড-ইণ্ডিয়ান তরুণীরা লাইন বেঁধে চলেছে চ্যালেঞ্জারের পেছন পেছন, পরনে তাদের একচিলতে বল্কলের পরিধেয়। সামনে সামনে চলেছেন গ্রেট-প্রফেসর,

বুটের ডগা উঁচিয়ে পা ফেলছেন গাম্ভীরি চালে, হাতে সেই শাসন-দণ্ড—তালপাতার ঝাঁটা, কালো দাড়ির জঙ্গল ফর-ফর করে উড়ছে হাওয়ায়। যেন হাস্যকর গীতিনাট্যের সুলতান চ'লছেন—পুরো হারেমটা লাইন দিয়ে চলেছে পেছনে পেছনে। সামারলি ব্যস্ত মালভূমির কীটপতঙ্গ আর পাখী-দের নমুনা সংগ্রহ নিয়ে। দিনরাত ব্যস্ত তা'ই নিয়ে। নমুনা সংগ্রহ করে আনছেন, সাফসুতরো করছেন, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছেন। বাকী সময়টা (পরিমাণটা নেহাৎ কম নয়) কাটাচ্ছেন চ্যালেঞ্জারের বাপান্ত করে—কেন মাথা খাটিয়ে সমস্যার সুরাহা করছেন না—মালভূমি থেকে অবতরণের পন্থা আবিষ্কার করছেন না।

চ্যালেঞ্জার কিন্তু নিয়মিত রোজ সকালে একা-একা বেরিয়ে যেতেন—মাঝে মাঝে যখন ফিরে আসতেন, মুখটা দেখতাম কালো হয়ে রয়েছে। যেন জবরদস্ত ঝক্কি একাই কাঁধে নিয়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছেন—গম্ভীরবদনে আত্মম্ভরিতার অভাব কিন্তু একবারও লক্ষ্য করিনি। ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। চরিত্র বটে একখানা। একদিন অবিশ্যি হাতে তালপাতার ঝাঁটা আর পেছনে স্তাবক-রমণীদের নিয়ে আমাদের দেখালেন তাঁর গুপ্ত কারখানা—সেই প্রথম ফাঁস করলেন গোপন প্ল্যানটা।

জায়গাটা একটা তাল-কুঞ্জের মাঝখানে। লম্বা লম্বা তালগাছ পরি-বেষ্টিত একটুকরো খোলামেলা চত্বর। ফুটন্ত কাদার একটা উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে মাঝখানে—যে প্রস্রবণের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রস্রবণের কিনারায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু চামড়ার ফিতে—ইগুয়ানোডনের চামড়ার ফিতে। আর রয়েছে একটা বিরাট চুপসোনা ঝিল্লার থলি—অতিকায় মৎস্য-গিরগিটি মারা হয়েছিল লেকের জলে—নিশ্চয় তারই চাঁচা-ছোলা রোদে শুকোনো পাকস্থলী। বিশাল এই বস্তার একদিক সেলাই করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আর একদিকে রাখা হয়েছে ছোট্ট একটা মুখ। বেশ কয়েকটা বাঁশের বেত ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এই মুখটার মধ্যে—বেতগুলোর অপর প্রান্ত লাগানো রয়েছে অনেকগুলো মোচাকৃতি মাটির ফানেলের মাথায়। ফানেলগুলো উপুড় করা রয়েছে ফুটন্ত কাদার ওপর—প্রস্রবণের গ্যাস ভুর-ভুর করে বেরিয়ে এসে ঢুকে যাচ্ছে ফাঁদলের মধ্যে। দেখতে দেখতে ফুলে উঠল চুপসোনো দেহযন্ত্রটা এবং ঊর্ধ্বগামী প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেল। থলির গায়ে লাগানো দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কষে বেঁধে দিলেন চ্যালেঞ্জার। আধঘণ্টার মধ্যেই গ্যাস-থলির টান পড়ল চামড়ার ফিতেগুলোর ওপর। ঝাঁকুনি দেখেই

বোঝা গেল বেশ খানিকটা ওজন নিয়ে গ্যাস-ব্যাগ এখন উঠে যেতে পারে শূন্যে। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে যেমন আত্মিক তুষ্টি নিয়ে পিতৃদের স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, চ্যালেঞ্জারের ক্ষেত্রেও দেখা গেল অনুরূপ দৃশ্য। বিশাল দাড়ি চুমড়োতে চুমড়োতে হাসি-হাসি মুখে নীরবে চেয়ে রইলেন তাঁর মস্তিষ্ক-প্রসূত নবজাতকের দিকে। নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করলেন সামারলি।

বললেন কিছুটির জ্বালা-ধরানো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—'চ্যালেঞ্জার, মতলব কি আপনার? ঐ দিয়ে আমাদের খাদ পার করাবেন নাকি?'

'মাই ডিয়ার সামারলি, আমার মতলব হাতে কলমে ওর শক্তিখানা আপনাকে দেখিয়ে দেওয়া:...যা দেখবার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার সুরেই সুর মেলাবেন আপনি।'

প্রত্যয়-কঠিন স্বরে সামারলি বললেন—'দয়া করে মাথা থেকে এক্ষুনি আইডিয়াটাকে বার করে দিন। শ্বেতকাক! অসম্ভব কাণ্ডকারখানার মধ্যে আমাকে ঢোকাবেন না। যত্তোসব পাগলের পাগলামি! লর্ড জন, আপনি কি বলেন?'

লর্ড সভার সদস্য মশায়ের মন্তব্যটা হ'ল এইরকম—'দারুণ মৌলিক ব্যাপার তো! কেরামতিটা দেখতে চাই আমি।'

'নিশ্চয় দেখবেন, নিশ্চয় দেখবেন,' আশ্বস্ত করলেন চ্যালেঞ্জার ত্রাতা মধুসূদনের মত—'বেশ কয়েকদিন ধরেই আমার এই শক্তিশালী মগজের সমস্ত শক্তি একাগ্র করে ভাবছিলাম পাহাড়-পাঁচিল টপকে নেমে যাওয়ার সমস্যার সমাধান করা যায় কি করে। গা বেয়ে যে নামতে পারব না, তা জানা গেছে। সুড়ঙ্গও যে নেই, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আর একটা সেতু বানিয়ে যে-পাহাড় চূড়া থেকে এসেছি এখানে—সেখানে ফিরে যেতেও আমরা অপারগ। ঠিক কিনা? তাহলে আমাদের এই চার মূর্তিকে ঐ ব্যবধানটুকু টপকে নিয়ে যাওয়া যায় কি করে? কিছুদিন আগে আমার এই ছোট্ট বন্ধুটির কাছে বলেছিলাম, উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে মুক্ত হাইড্রোজেনের আবির্ভাব ঘটছে। সেই থেকেই বেলুনের আইডিয়াটা ঢুকেছে মাথায়। কিন্তু ধাঁধায় পড়েছিলাম গ্যাসটাকে ধরে রাখার মত একটা মোড়ক আবিষ্কার নিয়ে। কিন্তু সরীসৃপদের প্রকাণ্ড অন্ত্র সম্পর্কে একটু ধ্যান ধারণা করতেই সমাধান হয়ে গেল সেই সমস্যারও। এবার দেখুন ফলটা কি দাঁড়িয়েছে!'

এক হাত শতচ্ছিন্ন কোর্টের সামনের পকেটে ঢুকিয়ে আরেক হাত তুলে সগর্বে দেখালেন গ্যাসভর্তি চামড়ার বস্তাটাকে।

দেখলাম, এরই মধ্যে ব্যাগ ফুলে ফেঁপে অখণ্ড বর্তুলাকারে প্রচণ্ড টান মারছে চামড়ার ফিতেগুলোর ওপর।

নাসিকা গর্জন ছেড়ে সামারলি বললেন—'রোদের তাতে মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি! বদ্ধ পাগল কোথাকার!'

লর্ড জন কিন্তু খুশীতে ডগমগ করে উঠলেন আইডিয়াটা দেখে। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন আমার কানে কানে—'বুড়ো তো কম ধড়িবাজ নন।' উচ্চকণ্ঠে বললেন চ্যালেঞ্জারকে—'দোলনা কোথায়?'

'দোলনা নিয়ে ভাবব এইবার। কিভাবে বানাবো, কি ভাবে গ্যাস-বেলুনে লাগাবো—সে-সব প্ল্যান আগেই ঠিক করে ফেলেছি। ইতিমধ্যে শুধু দেখাবো আমার তৈরী এই উড়ুক্কু যান আমাদের প্রত্যেকের ভার টেনে তুলতে পারে কিনা।'

'সবাইকে একসঙ্গে তো?'

'না, না। আমার প্ল্যান হল একজন একজন করে নেমে যাবে প্যারাসুটে করে নেমে যাওয়ার মত। তারপর টেনে তুলে আনবো বেলুন—কি ভাবে করব, সে ব্যবস্থাও ভেবে চিন্তে স্থির করে ফেলাটা খুব একটা কঠিন হবে না। একজনের ওজন নিয়ে যদি আস্তে আস্তে নেমে যেতে পারে, তাহলেই তো কেল্লা ফতে। তার বেশী আর চাই কী? সেইটুকুই করতে পারে কিনা, দেখা যাক এবার।'

বেশ বড় আকারের একটা ব্যাসাল্ট পাথরের চাঁই বার করে আনলেন চ্যালেঞ্জার। মাঝখানে খোবলানো থাকায় দড়ি বাঁধা যায় সেখানে অনায়াসেই। শংকু-পর্বতের চূড়ায় আরোহণের পর যে দড়িটা সঙ্গে এনেছিলাম, এবার সেই দড়ির কুণ্ডলী বার করলেন চ্যালেঞ্জার। লম্বায় একশ ফুটেরও বেশী। সরু হলেও বেশ মজবুত। চামড়া দিয়ে গলবন্ধনীর মত একটা বস্তুও তৈরী করেছেন দেখলাম। চারপাশ থেকে ঝুলছে অনেক-গুলো চামড়ার ফিতে। গলবন্ধনী রাখা হল স্ফীতোদর বেলুনের মাথায়—চারপাশ দিয়ে ঝুলে পড়া চামড়ার ফিতেগুলোকে তলায় জড়ো করে বেঁধে দিলেন, যাতে ঝুলোনো ওজনের চাপটা সমানভাবে ছড়িয়ে যায় বেলুনের সারা গায়ে। ব্যাসাল্ট পাথরের চাঁইটা বেঁধে দেওয়া হল এই গিঁটবাঁধা চামড়ার ফিতেগুলোর গুচ্ছে এবং তা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল দড়িটা। চ্যালেঞ্জার নিজের বাহুতে তিনপাক জড়িয়ে নিলেন সেই দড়ি।

এরপর যা ঘটবে, তা যে অতীব সন্তোষজনক—এই রকম একটা ভাব নিয়ে এক গাল হেসে বললেন বিজ্ঞেবুদ্ধির জাহাজমশায়—'আমার বেলুনের

বহন করার ক্ষমতাটা এবার হাতে কলমে পরীক্ষা হয়ে যাবে।' বলতে বলতে যে-কটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বেলুনটা বাঁধা ছিল গাছের গুঁড়িতে, ঘচাঘচ করে কেটে দিলেন সব কটা।

অভিযানে রওনা হয়ে ইস্তক অনেক বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাদের। কিন্তু নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মত এ রকম আসন্ন বিপদের মুখে কখনো পড়িনি। স্ফীত বেলুনটা ভীষণ গতিবেগে ঠিকরে গেল শূন্য পথে। পলক ফেলার আগেই হ্যাঁচকা টানে উঠিয়ে নিল চ্যালেঞ্জারের দেহ—ভদ্রলোকের পদযুগল মেদিনী ত্যাগ করে ধাবিত হল গগন পানে। চকিতের মধ্যে যেটুকু সময় পেলাম, সেইটুকুরই সদ্ব্যবহার করলাম আমি—আমার সামনে দিয়েই স াঁ করে কোমরখানা উঠে যাচ্ছে দেখে দু-হাতে তাই জড়িয়ে ধরলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম সাঁই সাঁই করে শূন্যে ধেয়ে যাচ্ছি আমিও। জাঁতি কলে যেভাবে ইঁদুর আটকে যায়, সেই রকম শক্ত মুঠোয় খপাৎ করে আমার পা চেপে ধরলেন লর্ড জন—কিন্তু বুঝলাম তিনিও ঊর্ধ্বগামী হয়েছেন আমার সঙ্গে—পা উঠে এসেছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে। মুহূর্তের জন্যে মনের চোখে দেখতে পেলাম সসেজের মালার মত আমরা চার দুঃসাহসী ঝুলছি ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ডের আকাশে। যে দেশের অভিযাত্রী আমরা—ভাসছি সেই দেশেরই মাথায়। তবে কপাল ভাল আমাদের—কেন না নারকীয় এই যন্ত্রের উত্তোলন ক্ষমতা প্রচণ্ড হলেও দড়ির ক্ষমতা তো নেই এতগুলো মানুষের ভার বইবার। তাই পটাং করে ছিঁড়লো দড়ি, আমরাও ধড়াধ্বড় করে আছড়ে পড়লাম একজনের ওপর আর একজন—দড়ি এসে পড়ল কুণ্ডলীর আকারে আমাদের চারপাশে। টলতে টলতে দু-পায়ে খাড়া হওয়ার মত অবস্থায় আসার পর ঘন নীল আকাশের বুকে দেখলাম একটা কালো দাগ—ব্যাসাল্টের চাঁই ভীমবেগে ধেয়ে চলেছে বাতাস চিরে।

চ্যালেঞ্জারের সেকী আহ্লাদ! এ রকম একটা ভয়ানক বিপদ থেকে স্রেফ পল্কা দড়ির দৌলতে রেহাই পেলাম বটে, কিন্তু তাতে দমে যাওয়ার পাত্র তিনি নন। জখম বাহুতে হাত ঘষতে ঘষতে চেঁচিয়ে উঠলেন উৎকট উল্লাসে—'অপূর্ব! অপূর্ব! এর চাইতে নিখুঁত আর সন্তোষজনক এক্স-পেরিমেন্ট আর হয় না! এতখানি সাফল্য আমি কল্পনাও করতে পারিনি। জেন্টলমেন, কথা দিচ্ছি—সাতদিনের মধ্যেই বানিয়ে দেব আর একখানা বেলুন—তারপরে আরামে আর নিরাপদে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রার প্রথম পর্বের জন্যে ভরসা রাখতে পারেন আমার ওপর।'

যে সব ঘটনার বিবরণ দিয়ে এলাম এতক্ষণ, তার প্রতিটাকে লিখেছি হুবহু যেভাবে ঘটেছিল, ঠিক সেইভাবে। এবার ঘটনাধারা সংক্ষিপ্ত করে এনে লিখছি খাড়াই প্রাচীরের তলদেশে পুরোনো শিবির থেকে—যে শিবিরে এতদিন ধরে অসীম সহিষ্ণুতা, ধৈর্য আর তিতিক্ষার প্রমাণ দিয়ে এসেছে আমাদের একান্ত বিশ্বস্ত নিগ্রো অনুচর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মালভূমি থেকে নেমে এসেছি অপ্রত্যাশিত এক পন্থায়—পেছনে ফেলে এসেছি স্বপ্নের মত আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট বিপদ আর ঝুঁকির পর্বতপ্রমাণ বোঝা। মাথার ওপর আকাশছোঁয়া লালচে কর্কশ এবড়োখেবড়ো প্রাচীর শীর্ষের ওপরে রয়েছে সেই দুঃস্বপ্নের দেশ যে দেশ থেকে কখনো পালাতে পারব ভাবতেও পারিনি। নির্বিঘ্নে সেখান থেকেই নেমে এসে আবার মিলিত হয়েছি জাম্বোর সঙ্গে। খুব জোর দেড় মাস কি দু-মাস পরেই পৌঁছোবো লণ্ডনে। এমনও হতে পারে, এ চিঠি আপনার হাতে পৌঁছোবে আমরা লণ্ডনে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে। প্রাণাধিক প্রিয় বিরাট সেই শহরে ফিরে যাওয়ার সুখস্বপ্নে এখন থেকেই মশগুল হয়ে রয়েছি আমরা প্রত্যেকেই।

চ্যালেঞ্জারের বিপজ্জনক হাতে-তৈরী বেলুন-এক্সপেরিমেন্ট যেদিন আমাদের প্রাণ-পিঞ্জর শূন্য করতে বসেছিল, সেইদিনই রাত্রে ভাগ্য পরিবর্তন ঘটল আমাদের। আগেই বলেছি, মালভূমি থেকে আমাদের সটকান দেওয়ার ব্যাপারে কেবল একজনই বরাবর সহানুভূতি দেখিয়ে গেছিল—তরুণ সর্দার মারেতাস—যার প্রাণরক্ষা করেছিলাম আমরা বাঁদর-মানুষদের টাউনে। একমাত্র তারই কোনো অভিপ্রায় ছিল না ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাদের এই নির্বান্ধব অঞ্চলে আটকে রাখার। ভাষা না বুঝলেও, ভাবভঙ্গী ইসারাইঙ্গিত দিয়ে ওর সেই অভিপ্রায় বারবার বুঝিয়ে দিয়েছিল আমাদের। আমার সঙ্গে ওর দহরম মহরম একটু বেশী মাত্রায় ছিল বোধ হয় প্রায় সমবয়সী বলেই। এক্সপেরিমেন্টের ধাক্কায় গা গতরে ব্যথা নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসার পর রাত্রে এল সে আমার কাছে। রোল করা একটা পাকানো গাছের ছাল তুলে দিল আমার হাতে। আঙুল তুলে গম্ভীর মুখে দেখাল মাথার ওপরকার গুহাশ্রেণী। পরক্ষণেই আঙুল নামিয়ে এনে দ্বিতীয় গুহাটা দেখিয়ে, ঠোঁটের ওপরে রেখে, মুখের ভাব আর চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা বিলক্ষণ গোপনীয়—পাঁচ কান করার মত নয়। আমাকে প্রশ্ন করার সময়টুকুও দিল না। পা টিপে টিপে চোরের মত চলে গেল জাতভাইদের গুহা অভিমুখে।

আগুনের ধারে বাকলের টুকরোটা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলাম সবাই

মিলে। সাইজে এক বর্গ ফুট। ভেতর দিকে একটা লাইনে আঁকা আশ্চর্য কতকগুলো আঁকাবাঁকা দাঁড়ি চিহ্ন। হুবহু তুলে দিলাম তার প্রতিলিপি :

গাছের ছালের সাদা দিকে কাঠকয়লা দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবে আঁকা দাগগুলো দেখে প্রথমে মনে হল গানের স্বরলিপির খসড়া।

বললাম—'জিনিসটা যে গুরুত্বপূর্ণ। তা কিন্তু ওর মুখের ভাব দেখেই বুঝেছি।'

সামারলি বললেন—'আদিম ইয়ার্কিও তো হতে পারে। সব মানুষের সত্তার মধ্যেই রসিকতার প্রবৃত্তি থাকে—এটাও তাই।'

চ্যালেঞ্জার বললেন—'উঁহু, এতো দেখা যাচ্ছে একটা মানচিত্র।'

ঘাড়ের ওপর দিয়ে গলাখানা সারসের গলার মত লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে বিচিত্র দাঁড়ি চিত্র দেখতে দেখতে লর্ড জন বললেন—'ধাঁধা বলেই তো মনে হচ্ছে। দেখি! দেখি!' বলেই আচমকা হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিলেন বাকলের টুকরোটা।

বললেন সোল্লাসে—'আরে গেল যা! ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছি মনে হচ্ছে। ছোকরা কিন্তু প্রথমে ঠিকই আঁচ করেছে। এই দেখুন! কটা দাগ আছে? আঠারোটা? এবার একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবুন তো মাথার ওপর গুহা রয়েছে ক'টা? আঠারোটা! কী?'

'ছালটা হাতে দেওয়ার সময়ে কিন্তু আঙুল দিয়ে গুহাগুলো দেখিয়েছিল মারেতাস,' বললাম আমি।

'তাহলে তো হয়েই গেল। যা দেখছেন. এটা ঐ গুহাগুলোর চার্ট। কী! এক লাইনে মোট আঠারোটা গুহা। কোনোটা গভীর, কোনোটার শাখা প্রশাখাও রয়েছে। আমরাও তো তাই দেখে এসেছি, তাই না? ম্যাপ, ম্যাপ, যা দেখছেন, তা ঐ গুহাদের ম্যাপ। সব চাইতে গভীর কিন্তু দ্বিতীয় গুহাটা—বাঁদিক থেকে।'

সহর্ষে বললাম—'পর্বত প্রাচীর ফুটো করে ওপাশ পর্যন্ত পোঁছেছে বলেই বোধহয় আঙুল দিয়ে ঠিক ঐ গুহাটাই আমাকে দেখিয়েছিল মারেতাস।'

চ্যালেঞ্জার বললেন—'ছোট্ট বন্ধু দেখছি ধাঁধার সমাধান বার করে ফেলল আমাদের আগেই। মারেতাস আভাসে ইঙ্গিতে বারবার বুঝিয়েছে আমাদের মঙ্গলই সে চায়। চায় বলেই এই ছালটা হাতে তুলে দিয়ে গেছে। আর

ঐ গুহা যদি পর্বত প্রাচীর এফোঁড় ওফোঁড় না করেই থাকে তো খামোকা দেখাতে যাবে কেন? আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই তো? তাই যদি হয় তাহলে ওদিককার ফুটো দিয়ে পাহাড় বেয়ে নামতে হবে প্রায় শ-খানেক ফুট—তার বেশী নয়।'

'একশফুট!' গজগজ করে উঠলেন সামারলি। 'সর্বনাশ!'

সোল্লাসে বললাম আমি—'তাতে কী! আমাদের দড়িটাই তো একশ ফুটের চেয়ে লম্বা। সর সর করে নেমে যাবে নিচে।'

প্রতিবাদ তুললেন সামারলি—'গুহার রেডইণ্ডিয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে যাবে কি করে শুনি?'

বললাম—'অনায়াসে যাবো। কেন না, মাথার ওপরকার কোনো গুহায় কোনো রেডইণ্ডিয়ানই থাকে না, ওগুলো ওদের গোলাবাড়ী আর গুদামঘর। এখুনি গিয়ে একটু গুপ্তচরগিরি করে এলেই তো হয়।'

মালভূমিতে অ্যারোকেরিয়া জাতের একরকম গাছ আছে। নামটা অবশ্য আমাদের উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কাছ থেকে জেনেছি। এ গাছের ডাল-পালায় দাহ্যপদার্থ খুব বেশী। মশাল হিসেবে সবসময়ে ব্যবহার করে রেড-ইণ্ডিয়ানরা। চারজনের প্রত্যেকেই এই ধরনের এক-একখানা চ্যালা কাঠ সঙ্গে নিয়ে আগাছা ভর্তি সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে পৌঁছোলাম দীর্ঘতম দ্বিতীয় বিশেষ গুহাটার সামনে। কেউ নেই গুহায়—বিরাট বিরাট বাদুড় ছাড়া। সংখ্যার অগণন। ভেতরে পা দিতে না দিতেই ঝাঁকে ঝাঁকে ডানা ঝাপটে উড়তে লাগল চারপাশে। রেডইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অভিলাষ ছিল না বলেই অন্ধকারের মধ্যেই হোঁচট খেতে খেতে বেশ খানিকটা গেলাম, অনেক বাঁক নিলাম, তারপর জ্বাললাম মশাল। চমৎকার গুহা। অতি সুন্দর। শুকনো খটখটে। ধূসর দেওয়ালগুলো তেলতেলে মসৃণ। ছাদটা খিলেনের মত বাঁকানো। নেটিভরা নানারকম প্রতীকচিহ্ন এঁকে রেখেছে মসৃণ গুহাগাত্রে। পায়ের তলায় ঝিকমিকে বালি। সাগ্রহে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেলাম অনেকখানি পথ। প্রবেশ করলাম গভীরে। তারপরেই বিষম হতাশায় অস্ফুট চীৎকার করে উঠলাম প্রত্যেকেই। পথ বন্ধ। সামনেই খাড়া পাথরের দেওয়াল। ইঁদুর গলবার মত ফাঁকও নেই কোথাও। না, এ-পথে চম্পট দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধকের সামনে নিমতেঁতো মুখে এবং দমে যাওয়া অন্তরে দাঁড়িয়ে রইলাম চারমূর্তি। ভূমিকম্পে পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার এটা নয়—আসবার পথে ম্যাপল হোয়াইট চিহ্নিত গুহায় যা ঘটে-

ছিল। এ গুহা একেবারেই কানাগলি। একটা প্রান্ত নিরেট দেওয়াল দিয়ে বন্ধ।

অদম্য চ্যালেঞ্জার কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন অভয় দিয়ে—'বন্ধুগণ, ভেঙে পড়বেন না। বেলুন বানিয়ে দেব কথা দিয়েছি খেয়াল রাখবেন।'

গুড়িয়ে উঠলেন সামারলি। আচ্ছা লোক বটে!

আমি বললাম—'ভুল গুহায় ঢুকে পড়িনি তো?'

ম্যাপে আঙুল রেখে বললেন লর্ড জন—'বৃথা আশা করছো ছোকরা। বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় আর ডানদিক থেকে সতেরো নম্বর। এই সেই গুহা।'

ওঁর আঙুলটা রেখেছেন যেখানে, সেইদিকে এক ঝলক তাকিয়েই দারুণ আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'বুঝেছি। বুঝেছি। আসুন আমার সঙ্গে।'

মশাল হাতে যে-পথে এসেছিলাম, প্রায় দৌড়ে ফিরে এলাম সেই পথে। মেঝের ওপর পোড়া দেশলাই কাঠিগুলো দেখিয়ে বললাম—'এইখানে… এইখানে জ্বালিয়েছিলাম আমাদের মশাল।'

'তা তো বটেই।'

'অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে পেরিয়ে এসেছি দু-ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া গুহার আর একটা সুড়ঙ্গ। ডান দিক ধরে হাঁটলেই পাবেন এর চাইতে লম্বা গুহাটা।'

যা বলেছিলাম, দেখা গেল তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তিরিশগজ যেতে না যেতেই দেখলাম ডান দিকে দেওয়ালের গায়ে মুখ ব্যাদান করে রয়েছে একটা বিরাট কালো অন্ধকারে ঠাসা গুহা মুখ। ভেতরে ঢোকার পর দেখলাম গুহাটা আগের গুহার চাইতে অনেক বেশী বড় আর দীর্ঘ। রুদ্ধ-শ্বাসে অসীম ধৈর্যে দ্রুতচরণে এগিয়ে চললাম এইপথ দিয়েই। কয়েক-শ গজ যাওয়ার পর আচমকা দেখলাম খিলেনের মত তমিস্রার বুকে একটা কালচে লাল আলোর দ্যুতি। দাঁড়িয়ে গেলাম হতভম্ব হয়ে। বিস্ময়ে হতবাক প্রত্যেকেই। স্থির অগ্নিশিখার চাদর পাতা রয়েছে যেন সেইদিকে—সুড়ঙ্গ ছেয়ে রয়েছে, পথ আটকে রয়েছে আমাদের। তারপরেই দ্রুততর বেগে পেয়ে গেলাম সেদিকে। কোনো শব্দ নেই, কোনো উত্তাপ নেই, মোটেই দুলছে না, নড়ছে না বিরাট সেই দ্যুতিময় লাল অগ্নির আবরণ—সারা গুহায় যেন রুপোলি আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। পায়ের তলার বালি অজস্র মণি-মাণিক্যের মত ঝকমক করছে। তা সত্ত্বেও ছুটলাম দুরুদুরু বুকে এবং

অবশেষে আবিষ্কার করলাম দেওয়ালের গায়ে বৃত্তাকার একটা ছিদ্র।

বিপুল আনন্দে ফেটে পড়লেন লর্ড জন—'কী সর্বনাশ! এ যে দেখছি চাঁদ! বন্ধুগণ! পাহাড়ের দেওয়াল পেরিয়ে এসেছি—পৌঁছেছি পাঁচিলের অন্য দিকে—ঐ তো বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা।'

গুহাগাত্রের ফুটো দিয়ে বাস্তবিকই দেখা যাচ্ছে পূর্ণচন্দ্রকে। দূর থেকেই সেই আলোকবন্যারই অত রঙ আর রূপের বাহার দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। খুব ছোট্ট ফুটো—জানলার চাইতে বড় নয়—কিন্তু আমরা গলে বেরিয়ে যেতে পারব অনায়াসেই। মাথা বার করে দেখলাম পাহাড় বেয়ে নেমে যাওয়াটা খুব একটা কঠিন নয়—সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে অনতিদূরেই। নিচ থেকে ফোকরটা চোখে পড়েনি খাড়াই পাহাড় ঠিক এই জায়গাটায় এসে বাইরের দিকে বেঁকে গিয়েছে বলে। অতিবড় দুঃসাহসীও তাই পর্বতারোহণের চেষ্টা করেনি, জানবেই বা কি করে বাঁকের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এমন সুন্দর একটা প্রবেশপথ? তাই তদন্ত করে দেখে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। রজতশুভ্র চন্দ্রের পানে তাকিয়ে উল্লাসে প্রায় নৃত্য করতে লাগলাম চার অভিযাত্রী। নিচের ঐ চেনা দেশে নেমে যাওয়া এখন তো নেহাতই ছেলেখেলা দড়ির দৌলতে। আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতেই ফিরে এলাম ক্যাম্পে—জিনিসপত্র গোছগাছ আরম্ভ করলাম ঝটপট বিদেয় নেওয়ার জন্যে।

কিন্তু সবই করতে হল চুপিসারে, অতি গোপনে। কে জানে, শেষ মুহূর্তেও হয়তো বাগড়া দিয়ে বসতে পারে রেডইণ্ডিয়ানরা, জোর করে আটকে রাখতে পারে পর্বত প্রাচীর বেষ্টিত এই ভয়ংকর সুন্দর মালভূমিতে। রাইফেল আর বুলেটগুলো ছাড়া অন্যসব জিনিসপত্রই ফেলে গেলাম। চ্যালেঞ্জার কিন্তু বায়না ধরে বসলেন দুটো জিনিস তিনি সঙ্গে নেবেনই। একটা একখানা জগদ্দল মার্কা প্যাকেট—নড়াতে চড়াতে গেলে কালঘাম ছুটে যায়। আর একটা তার চাইতেও ভারী—প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল প্যাকেটকে বয়ে আনতে—কি ছিল তার মধ্যে, আপাততঃ তা গুপ্ত রহস্যই হয়ে থাক। ধীরে ধীরে দিন ফুরালো, রাত এল। রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম অবশেষে। অতিকষ্টে একটু একটু করে জিনিসপত্র তুলে আনলাম সিঁড়ির ওপর দিয়ে। গুহার সামনে চাতালে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত দেখে নিলাম বিচিত্র সুন্দর অথচ ভয়ংকর ভয়ানক সেই দেশকে যে দেশ চিরকাল আমাদের চারমূর্তির মনের মধ্যে স্বপ্নের দেশ হয়ে বিরাজ করবে—কিন্তু অচিরেই যে-দেশ ছেয়ে যাবে শিকারী আর সন্ধানী দলে—ছারখার করে দেবে এখানকার বন্য

সৌন্দর্য, তছনছ করে ছাড়বে প্রকৃতির কোলে লালিত প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময়-রাজিকে। এ-দেশকে কিন্তু আমরা কোনদিনই ভুলতে পারব না এখানকার স্বপ্নসম বিস্ময়, বিভীষিকা, রোমান্স আর রূপের জন্যে—অনেক কষ্ট সয়েছি এ দেশে, অনেক বিপদ মাথায় নিয়েছি এ দেশে, শিখেছি অনেক, দেখেছি অনেক—তাই এ-দেশ শুধু আমাদেরই দেশ হয়ে থাকবে অন্তত: আমাদের কাছে। যখনি এ-দেশ প্রসঙ্গে কথা উঠবে, আমরা বলব, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও-তো আমাদের দেশ - আমাদেরই দেশ রে—আমরি সেই আশ্চর্য দেশ! বাঁদিকের লাগোয়া গুহাগুলোর প্রতিটায় দেখলাম খুশীখুশী লালচে আলোর আঁধার-কালো দ্যুতি। অনেক নিচে সিঁড়ির তলা ছেকে ভেসে এল রেড ইণ্ডিয়ানদের হাসি আর গানের আওয়াজ। তারও ওদিকে দূর বিস্তৃত মহাবন—যে-বনের মাথার ওপর অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশাল হ্রদের দর্পণসম স্থির চিক্কণ জলরাশি—অদ্ভুত দৈত্যাকার প্রাণীকুলের জননী হয়ে থাকুক ঐ সরোবর—বিদায় ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ড, বিদায় লেক গ্ল্যাডিস—চললাম আমরা তোমাদের ছেড়ে! ঠিক সেই মুহূর্তে নিবিড় তমিস্রার মধ্যে দিয়ে অরণ্য, তৃণভূমি, উষ্ণ প্রস্রবণ, জলাভূমির ওপর দিয়ে, বহুদূর থেকে ভেসে এল উচ্চনিনাদী হ্রেষারবের মত অতিপ্রাকৃতিক বিচিত্র কোনো প্রাণীর প্রলম্বিত চিৎকার—বিদায় চেয়েছিলাম ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ড থেকে—তাই বিদায় জানাল ম্যাপল হোয়াইট ল্যাণ্ড তার নিজস্ব স্বকীয় অলৌকিক অপার্থিব কণ্ঠস্বরে। পেছন ঘুরে বেগে প্রবিষ্ট হলাম গুহার তমাল কালো তমিস্রা-পুঞ্জে।

দু-ঘন্টা পরে পুলিন্দা টুলন্দা সমেত পৌঁছে গেলাম খাড়াই পর্বত প্রাচীরের তলদেশে। চ্যালেঞ্জারের ঐ বদখৎ মালপত্র ছাড়া আর কোনো অসুবিধেই হল না। জিনিসপত্র ঐখানেই ফেলে রেখে চটপট পা চালালাম জাম্বোর ক্যাম্প অভিমুখে। ভোরবেলা পৌঁছে তাজ্জব হতে হল নতুন করে। একী! এ যে গোটা বারো ধুনি জ্বলছে জ্বলবার কথা তো একটাই—জাম্বোর ধুনি। রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল পরমুহূর্তেই। উদ্ধারকারী দল পৌঁছে গেছে। চল্লিশ ফুট চওড়া খাদের ওপর সেতুবন্ধনের জন্যে যা-যা সরঞ্জাম দরকার—সব সঙ্গে নিয়ে এসেছে নদীতীর থেকে কুড়িজন রেড-ইণ্ডিয়ান। দড়িদড়া খুঁটি—কিছু বাকী নেই। যাক, ঐ বিটকেল বোঝা-গুলো ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলাম। ওরাই হবে এখন থেকে মালপত্রের বাহক। আগামী কালই রওনা হব আমাজন অভিমুখে।

বিনীতভাবে সব্বাইকে ধন্যবাদ জানানোর মত শরীর মেজাজ নিয়ে তাই সমাপ্ত করছি এই বিবৃতি। আমাদের এই চোখগুলো দেখে এসেছে অনেক বিরাট বিস্ময়, মনপ্রাণ মার্জিত সংশোধিত পরিশ্রুত হয়েছে অনেক কিছু সহনশীলতার মধ্যে দিয়ে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু আগের চাইতেও গভীরতর অনুভূতি আর সমৃদ্ধি লাভে ধন্য হয়েছি—মানুষ হিসেবে যা ছিলাম, তার চাইতেও উত্তম মানুষ হয়ে ফিরে চলেছি। প্যারাতে পৌঁছে যদি দুদিন সবুর করতে হয়, তাহলে এ-চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দেব। আর যদি তা না হয়, যেদিন লণ্ডনে পা দেব—এ-চিঠিও পৌঁছাবে ঠিক সেই দিনই আপনার হাতে। আগেই পৌঁছোক কি হাতে-হাতেই চিঠি দিই—মাই ডিয়ার ম্যাকআর্ডল, খুব শীগগিরই আপনার সঙ্গে করমর্দনের প্রত্যাশায় রইলাম।

১৬ ॥ শোভাযাত্রা! শোভাযাত্রা!

ফেরার পথে আমাজনের বন্ধুবর্গ সাদর সম্বর্ধনা এবং বিপুল আতিথ্যের আয়োজন করেছিলেন আমাদের জন্যে। তাঁদের সহৃদয় আচরণ কোনোদিন ভুলব না। কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ থাকুক এই বিবৃতির মধ্যে। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই সিনর পেনালোসা এবং ব্রেজিল সরকারের অন্যান্য অফিসারদের। যাত্রাপথের বিশেষ বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন এঁরাই। ঋণী রইলাম প্যারা-র সিনর পেরিরা-র কাছেও। বিচক্ষণ তিনি। ভদ্রোচিত আকৃতির জন্যে যা-যা পরিচ্ছদ প্রয়োজন, আগে থেকেই ভেবেচিন্তে তা যোগাড় করে রেখেছিলেন। তা নাহলে সভ্য দুনিয়ার মানুষ আমাদের হতশ্রী উঞ্ছ চেহারা দেখে আঁৎকে উঠত নিঃসন্দেহে। ওঁরা যে পরিমাণ খাতিরযত্ন আদর আপ্যায়ন করেছেন, আমাদের তরফ থেকে তার প্রতিদান নিতান্তই নগণ্য হয়েছে মানছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিকল্প করণীয়ও তো কিছু নেই। পই-পই করে সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছি, যে-পথে আমরা গিয়ে ফিরে এসেছি, সেই পথ পরিক্রমার নতুন প্রচেষ্টায় অর্থ, সময় এবং শক্তির অপব্যয়ই হবে কেবল, খুব ভেবেচিন্তে নামধাম এমনভাবে পাল্টে দিয়েছি সুদীর্ঘ এই প্রতিবেদনে যে হাজার চেষ্টা করেও তা থেকে জায়গাটার আসল ঠিকানা উদ্ধার করা যাবে না—আশ্চর্য দেশের হাজার মাইলের মধ্যেও আসা যাবে না। আমাজন অঞ্চল পেরিয়ে আসবার সময়ে তুমুল উত্তেজনা লক্ষ্য করেছিলাম। তখন ভেবেছিলাম, উত্তেজনাটা বুঝি নিছক স্থানীয় বাসিন্দাদের হুজুগে কৌতূহল। তখন কি ছাই জানতাম, গোটা ইউরোপ চঞ্চল হয়েছে আমাদের এই দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে। হৈ-চৈ পড়ে

গেছে মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। গুজবের পর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের মত। পল্লবিত হয়েছে আমাদের অজ্ঞাত অভিযানের অভিজ্ঞতা বৃত্তান্ত—ফলে পুরো মহাদেশ জুড়ে সেকী আলোড়ন আর চাঞ্চল্য, কৌতূহল আর বিস্ময়। ইংলণ্ডের বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, এত ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ আমরা জানতাম না। জানলাম 'আইভারনিয়া' জাহাজটা যখন পৌঁছোলো সাদাম্‌টন থেকে পাঁচশ মাইল দূরে। দৈনিকের পর দৈনিক থেকে আসতে লাগল বেতার বার্তা—একটার পর একটা সংবাদ প্রতিষ্ঠান কাকুতিমিনতি করতে লাগল বিপুল অর্থের বিনিময় অভিযানের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বেতার মারফৎ তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। সেই থেকেই বুঝলাম, শুধু তাবৎ বিজ্ঞান-দুনিয়া নয়, জনসাধারণ পর্যন্ত উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে কৌতূহলে আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেদের। আমরা চারজনে কিন্তু ঠিক করেছিলাম, সংবাদপত্র মহলের কাউকেই এখন কিছু বলব না। প্রথম প্রতিবেদন পেশ করবো প্রাণীবিজ্ঞান সমিতির অধিবেশনে। তাঁরাই তো পাঠিয়েছেন আমাদের—প্রতিবেদন সর্বপ্রথম হাতে পাওয়ার অধিকার শুধু সমিতিরই। তদন্ত করতে যাঁরা পাঠিয়েছেন—তদন্তের ফলাফল তাঁদেরকে জানানোই আমাদের কর্তব্য। সাদাম্‌টনে পৌঁছোনোর পর সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরেছিল আমাদের—একটা কথাও ফাঁস করিনি। ফল যা হবার তাই হ'ল। জনসাধারণ উন্মুখ হয়ে রইল প্রাণীবিজ্ঞান সমিতির অধিবেশনের দিনটির জন্যে। সাতুই নভেম্বর মিটিং হবে—বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কাগজে কাগজে। কিন্তু এত লোককে তো সমিতির সভাকক্ষে ঠাঁই দেওয়া যাবে না। এই সভাকক্ষেই সূচনা ঘটেছিল আমাদের অভিযান পর্বের প্রথম দৃশ্যের। অভিযান অন্তে এখানেই আমাদের প্রতিবেদন পেশ করার কথা। কিন্তু পিল পিল করে লোক আসতে থাকলে তো মহামুস্কিল হবে। এটুকু তো ঘর। তখন ঠিক হল মিটিং হোক রিজেন্ট স্ট্রীটের কুইন্স হলে। সবাই জানেন, কুইন্স হলেও তিলধারণের স্থান হয়নি। অধিবেশনের উদ্যোক্তারা যদি অ্যালবার্ট হলেও মিটিং ডাকতেন, তাহলেও সব লোককে জায়গা দিতে পারতেন না। এ থেকেই বুঝবেন কি বিপুল জনসমাবেশ ঘটেছিল বহু প্রতীক্ষিত সেই নাটকীয় ঘটনাবহুল দিনটিতে।

যেদিন লণ্ডনে পৌঁছোলাম, মহতী সভার আয়োজন হয়েছিল তার পরের সন্ধ্যায়। প্রথম সন্ধ্যায় চারজনের প্রত্যেকেই ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম যে-যার অতীব গুরুত্বপূর্ণ জরুরী কাজকর্ম নিয়ে। ব্যক্তিগত বিষয় নিঃসন্দেহে। আমি ব্যস্ত ছিলাম কি বিষয় নিয়ে, তা বলার সময় এখনো হয়নি। বিষয়টা

যত তফাতে থাকে, ততই তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা এমনকি কথাবার্তা পর্যন্ত অনেক কম আবেগপূর্ণ হবে। এই আখ্যানের পুরোভাগেই পাঠকপাঠিকাদের জানিয়ে রেখেছি—আমার এই দুঃসাহসিক অভিযানের মূল উৎসটির বৃত্তান্ত। সুতরাং উপাখ্যান চালিয়ে যাওয়াই সঙ্গত হবে—ফলাফলটাও জানিয়ে দেওয়া দরকার। জানাতে আমাকে হবেই একদিন। যে শক্তির তাড়নায় এই আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নিয়েছিলাম, সেই শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব চিরকাল।

অ্যাডভেঞ্চারের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত ঘটনাবহুল মুহূর্ত-বর্ণনায় এবার আসা যাক। আটুই নভেম্বরের সাতসকালে বসে যখন আকাশ পাতাল ভাবছি ঘটনা পরম্পরার জমকালো বর্ণনা দেওয়া যায় কিভাবে, এমন সময়ে আমার চোখ পড়ল আমার নিজের পত্রিকারই সেইদিনকার সংখ্যায়। হত-ভম্ব হয়ে গেলাম আমার পরম সুহৃদ এবং সতীর্থ রিপোর্টার ম্যাকডোনার মুন্সিয়ানা দেখে। পুরো ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ লিখেছে অত্যন্ত চমক-প্রদ কায়দায়। এরকম উৎকৃষ্ট প্রতিবেদন আমার নিজের লেখনী দিয়েও বেরোতো কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাজেই শিরোনামা-টিরোনামা সমেত পুরো প্রতিবেদনটাই উদ্ধৃত করে দেওয়াটাই কি যুক্তিযুক্ত নয়? নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠানোর উচ্ছ্বাস আর অহমিকায় বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট বাড়া-বাড়িই করে ফেলেছিল পত্রিকা—এ কথা আমাকে মানতেই হবে। কিন্তু অন্যান্য বড় বড় দৈনিকগুলোও কম যায়নি—ফলাও করে এমন কাহিনী লিখেছে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উপকরণে বর্ণনায় যা গেজেট পত্রিকার সমাচারের চেয়ে কোনো অংশে কম যায়নি। বন্ধুবর ম্যাক যা লিখেছিল, এবার উদ্ধৃত করা যাক সেই চাঞ্চল্যকর বর্ণনাবহুল রিপোর্টটা:

নতুন দুনিয়া

কুইন্স হলে মহৎ মহাসভা

তুমুল হট্টগোলের দৃশ্য

অসাধারণ ঘটনা

কী সেই জিনিসটা?

রিজেণ্ট স্ট্রীটে নৈশ দাঙ্গা

(বিশেষ প্রতিবেদন)

'প্রাণীবিজ্ঞান সমিতির বহু-আলোচিত অধিবেশন অবশেষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত রাতে কুইন্স হলের বিরাট সভাকক্ষে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার গতবছর এই সমিতিরই সভায় দাবী জানিয়েছিলেন, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের অস্তিত্ব এখনো রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায়। তাঁর উক্তি যাচাই করে নেওয়ার জন্যে গঠিত হয়েছিল একটি তদন্ত কমিটি। গতকাল এই কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হল সমিতির মহাসভায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সুবর্ণ-হরফে লেখা থাকবে এই তারিখটি। কেন না, মহাসভার ঘটনাবলী এমনই অভূতপূর্ব, চাঞ্চল্যকর এবং অত্যাশ্চর্য যে উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউই তা ইহজীবনে ভুলতে পারবে না।' (আহারে, বাহারে লিপিকর ভায়া ম্যাক! তোমার খুরে খুরে প্রণাম! শুরুতেই দেখছি দানবিক বাক্যমালার অবতারণা ঘটিয়েছো!) 'নীতিগতভাবে টিকিট সীমিত রাখা হয়েছিল কেবল সমিতির সদস্যবর্গ এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে। কিন্তু শেষোক্ত শব্দটির অর্থ বড়ই ব্যাপক—যত টানা যায়, রবারের ফিতের মত ততই বেড়ে যায়! ফল যা হবার, তাই হয়েছে দেখা গেল। অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা রাত ঠিক আটটায়—কিন্তু তার অনেক আগেই তিল ধারণের জায়গা পর্যন্ত ছিল না অতবড় সভাকক্ষের কোনোখানেই। যে যেখানে পারে ঠেসেঠুসে দাঁড়িয়ে গেছে। অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়েছিল সাধারণ মানুষ। প্রবেশাধিকার না পেয়ে পৌনে আটটা নাগাদ দারুণ হামলাবাজি চালিয়েছিল প্রবেশপথে— দরজা ভেঙে ফেলে আর কি! ফলে, জখম হয়েছেন কতিপয় ব্যক্তি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এঁদের মধ্যে আছেন এইচ ডিভিশনের ইন্সপেক্টর কনল্-ও। তাঁর একটা পা ভেঙে গেছে। অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত এই আক্রমণের পর দেখা গেল, সভাকক্ষে যাতায়াতের প্রতিটি পথে লোক দাঁড়িয়ে গেছে কাতারে কাতারে। এমন কি সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত আসন পর্যন্ত বেদখল হয়ে গেছে। আনুমানিক হিসেবে প্রায় পাঁচহাজার মানুষকে উদগ্রীব হয়ে থাকতে দেখা গেল পর্যটকদের আবির্ভাবের প্রত্যাশায়। ওঁরা এসে বসলেন মঞ্চের সামনের দিকে সংরক্ষিত আসনে। আগে থেকেই অবশ্য মঞ্চ ভরে উঠেছিল শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান-পণ্ডিতদের আবির্ভাবে। শুধু এই দেশ থেকেই নয়, সুদূর ফ্রান্স এবং জার্মানী থেকেও ছুটে এসেছিলেন এঁরা। সুইডেনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রফেসর সারজিয়াস স্বয়ং— উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সুবিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী। চার বীরপুরুষের প্রবেশকালীন অভ্যর্থনার বহর দেখেই মালুম হয়েছিল দেশের মানুষ তাঁদের কি চোখে দেখছে। অসাধারণ সেই সম্মান প্রদর্শনী বাস্তবিকই তুলনা-

বিহীন। পাঁচ হাজার মানুষ একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে মিনিট কয়েক ধরে হর্ষধ্বনি আর জয়ধ্বনিতে মজবুত ইমারতখানা চৌচির করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন পর্যবেক্ষকের চোখে কিন্তু বিরামবিহীন করতালি-নির্ঘোষের মধ্যেও কিছু ভিন্নমতের প্রকাশ ধরা পড়েছিল। তাই থেকেই আন্দাজ করে নেওয়া গিয়েছিল, সভার কার্যবিবরণীতে ঐকতান নাও থাকতে পারে—সুরলালিত্যের অভাব ঘটবেই বেসুরো ঘটনার আবির্ভাবে। ফলে, সভা আরও জমে উঠবে, প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হবে। সবিনয়ে বলা যেতে পারে, ভবিষ্য-দর্শনের ক্ষমতা কারো ছিল না বলেই আগে থেকেই কেউ কল্পনাও করতে পারেনি কি ধরনের অসাধারণ উৎকণ্ঠাপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের বিপুল বন্যায় হুড়মুড় করে ভেসে যেতে হবে প্রত্যেককেই।

'চার পর্যটকের চেহারার বিবরণ দেওয়ার আর দরকার বোধ করছি না। সব ক'টা কাগজেই বেশ কিছুদিন ধরেই ছাপা হয়ে চলেছে ফটোগ্রাফ। ধকল সয়েছেন অনেক, কিন্তু তার ছাপ খুব অল্পই পড়েছে অবয়বে। আর একটু ঝাঁকালো হয়েছে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের দাড়ি, আরো তাপসিক কঠোরতা অর্জন করেছে প্রফেসর সামারলির আকৃতি, লর্ড জনের চেহারাখানা যেন আরো একটু চামড়াঢাকা অস্থিসার হয়ে উঠেছে এবং প্রত্যেকেই মাতৃভূমি ত্যাগের আগে যে দেহবর্ণ নিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন তার চাইতে আরো রোদে-জলা গাঢ় দেহবর্ণ নিয়ে। এ ছাড়া চারজনের প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য বাস্তবিকই দেখবার মত—প্রাণশক্তি যেন ফেটে পড়ছে চোখেমুখে। সুবিখ্যাত ক্রীড়াবিদ এবং আন্তর্জাতিক রাগবি ফুটবল খেলোয়াড় ই-ডি ম্যালোন মশায়ের একটা চুলও তো দেখা গেল এদিক ওদিক হয়নি—আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি বলেই বোধহয় রয়েছেন এমন বহাল তবিয়তে—জয়ধ্বনি মুখর জনতার পানে আত্মতুষ্টিতে দেদীপ্যমান কৌতুক ক্ষরিত মুখে যে ভাবে দৃকপাত করে রইলেন, তা মানায় কেবল তাঁর ঐ নির্ভেজাল, সৎ এবং ঘরোয়া মুখাবয়বেই।'
(তবে রে ম্যাক, দেখা হোক, তারপর তোমাকে নেওয়া যাবে একহাত!)

'পর্যটকদের হর্ষধ্বনি দ্বারা আপ্যায়ন করার পর শ্রোতৃমণ্ডলী আসন গ্রহণ করলেন। তখন উঠে দাঁড়ালেন চেয়ারম্যান ডিউক অফ ডারহ্যাম। অধিবেশনের উদ্বোধন ঘটিয়ে তিনি বললেন, 'বেশী সময় তিনি নেবেন না। বিরাট এই জনসমাবেশ যার জন্যে উৎকণ্ঠায় ছটফট করছে, মিনিট খানেকের মধ্যেই তা শুরু করে দেবেন। তদন্ত-কমিটির মুখপাত্র প্রফেসর সামারলি যে জয়যুক্ত হয়ে দেশে ফিরেছেন, এ-কথা তাঁর আর বলার দরকার নেই—হাজার গুজবের মারফৎ দেশের আপামর জনসাধারণ তা জেনে গিয়েছে!' (করতালি)

'শুধু জয়যুক্তই হন নি, অসাধারণভাবে সফল হয়েছে ঐতিহাসিক এই অভিযান। (আবার হাততালি) 'রোম্যান্সের যুগ ফুরিয়ে যায়নি, সত্যের সন্ধানে বৈজ্ঞানিক তদন্তে বেরিয়ে পড়লে এমন সব রোমাঞ্চকর কাহিনীর উপকরণ হাতে আসবে, যা কোনো ঔপন্যাসিক দুরন্ততম কল্পনা দিয়েও মাথায় আনতে পারবেন না। আসন গ্রহণ করার আগে একটা কথাই শুধু তাঁর বলার আছে। কঠিন এবং বিপজ্জনক কর্তব্য সম্পাদন করে বহাল তবিয়তে এই ভদ্রলোকেরা ফিরে আসায় তিনি বিলক্ষণ আনন্দিত—সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রত্যেকেই নিশ্চয় সমানভাবে আনন্দিত এ-ব্যাপারে—কেন না, অভিযানে কোনো বিপর্যয় ঘটলে প্রাণীবিজ্ঞানের অপূরণীয় ক্ষতি হতই।' (বিষম করতালি। দেখা গেল, প্রফেসর চ্যালেঞ্জারও প্রাণপণে হাততালি দিচ্ছেন।)

'উৎসাহ-উদ্দীপনার আর এক প্রস্থ বিস্ফোরণ ঘটল প্রফেসর সামারলি উঠে দাঁড়ানোর পর। উনি যতক্ষণ ভাষণ প্রদান করলেন, তার সারা সময় জুড়েই বিরাট ঘরখানা যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল মুহুর্মুহু করতালি এবং হর্ষধ্বনিতে। যেহেতু আমাদের নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতার লেখা অ্যাডভেঞ্চারের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হতে চলেছে, তাই প্রফেসর সামারলির বক্তৃতা হুবহু এখানে আর উদ্ধৃত করা সমীচান হবে না। মোটামুটি কিছু আভাস ইঙ্গিতই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। প্রথমেই উনি বর্ণনা দিলেন অভিযানের উৎপত্তি ঘটল কিভাবে। তারপর প্রগাঢ় অভিনন্দন জানালেন বন্ধুবর প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে। সেইসঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিলেন তাঁর দাবী অবিশ্বাস করার জন্যে—বন্ধুবর অবশ্য ভালোভাবেই তার শোধ তুলেছেন প্রতিটি উক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়ে। তারপর চলে এলেন যাত্রাপথের বিবরণে। কিন্তু সযত্নে গোপন করে রাখলেন সেইসব তথ্য যা ফাঁস হয়ে গেলে অত্যাশ্চর্য সেই মালভূমিতে হানা দিতে পারে দেশশুদ্ধ লোক। মূল নদী থেকে মোটামুটিভাবে খাড়াই প্রাচীরের তলদেশে কিভাবে পৌঁছোলেন, কিভাবে প্রাচীর শীর্ষে আরোহণের সকল প্রচেষ্টা বারংবার ব্যর্থ হল, কিভাবে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে পর্বতা-রোহণে সফল হলেন এবং মালভূমিতে পদার্পণ করলেন—যার ফলে প্রাণ গেল দুজন অনুগত দো-আঁশলা সঙ্গীর—রোমাঞ্চকর সেই অ্যাডভেঞ্চার এমন সুকৌশলে বর্ণনা করে গেলেন যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শ্রোতৃমণ্ডলীর।' (বলিহারি যাই সামারলিকে! ভাষণের মুন্সিয়ানা আছে বটে! দো-আঁশলা দুজনের প্রাণবিয়োগ নিয়ে তিলমাত্র কানাকানি শোনা গেল না ঘরের মধ্যে—কোনো প্রশ্নই উঠল না।)

'কল্পনার মনোরথে চাপিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রাচীর শীর্ষে পৌঁছে দিলেন সামারলি। খাদে ব্রীজ তলিয়ে যাওয়ায় শ্রোতাদেরও যেন সেখানে নির্বাসিত করলেন অপূর্ব বাচনভঙ্গী মারফৎ। তারপর ধাপে ধাপে বর্ণনা দিতে লাগলেন অত্যাশ্চর্য সেই দেশের বিভীষিকা এবং সৌন্দর্য, আতংক এবং আকর্ষণের। নিজের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে বেশী মাতামাতি করলেন না, জোর দিলেন অ্যাডভেঞ্চারের ফলে বিজ্ঞান কি পেয়েছে, তার ওপর। মালভূমির আশ্চর্য পশু, পাখী, পোকামাকড়, উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে ফিরেছে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের এই প্রতিনিধিরা—বিস্ময় সমৃদ্ধ মালভূমির মূল বিস্ময় এরাই—এই উদ্ভিদ-কীট-পশু আর পক্ষী—মস্তক ঘুরিয়ে দেওয়ার মত বিস্ময়। ফলে, সমৃদ্ধতর হয়েছে বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার। কোলিওপটেরা আর লেপিডোপটেরার অদ্ভুত সমাবেশ দেখে তিনি তাজ্জব হয়েছেন। মাত্র কয়েক হপ্তার মধ্যেই একটির ছেচল্লিশটা, অপরটির চুরানব্বইটা নমুনা সংগ্রহ করে ফেলেছেন। কিন্তু দেখা গেল, জনসাধারণের বেশী আগ্রহ বড় প্রাণীদের নিয়ে—বিশেষ করে যে সব সুবৃহৎ প্রাণীরা নাকি লোপ পেয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে। এই জাতীয় প্রাণীর বিরাট ফর্দও দাখিল করলেন প্রফেসর—সেইসঙ্গে বলে রাখলেন, খুঁটিয়ে তদন্ত করলে ফর্দের দৈর্ঘ্য আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ডজন খানেক দানবিক প্রাণীর বেশ কয়েকটিকে তাঁরা দূর থেকে দেখেছেন—বিজ্ঞান যাদের খবর রাখে, তাদের কারোর সঙ্গেই মেলে না সেইসব প্রাণীদের আকৃতি। কিন্তু একদিন না একদিন এদের যথোপযোগী শ্রেণীবিভাগ হবে এবং পরীক্ষা চালানো যাবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি একান্ন ফুট লম্বা একটা সাপের কথা বললেন—যার চামড়ার রঙ ঘন বেগুনী, অন্ধকারে স্পষ্ট ফসফরাসের দ্যুতি বিকিরণ করতে পারে এবং শ্রেণীর দিক দিয়ে সম্ভবতঃ স্তন্যপায়ী—এরকম একটা অদ্ভুত জীবের বর্ণনাও দিলেন; বিরাট কালো এক জাতীয় মথ পোকার কাহিনী বললেন যার কামড় নাকি অত্যন্ত বিষাক্ত বলে রেডইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এইসব প্রাণী ছাড়াও মালভূমি ঠাসা রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক পশুপক্ষীতে—যাদের অনেকেই বিচরণ করেছে জুরাসিক যুগের প্রথম দিকে। এইরকম একটি রাক্ষুসে প্রাণীর নাম তিনি করলেন। প্রাণীটাকে মিঃ ম্যালোন লেকের ধারে জলপানরত অবস্থায় দেখেছিলেন এবং ঠিক এই প্রাণীটার ছবি স্কেচবুকে এঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন অ্যাডভেঞ্চার-পিয়াসী সেই আমেরিকান ভদ্রলোক—অজ্ঞাত জগতে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন যিনি। প্রাণীটার নাম স্টেগোসরাস। বর্ণনা দিলেন ইগুয়ানডন আর টেরোড্যাক-

টিলেরও—এই দুটি বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রথম মোকাবিলা ওঁদের। তারপর শ্রোতৃমণ্ডলীর গায়ে কাঁটা জাগিয়ে ছাড়লেন ভয়ংকর মাংসাশী ডাইনোসরের বর্ণনা দিয়ে। একাধিকবার অভিযাত্রীদের ধাওয়া করেছিল ভয়াবহ এই জীবটি। মালভূমিতে যত প্রাণীর সম্মুখীন হয়েছিলেন—এই ডাইনোসরটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র এবং ভয়াবহ, করাল এবং নৃশংস প্রকৃতির। এরপর চলে এলেন বিরাটকায় পক্ষী ফোরোর্যাকাসদের বর্ণনায়—সেই সঙ্গে কথা দিয়ে যেন ছবি এঁকে গেলেন সুবৃহৎ এল্‌ক্‌-য়ের—যাজ যে হরিণ বিচরণ করে বেড়াচ্ছে মালভূমিতে। শ্রোতাদের উৎসাহ আর কৌতূহল পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেল যখন সেন্ট্রাল লেকের রহস্য-নিচয় একে একে মেলে ধরতে লাগলেন কথা চিত্র দিয়ে। মায়াবী সরোবরের তলদেশে অতিকায় সর্পের নিবাস আছে শুনে এবং তিন-চক্ষু দানবিক মৎস্য গিরগিটির বর্ণনা শুনে অনেকেই কিন্তু নিজের গায়ে চিমটি কেটে পরখ করে নিলেন জেগে আছেন কিনা—কিন্তু প্রফেসর সামারলি তিলমাত্র উচ্ছ্বাস বা বাগাড়ম্বর না দেখিয়ে মেপে মেপে শব্দ ব্যবহার করলেন এমন ভাবে যে অবিশ্বাস করারও তো উপায় রইল না। এরপর তিনি বললেন রেডইণ্ডিয়ানদের কাহিনী এবং বনমানুষ-বানরদের অসাধারণ কলোনী-উপাখ্যান। শেষোক্ত জীবগুলি জাভার পিথিকানথ্রপাসদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর এবং মিসিং লিঙ্ক বলতে অনুমিতি সহযোগে যে ধরনের জীবকে কল্পনায় আনা যায়—প্রায় তার কাছাকাছি। সবশেষে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের উড়ো-যান আবিষ্কারের সরস বর্ণনা দিয়ে হাসিয়ে পেটের খিল খুলে দিলেন ঘরশুদ্ধ লোকের এবং মনে রাখবার মত ভাষণ শেষ করলেন কি পন্থায় কমিটি মালভূমি থেকে সটকান দিয়ে ফিরে এসেছে সভ্য দুনিয়ায়—তার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়ে।

'এ রকম একটা নিখুঁত বর্ণনাবহুল বচনমালার পর আশা করা গিয়েছিল সভার কাজও বুঝি শেষ হল। এরপর উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সারজিয়াস বক্তাকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানিয়ে নিশ্চয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। যথাবিহিতভাবে তা সমর্থনও করা হবে এবং সমিতি তদন্ত-কমিটির প্রতিবেদনকে মেনে নেবে। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল হাওয়া বইছে অন্য দিকে—ঘটনা প্রবাহও নিশ্চয় মসৃণ ধারায় বয়ে যাবে না। বিরোধীপক্ষ যে উপস্থিত রয়েছেন সভা মধ্যে, তার স্ফুরণ ঘটছিল মাঝে মধ্যেই। ভাষণ শেষ হতেই হলঘরের ঠিক মাঝখানে উঠে দাঁড়ালেন এডিনবরার ডক্টর জেম্‌স্‌ ইলিঙওয়ার্থ। জানতে চাইলেন বিবরণী গৃহীত হওয়ার আগে একটা সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাবে কিনা।

'চেয়ারম্যান : নিশ্চয় যাবে—সে রকম সংশোধনের প্রয়োজন হলে প্রস্তাব রাখবেন বৈকি।'

'ডক্টর ইলিঙওয়ার্থ : মহামান্য চেয়ারম্যান, সংশোধনী প্রস্তাব একান্তই প্রয়োজন।'

'চেয়ারম্যান : 'তাহলে তা এখুনি উপস্থাপিত করা হোক।'

'প্রফেসর সামারলি (তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে) : 'মহামান্য চেয়ারম্যানকে জানিয়ে রাখতে চাই এই ভদ্রলোক শিশু আমার ব্যক্তিগত শত্রু। 'ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা'য় ব্যাথিবাসের আসল নাম কি হওয়া উচিত, এই নিয়ে শুরু শত্রুতার।'

'চেয়ারম্যান : 'ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা সমীচীন হবে বলে মনে করি না আমি।—বলুন কি বলতে চান।'

'অভিযাত্রীদের বন্ধুবর্গ তুমুল বাধার সৃষ্টি করায় ডক্টর ইলিঙওয়ার্থের সব কথা ভালোভাবে শোনাও গেল না। এমন কি তাঁকে টেনে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করলেন কয়েকজন। কিন্তু ভদ্রলোকের বপু যেমন বিরাট, কণ্ঠস্বরও তেমনি বজ্রগর্ভ—কাজেই হট্টগোলের ওপর গলা চড়িয়ে শেষ করলেন বক্তৃতা। ওঁর উঠে দাঁড়ানোর মুহূর্ত থেকেই কিন্তু বোঝা গিয়েছিল বন্ধু সংখ্যা তাঁর নেহাৎ নগণ্য নয়—সমর্থকও প্রচুর—যদিও সমগ্র শ্রোতার তুলনায় তাঁরা সংখ্যালঘু। জনসাধারণের বিরাট অংশকে দেখা গেল একেবারেই নিরপেক্ষ। তাই মন দিয়ে শুনছেন দুই তরফেরই বক্তৃতা।

'লর্ড ইলিঙওয়ার্থের বক্তৃতাটা শুরু হল কিন্তু প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং প্রফেসর সামারলির বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপের ভূরি ভূরি প্রশংসা দিয়ে। নিছক বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধানে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা ওঁর একটি রচনা ব্যক্তিগতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি নিরতিসীম দুঃখিত। গত অধিবেশনে প্রফেসর সামারলি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, উনিও আদতে সেই একই ভূমিকা নিয়ে এই বক্তব্য উপস্থাপিত করছেন। গত মিটিংয়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কয়েকটি দাবী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁর এই সতীর্থটি। এখন ইনিই সেই একই দাবী নিয়ে এসেছেন অধিবেশনে এই প্রত্যাশায় যে কেউ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না। এটা কি যুক্তিযুক্ত ? ('হ্যাঁ,' 'না' এবং বহুক্ষণ ধরে বাধা প্রদান—এরই মধ্যে শোনা গেল ডক্টর ইলিঙওয়ার্থকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসার অনুমতি চাইছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার চেয়ারম্যানের কাছে।) এক বছর আগে এক ব্যক্তি কয়েকটা বস্তুর কথা বলে গেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, আরও চমকপ্রদ এবং

অন্যান্য বস্তুর কথা বলছেন চার ব্যক্তি। অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক এবং অবিশ্বাস্য ধরনের এই রকম একটা বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে কি খাড়া করা যায় এই সব কথাবার্তা? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি এক অঞ্চল থেকে জনাকয়েক পর্যটক ফিরে এসে বেশ কয়েকটা গল্পকথা শুনিয়েছিলেন—ধীরেসুস্থে বিচার-বিবেচনা না করেই ঐ সব গল্পগুলোকে সত্যি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। একই হঠকারিতা দেখাতে চান কি লণ্ডন প্রাণীবিজ্ঞান সমিতিও? কমিটির সদস্যরা যে প্রশংসনীয় চরিত্রের মানুষ, তা তিনি মানছেন। কিন্তু মানুষ জীবটার প্রকৃতি বড়ই জটিল। কুখ্যাতির প্রলোভনে বিপথগামী হতে পারেন প্রফেসর দুজনও। আলোয় ডানা পতপত করতে আমরা ভালবাসি প্রত্যেকেই মথ পোকার মত। প্রতি-দ্বন্দ্বীর শিকার-কাহিনীর চাইতেও রোমাঞ্চকর শিকার-কাহিনী ফলাও করে বলে বড়াই করতে চান পাকা শিকারীও; চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন পেশ করার ফিকিরে সাংবাদিকরাও ঘটনাকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করতে ছাড়েন না। কমিটির প্রত্যেকেরই দেখা যাচ্ছে নিজস্ব মোটিভ রয়েছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াসে তাঁরা যৎপরোনাস্তি চেষ্টা তো করবেনই। ('ছিঃ! ছিঃ! কী লজ্জা! কী লজ্জা!') আক্রমণ করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর নেই। ('অবশ্যই আছে—করছেনও তাই'—আবার বাধাদান এবং তুমুল হট্টগোল।') অত্যাশ্চর্য এই গল্পগুলোর যাথার্থ্য প্রমাণের উপকরণ স্বরূপ হাজির করা হল কেবল কতকগুলো অত্যন্ত অসার বর্ণনা। কি পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে? খানকয়েক ফটোগ্রাফ—এই তো? মৌলিক কার-চুপির এই যুগে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে কি গ্রহণযোগ্য এই সব ফটোগ্রাফ? আর কি পেলাম বলুন তো? দারুণ একখানা গল্প—গল্পের প্রথম দিকে আছে বিরাট বিরাট জন্তু জানোয়ারের লোমহর্ষক বর্ণনা এবং উপসংহারে আছে মালভূমি থেকে চুপিসারে পলায়নের এবং দড়ি বেয়ে নেমে আসার ছেলেভুলোনো অ্যাডভেঞ্চার। দড়ি বেয়ে ঐ ভাবে নেমে আসতে হয়েছিল বলেই নাকি অতিকায় প্রাণীদের নমুনা আনা সম্ভব হয়নি। এখানে তা দেখানোও যাচ্ছে না। গল্পটায় মৌলিকতা আছে, কিন্তু প্রতীতি সঞ্চারে অক্ষম। ফোরোর‍্যাকাসের একটা করোটি নাকি এনেছেন লর্ড জন রক্সটন। করোটিটা উনি শুধু দেখতে চান।

'লর্ড জন রক্সটন: লোকটা আমাকে মিথ্যেবাদী বলছে নাকি? (ভীষণ চেঁচামেচি।)

'চেয়ারম্যান: চুপ! চুপ! একদম চেঁচামেচি নয়! ডক্টর ইলিঙ-

ওয়ার্থ, অনুগ্রহ করে আপনার বক্তব্যের উপসংহার টানুন এবং সংশোধনী প্রস্তাবটা সভায় রাখুন।'

'ডক্টর ইলিংওয়ার্থ: মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আরও অনেক কথা বলার ছিল আমার। কিন্তু মাথা পেতে নিলাম আপনার নির্দেশ। আমার সংশোধনী প্রস্তাবটা এই: কৌতূহলোদ্দীপক ভাষণ প্রদানের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হোক প্রফেসর সামারলিকে এবং পুরো ব্যাপারটাকে 'অপ্রমাণিত' ধরে নিয়ে আরও বড় এবং সম্ভব হলেও আরও বিশ্বস্ত তদন্ত-কমিটির হাতে অর্পণ করা হোক।'

এ-হেন সংশোধনী প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এমন হৈ-হল্লা গলাবাজি গিটকিরি আরম্ভ হয়ে গেল যে তার বর্ণনা দেওয়াও বেশ মুস্কিল। পর্যটকদের চরিত্রে এই ধরনের কলঙ্ক লেপনে শ্রোতাদের একটা বিরাট অংশ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ভিন্নমতের প্রকাশ ঘটালেন হরেকরকম চিৎকার মারফৎ—'প্রস্তাব নথিভুক্ত করবেন না! 'ফিরিয়ে নিন প্রস্তাব!' 'ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিন না মশায়!' পক্ষান্তরে, কমিটির প্রতিবেদন যাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারে নি—সংখ্যায় তাঁরা মোটামুটি অংসখ্য—তার-স্বরে সাধুবাদ এবং সমর্থন জানালেন প্রস্তাবের তরফে—'চুপ! চুপ!' 'চেয়ারম্যানকে বলতে দিন!' খুবই যুক্তিযুক্ত কথা বলেছেন!' হলঘরের পেছন দিকে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়ে গেল। মেডিক্যাল ছাত্রদের আসন সে দিকেই—দেখা গেল দমাদম ঘুসি বিনিময় ঘটছে দু-দলের মধ্যে। মহিলাদের উপস্থিতির ফলেই ব্যাপারটা মারদাঙ্গা রূপ নিল না—নইলে হতাহত হ'ত অনেকেই। আচম্বিতে বিরতি ঘটল হাতাহাতিতে, থমথমে গুঞ্জন শোনা গেল কিছুক্ষণ। তারপরেই হলঘর জুড়ে নেমে এল সূচীভেদ্য নীরবতা, চেয়ার ছেড়ে খাড়া হয়েছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, ওঁর আকৃতি এবং আচরণ এমনই অদ্ভুতভাবে নজর-কাড়া যে ভদ্রলোক এক হাত তুলে ইসারায় সবাইকে নিশ্চুপ হতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরশুদ্ধ লোক বসে পড়লেন যে-যাঁর চেয়ারে—উৎকর্ণ হয়ে রইলেন তাঁর রায়দানের প্রতীক্ষায়।

'শুরু করলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ঠিক এইভাবে—'এখানে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অনেকেরই মনে থাকতে পারে, গতবারের মিটিংয়ে আমার বক্তৃতার সময়ে ঠিক এই ধরনের নির্বোধের মত অভব্য দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন কতিপয় ব্যক্তি। সেবারের মুখ্য অপরাধী ছিলেন প্রফেসর সামারলি। এখন তিনি মার্জিত, পরিশুদ্ধ এবং অনুতপ্ত হলেও ঘটনাগুলো পুরোপুরি বিস্মৃত হওয়ার মত নয়। আজ রাতে শুনলাম সেই রকমই, এমন কি তার চাইতেও

জঘন্য অপরাধের নমুনা। এইমাত্র যেভাবে মনোভাব প্রকাশ করে বসে পড়লেন ঐ ভদ্রলোকটি, তাঁর ঐ মনোভাবের মুখের মত জবাব দিতে গেলে আমাকেও নামতে হবে ওঁর মানসিক স্তরে। মনের দিক দিয়ে সেটা বড়ই পীড়াদায়ক আমার কাছে—জ্ঞানতঃ ঐ নিম্নস্তরে নিজেকে টেনে নামানোটা যে কি ঝামেলার ব্যাপার—তা নিশ্চয় উপলব্ধি করবেন অধিকতর উন্নতমনা শ্রোতারা। যত কষ্টই পাই না কেন, তবুও তা করতেই হবে আমাকে শুধু একটাই মহৎ উদ্দেশ্যে—যদি কারোর মনের মধ্যে যুক্তি সঙ্গত কোনো সংশয় শেকড় গেড়ে বসে গিয়ে থাকে—তা উৎপাটন করা।' (প্রবল হাস্য এবং বক্তৃতায় বাধাপ্রধান।) 'একটা ব্যাপার নিশ্চয় শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার হবে না। তদন্ত-কমিটির নেতা ছিলেন বলেই আজ রাতে সামারলিকে দাঁড় করানো হয়েছে ভাষণ দেওয়ার জন্যে। তাই বলে আমার কৃতিত্ব কিন্তু কমছে না—পুরো ব্যাপারটার গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিলাম আমিই, সুতরাং যদি কোনো সুফল প্রাপ্তি ঘটে থাকে, তবে তার কৃতিত্ব আমারই প্রাপ্য। এই তিন ভদ্রলোককে নিরাপদে নির্বিঘ্নে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার পূর্ব বর্ণনা মত সেই আশ্চর্য দেশে, তারপর তো শুনলেনই কিভাবে আমার গত মিটিংয়ের বক্তৃতার প্রতিটি অক্ষরের চাক্ষুস সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করে ওঁদের সব কিছু বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছি। তখন কিন্তু ভাবতেও পারিনি ফের-বার পর আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার মত নিরেট মস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তির সম্মুখীন হতে হবে। গতবারের অভিজ্ঞতার পর একটা ব্যাপারে বিলক্ষণ হুঁশিয়ার ছিলাম আমি। মাথায় যাঁর যুক্তিবুদ্ধির ছিটে-ফোঁটাও আছে, সে রকম ব্যক্তির মনে বিশ্বাস উৎপাদন করার মত প্রমাণাদি সঙ্গে করেই এনেছি। প্রফেসর সামারলির মুখে তো শুনলেনই, বাঁদর-মানুষরা আমাদের ক্যাম্প তছনছ করার সময়ে ক্যামেরাগুলোরও দফারফা করে দিয়ে গেছে—বেশীর ভাগ নেগেটিভই নষ্ট হয়ে গেছে।' (তীক্ষ্ণ বিদ্রূপধ্বনি, ব্যঙ্গের উচ্চহাস্য, বিবিধ তাচ্ছিল্য এবং টিটকিরির আওয়াজ; পেছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বললেন—'আরেকখানা গল্প বলুন মশায়, জমেছে ভালো।') 'বাঁদর-মানুষদের কাহিনী কিছুক্ষণ আগেই শুনেছেন। এইমাত্র যে সব শব্দ আমার কানে আসছে, তা শুনে কৌতূহলোদ্দীপক সেই জীবগুলোর কথাই বড্ড বেশী করে মনে পড়ছে।' (অট্টহাসি।) 'অমূল্য অনেক নেগেটিভ নষ্ট হয়ে গেলেও এখনো আমাদের সংগ্রহে এমন সব ফটোগ্রাফ আছে যার ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায় কি-ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব টিঁকে রয়েছে সেই মালভূমিতে। ফটো নিয়েও জালিয়াতি করেছেন আমার সহযাত্রীরা, এমন অভিযোগ কি

উঠেছে?' (তারস্বরে চিৎকার—'আজ্ঞে হ্যাঁ, উঠেছে বৈকি।' দারুণ হট্ট গোল। সভাপণ্ড হবার উপক্রম, দেখা গেল, কয়েকজনকে হিড়হিড় করে টেনে বার করে দেওয়া হ'ল ঘর থেকে।) 'বিশেষজ্ঞরা তো আছেন, যখন খুশী যেভাবে খুশী নেগেটিভগুলো যাচাই করে দেখতে পারেন। কিন্তু এ ছাড়াও আর কি সাক্ষ্য প্রমাণ ওঁরা এনেছেন বলুন তো? যে পরিস্থিতিতে পালাতে হয়েছিল, সে অবস্থায় বড বড বস্তা নিয়ে তো আসা যায় না—তবে প্রফেসর সামারলির সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে বহুবিচিত্র প্রজাপতি আর গুবরে পোকার নমুনা। এদের মধ্যে অনেকগুলোই একেবারে নতুন ধরনের। এ গুলোকে কি সাক্ষ্য প্রমাণ বলা যায় না?' (বেশ কয়েকটা কণ্ঠে 'না' 'না' চিৎকার শোনা গেল।) 'না বললেন কে?'

'ডক্টর ইলিংওয়ার্থ (উঠে দাঁড়িয়ে) :'আমরা যা বলতে চাই, তা এই—নমুনাগুলো প্রাগৈতিহাসিক মালভূমি থেকে নয়, অন্য জায়গা থেকে আমদানী করা হয়েছে, এমনও তো হতে পারে?') দারুণ হাততালি—হলঘরের ছাদ ফেটে উড়ে যায় আর কী!)।

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার : 'মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানশক্তির কাছে মাথা নত করা ছাড়া উপায় দেখছি না—তবে নামটার সঙ্গে যে আমার পরিচয় নেই, তাও না মেনে পারছি না। যাক গে, ফটোগ্রাফ আর কীটপতঙ্গের সংগ্রহ যখন মনে ধরল না, তখন বড় বিচিত্র নিখুঁত কিছু তথ্য হাজির করা যাক—এগুলো নিয়ে কিন্তু সবিস্তারে আলোচনা এখনো পর্যন্ত হয়নি। যেমন ধরুন টেরোড্যাকটিলদের পারিবারিক অভ্যেস—(একটি কণ্ঠস্বর—'ফালতু বকছেন,' এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার তুমুল হট্টগোল)—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, টেরোড্যাকটিলদের পারিবারিক আচার ব্যবহার সম্পর্কে বেশ কিছু আলোকপাত করতে পারি আমরা। আমার এই পোর্টফোলিওতেই অদ্ভুত সেই প্রাণীটার এমন একখানা ছবি আছে যা দেখলে আপনাদের বিশ্বাস হবেই—'

'ডক্টর ইলিংওয়ার্থ : 'কোনো ছবি দিয়েই আমাদের কিচ্ছু বিশ্বাস করাতে পারবেন না।'

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার : 'স্বচক্ষে দেখতে চান?'

'ডক্টর ইলিংওয়ার্থ : 'বলাবাহুল্য।'

'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার : 'দেখলে বিশ্বাস হবে?'

'ডক্টর ইলিংওয়ার্থ (অট্টহেসে) : 'নিঃসন্দেহে।'

'ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ঘটল অবিস্মরণীয় সেই সান্ধ্য অধিবেশনের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা—যে ঘটনা এমনই নাটকীয়ভাবে সাড়া ফেলল

ঘরশুদ্ধ লোকের মধ্যে যার সমতুল্য নজির কোনো বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। ঐতিহাসিক সেই ঘটনা কিভাবে বিবৃত করব ভেবে পাচ্ছি না। সংকেত করার ভঙ্গিমায় হাত তুললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার— সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সতীর্থ মিস্টার ই-ডি ম্যালোন অন্তর্হিত হলেন মঞ্চের পেছন দিকে। মুহূর্ত খানেক পরেই পুনরাবির্ভূত হলেন দানবিক আকৃতির এক নিগ্রোকে নিয়ে—দেখা গেল দুজনে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে আসছেন একটা প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্স। বাক্সটার ওজন যে নেহাৎ কম নয়, তা বোঝা গেল দুজনের হিমসিম খাওয়া অবস্থা দেখে। অতিকষ্টে আস্তে আস্তে বয়ে নিয়ে এসে রাখলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের চেয়ারের ঠিক সামনে। ঘর তখন থমথম করছে অংশু নৈঃশব্দ্যে—প্রত্যেকেই উন্মুখ হয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন পরবর্তী দৃশ্য দেখবেন বলে। বাক্সর ডালাটা টেনে পাশে সরানো যায়- সেই ভাবেই একপাশে টান দিয়ে খুললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। বাক্সের ভেতরে উঁকি মেরে বারকয়েক তুড়ি দিয়ে সোহাগভরা গলায় ডাকলেন- 'সোনার চাঁদ, আয় বাবা, আয়, উঠে আয়!' সাংবাদিকদের জন্যে সংরক্ষিত আসন থেকে শোনা গেল তাঁর সেই আদর-ভরা অভ্যর্থনা। পরমুহূর্তেই কানে ভেসে এল একটা খচমচ খড়মড় শব্দ এবং একটা অত্যন্ত ভয়াবহ আর কদাকার প্রাণী ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ে বসার মত ঝাঁকিয়ে বসল বাক্সের কিনারায়। ঠিক তখনি অপ্রত্যাশিতভাবে অর্কেস্ট্রার মধ্যে দড়াম করে আছড়ে পড়লেন ডিউক অফ ডারহ্যাম। সেদিকে চেয়েও দেখল না আতংক-অবশ বিপুল জনসাধারণ। হুঁশ নেই কারোরই! ছাদের জল-নিকাশের জন্য কিম্ভূতআকারের নালি নির্মাণ করতেন মধ্যযুগীয় স্থপতিরা। উন্মাদ কোনো স্থপতি-নির্মিত বিকটতম জল-নিকাশের নালির মত ভয়াবহ সেই প্রাণীটার মুখাবয়ব। তবে এটাও ঠিক যে, বিকৃত মস্তিষ্ক কোনো স্থপতি বিকটতম কল্পনা দিয়েও অমন মুখের অনুকরণ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। খল, ক্রুর, জঘন্য, নৃশংস, কুটিল, করাল সেই মুখে দু-টুকরো জলন্ত অঙ্গারের মত জলছে দুটো কুৎকুতে রক্তবর্ণ চোখ। দীর্ঘ পাশবিক মুখখানা অর্ধেক হাঁ করে থাকার ফলে দেখা যাচ্ছিল হাঙরের দাঁতের মত ধারালো দংষ্ট্রার পর-পর দুটো সারি। কুঁজো কাঁধ জড়িয়ে আছে যেন বিবর্ণ ধূসর আলোয়ান। ছেলেবেলায় যে শয়তানকে কল্পনা করে আঁৎকে উঠতাম—এ সেই মূর্তিমান শয়তান। দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল ঘরময়। চিলের মত কে যেন চেঁচিয়ে উঠল নিঃসীম আতংকে। সামনের সারিতে উপবিষ্ট দু-জন ভদ্র-

মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন চেয়ার থেকে। মঞ্চে উপবিষ্ট প্রায় প্রত্যেককেই দেখা গেল অর্কেস্ট্রার মধ্যে আছড়ে-পড়া চেয়ারম্যানের দিকে ছুটছেন। বিপুল আতংকে দিশেহারা হয়ে যাওয়ার মহাবিপদ ঘনিয়ে এল মুহূর্তের মধ্যে। হট্টগোল বন্ধ করার জন্য প্রফেসর চ্যালেঞ্জার মাথার ওপর দু-হাত তুলে ধরতেই তাঁর হস্ত-সঞ্চালন ঘাবড়ে দিল পাশের প্রাণীটিকে। আচম্বিতে গা থেকে খুলে গেল যেন অদ্ভুত আলোয়ানটা—কর্কশ চামড়ায় মোড়া একজোড়া ডানার মত ছড়িয়ে পড়ল দু-পাশে এবং ডানা ঝাপটানি দিল ভীমবেগে। প্রাণীটির স্বত্বাধিকারী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তার পা দুটো খামচে ধরলেন বটে—কিন্তু একচুল দেরী করে ফেলায় ধরে রাখতে পারলেন না। দাঁড় থেকে ছিটকে গিয়ে দশ ফুট বিস্তৃত শুকনো, কর্কশ চামড়ার ডানা ঝটপটিয়ে আস্তে আস্তে গোল হয়ে চক্কর দিতে লাগল কুইন্স হলের মধ্যে। ঘর মাৎ হয়ে গেল একটা পচা বিকট দুর্গন্ধে। গ্যালারীতে যারা বসেছিলেন, জ্বলন্ত চোখ আর খুনে চঞ্চুর আবির্ভাব তাঁদের দিকেই ঘটছে দেখে, এমন যাচ্ছেতাই আর্তনাদ আরম্ভ করে দিলেন যে উত্তেজনায় ক্ষেপে গেল কুৎসিত ভয়াল প্রাণীটা। দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগল চর্কিপাক দেওয়ার গতিবেগ, অন্ধ ভয়ের উন্মত্ততায় বারবার ধাক্কা খেল দেওয়ালে, আছড়ে পড়ল ঝাড়বাতিতে। বিষম বিপদ আসন্ন বুঝে আত্যন্তিক মানসিক যন্ত্রণায় দু-হাত মোচড়াতে মোচড়াতে এবং মঞ্চের ওপর নাচতে নাচতে গাঁ-গাঁ করে চেঁচাতে লাগলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—'জানলাটা বন্ধ করুন না আগে! দোহাই আপনাদের—জানলাটা বন্ধ করে দিন!' কিন্তু হুঁশিয়ারিটা মুখ দিয়ে বেরোলো বড় দেরীতে। গ্যাসবাতির শেডের মধ্যে মথ পোকা যেভাবে ডানা পত পত্‌ করে অন্ধের মত বারবার আছড়ে পড়ে, সেইভাবে দেওয়ালে বারবার দমদ্দম শব্দে আছাড় খেতে খেতে অতিকায় মথ পোকার মতই যেন বেরিয়ে যাওয়ার পথটি দেখতে পেয়ে গেল ভয়াল উড়ুক্কু শয়তান। চক্ষের নিমেষে বিশাল দেহটাকে গুটিয়ে নিয়ে গলে গেল ফোকর দিয়ে এবং উধাও হয়ে গেল পরমুহূর্তেই। দু-হাতে মুখ গুঁজে ধপাস্‌ করে চেয়ারে বসে পড়লেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কিন্তু পরম স্বস্তির বিপুল দীর্ঘশ্বাসের যেন ঝড় বয়ে গেল ঘরময়—কদর্য ঘটনাটার পরিসমাপ্তি ঘটায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন পাঁচহাজার মানুষ।

'তারপর যা ঘটল, তার বর্ণনা দেওয়া যে এত দুঃসাধ্য, তা কে জানত! মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা, স্রোতের মত নেমে এল হলঘরের পেছন দিক থেকে. বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনায়

তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে মিশল সেই স্রোতে, অবশেষে প্লাবনের আকার নিয়ে অর্কেষ্ট্রা মাড়িয়ে ভেঙেচুরে তছনছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মঞ্চের ওপর এবং চার মহাবীরকে তুলে নিল মাথার ওপর।' (সাবাস ম্যাক, লিখেছো ভালই!) 'অবিচার যদিও বা কিছু হয়ে থাকে শ্রোতাদের তরফ থেকে, এখন তা সুদে আসলে উশুল হয়ে গেল। সুবিচারের মহাপ্লাবনে ভেসে গেলেন চার হিরো। কেউ আর বসে নেই—দাঁড়িয়ে উঠেছেন প্রত্যেকেই। উল্লাসমুখর নিরেট জনতা ঘিরে ধরল চার অভিযাত্রীকে। শতকণ্ঠে শোনা গেল বজ্রনির্ঘোষ—'ওপরে তুলুন। ওপরে তুলুন।' মুহূর্তের মধ্যে কামানের চার-চারটে গোলার মত জনতার মাথার ওপর দিয়ে ছিটকে গেলেন চার দুঃসাহসী। বৃথাই হাত-পা ছুড়ে উচ্ছ্বাস-উন্মত্ত জনতার খপ্পর থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন—কিন্তু চারজনকেই কষে ধরে রাখা হল সম্মান আর মর্যাদার উচ্চশিখরে। তাছাড়া, ইচ্ছে থাকলেও নামানোর জায়গা তো নেই—জনতার নিশ্ছিদ্র নিরেট ব্যূহভেদ করে ছুঁচ গলানোও তখন দুঃসাধ্য। সহস্র কণ্ঠ জিগির দিয়ে উঠল আবার—'রিজেন্ট স্ট্রীট! রিজেন্ট স্ট্রীট।' উদ্বেলিত জনতার ঠাসবুনুনি, ধীরে ধীরে প্রবাহের আকারে বয়ে গেল দরজার দিকে—চার নায়ককে মাথায় নিয়েই। বাইরের দৃশ্য আরো অসাধারণ। লাখখানেকের চেয়েও বেশী মানুষ জড়ো হয়েছে রাস্তায়। উদগ্রীব প্রতীক্ষায় ছিল এতক্ষণ—এবার ছেঁকে ধরল চারদিক থেকে। ল্যাংহাম হোটেল থেকে অক্সফোর্ড সার্কাস পর্যন্ত দেখা গেল পঙ্গপালের মত অগুন্তি মানুষ ধাক্কাধাক্কি করে চলেছে মাথা তুলে চার হিরোকে শুধু চোখের দেখা দেখবার জন্যে। হলঘরের বাইরে সমুজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতির দ্যুতিতে স্পষ্ট দেখা গেল চার দুঃসাহসীদের জনতার মাথা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে শূন্যে তুলে ধরে অভিনন্দন জ্ঞাপনের ঠেলায় তাঁদের প্রাণান্ত করে ছাড়ছেন হর্ষোন্মত্ত বন্ধুবান্ধব। সেকী অট্টরোল! আনন্দ আর সমাদরের সেকী দানবিক বিস্ফোরণ! 'শোভাযাত্রা! শোভাযাত্রা!' হাঁক শোনা গেল দিকে দিকে। নিবিড় পদাতিক সৈন্যের মত রাস্তার দু-পাশ জুড়ে জনতা এগিয়ে গেল রিজেন্ট স্ট্রীট, পলমল, সেন্ট জেম্‌স্ স্ট্রীট এবং পিকাডিলি বরাবর। লণ্ডন শহরের মাঝখানে গাড়ী ঘোড়ার স্রোত বিপর্যস্ত তো হ'লই, সেই সঙ্গে খবর এল বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ লেগেছে নানা জায়গায়, মারপিট চলেছে পুলিশের সঙ্গে ট্যাক্সিওয়ালাদের। শেষকালে মাঝরাতের একটু পরে চার পর্যটককে নামিয়ে দেওয়া হল অ্যালবেমার্লিতে লর্ড জন রক্সটনের গৃহের সামনে। আনন্দে পাগল জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনায়

আচম্বিতে গা থেকে খুলে গেল যেন অদ্ভুত আলোয়ানটা—কর্কশ চামড়ায় মোড়া একজোড়া ডানার মত ছড়িয়ে পড়ল দু-পাশে। পৃ ২৫২

তখনো তাঁটার লক্ষণ দেখা গেল না। চার পর্যটককে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়েই শুরু হল সম্মিলিত কণ্ঠে কোরাস সংগীত—'বড় খাসা মানুষ হে এঁরা!' প্রোগ্রাম শেষ হ'ল 'গড সেভ দ্য কিঙ' গেয়ে। এইভাবেই যবনিকা নেমে এল অত্যন্ত অসাধারণ একটা সন্ধ্যায়—বহুদিন এমন দৃশ্য লণ্ডন শহরের কেউ দেখেনি।'

বন্ধুবর ম্যাকডোনা চুটিয়ে লিখেছে বটে। অলংকারপূর্ণ বর্ণোজ্জ্বল হলেও প্রতিবেদন কিন্তু মোটামুটি যথাযথ। মূল ঘটনাটায় শ্রোতাদের চক্ষু-চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, ভ্যাবাচাকা খেয়ে পাগলামির চূড়ান্ত করে ফেলেছে—কিন্তু আমি, অথবা আমরা, মোটেই হতভম্ব হইনি। পাঠক পাঠিকাদের মনে থাকতে পারে, লর্ড জন রক্সটনকে বেতের ঘেরাটোপে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে টেরোড্যাকটিলদের জলাভূমির দিকে যেতে দেখে-ছিলাম এক প্রভাতে। বলেছিলেন, 'শয়তানের বাচ্চা' আনতে যাচ্ছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে উপহার দেবেন বলে। প্রফেসরের মালপত্র বইতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল আমাদের, ইঙ্গিতসহ ঘটনাটা বিবৃত করে ছিলাম প্রতিবেদনে। ফেরার পথের বর্ণনা যদি দিতাম, তাহলে লিখতাম কিভাবে শয়তানের বাচ্চাকে রোজ পচা মাছ খাইয়ে ঠাণ্ডা রাখতে হয়েছিল। খুঁটিয়ে লিখিনি প্রফেসরের ঐকান্তিক ইচ্ছায়। উনি দূরদৃষ্টি দিয়ে আঁচ করে নিয়েছিলেন এমন যুক্তিতর্কের অবতারণা ঘটতে পারে, শুধু মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণে যার সমুচিত জবাব দেওয়া যাবে না। তাই শেষ মুহূর্তে প্রতি-পক্ষকে হতচকিত করার জন্যে ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলেন—একেবারেই যাতে ফাঁস না হয়, সে বিষয়ে বিলক্ষণ হুঁশিয়ার ছিলেন।

লণ্ডন টেরোড্যাকটিলের ভাগ্যে কি ঘটেছিল, এবার তা নিবেদন করা যাক। এ ব্যাপারে সঠিক কিছু বলা যাবে না। ভয়ার্ত দু-জন মহিলার জবানবন্দী থেকে জানা গিয়েছিল কুইন্স হলের ছাদে পৈশাচিক প্রতিমূর্তির মত কয়েক ঘন্টা বসেছিল কদর্য প্রাণীটা। পরের দিন সান্ধ্য দৈনিকগুলোয় প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেল, মার্লবরো হাউসের বাইরে কোল্ডস্ট্রীম গার্ডস-য়ের প্রাইভেট মাইল্‌স্ নামক কর্তব্যরত প্রহরী অনুমতি ব্যতিরেকে প্রহরা ছেড়ে চম্পট দেওয়ায় সামরিক বিধান অনুযায়ী শাস্তি পেয়েছে। প্রাইভেট মাইল্‌স্-য়ের জবানবন্দী কিন্তু আদালতে গ্রাহ্য হয়নি। আচম্বিতে চাঁদের সামনে দিয়ে স্বয়ং শয়তানকে উড়ে যেতে দেখে রাইফেল ফেলে মল বরাবর উর্ধ্বশ্বাসে উধাও হয়েছিল সে। আদালত গ্রাহ্য না করুক, এ ব্যাপারে জোরালো আলোকপাত করার পক্ষে ঘটনাটার সরাসরি গুরুত্ব আছে

বৈকি। এরপর পাওয়া গিয়েছিল আর একটাই খবর। প্রমাণ হিসেবে যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওলন্দাজ জাহাজ 'এস-এস ফ্রিজল্যাণ্ড' য়ের লগবুকে লেখা আছে ঘটনাটার লোমহর্ষক বিবরণী। পরের দিন সকাল নটা নাগাদ স্টার্ট পয়েন্ট থেকে মাইল দশেক দূরে দেখা গিয়েছিল বিকটাকার একটা জীব নক্ষত্র বেগে উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। উড্ডুক্কু ছাগল আর দানবিক বাদুরের সংমিশ্রণ বলা যায় সেই বিভীষিকাকে। বাড়ী ফেরার সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে যদি মাতৃভূমি অভিমুখে রওনা হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে ধূ-ধূ আটলান্টিকের কোথাও সলিল সমাধি ঘটেছে সর্বশেষ ইউরোপীয় টেরোড্যাকটিলের।

এবার আসা যাক গ্ল্যাডিস-য়ের প্রসঙ্গে—আমার প্রাণাধিকা সেই গ্ল্যাডিস! রহস্যমন্দির মায়াময় হ্রদের সেই গ্ল্যাডিস—সে লেকের নামকরণ আর তার নামে হবে না—লেকের নাম থাকবে সেন্ট্রাল লেক। আমি অন্ততঃ তাকে অমর করে রাখব না আমার রচনার মাধ্যমে। ওর প্রকৃতিতে নিঠুর রেখা বরাবর দেখেছিলাম। প্রেমাস্পদকে মৃত্যু অথবা বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা কি দুর্বলপ্রেমের লক্ষণ নয়? তার মন রাখতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম অজানার উদ্দেশে ঠিকই, মনের সংগোপনে কিন্তু ঠাঁই নিয়েছিল ওর প্রকৃতস্বরূপ। ওর ঐ সুন্দর মুখশ্রীর আড়ালে মনের অতলে ছিল নিশ্চয় চরম স্বার্থপরতা আর অস্থির-চিত্ততার যুগল ছায়া-তমিস্রা...আমি কি তা টের পাইনি বলতে চান? কিন্তু মন থেকে বারবার ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছি অস্বস্তিকর সেই চিন্তাকে—এখন তা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। বীরোচিত চোখ ঝলসানো কীর্তি ও কি নিছক মহৎ উদ্দেশ্যেই মনে প্রাণে চেয়েছিল? একজনকে বলি দিয়ে তার গৌরবে নিজে গৌরবান্বিত হওয়ার প্রয়াস কি পরিস্ফুট হয়নি আচার আচরণে, গালভরা বড়বড় কথাবার্তায়! নিজের গায়ে আঁচড়টি না লাগিয়ে আর একজনের সর্বনাশ ঘটিয়ে নিজের নাম কেনার প্রচেষ্টা কি নয় এটা? নাকি ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বৃথাই এই জ্ঞানোদয়? এই চিন্তা ভাবনা? আমার জীবনে এতবড় মানসিক আঘাত আর পাইনি। ফলে ক্ষণেকের জন্যে ছিদ্রান্বেষী হয়ে গিয়েছিলাম। এক হপ্তা কেটে গেছে সেই ঘটনার পর—লর্ড জন রক্সটনের সঙ্গে স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের পর কে জানে কপালে আমার আরও কত দুর্ভোগ লেখা আছে।

দু চার কথায় বলা যাক ব্যাপারটা। সাদামিটনে পৌঁছে কোনো টেলিগ্রাম বা চিঠি না পেয়ে সেই রাতেই স্ট্রেটহ্যামের ছোট্ট বাড়ীটায় দশটা নাগাদ হাজির হয়েছিলাম শংকিত চিত্তে—বুক ধড়াশ ধড়াশ করছিল—না জানি কি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনতে হবে। বেঁচে আছে তো গ্ল্যাডিস? না,

মারা গেছে ? যার সামান্য খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য জীবন বিপন্ন করে পাড়ি জমিয়েছিলাম, তার হাসিভরা মুখ, বাহ্‌বা আর দু-বাহুর আলিঙ্গনে নিজেকে বেঁধে ফেলার স্বপ্ন তখন উড়ে গেছে মস্তিষ্ক থেকে। কল্পনা পর্বতের উচ্চ শিখর থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছি বাস্তব মর্ত্যের প্রান্তরে। তাহলেও কে জানে আবার হয়ত উধাও হতে পারি রোম্যান্স-আপ্লুত মেঘলোকে। বাগানের পথ বেয়ে ধেয়ে গিয়ে দরজায় টোকা মারতেই ভেতরে শুনেছিলাম গ্ল্যাডিসের গলা। বিস্ফারিত চক্ষু চাকরাণীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে ঢুকে পড়েছিলাম বসবার ঘরে। পিয়ানোর পাশে ঢাকা দেওয়া ল্যাম্পের তলায় নিচু কেদারায় বসেছিল গ্ল্যাডিস। তিন লাফে গোটা ঘর পেরিয়ে গিয়ে দু-হাতে তুলে নিয়েছিলাম ওর দুটি করকমল।

বলেছিলাম উল্লাস অবরুদ্ধ কণ্ঠে—'গ্ল্যাডিস! গ্ল্যাডিস!'

বিস্ময়ভরা মুখ তুলে আমার পানে চেয়েছিল গ্ল্যাডিস। একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম ওর চোখেমুখে। চোখের ভাব, কঠিন চাহনি, দৃঢ়সংবদ্ধ অধরোষ্ঠ—সবই নতুন ঠেকেছিলো আমার চোখে। হাত টেনে নিয়েছিল আমার মুঠো থেকে।

'কি ব্যাপার ?'

'গ্ল্যাডিস! ব্যাপার কি আমিও তো বুঝছি না! তুমি তো আমার সেই গ্ল্যাডিস—তাই নয় কি ? গ্ল্যাডিস হাঙ্গারটন ?'

'না। গ্ল্যাডিস পট্‌স্‌। এসো, আলাপ করিয়ে দিই স্বামীর সঙ্গে।'

জীবন জিনিসটা যে এমন উদ্ভট হয়, এ অভিজ্ঞতারও আমার দরকার ছিল বইকি! যন্ত্রবৎ মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করে, করমর্দন করলাম ছোটখাট আকারের লাল-চুলো যে মানুষটির সঙ্গে, হাতল চেয়ারে গুটিসুটি মেরে এত-ক্ষণ ঢুকে বসেছিল সে—যে চেয়ারের পবিত্রতা সংরক্ষিত ছিল কেবল আমার ব্যবহারের জন্যেই। সবিনয়ে দেঁতো হাসি হেসে দুজনে ওঠানামা করলাম দুজনের সামনে।

গ্ল্যাডিস বললে—'এখানেই থাকতে বলেছেন বাবা আপাততঃ। আমাদের বাড়ীর ব্যবস্থা হয়ে এল বলে।'

'তাই নাকি!' বললাম আমি।

'প্যারা-তে আমার চিঠি পাও নি ?'

'না, কোনো চিঠিই পাইনি।'

'খুবই দুঃখের কথা। চিঠি পেলে সব পরিষ্কার হয়ে যেত।'

'পরিষ্কার তো হয়েই গেল।'

'উইলিয়ামকে তোমার সব কথাই বলেছি। কোনো গোপনতা নেই আমাদের দুজনের মধ্যে। খুবই দুঃখিত। কিন্তু তুমি যদি আমাকে এখানে একলা ফেলে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে যাও, এ ছাড়া আর কোনো পথ ছিল কী? মেজাজ খিঁচড়ে গেল না তো?'

'একেবারে না। এবার চলি, কেমন?'

'একটু নাস্তা করে গেলে হয় না?' বলল ছোটখাট মানুষটা। তারপরেই বললে যেন দারুণ-গোপন-কথা-বলার ভঙ্গিমায়—'এই রকমই তো ঘটে জীবনে। বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন থাকলে অবশ্য ব্যাপারটা অন্য রকম হত,' বলে হেসে উঠল আকাট মূর্খের মত। আমি পা বাড়ালাম দরজার দিকে।

চৌকাঠ পেরিয়েই আচমকা একটা ফ্যানট্যাসটিক তীব্র আবেগের উন্মাদনা পেয়ে বসল আমাকে। ছিটকে ফিরে এসে দাঁড়ালাম সফল প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে। ঘাবড়ে গেল লোকটা। ভয়ে ভয়ে চাইতে লাগল ইলেকট্রিক কলিংবেলের দিকে।

'একটা প্রশ্ন আছে। জবাব দেবেন?' শুধোলাম আমি।

'জবাব দেবার মত হলে নিশ্চয় দেব।'

'বাজিমাৎ করলেন কি করে বলুন তো? গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিলেন কি? কুমেরু অথবা সুমেরু আবিষ্কার করেছেন? বোম্বেটেদের নাকানি-চোবানি খাইয়েছেন? নাকি ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পেরিয়েছেন? কি এমন চোখ ধাঁধানো রোম্যান্সের কাজ করলেন যার ফলে কিস্তিমাৎ করে ফেললেন?'

অসহায় চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল লোকটা। শূন্যগর্ভ, সামান্য মুখাবয়বে লক্ষ্য করলাম কেবল সহৃদয়তার অভিব্যক্তি।

বললে অবশেষে—'ব্যাপারটা একটু বেশী রকমের ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে না?'

গলা চড়িয়ে বললাম—'তাহলে শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দিন। কি করেন আপনি? পেশা কী?

'আইনজ্ঞের কলমপেষা কেরানী আমি। ৪১ নম্বর চ্যান্সারি লেনের জনসন অ্যাণ্ড মেরিভেল কোম্পানীর দু-নম্বর কর্মচারী।'

'শুভরাত্রি!' বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলাম রাতের অন্ধকারে। ভগ্নহৃদয় সব নায়কের মতই বিষণ্ণ অন্তরের গরম কড়ার মধ্যে যেন একসঙ্গে টগবগ করে ফুটতে লাগল হাসি, রাগ আর দুঃখ।

আর একটা দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েই ইতি টানব এই কাহিনীতে। গতরাতে লর্ড জন রক্সটনের ঘরে নৈশ আহার করেছিলাম চার কমরেড। ধূমপান

করতে করতে সদ্য-সমাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে কত কথাই হল নিজেদের মধ্যে। পরিবর্তিত পরিবেশে বহু-পরিচিত মুখ আর চেহারাগুলো দেখে বেশ অদ্ভুত লাগছিল কিন্তু। অধস্তন ব্যক্তিদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে কেউকেটা মুখচ্ছবি নিয়ে বসে রয়েছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। চোখের পাতা অর্ধেক ঝুলে রয়েছে চোখের ওপর। চাহনিতে সেই অসহ্য উদ্ধত অভিব্যক্তি। মারমুখো দাড়ি ঠেলে আছে সামনের দিকে। সামারলিকে কানুনের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন। বিশাল বক্ষদেশ উঠছে আর নামছে হাপরের মত। খাটো ব্রায়ার পাইপখানা দাঁতে কামড়ে চ্যালেঞ্জারের প্রতিটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে চলেছেন সামারলি সাগ্রহে। বিতর্কের তালে তালে নাচছে ক্ষীণ গোঁফের রেখা আর ছাগুলে দাড়ি। রোদে জলা তামাটে মুখখানা সামনে বাড়িয়ে ধরে সমানে তর্ক করে যাচ্ছেন চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে। সবশেষে ঐ তো বসে রয়েছেন গৃহস্বামী মশায়। এবড়োখেবড়ো ঈগল-মুখের শীতল, সুনীল, হিমবাহ-সদৃশ চক্ষু যুগল চিক্‌চিক্ করছে অন্তস্তলের পাযণ্ডতা আর কৌতুকবোধে—ফুর্তিবাজ উনি চিরকালই—চরম বিপদের সামনে যেমন, গৃহের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও তেমনি! বন্ধুবর্গের সর্বশেষ চিত্রটিই মনের মধ্যে করে নিয়ে এসেছিলাম সেদিনকার সেই নৈশ আহারের পর। লর্ড জন রক্সটনের কি যেন বলবার ছিল। গোলাপী দ্যুতিতে মায়াময় অগণিত জয়ের স্মারকচিহ্নে ঠাসা নিজস্ব কক্ষেই কথাটা বলতে চেয়েছিলেন বলেই এই নৈশ-আহারের আয়োজন। আলমারী থেকে একটা পুরানো চুরুটের বাক্স এনে রাখলেন আমাদের সামনে টেবিলের ওপর।

বললেন—'ছোট্ট একটা ব্যাপার আছে। আগেই বলা উচিত ছিল—কিন্তু নিশ্চিন্ত না হয়ে বলব না ঠিক করেছিলাম। অযথা আশায় নাচিয়ে তারপর নিরাশায় রাস্তায় বসিয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এখন আর আশা নয়—ঘটনা রাখলাম আপনার সামনে। টেরোড্যাকটিলদের বাসা যেদিন আবিষ্কার করেছিলাম, সেদিনকার সব কথা মনে পড়ে? কী? জমির দিকে চাইতেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। আপনাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়, তাই বলছি। জিনিসটা একটা আগ্নেয়গিরির নির্গমন পথ—নীল কাদায় ভর্তি।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন প্রফেসর দুজন।

'এই পৃথিবীতে শুধু একটা জায়গাতেই এরকম নীলচে কাদাভর্তি আগ্নেয়-নির্গমন পথ দেখেছিলাম। কিমবার্লির বিশাল ডি বীয়ার্স হীরক-খনিতে—কী? তাহলেই দেখুন, জায়গাটা দেখামাত্র মাথার মধ্যে হীরের

চিন্তা ঢুকে পড়েছিল। জঘন্য জীবগুলোর আঁচড়ানি কামড়ানি থেকে গা বাঁচানোর জন্যে বেতের ঘেরাটোপ বানিয়ে নিয়ে খন্তা হাতে সারাদিন কাটিয়েছিলাম পরমানন্দে। ফলে, যা পেলাম—তা এই।'

চুরুটের বাক্স টেবিলের ওপর উপুড় করে ধরলেন লর্ড জন রক্সটন। খটাখট শব্দে ঠিকরে পড়ল বিশ থেকে ত্রিশটা এবড়ো খেবড়ো পাথর—সাইজে মটরশুঁটি থেকে আরম্ভ করে চেস্‌নাট বাদামের মত।

'ভাবছেন নিশ্চয় আগে বলা উচিত ছিল আপনাদের। হয়ত তাই ছিল। কিন্তু আমি জানি সাইজ যাই হোক না কেন, এ জাতীয় পাথরের দাম নির্ভর করে রঙ আর ঘনত্বর ওপর। তাই বোকা বনতে চাইনি। লণ্ডনে পা দিয়েই স্পিন্‌ক্‌-য়ে এক জহুরীর কাছে নিয়ে গিয়ে মোটামুটি ভাবে কাটিয়ে দামটা জানতে চেয়েছিলাম।'

পকেট থেকে একটা বড়ির কৌটো বার করে উপুড় করলেন টেবিলের ওপর। ঝকঝকে সুন্দর একটা হীরে ঠিকরে পড়ল টেবিলে। এমন অপূর্ব পাথর জীবনে খুব কমই দেখেছি।

'জলাভূমিতে অভিযানের এই হল আমাদের লাভ,' বললেন লর্ড জন রক্সটন। 'জহুরীর হিসেব অনুযায়ী সব কটা পাথরের মোট দাম দু'লক্ষ পাউণ্ড। চারভাগ হবে আমাদের মধ্যে। না, না, কোনো কথাই শুনব না। চ্যালেঞ্জার, কি করবেন আপনার পঞ্চাশ হাজার নিয়ে?'

চ্যালেঞ্জার বললেন—'আপনার বদান্যতা নিয়ে যদি নেহাৎই পীড়াপীড়ি করেন তো বলব, ঐ টাকায় একটা প্রাইভেট মিউজিয়াম বানাবো। এ স্বপ্ন আমার অনেক দিনের।'

'সামারলি, আপনি কি করবেন?'

'শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়ে চক জীবাশ্মর চূড়ান্ত শ্রেণী বিভাগ করব।'

'আমার বখরাটা ব্যয় করব আর একটা অভিযানের পেছনে—প্রাণাধিক মালভূমিটাকে আরো ভালো ভাবে দেখে আসব ঠিক করেছি। ছোকরা, তুমি নিশ্চয় বিয়ে-থা করে সংসারী হবে?' বললেন লর্ড জন।

ক্লিষ্ট হেসে বললাম—'এখন না। যদি আপত্তি না করেন তো আপনার সঙ্গেই যাবো।'

একটি কথাও আর বললেন না লর্ড জন রক্সটন। টেবিলের ওপর দিয়ে বাদামী হাতখানা শুধু বাড়িয়ে ধরলেন আমার পানে। □

ডিসইনটিগ্রেসন মেশিন

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মেজাজ আজ একেবারেই ঠিক নেই। পড়ার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, দরজার হাতলে হাত রেখেই শুনতে পেলাম তাঁর উচ্চনিনাদী কণ্ঠের সারা বাড়ী কাঁপানো স্বগত-ভাষণ :

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই নিয়ে দুবার ২৬ নাম্বার বলতে হয়েছে। দ্বিতীয় ফোনটা এসেছে আজ সকালে। কি ভেবেছেন আপনি? টেলিফোন হাতে নিয়ে কোথা-কার কে এক ইডিয়ট আমার মত একজন বিজ্ঞান সাধকের সাধনায় সমানে বিঘ্ন ঘটিয়ে চলবে? আর যেই বরদাস্ত করুক, আমি করব না। ম্যানেজারকে ডাকুন —এখুনি। কি বললেন! আপনিই ম্যানেজার? ম্যানেজার হয়েছেন তা ম্যানেজ করেন না কেন? একটা জিনিস তো খুব ভালই ম্যানেজ করেছেন দেখছি— আপনার মাথায় যে বস্তু কস্মিনকালেও ঢুকবে না—সেই রকম একটা দরকারী কাজ থেকে আমার মনটাকে সরিয়ে আনতে পেরেছেন। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দিন। নেই? তা তো থাকবেনই না। ফের যদি অন্যের টেলিফোন এখানে আসে, আদালতে টেনে নিয়ে যাব আপনাকে—এই বলে দিলাম। মুরগীর কোঁকর-কোঁ কানের ওপর একটা অত্যাচার—এই মর্মে এর আগে রায় দিয়েছে আদালত। আমি নিজে একবার সে মামলা জিতেছি। মুরগীর কোঁকর-কোঁ যদি অত্যাচার হতে পারে—টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং-ই বা হবে না কেন? পরিষ্কার মামলা। লিখে ক্ষমা চাইতে হবে। ঠিক আছে। ভেবে দেখব। গুড মর্নিং।'

ঠিক এই মুহূর্তে বুক ঠুকে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। খুবই খারাপ সময়ে ঢুকলাম। কপালে আজ অনেক দুর্গতি আছে দেখছি। রিসিভার নামিয়ে সেই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর—আমি গিয়ে পড়লাম একদম সামনে— রেগে আগুন সিংহের খপ্পরেই পড়লাম বলতে পারেন। প্রকাণ্ড দাড়ির চুল-টুল খাড়া হয়ে গিয়েছে, হাপরের মত বুকটা উঠছে আর নামছে বিদারুণ রাগে। কটমটে, ক্রুদ্ধ, উদ্ধত, ধূসর চোখে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করলেন এমন ভাবে যে দেখেই প্রমাদ গণলাম। বুঝলাম, সামনে পেয়ে ঝালটা ঝাড়বেন আমার ওপরেই!

'হদ্দকুঁড়ে শয়তানের দল! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মাইনে নিচ্ছে, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা!' শুরু হয়ে গেল কড়িকাঠ কাঁপানো তর্জন গর্জন—'নালিশ করছি, তখনও কিনা হাসি! কান আমার খাড়া—সব শুনেছি। ষড় করে আমাকে উত্যক্ত করার মতলব। গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মত তুমিও

এসে গেছো সকালটা নষ্ট করতে। কি দরকারে আসা হয়েছে জানতে পারি? নিজের দরকারে, না আবার ইন্টারভিউ নেওয়ার মতলবে? মাথা-মোটা বসটা আবার পাঠিয়েছে বুঝি? ছাখো ছোকরা, বন্ধুর মত এ বাড়ীতে একশ বার এসো—কিছু বলব না। কিন্তু খবরের কাগজের কাজ নিয়ে এলে তাড়িয়ে দেব দূর দূর করে।'

আমি শুনছি আর পাগলের মত পকেট হাতড়াচ্ছি। ম্যাকআর্ডলের চিঠি আর হাতে ঠেকছে না। আচমকা আবার কি যেন মনে পড়ে গেল চ্যালেঞ্জারের। মেজাজ আরো খারাপ করার মত ব্যাপার নিশ্চয়। ভীষণ ভ্রূকুটি করে টেবিলের কাগজ হাঁটকে টেনে বার করলেন খবরের কাগজ থেকে কাটা একটা খবর।

আমার নাকের ডগায় নাড়তে নাড়তে বললেন বজ্রনাদ কণ্ঠে—'রাত-জেগে লেখা তোমার ঐ ছাইপাঁশের মধ্যে কষ্ট করে আমার নামটা ঢুকিয়ে অশেষ উপকারের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। সোলেন-হোফেন স্লেটস-য়ে সম্প্রতি আবিষ্কৃত সরীসৃপদের জীবাশ্ম সম্পর্কে নির্বোধের মত উল্টোপাল্টা অনেক কিছুই লিখেছ। একটা প্যারাগ্রাফ শুরু করেছ এইভাবে: প্রফেসর জি.ই. চ্যালেঞ্জার যিনি কিনা এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম—'

'হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে?' চোখমুখ ভয়ংকর হয়ে উঠল চ্যালেঞ্জারের। 'কি হয়েছে মানে? আমি যা, তার চাইতে খাটো করে দেখানোর অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? বিশেষণগুলোর মধ্যে ঈর্ষার গন্ধ পাচ্ছি কেন? ফলাও করে খুব তো লিখেছো তারা নাকি আমার সমান—ক্ষেত্রবিশেষে আমার চাইতেও বড়!'

'শব্দ-চয়ন খুবই ভুল হয়েছে। ও ভাবে না লিখে লেখা উচিত ছিল—এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।' সঙ্গে সঙ্গে ঘাট মানলাম আমি। বললাম মন থেকেই, মন যোগাবার জন্যে নয়। ওষুধ ধরল সঙ্গে সঙ্গে। পালটে গেল পট। গেল শীত, এল বসন্ত।

'মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড, সম্মানটা গায়ের জোরে আদায় করছি, তা যেন ভেব না। তবে কি জানো, কুঁদুলে লড়াকু সতীর্থরা ঘিরে আছে আমাকে—বাধ্য হয়ে তৈরী থাকতে হয় পাল্টা মার মারবার জন্যে। নিজেকে জাহির করা আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি। কিন্তু কেউ আমার পিণ্ডি চটকে সরে পড়বে, সেটি হতে দিচ্ছি না। যাকগে! বসো, বলো, কেন এসেছ?'

সন্তর্পণে এলাম কাজের কথায়। জানি তো চ্যালেঞ্জারকে! সিংহমূর্তি

ধরতে পারেন যে কোন মুহূর্তে—আবার সিংহনাদ শুরু হলেই গেছি। কাজটা আর হবে না।

তাই ম্যাকআর্ডলের চিঠিটা বার করে খুলতে খুলতে বললাম—'পড়ে শোনাবো? সম্পাদক ম্যাকআর্ডলের চিঠি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', মনে পড়েছে। লোক খুব খারাপ না—জাতটা খারাপ হলেও লোকটা ভাল।'

'আপনার সম্পর্কে ওঁর ধারণা খুব উঁচু। ভীষণ শ্রদ্ধা করেন। গোলমেলে তদন্তে দুর্লভ জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন হলেই আপনার শরণ নিয়েছেন একাধিকবার। এটাও সেই ধরনের একটা ব্যাপার।'

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে। তোষামোদে বরফও গলে। চ্যালেঞ্জার তো কোন ছার। মেজাজটা ভিজে তুলতুলে হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। টেবিলে কনুই রেখে, গরিলা হাতদুটি যুক্ত করে, উদ্গত দাড়ি উর্ধ্বে তুলে বিশাল দুই চোখের ওপর চোখের পাতা আধখানা নামিয়ে এমনভাবে চাইলেন আমার পানে যে নিমেষ মধ্যে নতুন করে প্রমাণিত হয়ে গেল মানুষটার মহৎ গুণের শেষ নেই। উনি বর্বর, কিন্তু ঢের বেশী বদান্য।

'পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছেন আমাকেই :

'শ্রদ্ধেয় সুহৃদ প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে এখুনি দেখা করে নিম্নলিখিত ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা কর। হ্যাম্পসটেডের হোয়াইট ফ্রায়ার্স ম্যানসনে থিয়োডোর নেমর নামে একজন লাটভিয়ান ভদ্রলোক থাকেন। একটা অদ্ভুত মেশিন আবিষ্কারের কথা বলে বেড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। মেশিনটা সত্যিই নাকি অসাধারণ। আওতার মধ্যে থাকলে যে কোন বস্তুকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। যে কোন পদার্থ অনুপরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যেতে পারে। পদ্ধতিটা উল্টো দিকে চালিয়ে আবার তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতেও পারে। শুনে মনে হতে পারে বাড়িয়ে বলছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে মিথ্যে নয়, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সত্যিই একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন ভদ্রলোক।

'মেশিনটা যে এ-যুগের চেহারা পালটে দিতে পারে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তা না বললেও চলে। সাময়িকভাবে যুদ্ধ-জাহাজ বা সৈন্যদলকে অ্যাটম বানিয়ে রাখতে পারবে যে রাষ্ট্র, পৃথিবীটা পদানত থাকবে তারই। তাই এ ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত এখুনি দেখা দরকার সামাজিক স্বার্থে—রাজনৈতিক স্বার্থে। লোকটা আবিষ্কারটা বিক্রি করতে ব্যগ্র, তাই প্রচার-পাগল। কাজেই সাক্ষাৎ পেতে অসুবিধে

হবে না। এই সঙ্গে একটা কার্ড দিলাম—দেখালেই দরজা খুলে যাবে। আমার ইচ্ছে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে তুমিই যাও লোকটার বাড়ী। আবিষ্কারটা খুঁটিয়ে দেখ। তারপর মেশিনটার গুরুত্ব নিয়ে চিন্তা-উন্মেষক প্রবন্ধ লেখো গেজেটে। আজ রাতেই খবর চাই! —আর ম্যাকআর্ডল।'

চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে বললাম—'হুকুম হয়েছে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। সত্যিই তো, আমার দৌড় আর কদ্দূর বলুন? এ ব্যাপারে আমি একা গেলে হালে পানি পাব না। আপনাকে আসতেই হবে।'

প্রসন্ন কণ্ঠে চ্যালেঞ্জার বললেন—'খাঁটি কথাই বলেছো, ম্যালোন! বুদ্ধির ঘাটতি যদিও তোমার নেই, তাহলেও যা বললে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে এ তদন্ত তোমাকে দিয়ে হবে না। সকালটা এমনিতেই মাটি হয়েছে টেলি-ফোনের ঐ জঘন্য লোকগুলোর অত্যাচারে—কাজটা শেষ করতেও পারলাম না। কি কাণ্ড জানো? ইটালির ঐ জোচ্চোর মাজোটিকে মুখের মত জবাব দিচ্ছিলাম—নিরক্ষীয় উইপোকার শূককীট বুদ্ধি নিয়ে গালগল্প ছাড়া বার করে দিচ্ছিলাম—বাগড়া দিল টেলিফোনের উৎপাত। যাকগে, ভণ্ডটার মুখোশ রাত্রে খুলব 'খন। আপাততঃ বলো কি করতে হবে।'

এইভাবেই শুরু হল আমার আশ্চর্য জীবনের আর একটি অত্যন্ত অসামান্য অভিজ্ঞতা। অক্টোবরের সেই সকালে চ্যালেঞ্জারকে নিয়ে চেপে বসলাম পাতাল রেলে—নক্ষত্রবেগে ধাবিত হলাম উত্তর লণ্ডন অভিমুখে।

এনমোর গার্ডেন্স অভিমুখে রওনা হওয়ার আগেই শাপশাপান্ত-জর্জরিত টেলিফোন মারফৎ জেনে নিয়েছিলাম ভদ্রলোক বাড়ীতেই আছেন এবং জানিয়ে দিয়েছিলাম—আমরা আসছি। শুধু জানিয়ে দিয়েছিলাম না বলে বলা উচিত সাবধান করে দিয়েছিলাম—কেন না প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মত মানুষ-গরিলাকে নিয়ে কোথাও যাওয়া মানেই তো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটানো। যাই হোক, গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেখলাম ভদ্রলোক থাকেন হ্যাম্পস্টেডের একটা পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাটে। কার্ড পাঠানোর পরেও আমাদের বসতে হল আধঘন্টা। পেছনের ছোট্ট একটা ঘরে শুনলাম তাঁকে অনর্গল কথা বলতে। কথা বলছেন একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে। তাদের গলা শুনে বুঝলাম, রাশিয়ান। আধ ঘন্টা পরে দর্শনার্থীদের হল ঘরে নিয়ে গিয়ে বিদায় দিলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ঝলকে দেখে নিলাম চেহারাগুলো। কৃতকর্মা কমুনিস্টদের মতই খানদানি বুর্জোয়া চেহারা। চকচকে টপ-হ্যাট, ঘন কুঁচকোনো ভেড়ার লোমের অ্যাসট্রাকেন কোটকলার, রীতিমত সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান চেহারা। হল-ঘরের দরজা বন্ধ হতেই হন হন করে আমাদের ঘরে ঢুকলেন থিওডোর

নেমোর। চোখের সামনে এখনো ভাসছে সেই মূর্তি। রোদ্দুর পড়েছে মুখে। শীর্ণ লম্বা দুহাত ঘষতে ঘষতে কান এঁটো করা হাসি হেসে ধূর্ত হলুদ চোখে নিরীক্ষণ করছেন আমাদের দুজনকে।

লোকটা মাথায় খাটো, ভারী চেহারা। দেহের কোথায় একটা বিকৃতি আছে, কিন্তু ঠিক কোনখানে তা বলা মুস্কিল। কুঁজহীন কুঁজো বলাও চলে। মুখটা বড়, নরম তুলতুলে—যেন একতাল জলমাখা ময়দা। রঙটাও সেইরকম। চামড়া ভিজে-ভিজে। মুখ বোঝাই বিস্তর ব্রণ, ফুস-কুড়ি এবং যেচেতার দাগ—পাণ্ডুর পটভূমিকায় আরও কদাকার দেখাচ্ছে। চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মত এবং বেড়ালের খাঁটা-গোঁফের মতই সরু লম্বা গোঁফ রাখা হয়েছে ভিজেভিজে, লালা-গড়ানো, শিথিল মুখবিবরের ঠিক ওপরে। দেখলে গা ঘিন ঘিন করে—অতি নীচ মনোবৃত্তির সব লক্ষণই সেখানে পরিস্ফুট। কিন্তু বালি রঙের ভুরুজোড়ার পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে অত্যাশ্চর্য করোটির খিলেন। এরকম উন্নত ললাট আমি খুব একটা দেখিনি। চমকপ্রদ সেই মাথায় খাপ খেতে পারে শুধু একজনেরই টুপি—চ্যালেঞ্জারের। থিওডোর নেমোরের মুখের নিচের দিকে নীচ, হীন, ষড়যন্ত্রকারীর ছাপ—কিন্তু ওপরের দিকটা দেখলেই প্রত্যয় হয় যে বিশ্বের তাবৎ চিন্তাশীল, দার্শনিকদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য পুরুষ।

মখমল-মসৃণ কণ্ঠে ক্ষীণ বিদেশী উচ্চারণে বললেন—'জেন্টলমেন, আপনারাই টেলিফোন করেছিলেন? নেমোর ডিসইনটিগ্রেটর সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে আসছেন না তো?'

'মোটেই না, আমি গেজেট পত্রিকার সংবাদদাতা। ইনি প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।'

'নামটা বিখ্যাত—ইউরোপের সবাই জানে,' বলতে বলতে বৈষ্ণব-বিনয়ে ঝলসে উঠল হলদে শ্বদন্ত। 'কথাটা জিজ্ঞেস করার কারণ আছে। বৃটিশ সরকারের হাত ফস্কে আমার আবিষ্কার এখন অন্য হাতে চলে গেছে। ঠিক করেছিলাম, আগে যে আসবে তাকে দেব। দেরী করেছে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট। পস্তাতে হবে শীগগিরই। পস্তাবে গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্য। নিচ্ছে যারা তাদের আপনারা পছন্দ করবেন না জানি—কিন্তু দোষটা আপনাদেরই।'

'সিক্রেট বিক্রি করে দিয়েছেন?'

'যে দাম হেঁকেছি, সেই দামেই বেচেছি।'

'যারা কিনছে, যন্ত্রটার সর্বস্বত্ব একা তারাই ভোগ করবে?'

'বলা বাহুল্য।'

'কিন্তু অন্যেও তো জানে আবিষ্কারের গুপ্ততত্ত্ব?'

'আজ্ঞে না, কেউ জানে না,' বলে বিশাল ললাটে টুসকি মারলেন থিওডোর নেমোর। 'আবিষ্কারের মূল চাবিকাঠি লুকানো আছে এই সিন্দুকে—ইস্পাতের সিন্দুকের চাইতেও তা নির্ভরযোগ্য। ইয়েল চাবির চাইতেও অনেক দামী চাবি দিয়ে এ সিন্দুক বন্ধ থাকে—সিক্রেট খোলা যাবে কি করে? অন্যে যা জানে তা ভাসা ভাসা। পুরো সিক্রেটটা কেউই জানে না—আমি ছাড়া। দুনিয়ার শুধু একজনই বিরাট এই আবিষ্কারের আসল সিক্রেট মাথায় মধ্যে নিয়ে বসে আছে—ছিটেফোঁটাও পড়ে নেই কোথাও।'

'যাদের বিক্রি করলেন—তারা কিন্তু জানে।'

'মোটেই না। টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে দেব, অত বোকা ভাববেন না। টাকা পেলেই এ সিন্দুক তাদের।' বলে ফের টুসকি মারলেন ললাটে—'যা খুশী করুক—আমার তা নিয়ে চিন্তা নেই। পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে তৈরী হবে তারপর থেকেই। আমি কিন্তু পয়সা নিয়ে খালাস—নিষ্ঠুর, নির্মম, নির্দয়ভাবেই শেষ হবে আমার দায়িত্ব।' কান-এঁটো করা হাসি এবার যেন নেকড়ের হাসিতে পরিণত হল। পরম তৃপ্তিতে দু'হাত ঘষতে লাগলেন থিওডোর নেমোর।

এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কথা না বললেও মুখে ফুটে উঠেছিল থিওডোরের প্রতি অপরিসীম বিতৃষ্ণা। চ্যালেঞ্জারের মুখটা এমন ধাতু দিয়ে গড়া যে মুখের কোন ভাবই সেখানে গোপন থাকে না। থিওডোর নেমোরকে দেখেই যে তাঁর হাড়পিত্তি জ্বলে গিয়েছে, মুখের রেখায় তাই তা পরিস্ফুট।

এবার বাড়ী কাঁপানো গলায় বললেন—'মাপ করবেন। জিনিসটা আদৌ আলোচনা করার মত বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সেটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এ-নিয়ে কথা বলার কোনো দরকার আছে কি? এই তো সেদিন একজন জোচ্চোর খুব লম্বা লম্বা কথা বলেছিল। অনেক দূর থেকে মাইন্‌স্ ফাটিয়ে দেওয়ার কলকব্জা নাকি তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল লোকটা পয়লা নম্বরের ঠগ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। বিজ্ঞানের সাধনায় আমার কিছু অবদান আছে, সে তত্ত্ব আপনার অজ্ঞাত নয়। একটু আগেই তাই বললেন, ইউরোপের সবাই চেনে আমাকে—যদিও

আমেরিকাতেও এরকম সুনাম আর একখানা নামের মধ্যে পাবেন কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞান ঘাঁটাঘাঁটি করি বলেই বলছি, পদে পদে হুঁশিয়ার থাকাটাই প্রকৃত বিজ্ঞানীর লক্ষণ। আগে প্রমাণ দেখান, তারপর লম্বা লম্বা কথা বলুন।'

হলুদ চোখে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন নেমোর। কিন্তু বিনয়-ক্ষরিত চটচটে হাসিটা আরো ছড়িয়ে পড়ল এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত—'আপনার নাম যশের উপযুক্ত কথাই বলেছেন, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। শুনেছি আপনাকে ঠকানো যায় না। দুনিয়ার সবাই ঠকতে পারে—আপনি বাদে। কাজেই যন্ত্রের কার্যকারিতা হাতে কলমে দেখিয়ে দেব। তার আগে মূলসূত্র সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নিই।

'বুঝতেই পারছেন এক্সপেরিমেন্টের খাতিরে যা বানিয়েছি, তা একটা নিছক মডেল। আকারে ছোট হলেও স্বল্প আওতার মধ্যেই কাজ দেয় চমৎকার। আপনাকে অ্যাটমে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে আবার সেই অ্যাটমের সংশ্লেষণ ঘটিয়ে আপনাকে ফিরিয়ে আনা নেহাতই ছেলেখেলা এই মডেল যন্ত্রের কাছে। অবশ্য যন্ত্র যারা কিনেছে, তাদের উদ্দেশ্য অন্য। কোটি কোটি মুদ্রা ঢালছে বিদেশী রাষ্ট্র—নিশ্চয় আপনাকে ভেঙেচুরে অ্যাটম বানানোর জন্যে নয়। ছোট্ট খেলনার মত এই মডেলকেই যখন বড় আকারে বানানো হবে—তখন আর খেলনা থাকবে না। একই শক্তিকে বিরাট আকারে প্রয়োগ করলে যে ঘটনা ঘটবে তা দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।'

'মডেলটা দেখতে পারি?'

'শুধু দেখতেই পাবেন না, আপনার নিজের শরীরের ওপরেই অকাট্য প্রমাণ হাতে হাতে পাবেন—যদি সে সাহস আপনার থাকে।'

'যদি মানে?' সিংহনাদ করলেন চ্যালেঞ্জার। 'ঘোর আপত্তি জানাচ্ছি আপনার 'যদি' কথাটায়। বাজে কথা একদম বলবেন না।'

'আরে, আরে, আমি কি একবারও বলেছি আপনার সাহস নেই? নিজের শরীরের ওপর দিয়েই যন্ত্রটার ক্ষমতা যাচাই করে নেওয়ার একটা সুযোগ আপনি পাচ্ছেন—তার আগে কয়েকটা কথা বলব। সব বস্তুই যে সব নিয়মের অধীন—কথাটা সেই নিয়ম নিয়ে।

'কিছু কৃস্ট্যাল আর লবণজাতীয় জিনিস আছে যাদের জলে রাখলে গুলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন, চিনি। তখন জল দেখে বোঝাও যায় না যে তার মধ্যে কিছু আছে। আবার যদি সেই জলটাকে ফুটিয়ে বাষ্প করে উড়িয়ে দেওয়া হয়—গুলে থাকা বস্তুগুলো ফের দেখা যায়। ঠিক এইভাবে

আপনার ঐ জীবন্ত দেহটাকে বিশেষ কোন পদ্ধতি দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মিশিয়ে দেওয়া কি যায় না? পদ্ধতিটাকে উল্টো দিক শুরু করলে আবার কি আপনাকে ফিরিয়ে আনা যায় না?'

'আদর্শ মিথ্যে হিসেবে দৃষ্টান্তটা মন্দ নয়,' জোর দিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার। 'দেহের পরমাণুকে ব্রহ্মাণ্ডে মিলিয়ে দেওয়ার মত ভাঙচোর করার শক্তি থাকলেও থাকতে পারে, একথা তর্কের খাতিরে মেনে নিয়েও বলব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়া সেই পরমাণুগুলোকে ফের এক জায়গায় বসিয়ে আস্ত দেহটাকে আবার খাড়া করার কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই।'

'আপত্তি যুক্তিযুক্ত। জবাব একটাই—প্রতিটা অ্যাটমকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় যার-যার জায়গায়। অদৃশ্য কাঠমোর মধ্যে যার যেখানে জায়গা—ঠিক খাপে খাপে বসে যায় সেইখানেই। ইঁট দিয়ে কাঠামো ভরাট করার মত। হাসছেন? হাসুন। কিন্তু হাসি এখুনি মিলিয়ে যাবে, প্রফেসর। পালাবার পথ পাবে না আপনার অবিশ্বাস।'

চ্যালেঞ্জার বৃষস্কন্ধ ঝাঁকিয়ে বললেন—'টেস্টের জন্যে আমি তৈরী।'

'আর একটা ব্যাপার শুনুন। প্রাচ্যের জাদুবিদ্যা আর প্রতীচ্যের গুপ্ত-বিদ্যায় 'অ্যাপোর্ট' বলে একটা শব্দ আছে। অলৌকিক ভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় যে কোন জিনিস। ব্যাখ্যা একটাই—জিনিসটা অণুপরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে ইথারের মধ্যে দিয়ে আসে নতুন জায়-গায়—খাপে খাপে বসে যায় অদৃশ্য কাঠামোর নিজের নিজের জায়গায়। যে দুর্দমনীয় নিয়মের তাড়নায় এ কাণ্ড ঘটে, সেই নিয়মের অধীনে থেকে মেশিন দিয়ে একই কাণ্ড ঘটানো যায়।'

'একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারকে আর একটা অবিশ্বাস্য ঘটনার উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মিস্টার নেমোর, আপনার 'অ্যাপোর্ট তত্ত্ব আমি মানি না, আপনার যন্ত্র আবিষ্কারও বিশ্বাস করি না। আমার সময়ের দাম আছে। হাতে-নাতে যন্ত্রের ক্ষমতা যদি দেখাতে চান, তাহলে ভূমিকা রেখে লেগে পড়ুন।'

'তাহলে আসুন পেছনে পেছনে,' বলে পেছনের দরজা দিয়ে সিঁড়িতে পা দিলেন থিওডোর নেমোর। কয়েক ধাপ নেমেই একটা বাগান। তারপর একটা বার-বাড়ী। দরজায় তালা ঝোলানো। তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন থিওডোর।

দেখলাম, একটা মস্ত ঘর। সাদা চুনকাম করা। কড়িকাঠ দেখা যাচ্ছে না তামার তারে। ঝালরের মত ঝুলছে অসংখ্য তার। এককোণে থামের

ওপর বসানো একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের সামনে একটা মস্ত তিনপলা কাঁচ—প্রিজ্‌ম্‌। চওড়ায় এক ফুট, লম্বায় তিনফুট। ডানদিকে একটা চেয়ার—দস্তার মঞ্চে বসানো—মাথায় ভার্নিশ করা তামার টুপি। অগুন্তি তার বেরিয়ে এসেছে টুপি আর চেয়ার থেকে। পাশে একটা খাঁজকাটা চাকার মত বস্তু। প্রতিটি খাঁজে একটি করে সংখ্যা লেখা। শূন্য চিহ্নিত খাঁজে আটকে রয়েছে একটা হাতল—রবার দিয়ে মোড়া।

হস্ত সঞ্চালনে আজব যন্ত্র দেখিয়ে বললেন অদ্ভুত আবিষ্কারক—'এই সেই নেমোর ডিসইনটিগ্রেটর। নিলয় যন্ত্র। ভুবনবিখ্যাত হতে চলেছে দুদিন পরেই—কাঁপিয়ে ছাড়বে বহু সিংহাসন—পতন ঘটবে বহু সরকারের—শক্তির ভারসাম্য উল্টে যাবে সারা দুনিয়ায়। বিপুল সেই শক্তির ধারক এই মেশিন এবং আমিই তার স্রষ্টা। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, একটু আগেই বেশ অশোভন ভাবে মেশিন সম্পর্কে অনেক কটূক্তি করেছেন—সৌজন্যের ধার ধারেন নি। নতুন শক্তির ক্ষমতাটা কি নিজের শরীরের ওপর যাচাই করবেন? চেয়ারে বসবেন? সাহস থাকলে বসুন।'

সাহসের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জার সিংহবিশেষ—খোঁচা খেলে ক্ষিপ্ত। উল্কাবেগে ধেয়ে গেলেন চেয়ারে বসবার জন্যে। ঝাপটে ধরলাম আমি।

'না। আপনার যাওয়া হবে না। আপনার জীবনের দাম অনেক। ভয়ংকর ঝুঁকি নিচ্ছেন। ফিরে যে আসবেন তার গ্যারান্টি কি? চেয়ার দেখে তো মনে হচ্ছে সিঙ-সিঙের ইলেকট্রিক চেয়ার—মৃত্যুদণ্ডের যন্ত্র।'

'তুমি সাক্ষী রইলে—সেই আমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। বেচাল দেখলেই ক্যাঁক করে চেপে ধরবে। মরে-টরে গেলে নরহত্যার দায়ে কোর্টে টেনে নিয়ে যাবে।'

'তাতে বিজ্ঞানী-মহল কি খুশী হবে? অনেক কাজ এখনো বাকী—সে কাজ আপনি ছাড়া কেউ পারবে না। না, আমি আগে যাব। যদি দেখেন সব ঠিক—গায়ে আঁচড়টি লাগে নি—আপনি যাবেন।'

নিজের বিপদে সন্ত্রস্ত হন না চ্যালেঞ্জার, কিন্তু টনক নড়ে হাতের কাজ অসমাপ্ত থাকবে শুনলে। তাই দ্বিধায় পড়লেন। সেই ফাঁকে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে গেলাম, ঝপ করে বসে পড়লাম ভয়ংকর সেই চেয়ারে। দেখলাম, হাতলে হাত দিলেন থিওডোর। ক্লিক আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে গেল মুহূর্তের জন্য, চোখের সামনে দেখলাম কুয়াশা। পরক্ষণেই অপসৃত হল কুয়াশা যবনিকা। দেখলাম, থিওডোরের স্পর্ধিত হাসি আর পাশেই চ্যালেঞ্জারের ব্যাদিত বদন—আপেলের মতন লাল গাল দুটোয় রক্ত একদম

নেই—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন আমার পানে।

'কি হল, চালান মেশিন?' বললাম আমি।

'চালানো হয়ে গেছে,' অমায়িক কণ্ঠ থিওডোরের। 'খুব ভাল ফল দেখা গেছে আপনার ওপর, এবার প্রফেসরের পালা—যদি রাজী থাকেন।'

বৃদ্ধ বন্ধুকে এভাবে বিচলিত হতে কখনো দেখিনি। লৌহ-কঠিন স্নায়ু যেন গুঁড়িয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে আমার হাত ধরে বললেন—'কি সাংঘাতিক কাণ্ড! ম্যালোন, সত্যিই তুমি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে! কুয়াশার মত কি একটা ভাসছিল কিছুক্ষণ।'

'কতক্ষণ? মানে, অদৃশ্য হয়েছিলাম কতক্ষণ?'

'দু' তিন মিনিট তো বটেই। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম—লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, ভয়ের চোটে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, আর বুঝি তোমায় দেখব না। তারপর কট্ করে আবার একটা আওয়াজ হল—নতুন খাঁজে হাতল লাগাতেই ফিরে এলে তুমি। অবিকল আগের তুমি—খালি যা একটু ঘাবড়ে গেছো। ও গড, কি আহ্লাদই না হচ্ছে দেখে!' রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন চ্যালেঞ্জার।

ত্যাঁদোড় আবিষ্কারক কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—'কি হল? থাক ছেড়ে গেল নাকি? বসবেন না?'

শুনে জোর করে মন থেকে ভয় তাড়ালেন চ্যালেঞ্জার এবং প্রচেষ্টাটা প্রকট হল চোখে মুখে। পা বাড়ালেন সামনে, আমি হাত দিয়ে আটকালাম। হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গিয়ে বসলেন চেয়ারে। হাতলটা ঠেলে দিলেন থিওডোর—কট করে তিন নম্বর খাঁজে আটকাতেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জার।

নির্ঘাত আঁৎকে উঠতাম—কিন্তু সামলে নিলাম অপারেটর ভদ্রলোক তিলমাত্র বিচলিত হন নি দেখে।

'ইন্টারেস্টিং,' বললেন থিওডোর। 'ভাবুন দিকি এই মুহূর্তে এই বিল্ডিং-য়ের কোন এক জায়গায় প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব পারমাণবিক মেঘ হয়ে শূন্যে ভাসছে। উনি এখন আমার খপ্পরে। জীবন নির্ভর করছে আমার করুণার ওপর। ইচ্ছে করলে ঐ অবস্থাতেই রেখে দিতে পারি অনন্তকাল—পৃথিবীর কোন শক্তিই ফিরিয়ে আনতে পারবে না।'

'আমি বাধা দেব।'

বিনয়ক্ষরিত হাসিটা আবার নেকড়ের হাসি হয়ে গেল—'আপনি কি ভাবেন আমি তা ভাবিনি? কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো। প্রফেসর

চ্যালেঞ্জার গলে মিলিয়ে গেছেন শূন্যে—ভাবতে পারেন ? ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হয়েছেন চিরকালের মত—চিহ্নটি পর্যন্ত রেখে যান নি। কী ভয়ংকর ! কী ভয়ংকর ! যাবার সময়ে একটু ভাল ব্যবহার যদি করে যেতেন ! একটু ভদ্রতাও যদি দেখাতেন। তাই একটু শিক্ষার দরকার ওঁর—'

'খবরদার—'

'আরে মশায়, মেশিনের আর একটা ক্ষমতা হাতেনাতে দেখে যান। আমি দেখেছি, চুলের কম্পনতরঙ্গ জ্যান্ত দেহের অন্য সব কিছুর কম্পনতরঙ্গ থেকে একেবারে আলাদা। তাই ইচ্ছে করলে জ্যান্ত দেহে চুল নতুন করে লাগাতে পারি, বাদ দিতেও পারি। বুঝলেন ব্যাপারটা ? কাগজে ছুটিয়ে প্রবন্ধ লেখবার মালমসলা পেয়ে যাবেন এখুনি। আমি দেখতে চাই, রোঁয়া ছাড়া ভালুকটাকে দেখায় কেমন। এই দেখুন !'

কট্ করে শব্দ হল হাতলের। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন চ্যালেঞ্জার। কিন্তু এ কোন্ চ্যালেঞ্জারকে দেখছি ! এ যে কেশর-কাটা পশুরাজ ! দেখেই রাগের চোটে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল তিড়বিড়িয়ে—একি বাঁদরামি প্রফেসরকে নিয়ে ! সেই সঙ্গে পেল প্রচণ্ড হাসি। সেকি হাসি ! দুর্লভ সেই দৃশ্য দেখে পেট ফেটে হাসি এল আমার—হাসির ধাক্কায় জল এসে গেল চোখে।

চ্যালেঞ্জারের প্রকাণ্ড মাথা এখন আঁতুড়ে শিশুর মত কেশহীন—চিবুক মেয়েদের মত মোলায়েম। গুচ্ছ গুচ্ছ দাড়ি উধাও হওয়ায় ঝুলে-পড়া ভীষণ চওড়া মাংসল চোয়ালটাকে মনে হচ্ছে বুলডগের চোয়াল। মল্লবীরের মত মারকুটে চেহারা—শূকরের মত থ্যাবড়া চওড়া চোয়ালটা মার খেয়ে খেয়ে যেন থেঁৎলে, তেউড়ে, বেঢপ।

আমার অট্টহাসি অথবা থিওডোরের কুচুটে হাসি দেখে কিনা জানি না, মাথায় হাত দিলেন চ্যালেঞ্জার। পরমুহূর্তেই বুঝলেন মাথা মুখের কি দশা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হুংকার ছেড়ে এক লাফে গিয়ে পড়লেন থিওডোরের ওপর এবং টুঁটি টিপে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেঝের ওপর। প্রফেসরের আসুরিক শক্তির খবর রাখি বলেই আঁৎকে উঠলাম—আর রক্ষে নেই ! নির্ঘাৎ খুন হয়ে যাবেন থিওডোর।

গলা ফাটিয়ে বললাম—'করছেন কি ! মেরে ফেললে আপনার চুল-দাড়ি যে জীবনে ফিরে পাবেন না !'

যুক্তি মনে ধরল চ্যালেঞ্জারের। রেগে উন্মাদ হয়ে গেলেও যুক্তি বিচারের ক্ষমতা উনি কখনো হারান না। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে গলা

টিপে ধরে টেনে তুললেন বেচারী থিওডোরকে। বাঘের মত চেঁচিয়ে বললেন—'পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি চুল-দাড়ি না ফিরে পাই, টুঁটি টিপে ধরে বিট্‌কেল বডি থেকে প্রাণটাকে বার করে ছাড়ব বলে দিলাম।'

চ্যালেঞ্জার যখন রেগে ফুটতে থাকেন, তখন তাঁর সঙ্গে তর্ক করা নিরাপদ নয়। বুকের পাটা যার অসীম, তাকেও কেঁচোর মত কুঁচকে সরে আসতে দেখেছি ঐ মূর্তির সামনে। থিওডোর নেমোর সে তুলনায় কিছুই নয়। পক্ষান্তরে, বুকের পাটা বলে কোন বস্তুর তিলমাত্র লক্ষণ এসে পর্যন্ত চোখে পড়েনি। কিন্তু এখন যা দেখলাম, তা আরো শোচনীয়। লোকটার মুখের রঙ এমনিতে পাণ্ডুর—এই মুহূর্তে তা মাছের পেটের মত ফ্যাকাসে—তার ওপর ব্রণ, ফুস্কুরি পর্যন্ত রঙ পাল্টানোয় দেখাচ্ছে অতি কদাকার। হাত পা কাঁপছে থরথরিয়ে, অঁ-অঁ চীৎকার ছাড়া আওয়াজ বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে।

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে অবশ্য বললেন অতি কষ্টে—'আপনি যেন কি প্রফেসর! ঠাট্টাও বোঝেন না! বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এ রকম নির্দোষ ঠাট্টা-ইয়ার্কি কি খুবই দোষের? তার জন্যে মারধরের দরকার ছিল কি? আপনি চেয়েছিলেন মেশিনটার ক্ষমতা পুরোপুরি যাচাই করবেন—আপনার ওপর দিয়েই দেখাচ্ছিলাম ক্ষমতাটা। বিশ্বাস করুন, জব্দ করার মতলব আমার নেই!'

উত্তরে চেয়ারে গিয়ে বসলেন চ্যালেঞ্জার।

বললেন—'ম্যালোন, নজর রেখো—বেচাল দেখলেই ধরবে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'দেরী কেন? ফিরিয়ে দিন দাড়ি গোঁফ। ঠিক আগের মত।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বেচারী আবিষ্কারক। পুরোদমে চালু হয়ে গেল যথাস্থানে চুল ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি। এক মুহূর্ত পরে দেখলাম চ্যালেঞ্জার আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসেছেন। আবার দাড়ির জঙ্গলে আর চুলের বোঝায় গাল আর মাথা ভরে উঠেছে। সস্নেহে দাড়িতে হাত বুলোলেন চ্যালেঞ্জার। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে মাথাতেও হাত দিলেন। সব ঠিক আছে দেখে প্রসন্ন মুখে ধীর পদে নেমে এলেন চেয়ার থেকে।

'মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে আপনার নিজের জীবনটাই যে যেতে বসেছিল মশায়। বড্ড বেশী ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন। যাই হোক, আপনার কথা বিশ্বাস করলাম—ইয়ার্কি করেন নি, যন্ত্রের শক্তি দেখাচ্ছিলেন। এখন

কয়েকটা সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর চাই। প্রশ্নগুলো যন্ত্রের শক্তি সম্পর্কে।'

'শক্তির উৎস কি, সেই প্রশ্ন বাদে সব প্রশ্নের উত্তর দেব। ওটাই আমার সিক্রেট।'

'এ সিক্রেট আপনি ছাড়া কেউ জানে না বলছিলেন—সত্যি?'

'আঁচ করতেও পারবে না—জানা তো দূরের কথা।'

'আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টরা জানে নিশ্চয়?'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট-ফ্যাসিস্ট্যান্ট আমার নেই। কাজের সময়ে আমি একা।'

'বলেন কি! শক্তিটার সত্যতা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আর নেই। কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগ কিরকম হতে পারে বুঝতে পারছি না।'

'বললাম তো এটা একটা মডেল। একই নক্সার বড় প্লান্ট বানানো কঠিন কিছু নয়। দেখেই বুঝেছেন নিশ্চয়, মডেলের শক্তি বইছে ওপর থেকে নিচে—নিচ থেকে ওপরে। কারেন্ট ওপরে যাচ্ছে—নিচে নামছে—মাঝখানে এমন একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে যার মধ্যে গিয়ে আপনি অ্যাটম ভেঙে যাচ্ছেন, আবার সেই অ্যাটম আগের মত জোড়া লেগে যাচ্ছে। ওপর নিচে না করে পাশাপাশি শক্তি প্রবাহও সম্ভব। ফলাফল একই হবে। জমির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় কারেন্ট ছুটবে—কারেন্টের তীব্রতার অনুপাতে মাঝখানের ব্যবধান ঠিক করতে হবে।'

'যেমন? উদাহরণ দিন।'

'ধরুন, যন্ত্রের মেরু দুটো রাখা হয়েছে দুটো জাহাজে। মানে দু'জাহাজে রইল বিপরীতধর্মী দুই শক্তি। মাঝখানের অক্ষরেখা বরাবর ফাঁকা জায়গাটায় যুদ্ধ-জাহাজ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে অণু হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এক দঙ্গল সৈন্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখা যাবে।'

'এই সিক্রেটই আপনি ইউরোপের একটিমাত্র রাষ্ট্রকে বেচেছেন? যন্ত্র প্রয়োগের ক্ষমতা কেবল তাদেরই থাকবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা থাকবে। কথা দেওয়া হয়ে গেছে, এখন টাকা হাতে পেলেই এমন ক্ষমতা তারা হাতে পাবে যা কল্পনা করার ক্ষমতাও অন্য রাষ্ট্রের নেই। যোগ্য হাতে পড়লে এ-যন্ত্র যে কি ভেল্কি দেখাবে তা ভাবতেও পারছেন না। দরকার মত অস্ত্র ধরতে পেছপা যাঁরা হন না—এমনি শক্তিমান রাষ্ট্রের হাতেই থাকা চাই এ যন্ত্র। ফলটা হবে সাংঘাতিক! অপূর্ব!' বলতে বলতে ক্রূর তৃপ্তিতে চকচক করে উঠল হস্দ চক্ষু—কুটিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখময়—'কল্পনা করুন, লণ্ডন শহরের দু'দিকে বসানো হয়েছে যন্ত্রের দুই অংশ। বিপুল হারে কারেন্ট প্রবাহের ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে। তারপরের

দৃশ্যটা ভাবতে পারেন?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন নেমোর—'টেমস উপত্যকায় ক্ষুর দিয়ে চেঁচে কামালে যা হয়—ঠিক সেই দৃশ্য! অপূর্ব! অপূর্ব! পিঁপড়ের মত লাখ লাখ মেয়ে, পুরুষ, শিশু পিল পিল করছে যে শহরে—নেই তাদের একজনও! হাঃ হাঃ হাঃ!'

আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। সবচেয়ে ভয় পেলাম লোকটার উল্লাস দেখে—পৈশাচিক আনন্দ যেন বিমূর্ত হচ্ছে বলার ধরনে! প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠছে বিকট মনোবৃত্তি। আমি আঁৎকে উঠলেও প্রফেসর চ্যালেঞ্জার দেখলাম নির্বিকার। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, বরং যেন মজাই পেলেন। মুচ'কি মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন থিওডোর নেমোরের।

বললেন—'অভিনন্দন রইল। সত্যিই প্রকৃতির একটা আশ্চর্য শক্তিকে মানুষের সেবায় লাগানোর পদ্ধতি আপনি আবিষ্কার করেছেন। কোন আবিষ্কার যদি ধ্বংসের জন্যে ব্যবহার করা হয়, তার জন্যে বিজ্ঞানী দায়ী নন। তাঁর কাজ অজানাকে জানা, জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা। নতুন জ্ঞানকে সমাজ কি কাজে লাগাবে, সে ভাবনার ভার তাঁর নয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হলে ব্যাপারটা শোচনীয় দাঁড়াবে ঠিকই, কিন্তু কিছু করার নেই। যন্ত্রের সূত্র বুঝলাম। গঠন-কৌশল দেখবার ইচ্ছে আছে। আপত্তি আছে কি?'

'একদম না। যন্ত্র দেখে কি ও আত্মাকে বুঝতে পারবেন? যন্ত্র তো একটা বডি—দেহ। প্রাণটা কোথায়, তা আঁচ করার ক্ষমতা আপনার নেই।'

'তা ঠিক। তাহলেও এত সূক্ষ্ম যন্ত্র কখনো দেখিনি। মৌলিক আবিষ্কারের চূড়ান্ত নিদর্শন,' বলে তারের গোলক-ধাঁধার মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন প্রফেসর। কয়েকটা অংশে হাত দিলেন। তারপর বিপুল বপু টেনে তুললেন চেয়ারে।

'ফের ব্রহ্মাণ্ড পর্যটনের ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?' থিওডোর জিজ্ঞেস করলেন।

'পরে, একটু পরে! কিন্তু ইলেকট্রিসিটি লীক করছে মনে হচ্ছে?—হ্যাঁ, বেশ টের পাচ্ছি। খুব ক্ষীণ একটা কারেন্ট বইছে শরীরের মধ্যে দিয়ে—আপনিও জানেন, তাই না?'

'অসম্ভব! ইনসুলেটর দিয়ে পুরোপুরি মোড়া—কারেন্ট আসবে কোত্থেকে?'

'কিন্তু আসছে—আমি বলছি,' আসন থেকে গুরুভার দেহ নামিয়ে আন-

লেন চ্যালেঞ্জার। ত্রস্তে সে জায়গায় গিয়ে বসলেন থিওডোর।

'কই, আমি তো টের পাচ্ছি না।'

'শিরদাঁড়াটা কি রকম শিরশির করছে না?'

'আজ্ঞে না। আমার করছে না।'

খুব জোরে কট্ করে একটা আওয়াজ হতেই ফুস্ করে মিলিয়ে গেলেন আবিষ্কারক। সচমকে ফিরে চাইলাম চ্যালেঞ্জারের পানে—'কী সর্বনাশ! মেশিনে হাত দিয়েছিলেন নাকি?'

যেন একটু অবাক হয়ে গিয়েই মিটিমিটি হাসতে লাগলেন চ্যালেঞ্জার।

'আরে তাই তো! কি কাণ্ড করলাম বলো তো! কখন জানি হাত লেগে গেছে হাতলে। এ রকম খসড়া মডেলে অ্যাকসিডেন্ট তো ঘটবেই। চারদিকে খোঁচা আর তার ঝুলছে। হাতলটাকে ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।'

'তিন নম্বর খাঁজে আটকেছে হাতল। ডিসইনটিগ্রেট করার খাঁজ কিন্তু ঐটাই।'

'তোমাকে করার সময়ে আমিও তাই দেখেছি।'

'কিন্তু আপনাকে ফিরিয়ে আনার সময়ে ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম। কোন খাঁজে হাতল ছিল দেখিনি। আপনি দেখেছেন?'

'দেখে থাকতে পারি, তবে কি জানো ছোকরা, ছোটখাট ব্যাপার মনে রাখার চেষ্টা আমি করি না। খাঁজ তো দেখছি অনেকগুলো—কোনটারই উদ্দেশ্য জানা নেই। যা জানি না, তা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা সমীচীন নয়। সুতরাং যে অবস্থায় মেশিন রয়েছে, থাকুক ঐ অবস্থায়।'

'আপনি—'

'ধরেছো ঠিক। থিওডোর নেমোরের কৌতূহল-জাগানো ব্যক্তিত্ব এই মুহূর্তে ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। মেশিনটা তাঁর অপদার্থ। বিশেষ একটা রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়েছে মেশিনের অধিকার থেকে—ফলে, পৃথিবী রক্ষে পেয়েছে অনেক ধ্বংসের খপ্পর থেকে। কাজটা মন্দ হয়নি, ম্যালোন। সকালটা শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল। তোমার বস্ ভদ্রলোকও একটা জবর প্রবন্ধ পেয়ে গেলেন। লাটভিয়ান আবিষ্কারকের সঙ্গে তাঁর সংবাদদাতার সাক্ষাৎকারের পরেই ভদ্রলোকের রহস্যজনক অন্তর্ধানের ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে যাবে—কিন্তু কাগজে তোমার প্রবন্ধটা সাড়া জাগাবে দেশে বিদেশে। লাভ হল তোমাদের দুজনেরই। আর আমার লাভের মধ্যে পেলাম অভিনব এক অভিজ্ঞতা। কাঠখোট্টা লেখাপড়া নিয়ে অষ্টপ্রহর থাকি। মাঝে মাঝে

হাল্কা মুহূর্ত এলে মন্দ লাগে না। নীরস দৈনিক রুটিনে এইটুকুই আমার মজা। কিন্তু শুধু মজা নিয়ে থাকলে তো চলবে না, জীবনে কর্তব্য অনেক। আমিও চললাম আমার কর্তব্য করতে। নিরক্ষীয় উইপোকার শূককীট বৃদ্ধি সম্পর্কিত ধাপ্পাবাজি ফাঁস করে ইটালিয়ান ম্যাজোটির মুখোশ না খোলা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

পেছন ফিরে দেখলাম চেয়ারের ধারে ধারে তখনও যেন একটা স্বচ্ছ কুয়া-শার মত কি ভাসছে।

বললাম—'আপনি কিন্তু—'

'আইনভক্ত নাগরিকের প্রথম কর্তব্য নরহত্যা নিবারণ। আমিও তাই করেছি। ও নিয়ে আর কোন কথা নয়, ম্যালোন, যথেষ্ট হয়েছে। অনেক দরকারী কাজ এখনো বাকী—অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম এখানে,' বল-লেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। □

হোয়েন দি ওয়ার্ল্ড স্ক্রীম্‌ড্‌

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে অনেক কথাই বন্ধুবর এডোয়ার্ড ম্যালোনের মুখে শুনেছি। সব কথা মনে নেই—যা মনে আছে তাও স্পষ্ট নয়। ম্যালোন কাজ করে 'গেজেট' পত্রিকায়। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের অত্যাশ্চর্য কয়েকটা অ্যাডভেঞ্চারে সঙ্গী হয়েছিল। আমি আমার কাজকর্ম ব্যবসাপত্র নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে বাইরের জগতের খবর বিশেষ রাখতে পারি না। নিজের কোম্পানী তো, বেশী খাটতে হয়। তার ওপর এত বেশী অর্ডার আসছে যে নিজের স্বার্থ দেখা ছাড়া অন্যের খবর নেওয়ার ফুরসৎ নেই। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ভাবে মনে ছিল, ভদ্রলোক মহাপণ্ডিত, কিন্তু বুনো টাইপের, ব্যবহার ভারী খারাপ—সহ্যাতীত দুর্দান্ত মেজাজ—রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—দর্শনার্থীকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধা করেন না। তাই এই রকম একটা লোকের কাছ থেকে ব্যবসা সম্পর্কিত পত্র পেয়ে ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম।

চিঠিখানা এই :

'১৪ (বিস), এনমোর গার্ডেন্স'
কেনসিংটন

'মহাশয়,—

'কূপখননে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে কাজ দেওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি। আপনাকে গোপন করে লাভ নেই—বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব একটা ভাল নয়। আমি দেখেছি, আমার মত সুসংবদ্ধ চৌকস ব্রেনের অধিকারী হলে যে কোন মানুষই যে কোনো বিশেষজ্ঞের বিশেষ জ্ঞান সম্বন্ধে আরো গভীর, আরো উদার জ্ঞানদান করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বিশেষ জ্ঞান বলতে যা বোঝায়, আসলে কিন্তু তা সীমিত জ্ঞান—নিজের ক্ষেত্রেই সঙ্কুচিত। বিশেষ জ্ঞানটাও একটা বিশেষ পেশা! দৃষ্টিভঙ্গী তাই অনুদার।

'যাই হোক, আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। বাজিয়ে দেখতে চাই। কূপখননে বিশেষজ্ঞদের লিস্টে আপনার নাম দেখলাম। (কুয়ো খোঁড়াও আবার একটা বিশেষ জ্ঞান! অদ্ভুত! হাস্যকর!) নামটা চোখে লাগল। খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার এক তরুণ বন্ধু এডোয়ার্ড ম্যালোনের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে। কাজেই, আপনার সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশী হব। আমার কাজের ধরনটা উঁচুদরের। যদি বুঝি আপনি কাজের লোক, তাহলে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনি পাবেন। এখন এর

বেশী আর বলব না—কেন না জিনিসটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং যা কিছু বলবার মুখে বলব। আগামী শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় উপরোক্ত ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করুন—অন্য কোথাও যাবার কথা থাকলে তা বাতিল করুন। খাবার ব্যবস্থা ভালই আছে, মিসেস চ্যালেঞ্জার না খাইয়ে কাউকে ছাড়েন না।

'জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার'

চীফ ক্লার্ককে চিঠিখানার জবাব দিতে বললাম। জবাব চলে গেল এই মর্মে যে কথামত মি: পিয়ারলেস জোন্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে যথাসময়ে হাজির হবেন। ক্লার্কের চিঠিতে সৌজন্যর অভাব ছিল না। কিন্তু গোড়াতেই ছিল একটা বাঁধাধরা গৎ—আপনার তারিখহীন চিঠি পেলাম। ফলে আর একখানা চিঠি লিখলেন প্রফেসর :

'মহাশয়',—চ্যালেঞ্জারের এবারের হাতের লেখা যেন কাঁটাতারের বেড়া বিশেষ—'লক্ষ্য করলাম, আমার চিঠিতে তারিখ না দেওয়ার তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে আপনি মন্তব্য করেছেন। মহাশয়ের কি খেয়াল নেই সাংঘাতিক শুল্কের বিনিময়ে সরকার বাহাদুর একটা ছোট্ট গোলাকৃতি ছাপ দেন সব খামের ওপরেই? চিঠি কবে ডাকে ফেলা হল—তারিখের বিজ্ঞপ্তি থাকে সেই ছাপের মধ্যে। এ চিহ্নটা না থাকলে, অথবা অস্পষ্ট মনে হলে আপনার উচিত ডাক বিভাগের কর্তাদের চিঠি লেখা। ইত্যবসরে একটা কথা বলে রাখি আপনাকে যে ব্যাপারে ডাকা হয়েছে, কথা বলবেন কেবল সেই ব্যাপারেই। আমার চিঠি লেখার কায়দা নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।'

বেশ বুঝলাম বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি। তাই এ ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার আগে বন্ধুবর ম্যালোনের সঙ্গে একটু পরামর্শ করা মনস্থ করলাম। এককালে রিচমণ্ডের হয়ে দুজনে রাগার খেলেছিলাম। ম্যালোন দেখি ঠিক আগের মতই রয়েছে—ফুর্তিবাজ আইরিশম্যান। চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে আমার প্রথম টক্করের বিবরণ শুনে গড়িয়ে পড়ল হাসতে হাসতে।

বললে—'ও আর এমন কি। ছালটা তো ছাড়িয়ে নেন নি। মিনিট পাঁচেক সঙ্গে থাকলে সত্যিই জ্যান্ত ছাল-ছাড়ানো গোছের অবস্থা দাঁড়াবে তোমার। পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাঁধানোর ব্যাপারে দুনিয়ায় ওঁর জুড়ি নেই।'

'কিন্তু দুনিয়া ওঁকে মেনে নেয় কেন?'

'কে বললে নিয়েছে? মামলা মোকদ্দমার ফর্দ দেখলে তোমার মুণ্ডু

ঘুরে যাবে। কে কোথায় কোন কাগজে ওঁর নিন্দে করেছে, অমনি দিয়েছেন মামলা ঠুকে। ঝগড়াঝাঁটির মামলাই কি কম। তার ওপর আছে পুলিশ আদালতে মারধরের—'

'মারধর!'

'আরে গেল যা! তুমি কি ভাব ওঁর কথায় সায় দিতে না পারলে উনি তোমাকে জামাই আদর করবেন? মাথার ওপর তুলে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেবেন। কোট-প্যান্ট পরা আদিম গুহামানব বলতে যা বোঝায়, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আসলে তাই। কেউ কেউ এক আধ শতাব্দী আগে পরে জন্মায়—উনি জন্মেছেন লক্ষ লক্ষ বছর পরে। নিওলিথিক যুগ বা কাছাকাছি কোন যুগের বর্বর বলা চলে।'

'এর পরেও উনি প্রফেসর হয়েছেন?'

'সেইটাই তো আশ্চর্য! ইউরোপে এরকম ব্রেন দ্বিতীয় কারো নেই। ও ব্রেনের কাছে কোন স্বপ্নই স্বপ্ন নয়—বাস্তব রূপায়ন করবেনই। সতীর্থরা ওঁকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না—কিন্তু ওঁর প্রগতিকে টেনে ধরে রাখতেও পারেন না। উনি এগিয়ে যান নিজের শক্তিতে—ফোঁস ফোঁস করতে করতে তেড়েফুঁড়ে হিংসুটে সতীর্থদের ঠেলে ফেলে দিয়ে চলেন নিজের পথে—কারও ধার ধারেন না, তোয়াক্কা রাখেন না। হাত দিয়ে যেমন হাতী ধরে রাখা যায় না—প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকেও তাঁর লক্ষ্য থেকে সরিয়ে আনা যায় না।'

'বুঝলাম। ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। এ লোকের সঙ্গে কারবারের ইচ্ছে আমার নেই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করব।'

'মোটেই করবে না। বরঞ্চ কাঁটায় কাঁটায় যথাসময়ে দেখা করবে, ঘড়ি ধরে শেষ মিনিট পর্যন্ত যা-যা বলবেন মন দিয়ে শুনবে।'

'কেন? কোন দুঃখে? চুরির দায়ে বাঁধা পড়েছি নাকি?'

'কেন শুনবে তা বলছি। তার আগে একটা কথা বলে রাখি। বুড়ো চ্যালেঞ্জার সম্বন্ধে যা বললাম, তা সত্যি—কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই। কাছে গেলে মানুষটাকে না ভালোবেসে পারা যায় না। উনি মন থেকে কারো ক্ষতি চান না। বুড়ো ভালুকের মহত্ত্ব সেইখানেই। পক্ষান্তরে, ওঁর মত নরম দরাজ মনও বড় একটা দেখা যায় না। মদিরা নদীর পাড় বরাবর একশ মাইল হেঁটে এসেছিলেন গুটি বসন্তে ভর্তি ইণ্ডিয়ান শিশুকে কোলে নিয়ে। ভাবতে পারো? মানিয়ে নিতে পারলে মারধরের ধার দিয়েও যাবেন না উনি।'

'সে সুযোগই দেব না। যাবই না।'

'না গেলে তুমিই পস্তাবে। হেংগিস্ট ডাউন রহস্য সম্পর্কে কিছু শুনেছো কি? দক্ষিণ উপকূলে মাটির মধ্যে ডাণ্ডা পোঁতা হচ্ছে কেন জানো?'

'গোপনে কয়লার খনি আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে শুনেছি।'

চোখ টিপে ম্যালোন বললে—'যা শুনেছো, তাই শুনে রাখো। বুড়ো চ্যালেঞ্জারের সব কথাই আমি জানি—পাঁচকান করব না কথা দিয়েছি, তাই বলতে পারছি না। কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা যেটুকু জেনেছে, তা বলতে বাধা নেই। বেটারটন নামে এক ভদ্রলোক বেশ দুপয়সা কামিয়েছিলেন রবারের ব্যবসায়। স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি উনি চ্যালেঞ্জারকে দান করেন। শর্ত একটাই—বিজ্ঞানের কাজে লাগাতে হবে। সম্পত্তির মোট দাম নেহাৎ কম নয়—কয়েক কোটি পাউণ্ড তো বটেই। সাসেক্সের হেংগিস্ট ডাউনে বেশ কিছু জমিজমা কিনলেন চ্যালেঞ্জার। জায়গাটা পতিত জমি—খড়ি অঞ্চলের একদম উত্তর দিকে। পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেললেন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। জমির ঠিক মাঝখানে একটা গভীর খাদ ছিল—বৃষ্টির জলে খড়িমাটি ধুয়ে আপনা থেকেই গর্ত বেরিয়ে পড়েছিল। সেইখানে মাটি খোঁড়া আরম্ভ করলেন চ্যালেঞ্জার। পাঁচজনকে বললেন—' বলে ফের চোখ টিপল ম্যালোন—'ইংল্যাণ্ডে যে পেট্রল আছে তা তিনি প্রমাণ করবেন। ছোট্ট অথচ আদর্শ একটা গ্রামও গড়লেন। মোটা মাইনে দিয়ে শ্রমিকদের এনে রাখলেন সেই গ্রামে—টাকার টনিকে মুখ বন্ধ রাখলেন প্রত্যেকের—ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের পেটে বোমা মারলেও মুখ থেকে কথা বার করা সম্ভব নয়। পুরো জমিটা যেমন কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা—খাদটাও তেমনি কাঁটাতারের বেড়ায় সুরক্ষিত। দিনরাত খাদের মধ্যে এক দঙ্গল ব্লাডহাউণ্ড ছাড়া থাকে ভেতরে। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে বেশ কয়েকজন খবরের কাগজের রিপোর্টার, প্যান্টের পাছা আস্ত থাকেনি কারোরই—অনেকেই মরতে বসেছিল—আয়ু ছিল বলে বেঁচে গিয়েছে। কাজটা বিরাট—ভার নিয়েছেন স্যার টমাস মর্ডেনের কোম্পানী। ওদের মুখেও কুলুপ আঁটা—কি কাজ হচ্ছে ফাঁস করেনি আজও। এবার কুয়ো খোঁড়ার দরকার। বোকামি কোরো না। কাজ করব না বললে শুধু যে একটা মোটা টাকার চেকই হারাবে তা নয়—জীবনে যে লোকের সংস্পর্শে তুমি আসতে পারোনি, তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে—বিশ্বের বিচিত্রতম মানুষের সঙ্গে দহরম মহরম কি চাট্টিখানি কথা? সে সুযোগ কে পায় হে?'

ম্যালোনের যুক্তিই শেষ পর্যন্ত ধোপে টিঁকল। শুক্রবার সকালে চললাম

এনমোর গার্ডেন্স অভিমুখে। সময়ের ব্যাপারে একটু বেশী হুঁশিয়ার হয়েছিলাম বলে দোরগোড়ায় পৌঁছোলাম বিশ মিনিট আগে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সময় কাটাচ্ছি, এমন সময়ে ফুটপাত ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড রোলসরয়েস গাড়ীটা দেখেই খটকা লাগল। দরজার গায়ে রুপোর তীর। আরে! এ গাড়ী যে জ্যাক ডিভনশায়ারের—সুবিখ্যাত মর্ডেন কোম্পানীর ছোটকর্তা। ভদ্রলোক শিষ্টাচারের অবতার বললেই চলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই যে অবস্থায় দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল জ্যাক, তাতে আমার পিলে পর্যন্ত গেল চমকে।

বেগে ছিটকে এল জ্যাক—দরজায় দাঁড়িয়ে শূন্যে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চ্যাঁচাতে লাগল তারস্বরে—'নিপাত যা। জাহান্নমে যা! বেল্লিক বুড়ো তুই গোল্লায় যা!'

'কি ব্যাপার জ্যাক? সাতসকালেই মেজাজ খারাপ কেন?'

'আরে পিয়ারলেস যে! তুমিও কি এ কাজে নেমেছো?'

'নামতে পারি—সুযোগ এসেছে।'

'ঠেলা বুঝবে'খন।'

'তোমার চাইতে বেশী নাকি?'

'আশ্চর্য কিছু নয়। খাস চাকর এসে বলে কিনা: স্যার, প্রফেসর বলে পাঠালেন তিনি এখন একটা ডিম খেতে ব্যস্ত আছেন, আপনি যদি সুবিধেমত অন্য কোন সময়ে আসেন উনি নিশ্চয় দেখা করবেন। একটা চাকরের মারফৎ কিনা এই কথা বলা! আরে, আমি এসেছি বিয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ডের চেক নিতে, পাওনাদারের সঙ্গে এমনি ব্যাভার।'

শিস্ দিয়ে উঠলাম।

'টাকা তাহলে পাচ্ছ না?'

'সে কথা না, টাকাকড়ির ব্যাপারে উনি খাঁটি লোক। দরাজ হাত—বুড়ো গরিলার এ গুণটা অন্তত আছে। কিন্তু কখন দেবেন, কিভাবে দেবেন—সেটা তাঁর খুশী এবং সে ব্যাপারে কারও তোয়াক্কা রাখেন না। মরুক গে, যাও তুমি—ছাখো তোমার কপালে কি জোটে,' বলেই ছিটকে গিয়ে মোটরে বসে গাড়ী হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাক।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ফুটপাতে এবং ঘন ঘন তাকাতে লাগলাম ঘড়ির দিকে। ঠিক সময়ে না হলে কড়া নাড়ব না। একটা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি। খেলাধুলোর অভ্যেস আমার আছে। গায়ে মোটামুটি জোর আছে, শরীরটাও মজবুত। তা সত্ত্বেও কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কখনো এরকম

সন্ত্রস্তবোধ করিনি। ভয়টা মারধরের নয়। বদ্ধ উন্মাদ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যদি মারতে আসেন, নিজেকে বাঁচানোর শক্তি আমার আছে। কিন্তু ভয় পাচ্ছি কেলেংকারীর—সেইসঙ্গে অমন শাঁসালো একটা পার্টিকে হারানোর আশংকাও আছে। এই মিশ্র অনুভূতির জন্যেই গুর্ গুর্ করছে বুকের ভেতরটা। যত ভয় তো কল্পনার মধ্যেই—আসল কাজ শুরু হয়ে গেলেই ভয়ভাবনারও অবসান ঘটে।—তাই কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায় ধাক্কা দিলাম দরজায়।

দরজা খুলল খাস-চাকর। মুখখানা যেন কাঠ কুঁদে তৈরী। ভাবলেশ-হীন। অনেক ধাক্কা সয়ে যেন নির্বিকার। অষ্টম আশ্চর্য দেখলেও অবাক হবার পাত্র নয়।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'অবশ্যই আছে।'

হাতের ফর্দের পানে তাকিয়ে বললে—'কি নাম আপনার?...ঠিক আছে মিঃ পিয়ারলেস জোন্স...সাড়ে দশটা। সব মিলে যাচ্ছে। কিছু মনে করবেন না মিঃ জোন্স, খবরের কাগজওয়ালাদের উৎপাতে সাবধান থাকতে হয়। এত কড়াকড়ি ওদের জন্যেই—প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বসে আছেন আপনার পথ চেয়ে।'

পরমুহূর্তেই সম্মুখীন হলাম প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের। 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে বন্ধুবর ম্যালোন প্রফেসরের ভাল বর্ণনাই দিয়েছে। আমার কলমের জোর ওর মত নয়। কাজেই সে চেষ্টা করব না। সেই মুহূর্তে আমি শুধু দেখলাম মেহগনী টেবিলের ওদিকে এক বিরাট ব্যক্তির ধড়—মাঝখানে কোদালের মত প্রকাণ্ড কালো দাড়ি, ওপরে একজোড়া বিশাল ধূসর চোখ—উদ্ধত চোখের পাতা অর্ধেক নামানো। মস্ত মাথাটা পেছন হেলিয়ে কোদাল-দাড়ি সামনে ঠেলে সারা দেহে যেন একটা অসহ্য ঔদ্ধত্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সারা গায়ে যেন লেখা রয়েছে 'এটা আবার কোন ঘাটের মড়া? মতলবটা কি?' আমার কার্ড বার করে রাখলাম টেবিলে।

'আ! আপনিই মিঃ পিয়ারলেস জোন্স—তথাকথিত বিশেষজ্ঞ,' কার্ড-খানা এমনভাবে কোণ ধরে ঝুলিয়ে রেখে কথাগুলো বললেন প্রফেসর যেন কার্ডের গন্ধে তাঁর গা ঘিন ঘিন করছে। 'আপনার ধর্মপিতার দৌলতেই কিন্তু আপনার নামটা আমার চোখে পড়ল। কি নামই দিয়েছিলেন ভদ্র-লোক! পিয়ারলেস—অতুলনীয়। দেখলেই হাসি পায়।'

মুখখানা ভীষণ গম্ভীর করে বললাম—'আমি কিন্তু এসেছি স্যার, ব্যবসার

কথা বলতে, নাম নিয়ে কথা বলতে নয়।'

'আরে সর্বনাশ! আপনি তো দেখছি আচ্ছা লোক—একটুতেই গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। স্নায়ুর অবস্থা ভাল নয়—মেজাজ তাই সপ্তমে। সাবধানে কথা বলা দরকার। বসুন, মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। সিনাই পেনিনসুলার পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আপনার লেখাটা পড়লাম। আপনিই লিখেছেন তো?'

'তাই তো মনে হয়। লেখার ওপরে আমার নামই ছাপা হয়েছে।'

'ঠিক কথা! ঠিক কথা! তবে কি জানেন, নামের তলায় লেখাটা সব সময়ে সেই নামের লোককেই লিখতে হবে—তার কোন মানে নেই। বলার ধরনটা একঘেয়ে হলেও মাঝে মাঝে অভিনব আইডিয়ার চমক আছে। নতুন চিন্তার বীজ আছে। বিয়ে করেছেন?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে পেটে কথা রাখতে পারবেন বলে মনে হয়।'

'কথা দিলে সে কথা আমি রাখি।'

'বেশ, বেশ, ম্যালোন ছেলেটা,' এমন ভাবে বললেন যেন টেডের বয়স মোটে দশ বছর 'আপনার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। আপনাকে নাকি বিশ্বাস করা যায়। এই বিশ্বাসটাই এ-কাজের সবচেয়ে বড় মূলধন। কেন না, পৃথিবীর বড় বড় সব এক্সপেরিমেন্ট বলতে এটাও—না, না, পৃথিবীর ইতি-হাসে সবচাইতে বড় এক্সপেরিমেন্ট বলতে এইটাই—আর কিছু নেই—কাজেই মুখে চাবি দিয়ে থাকতে হবে এর মধ্যে থাকলে। আমি চাই আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।'

'সে তো অনেক সম্মানের কথা।'

'সম্মান তো বটেই। এ সম্মানের ভাগ আর কাউকেই দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু উঁচুদরের কারিগরি দক্ষতার দরকার হয়ে পড়ায় ডাকতে হচ্ছে আপনাকে। যাক, কথা যখন দিয়েছেন মরে গেলেও পেটে কথা রাখবেন, তখন আসা যাক আসল কাজের কথায়। মিঃ জোন্স, এই যে পৃথিবীটার ওপরে আমরা সংসার পেতে বসে আছি, একে আমি জ্যান্ত প্রাণী বলেই মনে করি। এর শরীরে নিঃশ্বাস নেওয়ার যন্ত্র আছে, রক্তবহা শিরা উপশিরা ধমনী আছে, এমন কি নিজস্ব স্নায়ুমণ্ডলীও আছে।'

এ যে দেখছি একেবারেই উন্মাদ!

প্রফেসর বললেন—'তত্ত্বটা আপনার মাথায় ঢুকল না লক্ষ্য করছি। ঢুকবে—আস্তে আস্তে। দানব জন্তুর লোমশ গায়ের সঙ্গে জল বা বাদায়

দারুণ মিল আছে। অনুরূপ মিল আরো রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে। অনেকদিন ধরে সারা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও জমি ঠেলে উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে। ভূমিকম্প হচ্ছে, জমি পাহাড় হঠাৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে—দানব-জন্তু যেন আঙুল মটকাচ্ছে আর গা চুলকোচ্ছে। পরিষ্কার?'

'আগ্নেয়গিরির ব্যাপারটা বললেন না তো?'

'আরে, ওরকম বেশী তেতে থাকা জায়গা তো আমাদের দেহেও রয়েছে।'

কি সাংঘাতিক সব কথাবার্তা! কল্পনার একি ভয়ংকর উন্মত্ততা! জবাব দেব কি, বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল মাথা।

ঐ অবস্থাতেই বলে ফেললাম কোনমতে—'টেমপারেচারের মানেটা কি এবার বলুন? পাতালে যত নামা যায়, তাপমাত্রা ততই বেড়ে যায়। তার মানে কি? পৃথিবীর জঠরটা টগবগে তরল অবস্থায় রয়েছে, তাইতো?'

হাত দিয়ে যেন আমার যুক্তিটাকে ঠেলে ফেলে দিলেন প্রফেসর।

'স্কুলে পড়াটা আজকাল বাধ্যতামূলক। কাজেই মহাশয়ের জানা থাকতে পারে যে ভূগোলকের দুপাশ কমলালেবুর মত চাপা—অর্থাৎ দুই মেরু অঞ্চল অনেকখানি এগিয়ে আছে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে। কেন্দ্রে যদি তরল উত্তাপ থাকত তাহলে সুমেরু আর কুমেরু সব চাইতে বেশী তেতে লাল হয়ে থাকত। কিন্তু বারোমাস বরফ জমে রয়েছে সেখানে। গরম একদম নেই। ঠিক কি না?'

'নতুন কথা শুনছি।'

'নতুন তো বটেই। মৌলিক চিন্তা করতে গেলে অনেক ঝক্কির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সাধারণ মানুষ নতুন ব্যাপার বুঝতেই পারে না—মাথাতেও নিতে চায় না। বলুন দিকি এটা কি?' বলে টেবিল থেকে একটা ছোট্ট বস্তু তুলে নিয়ে দেখালেন প্রফেসর।

'কাঁটাওয়ালা সামুদ্রিক জন্তু।'

'একেবারে ঠিক।' একটু বেশীরকম অবাক হয়ে বললেন প্রফেসর—দুধের বাচ্চা দারুণ কিছু করে ফেললে প্রাপ্তবয়স্ক যেমন চমকে ওঠে—সেই ভাবেই চোখ গোল গোল করে বললেন—'কাঁটাওয়ালা সামুদ্রিক জন্তুই বটে। ইকিনাস—আহা মরি কিছু নয়। ইকিনাসের মত ছোট বড় বিস্তর প্রাণী প্রকৃতির খেয়ালে ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে—কেউ বড়, কেউ ছোট। ইকিনাস তাহলে একটা মডেল—পৃথিবীর ক্ষুদে সংস্করণ। ভাল করে দেখুন, এর দু'পাশ চাপা—আকারেও মোটামুটি গোল—ভূগোলকের মতই। তাহলে

বলা যাক, পৃথিবী গ্রহটা আসলে একটা সুবৃহৎ ইকিনাস।—কি? আপত্তি আছে নাকি?'

আপত্তি আমার একটাই। পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর। যুক্তিটুক্তির মাথামুণ্ডু নেই। কিন্তু মুখের ওপর তা বলবার সাহস হল না। তাই ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মত নিরীহ ভাবে জিজ্ঞেস করলাম:

'জ্যান্ত প্রাণীর খাবার দরকার। পৃথিবীর খাবার আসে কোত্থেকে?'

'চমৎকার পয়েন্ট! অত্যন্ত চমৎকার পয়েন্ট!' যেন আমাকে কৃতার্থ করে ছাড়লেন, এই রকম একখানা ভাব করে বললেন প্রফেসর—'আপনার চোখ আছে। চট করে আসল জায়গায় নজর যায়। তবে সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো চোখ এড়িয়ে যায়। আপনার প্রশ্ন তাহলে পৃথিবীর পুষ্টি নিয়ে। পৃথিবী বেঁচে আছে কি খেয়ে—এই তো? বেশ, বেশ, দেখাই যাক না ইকিনাসরা কি ভাবে বেঁচে আছে। ইকিনাস থাকে জলের মধ্যে—সারা গায়ের ছোট ছোট নল দিয়ে সেই জল যায় শরীরের মধ্যে—যোগায় পুষ্টি।'

'তাহলে কি বলতে চান, জল খেয়ে পৃথিবী—'

'আজ্ঞে না। পৃথিবীকে পুষ্টি জোগাচ্ছে ইথার। চক্রাকার কক্ষ-পথে পৃথিবী ছুটছে। ইথারের মধ্যে ডুবে থাকার ফলে অনবরত শুষে নিচ্ছে সেই ইথার—ইথারের মধ্যে দিয়ে পুষ্টি গিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে পৃথিবীকে। ঠিক এইভাবে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-ইকিনাসরাও ইথার শুষে প্রাণটাকে রেখেছে টিঁকিয়ে। শুক্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহরাও দল বেঁধে ছুটছে ইথার সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে—পুষ্টি সংগ্রহও চলছে বিরামবিহীনভাবে।'

নাঃ, একেবারেই মাথা বিগড়েছে লোকটার। তর্ক করাও বাতুলতা। তাই চুপ করে রইলাম। প্রফেসর কিন্তু আমার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিলেন। অনুকম্পার হাসি হেসে যেন জীবন ধন্য করে দিলেন।

বললেন—'এই তো মাথায় আস্তে আস্তে ঢুকছে। প্রথম প্রথম ধাঁধা লাগছে ঠিকই, সব ঠিক হয়ে যাবে এখুনি। ছোট্ট ইকিনাসকে সামনে রেখে এবার যা বলব কান পেতে শুনুন।

'ইকিনাস মহাপ্রভুর গা-টা কি রকম শক্ত দেখেছেন? আচ্ছা, এই শক্ত খোলার ওপর ক্ষুদে ক্ষুদে অনেক পোকা কি নেই? চোখে দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু আছে নিশ্চয়। ইকিনাস কি তা টের পাচ্ছে?'

'মনে হয় না।'

'তাহলেই দেখুন, ভাঙা জাহাজ বহুদিন সমুদ্রে ভেসে থাকলে গায়ে যেমন ছ্যাতলা পড়ে, মহাশূন্য দিয়ে সূর্যের চারধারে বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে

পৃথিবীর ওপরেও যদি শ্যাওলা পড়ার মত গাছপালা জন্মায়, ক্রম বিবর্তনের পথে পোকা মাকড়ের মত মানুষ আর প্রাণী কিলবিল করতে থাকে, পৃথিবীর পক্ষে কি তা জানা সম্ভব? পৃথিবীর খেয়ালই নেই জীবাণুর মত তার সারা গায়ে আমরা সংসার পেতে বসে আছি।

'এই অবস্থাই চলেছে যুগযুগান্তর ধরে—কিন্তু একই পরিস্থিতি চিরকাল চলুক—আমার তা ইচ্ছে নয়। তাই ঠিক করেছি, পরিস্থিতিটাকে একটু পালটাব।'

'পরিস্থিতি পালটাবেন মানে?' প্রশ্ন করলাম বিমূঢ়ের মত।

'মানে, পৃথিবীকে জানিয়ে দেব যে আমরা আছি। সে জানুক যে আমরা নেহাৎ ফ্যালনা নই—অত উপেক্ষার বস্তু নই। অন্ততঃ একজন লোকও আছে তার খোলার ওপর, নাম যার জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার, যে ইচ্ছে করলে বোমভোলা পৃথিবীকেও খুঁচিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে পারে। এমন খোঁচা তাকে মারব যা সে জীবনে খায়নি—হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে ছাড়ব জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার যে সে লোক নয়।'

'কিন্তু কিভাবে, প্রফেসর, কিভাবে?'

'এই তো পথে এসেছেন। আবার ফিরে আসা যাক কাজের কথায়। তাকান আমার ইকিনাসের দিকে। সারা গায়ে শক্ত খোলার নিচে রয়েছে স্নায়ুমণ্ডলী—নরম সংবেদনশীল দেহ। ধরুন, খোলার ওপরে বাসা বেঁধে থাকা কোন পরদেহী জন্তু ঠিক করল ইকিনাসের টনক নড়াতে হবে। কি করবে সে? নিশ্চয় খোলা ফুটো করে নরম জায়গায় হাত দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাই না?'

'তা তো বটেই।'

'এবার আসা যাক মশা কামড়ানোর উদাহরণে। মশা যখন পায়ে বসে, টের পাই না। কিন্তু যেই হুল ফোটায়, মানে, চামড়া অর্থাৎ নরদেহের খোলা ছাঁদা করে ভেতরে শলাকা ঢুকিয়ে দেয়—যন্ত্রণার মাধ্যমে টের পাই গায়ের ওপর এক উৎপাত বসেছে। আমি কি করতে চাই, এবার নিশ্চয় তা মাথায় ঢুকছে। অন্ধকারে আলো দেখা যাচ্ছে।'

'কী সর্বনাশ! পৃথিবীর খোলা ফুটো করে ভেতরে পর্যন্ত শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়ার প্ল্যান এঁটেছেন!'

পরম নির্লিপ্তের মত দুই চোখ মুদলেন প্রফেসর।

বললেন—'না বলতেই আঁচ করে ফেললেন। শুধু প্ল্যানই আঁটিনি,

-বৎস, কাজও এগিয়েছে। পৃথিবীর খোলা-ফুটো কোনকালে হয়ে গেছে।'

'বলেন কি!'

'মর্ডেন কোম্পানী বড ভাল কাজ করছে—রাশি রাশি বারুদ, শাবল, গাঁইতি কোদাল, তুরপুন নিয়ে বছরের পর বছর দিবারাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কাজ শেষ করে এনেছে। আমি যা চাই তা এখন হাতের মুঠোয়।'

'আপনি কি বলতে চান ভূ-ত্বক এফোঁড ওফোঁড় হয়ে গেছে?'

'ভডকে যাওয়ার জন্যে কথার সুরটা যদি ঐ রকম হয়ে থাকে, গায়ে মাখব না! কিন্তু যদি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না মনে করে থাকেন—

'আজ্ঞে না, ও সব কিছু নয়।'

'তাহলে যা বলব, বিনা প্রশ্নে মেনে নেবেন। ভূ-ত্বক এফোঁড় ওফোঁড় করা হয়ে গেছে। চোদ্দ হাজার চারশ বিয়াল্লিশ গজ অর্থাৎ প্রায় আট মাইল পুরু ভূ-ত্বক ফুটো করতে গিয়ে একটা মস্ত লাভও হয়েছে। দারুণ সমৃদ্ধ একটা কয়লার খনির সন্ধান পেয়েছি—যার দৌলতে এক্সপেরিমেন্টের পুরো খরচাটাই উঠে আসবে। বেগ পেতে হয়েছিল খড়িস্তরের জলের ঝর্ণা আর হেস্টিংস-বালি নিয়ে। সে বাধাও পেরিয়ে গিয়েছি—পৌঁছেছি শেষ স্তরে—মিঃ পিয়ারলেস জোন্সের স্তরে। মশার ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন। কুয়োছেঁদার শলাকা হোক মশার হুল। চিন্তার কাজ শেষ—প্রস্থান ঘটুক চিন্তাবিদের। যন্ত্রের কাজ শুরু—প্রবেশ ঘটুক যন্ত্রবিদের। সঙ্গে থাকুক ধাতুর ডাণ্ডা—অতুলনীয়, নাকি বলেন? মাথায় ঢুকেছে?'

'আট মাইল! বলছেন কি আপনি? কুয়োখোঁড়ার শেষ সীমা পাঁচ হাজার ফুটের বেশী নয়। সিলেসিয়ায় ছ হাজার দু'শ ফুট পর্যন্ত কুয়োর অভিজ্ঞতা আমার আছে—লোকে বলে সেটাই নাকি একটা আশ্চর্য ব্যাপার।'

'মিঃ পিয়ারলেস, সব গুলিয়ে ফেললেন। হয় আমার কথায়, না হয় আপনার ব্রেনে গলদ আছে। ঠিক কোথায়, তা নিয়ে আপাততঃ আলোচনা করতে চাই না। কুয়োখোঁড়ার শেষ সীমা কদ্দূর, সে জ্ঞান আমার টনটনে। ছ ইঞ্চি ছেঁদায় কাজ চলে গেলে নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে বিরাট সুড়ঙ্গ খুঁড়তে যেতাম না। আপনাকে যা বলি তা করুন। একটা একশ ফুট লম্বা ভীষণ ধারালো ড্রিল তৈরী রাখুন—চালানো হবে ইলেকট্রিক মোটরে।'

'ইলেকট্রিক মোটর কেন ?'

'মিঃ জোন্স, আমি হুকুম দিতে ডেকেছি আপনাকে—হুকুমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যে নয়। এমনও হতে পারে যে দূর থেকে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ড্রিল চালানোর ফলে প্রাণে বেঁচে যেতে পারেন আপনি।—কি, পারবেন তো?'

'কেন পারবো না?'

'তাহলে শুরু করে দিন। যন্ত্রপাতি নিয়ে এখুনি চলে আসার মত অবস্থা এখনো হয়নি—কিন্তু আপনি প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আর কিছু বলার নেই আমার।'

'কিন্তু কি ধরনের মাটি ছেঁদা করতে হবে, তা বলবেন তো? বালি, না, কাদামাটি, না, খড়ি? মাটির ধরন অনুসারে কাজের রকমফের আছে যে।'

'জেলী,' বললেন প্রফেসর। 'ধরে নিন জেলীর মধ্যে দিয়ে ড্রিল ঢোকাতে হবে আপনাকে। আজ আর না। হাতে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। গুড মর্নি জানাচ্ছি। আপনি এখন আসুন। অফিসে গিয়ে কনট্রাক্ট তৈরী করে ফেলুন—আপনার দক্ষিণা তাতে লিখুন—পাঠিয়ে দিন কারখানার বড় কর্তাকে।'

মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করে পেছন ফিরলাম। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। কৌতূহলে ফেটে পড়তে চাইছে ভেতরটা। দেখি, এইটুকু সময়ের মধ্যেই ঘাড় হেঁট করে ভীষণ বেগে পালকের কলম দিয়ে লিখে চলেছেন প্রফেসর—কাঁচ কাঁচ শব্দে যেন আর্তনাদ করছে বেচারী কলম। বাধা পড়ায় রেগে মেগে তাকালেন আমার পানে।

'আবার কি? আমি তো ভাবলাম বিদেয় হয়েছেন।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। এক্সপেরিমেন্টটা অসাধারণ, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি?'

'বেরোন! এখুনি বেরোন!' রুদ্রমুখে উগ্রকণ্ঠে বললেন প্রফেসর—'ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি একটু ছাড়ুন। সব কিছুই কাজে লাগানোর দৃষ্টি ভঙ্গী পরিহার করুন। জঘন্য বাণিজ্যিক পঙ্ক থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বে তুলুন। বিজ্ঞান চায় জ্ঞানের উদ্ঘাটন। জ্ঞান আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক যেখানে খুশী—তবুও চাইব আরো জ্ঞান। আমরা কি, কেন, কোথায়—চিরন্তন এই প্রশ্নের জবাব খোঁজাই মানব মনের শ্রেষ্ঠ উচ্চাশা নয় কি? যান্‌, ভাগুন, পালান!'

আমি পেছনে ফেরার আগেই দেখলাম অসাধারণ মানুষটা কালো চুলে বোঝাই প্রকাণ্ড মাথা ওঁজরে ফের লিখতে শুরু করে দিয়েছেন ত্বরিৎ বেগে—মাথা, চুল, দাড়ি একাকার হয়ে গিয়েছে—কলম আবার কাতরাচ্ছে—মানুষটা যেন ইহজগৎ ছাড়িয়ে মুহূর্ত মধ্যে অন্য জগতে চলে গিয়েছেন। পেছন ফিরে এই দৃশ্যই দেখতে দেখতে চৌকাঠ পেরিয়ে এলাম—মনের চোখে তবুও ভেসে রইল আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব—মাথায় চেপে রইল তার চাইতেও আশ্চর্য এক অভিযানের দায়িত্ব।

ঘূর্ণিত মস্তকে অফিসে ফিরে এসে দেখি টেড ম্যালোন বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে বসে রয়েছে আমার ঘরে। সাক্ষাৎকারের বর্ণনা শোনার লোভে আগে ভাগেই চলে এসেছে বন্ধুবর।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বলল সোল্লাসে—'কি হে, মারধর খাওনি দেখছি! চ্যাঁচামেচিও খুব একটা হয় নি। মানে, বুড়োকে কব্জায় এনে ফেলেছো। বলো দিকি কেমন লাগল বুড়ো খোকাকে?'

'জীবনে এরকম দাম্ভিক, উদ্ধত, আত্ম সিদ্ধান্তে স্ফীত মানুষ আমি দেখিনি, তা সত্ত্বেও—'

'ঠিক! ঠিক!' উল্লসিত মুখে সায় দিল ম্যালোন—'সব কাকেরই এক রা! লোকটাকে দাম্ভিক, উদ্ধত, অসহ্য ইত্যাদি ইত্যাদি বলবার পরেও বলতে হবে—'তা সত্ত্বেও'। তুমি যা বললে, উনি তার চাইতেও অনেকগুণ বেশী বদ্। কিন্তু ওঁর মত বিরাট পুরুষকে আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে যাওয়া কি ঠিক? অন্যের ক্ষেত্রে যা শোভা পায় না, ওঁর ক্ষেত্রে তা অশোভন হবে কেন বলতে পারো?'

'আমার চাইতে অনেক বেশী জানো তুমি ওঁর সম্বন্ধে, কাজেই ও কথা আমি বলতে না পারলেও একটা কথা বলব জোরের সঙ্গে। উনি গোঁয়ার, জেদী, উচ্চাশায় অন্ধ উন্মাদ হতে পারেন—কিন্তু যা বললেন তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ওঁর জুড়ি নেই। কথাটা কি সত্যি?'

'অবশ্যই সত্যি। চ্যালেঞ্জার বাজে কথা বলার লোক নন—ওঁর কোন কাজই অকাজ নয়। কদ্দূর শুনেছো বল। হেংগিস্ট ডাউনের ব্যাপার বলেছেন?'

'মোটামুটি বলেছেন।'

'পুরো ব্যাপারটাই জেনো বিরাট আকারে হতে চলেছে—চিন্তাটা যেমন বিরাট—কাজটাও তেমনি বিরাট। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের চক্ষে

দেখতে পারেন না চ্যালেঞ্জার, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করেন। কেন না, উনি জানেন ওঁর সম্মতি ছাড়া কোন খবরই কাগজে ছাপাব না। তাই ওঁর পরিকল্পনার কিছু কিছু আমি জানি। ওঁর পাণ্ডিত্য এতই অগাধ যে কথা বলে তল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই শুধু এইটুকুই জেনো যে ওঁর পুরো প্ল্যানটাই নিরেট বনেদের ওপর তৈরী—ফালতু নয়—অবাস্তব নয়। কাজ উনি শেষ করে এনেছেন। যে কোন মুহূর্তে অনেক নতুন ঘটনাই ঘটবে—এরপর কি করতে হবে সে নির্দেশ পাবে হয় আমার মুখে, না হয় ওঁর নিজের মুখে। এর মধ্যে কিন্তু তুমি কাজে কামাই দিও না—যা-যা বলেছেন তৈরী করে ফ্যালো।'

শেষ পর্যন্ত পরবর্তী নির্দেশ এল ম্যালোনেরই কাছ থেকে। কয়েক হপ্তা পরে নিজেই এল আমার আফিসে—প্রফেসরের হুকুম মত।

বললে—'চ্যালেঞ্জার পাঠিয়েছেন।'

'হাঙরের আগে আগে পাইলট মাছ ছোটে শুনেছি। তুমি সেই পাইলট মাছ।'

'যা খুশী বলতে পার। ওঁর সঙ্গে থাকলেও বুক দশ হাত হয়। সত্যিই আশ্চর্য মানুষ হে—কাজ তো প্রায় মেরে এনেছেন। যে কোন মুহূর্তে ঘণ্টা বাজিয়ে পর্দা তুলে ভেল্কি দেখাবেন। এবার তোমার পালা।'

'চোখে না দেখা পর্যন্ত এক বর্ণও বিশ্বাস করছি না। তবে আমি তৈরী। মালপত্র সব গুছিয়ে রেখেছি লরীতে। হুকুম হলেই বেরিয়ে পড়ব।'

'তাহলে তাই পড়ো। তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি তো। প্রচণ্ড উদ্যম আর সময়ানুবর্তীতায় নাকি ঠাসা তোমার চরিত্র—আমার নাম ডুবিও না। আপাততঃ এসো আমার সঙ্গে। ট্রেনে বসে বলব কি করতে হবে।'

সেদিন মে মাসের বাইশ তারিখ—বসন্তের মিষ্টিমধুর সকাল। শুরু হল আমার স্মরণীয় অভিযান—দুদিন পরেই যে অঞ্চল বিখ্যাত হতে চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে—যে রঙ্গমঞ্চে ছোট্ট একটা ভূমিকা অভিনয়ের সুযোগ আমি পেয়েছি—রওনা হলাম সেই পতিত জমি অভিমুখে। চলন্ত ট্রেনে বসে টেড আমাকে একটা চিঠি দিল। চ্যালেঞ্জার লিখেছেন আমাকে। চিঠির মধ্যে রয়েছে আমার কর্মের ফিরিস্তি।

'মহাশয়' (শুরু হল চিঠি)—

'হেংগিস্ট ডাউনে পৌঁছে চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ বার ফোর্থের সঙ্গে দেখা

করবেন—আমার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন উনিই। তরুণ বন্ধু ম্যালোন এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছে কাউকে আমার কাছে আসতে দিতে চাই না বলে। ছোকরার সঙ্গে হরবখৎ যোগাযোগ রয়েছে আমার—লোকজনের হামলা থেকে আমাকে আগলে রাখার ভার ওকেই দিয়েছি। চোদ্দ হাজার ফুট সুড়ঙ্গের নিচে পৌঁছে অদ্ভুত অনেক কাণ্ডকারখানার সম্মুখীন হয়েছি। পৃথিবীগ্রহের দেহটা যে কি, সে সম্বন্ধে আমার ধারণাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়েছে। কিন্তু আরো চাঞ্চল্যকর প্রমাণ দরকার—নইলে আধুনিক বিজ্ঞানী মহলের জড় মস্তিষ্ককে সচেতন করা যাবে না। সে প্রমাণ দেবেন আপনি—দেখবে ওরা। লিফটে চড়ে পাতালে নামবার পথে দেখবার চোখ যদি থাকে, তাহলে পর-পর দেখবেন মাধ্যমিক খড়িস্তর, কয়লার খনি, ডেভনিয়ান আর কেমব্রিয়ান নিশানা এবং সব শেষে গ্র্যানাইট পাথর। সুড়ঙ্গের তলদেশ ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। অনুগ্রহ করে ত্রিপলে হাত দেবেন না। তলার স্পর্শ-কাতর বস্তুটাই পৃথিবীর চামড়ার বাইরের দিক—বুঝেশুনে হাত দিতে না পারলে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে—যে কাণ্ড পরে ঘটাতে চাইছি তা আগেই ঘটে যেতে পারে। আমার নির্দেশমত তলদেশ থেকে বিশফুট ওপরে আড়াআড়ি ভাবে সুড়ঙ্গের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত দুটো মজবুত লোহার বরগা রাখা হয়েছে—দুটোর মাঝখানে সামান্য ফাঁক আছে। আপনার কুয়োর নল ঐ ফাঁকে আটকে থাকবে—ক্লিপের মত বরগা দুটো দুপাশ থেকে ধরে রেখে দেবে। পঞ্চাশ ফুট লম্বা ড্রিল নিলেই কাজ চলবে। বরগার নিচ দিয়ে বিশ ফুট নেমে যাবে ত্রিপলের মাথা পর্যন্ত—আর বেশী নামাতে যাবেন না—প্রাণটা বেঘোরে যাবে। বাকী তিরিশ ফুট উঠে থাকবে বরগার ওপরে। ড্রিল ছেড়ে দিলেই নিজের ভারেই ড্রিলের ছুঁচোলো অংশ পৃথিবীর নরম বস্তুর মধ্যে আপনা থেকেই চল্লিশ ফুট পর্যন্ত ঢুকে যাবে আশা করছি। বস্তুটা অত্যন্ত নরম—ঠেলে ঢোকানোর দরকার হবে না। মোটামুটি বুদ্ধি থাকলেই আমার এই নির্দেশ বোঝা উচিত—কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে মনে হয় আর একটু বোঝানোর দরকার। দরকার মত আমার তরুণ বন্ধু ম্যালোনের মারফৎ জিজ্ঞাসা কিছু থাকলে খবর পাঠাবেন।

'জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।'

অনুমান করে নিন কি নিদারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পৌঁছোলাম সাইথ ডাউন্সের উত্তর সানুদেশে—স্টরিঙটন স্টেশনে। অতি ঝরঝরে একটা রদ্দিমার্কা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভক্সহল থারটি। সেই

গাড়ীতে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে গেলাম মাইল ছ-সাত পথ। রাস্তায় লোকজন গাড়ী-ঘোড়া যায় হামেশাই। এক জায়গায় একটা ভাঙা লরী পড়ে আছে ঘাসের মধ্যে। বুঝলাম, আমাদের মতই অবস্থা কাহিল হয়েছিল লরীর মালিকের—লরী ফেলেই পালাতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। আরেক জায়গায় আগাছার মধ্যে উঁকি মারছে মরচে পড়া একটা বিরাট যন্ত্র। ভালভ আর পিস্টন দেখেই বুঝলাম জিনিসটা কি—হাইড্রলিক পাম্প।

কাষ্ঠ হেসে ম্যালোন বললে—'কার কাণ্ড জানো? খোদ চ্যালেঞ্জারের। উনি যেমনটি চেয়েছিলেন তার থেকে সামান্য ফারাক হয়েছিল। এক ইঞ্চির দশভাগের একভাগ। কিন্তু কিছুতেই নিলেন না—ঐখানেই ফেলে দিলেন।'

'সেকি! মামলা হয়ে যাবে যে! গেছেও নিশ্চয়?'

মামলার কথা আর বলো না ভাই। এখানেই একটা আদালত বসানো দরকার। সারা বছর একজন বিচারপতিকে ব্যস্ত রাখার মত মামলা জুগিয়ে যাবেন চ্যালেঞ্জার। শুধু আদালত বলে কেন, একটা আলাদা গভর্ণমেন্টও দরকার শুধু ওঁর জন্যে। কারও ধার ধারেন না হে! রেক্স বনাম জর্জ চ্যালেঞ্জার, জর্জ চ্যালেঞ্জার বনাম রেক্স। এক আদালত থেকে আরেক আদালতে শয়তানের নাচ নেচে বেড়াবে দু'জনে—মামলা কিন্তু শেষ হবে না। এসে গেছি। এই যে জেনকিন্স, পথ ছাড়ো—আমি হে আমি।'

কপির মত কানওয়ালা অদ্ভুত চেহারার বিশালকায় এক ব্যক্তি গাড়ীর মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল সন্দিগ্ধ চোখে। ম্যালোনের গলা শুনে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে স্যুট সেলাম ঠুকল খটাং শব্দে।

'তাই বলুন, আপনি এসেছেন। আমি ভাবলাম আমেরিকান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সেই ছিনেজোঁকটা।'

'এসে গেছে নাকি ওদের লোক?'

'আজকে এসেছিল। গতকাল তাড়িয়েছি টাইমস্-এর লোক। মাছির মত চারদিকে ভ্যানভ্যান করছে দিনরাত। ঐ দেখুন না—' দূরে দিগন্তের কাছাকাছি একটা কালো বিন্দু দেখিয়ে বললে—'চকচক করছে দেখছেন? টেলিস্কোপ বসিয়েছে শিকাগোর ডেলী নিউজ পত্রিকা। আঠার মত লেগে রয়েছে পেছনে। কাকের মত ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসে আছে বেকন বরাবর।'

'বেচারা! আমি নিজে খবরের কাগজে কাজ করি বলেই ওদের মনের অবস্থাটা বুঝি!' বলতে বলতে আমাকে নিয়ে গেট পেরিয়ে এল ম্যালোন—

গেটের দুপাশে দুর্ভেদ্য কাঁটাতারের মারাত্মক বেড়া।

চীৎকারটা শুনলাম ঠিক তখনি। পেছন থেকে আকুল কণ্ঠে 'ম্যালোন! টেড ম্যালোন!' বলে কে যেন বুকফাটা কান্না কেঁদে উঠল। চমকে ফিরে দেখি গেট-কীপারের আসুরিক বাহুবন্ধনে ছটফট করছে একজন বেঁটে মোটা লোক—মোটরবাইক চালিয়ে এসে নামতে না নামতেই ঝাপটে ধরেছে দ্বাররক্ষক।

'ছাড়ো বলছি। খবরদার হাত দিও না গায়ে! ম্যালোন! হাড় গুঁড়িয়ে দিল যে গরিলাটা—ছেড়ে দিতে বলো না!'

'জেনকিন্স! জেনকিন্স! ছাড়ো, ছেড়ে দাও। আমার বন্ধু। কি হে বুড়ো বরবটি, এ তল্লাটে কি মনে করে? তোমার এখতিয়ার তো ফ্লিট স্ট্রিটে—মরতে সাসেক্সে এসেছো কেন?'

'যে জন্যে তুমি এসেছো।—গল্প একটা লিখতেই হবে হেংগিস্ট ডাউন্স রহস্যের ওপর। হুকুম হয়েছে লেখা না নিয়ে যেন ফিরি।'

'কিন্তু রয়, তা যে হবার নয়। তারের বেড়ার এদিকে আসতে হলে অনুমতি চাই প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের।'

'আরে, সে চেষ্টাও কি করিনি? গেছিলাম আজ সকালে।'

'কি বললেন প্রফেসর?'

'কি আবার বলবেন!' উৎকট মুখভঙ্গী করে বলল রয়—'বললেন অনু-মতি দেওয়ার আগে জানলা গলিয়ে আমাকে ফেলে দিল কেমন হয়?'

হেসে উঠল ম্যালোন।

'তুমি তখন কি বললে?'

'আমি বললাম, দরজাটা কি দোষ করেছে? বলেই আর দাঁড়াই নি। দরজাটা যে সত্যিই কোন দোষ করেনি, তা প্রমাণ করার জন্যেই সাঁৎ করে বেরিয়ে এসেছি দরজা দিয়ে। তর্ক করার সময় তখন নয়। কিন্তু লণ্ডনের দাড়িওলা অসুরটা আর এখানকার এই গলাকাটা গুণ্ডাটা আমার ক্যামেরার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। ম্যালোন, তুমি এদের নিয়ে আছো কি করে?'

'রয়, ইচ্ছে করলে আমি সবই পারি। কিন্তু এ-যাত্রা তুমি হেরে গেলে। ফ্লিট স্ট্রীটে তো শুনি তোমাকে নাকি আটকানোর ক্ষমতা দুনিয়ার কারো নেই—কিন্তু এখানে তোমার নাক গলানোর ক্ষমতাও নেই। খামোকা মাঠে ময়দানে পড়ে না থেকে বরং অফিসে ফিরে যাও। দিন কয়েকের মধ্যে চ্যালেঞ্জারের অনুমতি এলেই খবর তোমার অফিসে পৌঁছে দেব।'

'ঢোকা তাহলে যাবে না?'

'একদম না।'

'টাকা দিলে আপত্তি আছে?'

'সেটা তুমিই ভাল জান।'

'শুনেছি নিউজিল্যাণ্ডে যাওয়ার সোজা রাস্তা এইটাই।'

'তার চাইতেও সোজা রাস্তায় পৌঁছে যাবে হাসপাতালে—যদি এর পরেও নাক গলানোর চেষ্টা করো। আর বকিও না—কেটে পড়ো। অনেক কাজ বাকী।'

কম্পাউণ্ডে পা দিয়ে ম্যালোন বললে—'ওঁর নাম রয় পার্কিন্স—যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদদাতা। এক সময়ে একসঙ্গে কাজ করেছি দু'জনে। রয় নাকি অজেয় —জগতের কোন বাধাই ওর কাছে বাধা নয়—ওর সেই সুনাম আজ ক্ষুণ্ণ হল। ওর ঐ নিরীহ ভাল মানুষের মত মুখখানাই ওকে সব বাধা পার করিয়ে ছাড়ে। আচ্ছা, ঐ যে বাড়ীগুলো দেখছ—' আঙুল দিয়ে দূরে কতকগুলো লাল ছাদের ভারী সুন্দর বাংলো দেখিয়ে বললে ম্যালোন—'ওখানে থাকে শ্রমিক কর্মচারীরা। মোটা মাইনে দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে নানান জায়গা থেকে —প্রত্যেকেই অবিবাহিত এবং কথা দিয়েছে মদ খাবে না, এখানকার কথাও কাউকে বলবে না। সেইজন্যেই একটা কথাও ফাঁস হয়নি আজ পর্যন্ত। ঐ মাঠটা ফুটবল খেলার জন্যে। একটেরে বাড়ীটায় লাইব্রেরী আর ফুর্তি করার ঘর—দুটোই আছে। যাই বলো, বুড়ো বৈজ্ঞানিক সংগঠন করতে জানেন। ঐ আসছেন মিঃ বারফোর্থ—ইঞ্জিনীয়ারদের বড়কর্তা।'

রোগা, লম্বা, বিষণ্ণ-বদন এক ব্যক্তি ভীষণ উদ্বিগ্ন মুখে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে।'

কথাও বলল বিমর্ষ কণ্ঠে—'আপনিই নিশ্চয় আর্টেজিয়ান ইঞ্জিনীয়ার? আপনি আসবেন আগেই শুনেছি। বাঁচলাম এতক্ষণে। বলব কি মশাই, আধমরা হতে বসেছি স্রেফ দায়িত্বের বোঝায়—স্নায়ু আর নিতে পারছে না। সুড়ঙ্গ খুঁড়ছি আজ কতদিন হল—কখন যে কি উৎপাত উঠে আসবে, সেই উৎকণ্ঠাতেই প্রাণ আমার যায় যায়। কখনো তেড়েফুঁড়ে উঠছে খড়িজলের ফোয়ারা, আবার কখনো দেখছি কয়লার খনি, কখনো পেট্রলের পাতাল পুকুর, আবার কখনো স্রেফ নরকের আগুন। জানি না শেষ পর্যন্ত কি আছে—যাই থাকুক না কেন, সে মোকাবিলার ভার আপনার।'

'একদম নিচে কি খুব গরম?'

'গরম তো বটেই। বিলক্ষণ গরম। তবে কি জানেন, বাতাসের ঐ চাপও বদ্ধ পরিবেশে গরম তো থাকবেই—তার বেশী নয়। টাটকা বাতাস

ঢুকিয়ে বদ্ধ পরিবেশে বাতাস যে টেনে তুলে আনা হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু বেশী গভীর সুড়ঙ্গে তাতে কি কোনো সুরাহা হয়? দু'ঘন্টার বেশী পাতাল সুড়ঙ্গে আজ পর্যন্ত কেউ থাকতে পারেনি। প্রফেসর নিজেও নেমেছিলেন গতকাল। কাজ দেখে খুব খুশী। দুপুরে খেতে আসুন। তারপর নিজের চোখেই দেখবেন'খন।'

সামান্যই খেলাম এবং তাড়াতাড়ি খেলাম। তারপর ম্যানেজার সযত্নে দেখালেন ইঞ্জিন-হাউসের যাবতীয় যন্ত্রপাতি। সেই সঙ্গে দেখলাম ঘাসের ওপর ছড়িয়ে বিস্তর ভাঙাচোরা কলকব্জা—কোন কাজেই আর লাগে না। একপাশে প্রকাণ্ড অ্যারল হাইড্রলিক বেলচা—প্রথম দিকে মাটি খোঁড়া হয়েছে এই দিয়ে, এখন পুরো মেশিনটাই খুলে ফেলে রাখা হয়েছে ঘাসের ওপর। ঠিক তারপাশেই রয়েছে আর একটা অতিকায় মেশিন। ইস্পাতের দড়ির ওপর বাঁধা সারি সারি বালতি পাতালে নামিয়ে মাটি কাটা রাবিশ তুলে আনত পাতাল-সুড়ঙ্গ থেকে। পাওয়ার হাউসে হেলায় পড়ে বেশ কয়েকটা এসচার উইস টারবাইন। সাংঘাতিক শক্তি ধরে প্রতিটি ইঞ্জিন। হর্স-পাওয়ারের হিসেবে শক্তির ধরনটা হয়ত বোঝা যাবে না—তাই অন্যভাবে বুঝিয়ে বলছি। মিনিটে একশ চল্লিশবার ঘুরপাক খাওয়ার ক্ষমতা রাখে এক-একটা টারবাইন—চালু রাখে হাইড্রলিক অ্যাকুমুলেটর্স্—ফলে, তিন ইঞ্চি পাইপের মধ্যে দিয়ে প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে চোদ্দশ পাউণ্ডের প্রচণ্ড চাপ সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে গিয়ে চালাতে থাকে চার-চারটে রক-ড্রিল, ঘুরতে থাকে ব্র্যাণ্ডটাইপের ধারালো ফলা। ইঞ্জিন হাউসের ওপরেই পাওয়ার হাউস। চারদিকে এত আলো জ্বলছে এই পাওয়ার হাউসের দৌলতেই। তারপরেই আর একটা দু'শ অশ্বশক্তিসম্পন্ন মহাকায় টারবাইন—দশ ফুট পাখা ঘুরিয়ে বারো ইঞ্চি পাইপের মধ্যে দিয়ে হু হু করে বাতাস ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে সুড়ঙ্গের তলদেশে। ম্যানেজার অতি যত্নের সঙ্গে প্রতিটি মেশিন দেখলেন, যান্ত্রিক বিবরণ বিশদভাবে বোঝালেন। শুনতে শুনতে আমার সারা গা হাত পা-য়ে যেন খিঁচ ধরে গেল—যেমনটা এই মুহূর্তে হয়ত হচ্ছে এই কাহিনীর পাঠকের। বাঁচলাম একটা ঝনঝনাৎ আওয়াজ শুনে। ফিরে দেখি আমারই লেল্যাণ্ড লরী আসছে। বিরাট লরী—এক সঙ্গে তিনটন মাল টানতে পারে। লরীর ওপর ঠাসা আমার যন্ত্রপাতি, টিউব এবং টুকিটাকি বিস্তর জিনিস। স্তূপাকার মালপত্রের ওপর বসে আমার ফোরম্যান পিটার, আর একজন মুখে তেল কালি মাখা ভীষণ নোংরা অ্যাসিস্ট্যান্ট। গোঁ-গোঁ করে গজরাতে গজরাতে ঘাসের ওপর গিয়ে

দাঁড়াল রাক্ষুসে লেল্যাণ্ড। দুই মূর্তি টপাটপ লাফিয়ে নেমে মাল নামাতে লাগল নিচে—বক্তৃতার তোড়ে বাধা পড়ায় স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচলাম আমি। ম্যালোন আর আমাকে নিয়ে ম্যানেজার এগোলেন সুড়ঙ্গের দিকে।

সে এক অদ্ভুত জায়গা। মনে মনে যা ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক ব্যাপকভাবে এলাহি কাণ্ড চলছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। ঘোড়ার খুরের আকারে ছোটখাট পাহাড় ঘিরে রয়েছে পুরো অঞ্চলটা। এ পাহাড় মনুষ্য নির্মিত। ধরিত্রীর জঠর বিদীর্ণ করে সুড়ঙ্গ নেমেছে নিচে—মাটি তুলে ঢালা হয়েছে পাহাড়ের আকারে। খড়িমাটি, কাদামাটি, কয়লা, গ্র্যানাইট —এই চারটে জিনিসই দেখলাম অশ্বখুরাকৃতি সেই পাহাড়ে। পাহাড় যেখানে তিন দিকে ঢালু হয়ে এসে মিশেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে সারি সারি লোহার থাম আর বড় বড় চাকা—গম্ভীর গর্জনে চলেছে পাম্প, চালু রয়েছে পাতাললিফট। ইঁটের তৈরী টানা লম্বা একটা বাড়ী নির্মিত হয়েছে আড়াআড়ি ভাবে ঘোড়ার খুরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। পাম্প রয়েছে এই বাড়ীর একদিকে—আর একদিকে সুড়ঙ্গের খোলা মুখ। তিরিশ কি চল্লিশ ফুট ব্যাসের একটা প্রকাণ্ড হাঁ—ওপরে ইঁট আর সিমেন্টের ছাউনী। ঘাড় লম্বা করে আট মাইল গভীর সেই অকল্পনীয় সুড়ঙ্গের গভীরে তাকাতেই মাথা ঘুরে গেল আমার। তেরচাভাবে রোদ পড়েছে সুড়ঙ্গের মুখে —কয়েক-শ ফুট পর্যন্ত খড়িমাটির স্তর দেখা যাচ্ছে—মাটি যেখানে আলগা, ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা আছে, সেই জায়গাগুলো ইঁটের গাঁথনি দিয়ে মজবুত করা হয়েছে। গহ্বরটা সোজা নেমে গেছে পাতালে—অনেক নিচে অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা আলোর কণা—আলপিনের ডগার মত ছোট্ট—কিন্তু মিশমিশে অন্ধকারের বুকে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল।

'কিসের আলো, ম্যালোন?' শুধোলাম আমি।

পাঁচিলে ভর দিয়ে আমার পাশে দাঁড়ল ম্যালোন। মাথা বাড়িয়ে দেখল আলোর বিন্দুটা।

বলল—'খাঁচা উঠছে। চমৎকার লাগছে দেখতে, তাই না? চোখ ফেরানো যায় না। ও রকম অনেক খাঁচাই ওঠানামা করছে কিন্তু আট মাইল বরাবর। আলোটা শক্তিশালী আর্কল্যাম্পের। খুব জোরে আসছে —পৌঁছোবে মিনিট কয়েকের মধ্যেই।'

সত্যিই যেন নক্ষত্রবেগে উঠে এল আলোর কণাটা। অন্ধকারের মধ্যে থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই ধেয়ে এল ওপরে। দ্রুত আকারে বৃদ্ধি পেল

প্রতিময় কণা—প্রখর দীপ্তিতে দিনের আলোর মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সুড়ঙ্গ। চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। তাকিয়ে থাকতেও পারলাম না। তারপরেই খটাং খট করে চাতালে এসে লাগল লোহার খাঁচা। নেমে এল চারজন লোক—এগিয়ে গেল প্রবেশ পথের দিকে।

'যাক, সবাই ফিরেছে,' বললে ম্যালোন—'দু-ঘণ্টা শিফট ডিউটি বড় কম কথা নয়। নিচে নামলেই বুঝবে। তোমার কিছু জিনিস এই সঙ্গে নামিয়ে দিতে পারো। তুমিও চল। নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না।'

ইঞ্জিন হাউসের লাগোয়া একটা বাড়ীতে ম্যালোন নিয়ে গেল আমাকে। হাল্কা তসরের কাপড়ে তৈরী অনেকগুলো পোশাক ঝুলছিল দেওয়ালে। ম্যালোনের দেখাদেখি আমিও আগে নিজের জুতো মোজা কোট প্যাণ্ট জামা গেঞ্জি—সব খুললাম। তারপর গায়ে দিলাম তসরের পোশাক—পায়ে পরলাম রবারের চটি। আমার আগেই ধড়াচূড়া পরে নিয়ে সাজঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ম্যালোন। ঠিক তার পরেই একটা ভীষণ হাঁকডাক কানে ভেসে এল—যেন এক সঙ্গে দশটা কুকুর ঝটাপটি করছে। ছুটে বেরিয়ে এসে দেখি আমারই সেই ঝুলকালি মাখা অ্যাসিস্ট্যাণ্টটিকে জাপটে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ম্যালোন। কুয়োখোঁড়ার জন্যেই পিটার ওকে এনেছে—কিন্তু ম্যালোন আসুরিক বলে কি যেন ছিনিয়ে নিতে চাইছে লোকটার হাত থেকে—তেলকালি মাখা অ্যাসিস্ট্যাণ্টটিও তেমনি গোঁয়ার—মরিয়া হয়ে আঁকড়ে রয়েছে জিনিসটা। কিন্তু ম্যালোনের সঙ্গে পারবে কেন—ওর গায়ের জোরের খবর আমি অন্ততঃ রাখি। হাত থেকে জিনিসটা কেড়ে নিয়ে পায়ের তলায় ফেলে দমাদম করে তার ওপর খানিক নেচে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছাড়ল চক্ষের নিমেষে। ভেঙে যাওয়ার পর বুঝলাম বস্তুটা কি। ফটো তোলার ক্যামেরা। তেলকালি মাখা আমার সেই অ্যাসিস্ট্যাণ্টটি মুখখানা আরো কালো করে উঠে দাঁড়ালো ভূমিশয্যা ছেড়ে। বললে ভীষণ তীব্র স্বরে—'ম্যালোন, তুমি জাহান্নমে যাও। মেশিনটার দাম কত জানো? দশ গিনি। আনকোরা নতুন।'

'উপায় নেই, রয়। স্বচক্ষে যখন দেখলাম ছবি তুলছো, এ ছাড়া আর পথ ছিল না।'

রাগের চোটে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত চিড়বিড়িয়ে উঠল আমার। ধমকে উঠলাম কড়া গলায়—'আমার কোম্পানীর ইউনিফর্ম পেলেন কোত্থেকে?'

রয় লোকটা সত্যিই পাজীর পা-ঝাড়া। মিটমিটে শয়তান। মিচকে-পোড়া বদমাস। চোখ-টোখ টিপে দাঁত বার করে এমন একটা হাসি হাসল যেন দারুণ একখানা তামাসা হয়ে গেল এইমাত্র।

বলল—'কি যে বলেন! কায়দার কি আর শেষ আছে। এ বান্দা পারে না হেন কাজ নেই। আপনার ফোরম্যান কিন্তু কিস্সু জানেন না—ওঁকে যেন দুষবেন না। উনি তো ছেঁড়া ন্যাকড়া ভেবে ফেলে দিয়েছিলেন। আমি কি করলাম জানেন? নিজের জামা কাপড় দিলাম ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্টকে—ব্যস, পেয়ে গেলাম ভেতরে আসার ছাড়পত্র।'

'ঢের হয়েছে, এখন বেরিয়ে যাও!' কাঠচেরা গলা ম্যালোনের—'না, না, তর্ক করো না। তোমার বরাত ভাল চ্যালেঞ্জার এখানে নেই। কিন্তু মনে রেখো এখানকার ডালকুত্তার কাজটা আমাকেও করতে হচ্ছে। শুধু ঘেউ ঘেউ করে ডেকেই ছেড়ে দেব তা ভেব না—ঘ্যাঁক করে কামড়েও দিতে পারি। বেরোও! বেরিয়ে যাও! কুইক মার্চ!'

হল্লা শুনে কম্পাউণ্ড থেকে দু'জন রক্ষী দৌড়ে এসেছিল। তারা তো হেসেই খুন ম্যালোনের কাণ্ড দেখে। বত্রিশপাটি দাঁত বার করে দু'পাশ থেকে বগল দাবা করল অত্যুৎসাহী রয়কে এবং কুচকাওয়াজ করিয়ে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। এর কিছুদিন পরেই 'অ্যাডভাইসার' পত্রিকায় চার-কলম জুড়ে চাঞ্চল্যকর সেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল কেন, সুধী পাঠকপাঠিকারা এবার নিশ্চয় তা উপলব্ধি করছেন। 'বৈজ্ঞানিকের উন্মাদ স্বপ্ন'—এই ছিল পিলে চমকানো সেই নিবন্ধের জবরদস্ত শিরোনামা—তার তলায় সাব-টাইটেল ছিল এই: 'অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সোজা পথ'। প্রবন্ধটা বেরোনোর পরেই সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হতে হতে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং 'অ্যাডভাইসার' কাগজের সম্পাদক মশাইকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাঁর জীবনের সব চাইতে বিপজ্জনক এবং বিরক্তিকর এক সাক্ষাৎকারের। চ্যালেঞ্জারের মাথার শির ছিঁড়ে যায় নি নেহাৎ পরমায়ুর জোর ছিল বলে। সে কী প্রবন্ধ। রয় পার্কিন্স ওর সমস্ত প্রতিভা সন্নিবেশিত করেছিল ঐ একখানি কাহিনীর মধ্যে। অনেক রঙ চাপিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চুটিয়ে লিখেছিল 'কাঁটা-তার ঘেরা গলা-কাটা গুণ্ডা-বেষ্টিত টহলদার ডালকুত্তা সংরক্ষিত' কম্পাউণ্ডে 'বহু-অভিজ্ঞ রণক্ষেত্র-সাংবাদিক পার্কিন্সের' রক্তলাল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, লিখেছিল কিভাবে 'এনমোর গার্ডেন্সের লোমশ বণ্ডাটা' নাকি 'অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান সুড়ঙ্গ প্রায় শেষ করে এনেছেন—কিন্তু তাঁর ভাড়াটে গুণ্ডারা সুড়ঙ্গের মুখ থেকেও মারতে মারতে

টেনে এনেছে 'বহু-অভিজ্ঞ রণক্ষেত্র-সাংবাদিক রয় পার্কিন্স'কে। এদের মধ্যে একজনকে রয় পার্কিন্স চেনে। 'লোকটা সবজান্তা ওস্তাদ—সাংবাদিক মহলেও কিছুদিন ঘুর ঘুর করেছিল সাংবাদিক হওয়ার সুদূর স্বপ্ন নিয়ে'। আরেকজন পরেছিল 'অদ্ভুত ধরনের প্রাচ্যদেশের পোশাক—কদাকার পৈশাচিক চেহারা তার—আর্টেজিয়ান ইঞ্জিনীয়ার বলে নিজেকে জাহির করলেও দেখতে মাল-টানা ছ্যাকরা গাড়ীর মতই'। এইভাবে মনের সুখে আমাদের দুজনের পিণ্ডি চটকে মনটা হাল্কা হয়ে যাওয়ার পর রয় পার্কিন্স আশ্চর্য নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে পাতাল-কূপের মুখের কাছে রেললাইন পাতা হয়েছে কি ভাবে, কি ভাবে মাটি কাটা হয়েছে তেড়াবেঁকা পথে যাতে ফাঁদল টাইপের ট্রেন মাটি নেওয়ার জন্যে নামতে পারে পাতাল-কূপের মুখে। জমজমাট সেই প্রবন্ধটায় লাভ হয়েছিল একটাই—সাউথ ডাউন্সের নিষ্কর্মা ভবঘুরেরা আরো বেশী করে ভীড় জমিয়েছিল আশে পাশে এবং শেষের সেইদিন যখন এসেছিল—অত কাছে জটলা পাকানোর জন্যে পস্তাতে হয়েছিল শোচনীয়ভাবে।

আমার ফোরম্যানটি সত্যিই কাজের। এইটুকু সময়ের মধ্যেই হাতাহাতি করে লরী খালি করে মালপত্র নামিয়ে ফেলেছে ঘাসের ওপর। যন্ত্রপাতি, ঘন্টাবাক্স, ক্রোজফুট, ভি-ড্রিল, ওজন—সব তৈরী। ম্যালোন কিন্তু বেঁকে বসল। ওর ইচ্ছে জিনিসপত্র পরে নামালেও চলবে—আগে নামতে হবে আমাকে। কাজেই উঠে বসলাম ইস্পাতের জাল ঘেরা খাঁচায়। চীফ ইঞ্জিনীয়ার রইলেন সঙ্গে। হু-হু করে নামতে লাগলাম ভূগর্ভে। নামতে নামতে দেখলাম, কূপের মাঝে মাঝে একটা করে চাতাল—প্রত্যেকটা চাতালে ঝুলছে একটা লিফট। বৃটিশ লিফটের মত শম্বুকগতি নয়—রেল-গাড়ীর মতই ছুটতে বায়ুবেগে। অথচ কিন্তু মনেই হচ্ছে না ওপর থেকে নিচে পড়ছি—যেন রেলে চড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।

প্রতিটি খাঁচাই স্টীলের জাল দিয়ে ঘেরা—প্রখর আলো মাথা থেকে ঠিকরে যাচ্ছে কুয়োর দেওয়ালে। অস্পষ্ট কিছুই নেই। চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে ভূ-স্তর। সাঁৎ করে মিলিয়ে যাচ্ছে ওপরে। খড়িস্তর খুব পুরু নয়। তারপরেই এল কফি রঙের হেষ্টিংস স্তর, হাল্কা রঙের অ্যাসবার্ণহাম স্তর, গাঢ় রঙের কার্বনিফেরাস কাদামাটি, তারপরেই বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিকমিক করে উঠল একটার পর একটা কুচকুচে কালো কয়লার স্তর—মাঝে মাঝে কাদামাটির বলয়। ইঁটের গাঁথনি দিয়ে আলগা মাটিকে জায়গায় জায়গায় ঠেকিয়ে রাখা হলেও সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে পুরো কুয়োটা দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালের নিজস্ব শক্ত গাঁথনির ওপর। দেখলে তাক লেগে

যায়। কি পরিমাণ যান্ত্রিক দক্ষতা আর মেহনতের ফলে এ কাণ্ড সম্ভব হয়েছে—অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। কয়লার খনির ঠিক নিচেই যেন তাল তাল সিমেন্টের ডেলা দেখলাম মনে হল। পরক্ষণেই হু-উ-উ-স করে লিফট নেমে এল গ্র্যানাইট স্তরের মাঝে—চারদিকে লক্ষ হীরের মত ঝলমল করতে লাগল দেওয়ালে গাঁথা কোয়ার্জ ক্রস্টালের দানা। এই হল আদিম গ্র্যানাইট—হীরকচূর্ণের মত হ্যুতিময় ক্রুরোর দেওয়াল। নামলাম আরও নিচে—অনেক নিচে—জীবিত মানুষ এত পাতালে অবতরণের কথা কল্পনাও করতে পারেনি কখনো—একজন ছাড়া। চোখের সামনে দিয়ে তীরবেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে প্রাচীন পাথরের বিচিত্র নমুনা। লালচে-সাদা ফেল্‌স-পারের স্তরটা জীবনে ভুলতে পারব না। গোলাপী রঙের আদিম প্রস্তর অপার্থিব রূপে ঝিলমিল করেছিল অনেকক্ষণ—স্তরটা অনেকখানি—প্রখর আলোয় যেন গোলাপী বিদ্যুৎ ছুটছিল দেওয়ালের গা থেকে। এইভাবে পেরিয়ে চললাম চাতালের পর চাতাল—লাফ দিয়ে ঢুকলাম এক লিফট থেকে আরেক লিফটে। উত্তরোত্তর বেড়েই চলল তাপমাত্রা—ভারী হতে লাগল বাতাস। হাল্কা তসরের পোশাকও ঘামে আটকে গেল গায়ের সাথে—দরদর ধারায় ঘাম গড়িয়ে ঢুকতে লাগল পায়ের চটিতে। শেষকালে মনে হল আর বুঝি পারব না—এত গরম সওয়ার ক্ষমতা আমার ফুরিয়েছে—ঠিক তখনি দেওয়ালের গা থেকে বার করা একটা গোলাকার চাতালে এসে দাঁড়িয়ে গেল লিফট। নেমে দাঁড়ালাম মঞ্চে। অদ্ভুত চোখে চারপাশের দেওয়াল দেখে নিল ম্যালোন। ওকে আমি জানি বলেই বলছি, ওর চোখের চাউনি দেখে সেদিন আমার বুকও কেঁপে উঠেছিল। অত বুকের পাটা দ্বিতীয় কোন পুরুষের আছে বলে আমার জানা নেই। তা সত্ত্বেও সেদিন সেই মুহূর্তে ম্যালোনের ভয়-তরাসে চোখে ফুটে উঠেছিল আত্যন্তিক স্নায়বিক দুর্বলতা।

চীফ ইঞ্জিনীয়ার দেওয়ালে হাত বুলিয়ে নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরলেন হাতটা। বললেন—'দেখেছেন? অদ্ভুত, তাই না?' দেখলাম, চটচটে গাঁজলার মত কি যেন লেগে হাতময়। 'প্রফেসর তো ভীষণ খুশী এই দেখে—আমি কিন্তু মশায় মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। দেওয়াল কি রকম কাঁপছে দেখেছেন? নিচ পর্যন্ত চলছে এই কাঁপুনি। এই দেখেই তো আনন্দে আটখানা হয়েছেন প্রফেসর। আমি কিন্তু এরকম কাণ্ড জীবনে দেখিনি মশায়।'

ম্যালোন বললে—'গতবারেও এ কাঁপুনি আমি দেখে গিয়েছি। তোমার ড্রিল লাগানোর জন্যে বরগা দুটো দেওয়ালে ঢোকানো হচ্ছিল। দেওয়াল

কাটার সময়ে দেখেছি দেওয়াল যেন চমকে চমকে উঠছে। এক-একটা ঘা পড়েছে—দেওয়াল যেন শিউরে উঠেছে। বুড়োর কথা খাস লণ্ডনে অবাস্তব মনে হতে পারে—ভূপৃষ্ঠের আট মাইল নিচে নয়।'

'তেরপলের নিচে কি আছে যদি দেখেন ভিরমি খাবেন,' বললেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার। 'নিচের দিকের এই পাথর কিন্তু মাখনের মত নরম—কচাকচ কেটেছি—একটুও বেগ পাইনি। কিন্তু পাথর গেল ফুরিয়ে, নিচে দেখা গেল সেই জিনিসটা। বলব কি মশায়—ও-জিনিস পৃথিবীর কেউ কোনদিন দেখেনি। আট মাইল নিচে যে এরকম একটা স্তর থাকতে পারে, কল্পনাতেও আনা যায় না। দেখেই আঁৎকে উঠলেন প্রফেসর—'চাপা দিন! চাপা দিন! এক দম ছোঁবেন না বলে দিলাম।' যে ভাবে উনি চাপা দিয়েছেন, রয়েছে ঐভাবেই। কেউ হাতও দেয়নি।'

'এসেছি যখন একটু দেখতে ক্ষতি কি?'

আতংক ফুটে উঠল চীফ ইঞ্জিনীয়ারের মেহনত-রুক্ষ মুখে।

'বলছেন কি! প্রফেসরের সঙ্গে চালাকির পরিণামটা কি জানেন? ভীষণ ধূর্ত উনি—ঠিক টের পেয়ে যাবেন তেরপল তোলা হয়েছিল। তার-পরের ব্যাপারটা ভাবতে পারেন?—যাক গে, যা হয় হবে, কোণ তুলে ঝট করে একটু উঁকি দেওয়া যাক।'

তেরপলের কোণে বাঁধা একটা দড়ির একপ্রান্ত বাঁধা ছিল দেওয়ালে গাঁথা খরগায়। ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলোয় চকচকে তেরপলের সেই কোণটা দেখে নিয়ে দড়ি ধরে টান দিলেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার—ছ'বর্গগজ পরিমিত জায়গা উন্মোচিত হল চোখের সামনে।

শিউরে উঠলাম অতি অসাধারণ অতি ভয়ংকর সেই দৃশ্য দেখে। দেখলাম, ধূসর বর্ণের চকচকে পিচ্ছিল গাঁজলার মত একটা বস্তু ধীর ভাবে উঠছে নামছে নিঃশ্বাসের ছন্দে। ধুকপুকুনিটা সরাসরি উঠছে না—যেন একটা মৃদুমন্দ তরঙ্গের অতি-ক্ষীণ আভাস—স্পন্দন বেগ সঞ্চারিত হচ্ছে ওপর দিয়ে। ওপরের চেহারাও যেন কেমনতর। এক বস্তু দিয়ে নির্মিত নয়—সর্বত্র সমান প্রকৃতির নয়। যেন ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখছি ভেতর পর্যন্ত—দেখতে পাচ্ছি ছোটবড় কোষের মত বায়ুভর্তি বা তরল পদার্থ ভর্তি অগুন্তি বস্তু। চেহারা তাদের একরকম নয়—আকারও নয়। সাদাটে অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে নিহিত এক অজানা রহস্যময় জগৎ। মন্ত্রমুগ্ধের মত অসাধারণ সেই দৃশ্যের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলাম আমরা তিনজনে।

আতংক-ঘন ফিসফিসানির সুরে ম্যালোন বললে—'ঠিক যেন একটা

ছাল ছাড়ানো জন্তু। ইকিনাসের দৃষ্টান্তই শেষ পর্যন্তই সত্যি হল দেখছি!'

'সর্বনাশ! এই জানোয়ারের গায়ে হার্পুন গাঁথার ভারটা পড়ল শেষ-কালে আমারই কাঁধে!' সভয়ে বললাম আমি।

ম্যালোন বললে—'সেটা তোমার পরম সৌভাগ্য, বন্ধু! এবং আমার চরম দুর্ভাগ্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার পাশেই থাকতে হবে বলে।'

'আমি কিন্তু থাকছি না,' সাফ বলে দিলেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার। 'প্রফেসর যদি জোর করে পাঠান, চাকরী ছেড়ে পালাব। একী! দেখুন! দেখুন! কাণ্ড দেখুন!'

ধূসর বস্তুর ওপর দিকটা সহসা উত্তাল তরঙ্গের আকারে ঠেলে উঠল আমাদের দিকে—জাহাজের গলুইতে দাঁড়ালে যেভাবে ঢেউ ঠিকরে আসে—অনেকটা সেইভাবে। তারপরেই ফের আস্তে আস্তে নেমে গেল নিচে—আবার একঘেয়ে ধীর গতিতে স্পন্দিত হতে লাগল পৃষ্ঠদেশ—মৃদুমন্দ ধুক-পুকুনির ক্ষীণ ধাক্কায় দুলে দুলে উঠতে লাগল ধূসর রহস্য। দড়ি আলগা করে তেরপল নামিয়ে দিলেন বারফোর্থ।

বললেন ভয়ধরা কণ্ঠে—'আমরা আছি বুঝতে পেরেছে মনে হল?'

'কিন্তু ফুলে উঠে তেড়ে এল কেন? আলোর জন্যে মনে হয়। গায়ে আলো পড়তেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।'

'এবার আমায় কি করতে হবে বলুন,' বললাম আমি।

লিফট যেখানে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তার তলা থেকে দুটো লোহার মোটা বরগা আড়াআড়ি ভাবে ঢুকে রয়েছে দু'দিকের দেওয়ালে—মাঝে ইঞ্চি নয়েক ফাঁক। বারফোর্থ সেইদিকে আঙুল তুলে বললেন—'মতলবটা বুড়ো প্রফেসরের। আমার হাতে ছেড়ে দিলে আরও ভালভাবে করতে পারতাম। কিন্তু ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া ঝকমারি। তার চাইতে মুখ বুঁজে হুকুম তামিল করা অনেক নিরাপদ।—ওঁর ইচ্ছে আপনার ছ'ইঞ্চি ড্রিল এনে ঐ ঠেকনার ওপর কোথাও রাখবার ব্যবস্থা করুন।'

'ও আর এমন কি ব্যাপার। আজ থেকেই লাগছি কাজে।' বললাম আমি।

ধরাধামের সবকটা মহাদেশে বহু কূপখননের পাঁচরকম অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু সেদিন যে কাজে হাত দিলাম, তার তুল্য নজীর আমার কর্ম-জীবনে একটিও নেই। ঐখানে দাঁড়িয়ে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম, কেন প্রফেসর বারবার বলেছিলেন ড্রিল ঢোকাতে হবে দূর থেকে। অসুবিধেও

হল না। ইলেকট্রিক কারেন্টের শরণ নিলাম—কেন না আটমাইল গভীর সুড়ঙ্গের আগা থেকে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিক তার পাতা ছিল দেওয়াল বরাবর। ঠিক করলাম দূর থেকে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিক কন্ট্রোল মারফৎ ড্রিল চালিয়ে দেব ধরিত্রীর কোমল জঠরে। ফোরম্যান পিটার আর আমি নিরতিশীম যত্নে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে টিউবগুলো এনে সাজিয়ে রাখলাম পৃথিবী-গর্ভের পাথুরে চাতালে। তারপর সব নিচের লিফট একটু ওপরে তুলে রাখলাম—কাজ করবার জায়গা বার করার জন্যে। ওজনের ভারে ড্রিল পোঁতা যায় ঠিকই—মাধ্যাকর্ষণের জোরে আপনা থেকেই ছুঁচলো ফলা ঢুকে যাবে জঠরে—কিন্তু তবু ওজনের ওপর ভরসা রাখতে পারলাম না। সংঘট্ট-পদ্ধতি প্রয়োগ করব ঠিক করলাম—জোর ধাক্কা দিতে হবে ওপর থেকে। তাই লিফটের তলায় ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত প্রান্তদেশ থেকে কপিকলের মধ্যে দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম একশ পাউণ্ড ওজন সহ টিউবগুলো। ওজন বাঁধা রইল একটি দড়িতে এবং সেই দড়িটি এমনভাবে আটকানো রইল দেওয়ালে যাতে ওপর থেকে সুইচ টিপলেই বিদ্যুৎ প্রবাহের দোলতে দড়ি খসে যাবে দেওয়াল থেকে—ওজনের ভারে ড্রিল গেঁথে যাবে নিচে। কাজটা সূক্ষ্ম এবং অতীব মেহনতের— বিশেষ করে নিরক্ষীয় উত্তাপের চাইতেও জঘন্য ঐ তপ্ত আব-হাওয়ায়। সর্বোপরি রয়েছে পা ফস্কে পড়ে যাওয়ার আতংক। হাত ফসকে একটা যন্ত্রও যদি ছিটকে গিয়ে পড়ে তেরপলের ওপর—অকল্পনীয় বিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই। তটস্থ হয়েছিলাম পরিপার্শ্বের জন্যেও—গায়ের লোম খাড়া হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। মুহুর্মুহু অনুভব করেছি অতি বিচিত্র একটা কাঁপুনি, একটা শিহরণ দেওয়ালের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে—হাত দিতেই স্পষ্ট অনুভব করেছি দূরাগত ক্ষীণ ধুকপুকুনি। তাই কাজকর্ম শেষ করে যখন ওপরে ওঠার সংকেত দিলাম, কি আনন্দই যে হয়েছিল আমার আর পিটারের তা বলবার নয়। বারফোর্থকে বললাম ঝট-পট খবর দিতে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে। সব তৈরী—যখন খুশী শুরু করতে পারেন এক্সপেরিমেন্ট।

বেশী অপেক্ষা করতে হল না। কাজ শেষের তিন দিন পরেই ডাক এল।

নিমন্ত্রণ পত্রটা বাস্তবিকই অসামান্য। ঘরোয়া বৈঠকের নেমন্তন্ন যে ভাবে করা হয়, অনেকটা সেইভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রফেসর। লিখেছেন ঃ

প্রফেসর জি. ই. চ্যালেঞ্জার

এফ. আর. এস., এম. ডি., ডি-এসসি ইত্যাদি।

(জীববিজ্ঞান সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি এবং আরও অনেক সম্মানসূচক খেতাব ও নিয়োগ-পত্রের অধিকারী—ছোট্ট এই কার্ডের স্বল্প পরিসরে অত কথা লেখবার জায়গা নেই)

আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন

মিঃ জোন্সকে (মহিলা সঙ্গিনী আনা চলবে না।)

সময় : ২১ শে জুন, মঙ্গলবার, সকাল সাড়ে এগারোটা।

স্থান : হেংগিস্ট ডাউন, সাসেক্স।

উপলক্ষ্য : মন এবং জড় জগতের ওপর প্রভুত্বের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ।

ভিক্টোরিয়া থেকে বিশেষ ট্রেন ছাড়বে দশটা পাঁচ মিনিটে। যাত্রীরা টিকিটের পয়সা দেবেন পকেট থেকে। খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এক্সপেরিমেন্টের পর—অবস্থা আয়ত্তের বাইরে গেলে খাওয়া না হতেও পারে। স্টেশন : স্টরিংটন।

আর এস. ভি. পি (বড় বড় অক্ষরে চ্যালেঞ্জারের নাম), ১৪, বিস, এনমোর গার্ডেন্স, এস. ডব্লিউ।

একই চিঠি পেয়েছিল ম্যালোন! কাষ্ঠ হেসে বলল—'চিঠি দিয়ে চালিয়াতি দেখাচ্ছেন বুড়ো। আরে বাবা, চিঠি না দিলেও যাব। জল্লাদের হুকুমে ফাঁসিকাঠে হাজির থাকাও বলতে পার। প্রফেসর কিন্তু এর মধ্যেই হৈ-চৈ ফেলেছেন লণ্ডনে। হাটে বাজারে পথে ঘাটে অফিস আদালতে মুখে মুখে কেবল ওঁরই নাম। প্রচার কাকে বলে, চ্যালেঞ্জার তা জানেন।'

অবশেষে এল সেই দিন। আগের দিন রাত্রে আমি নিজে গেলাম সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার জন্যে। ছেঁদা করার ফলা ঝুলছে ঠিক জায়গায়, ওজন চাপানো রয়েছে হিসেব মত, সুইচ টিপলেই বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটে আসবে যে কোন মুহূর্তে। দেখে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। অদ্ভুত এই এক্সপেরিমেন্টে আমার অংশটুকু সুচারুভাবেই পালন করতে পেরেছি ভেবে বেশ ভাল লাগল। সুইচ টেপার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে রন্ধ্র-মুখ থেকে পাঁচশ গজ দূরে—যাতে কোন বিপত্তি না ঘটে। বিশেষ সেই দিনটিতে সাউথ ডাউন্সে পৌঁছে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠলাম পুরো দৃশ্যটা এক নজরে দেখবার অভিলাষে।

গ্রীষ্মের সেই মনোরম ইংলিশ প্রভাতে যা দেখলাম তা মনে থাকবে অনেকদিন। দেখলাম, পৃথিবীর সব লোক যেন জড়ো হয়েছে হেংগিস্ট ডাউনে। যতদূর দুচোখ যায় কেবল মাথা আর মাথা। রাস্তাঘাটে পিল

পিল করছে কেবল মানুষ। গলিঘুঁজি বেয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে মোটরগাড়ী—কম্পাউণ্ডের গেটে নামিয়ে দিচ্ছে আরোহীদের। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার বেশী এগোতে পারছে না। ষণ্ডামার্কা একদল রক্ষী পাহারা দিচ্ছে ফটকে। ঘুষ দিয়ে কান্নাকাটি করেও ঢোকা যাচ্ছে না ভেতরে। কার্ড না দেখালে হাঁকিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরে থেকেই। পাহাড়ের গায়ে, সানুদেশে এবং এদিকে ওদিকে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে ভোর থেকেই। ফটকে তাডা খেয়ে উৎসাহীরা ছুটে গিয়ে ভীড় বাড়াচ্ছে সেখানে। ডার্বিরেসের দিন ঘোড়দৌড়ের মাঠ এপ্‌সম ডাউন্সকে যে রকম দেখায়, পুরো তল্লাটটাকে দেখাচ্ছে সেই রকম। কম্পাউণ্ডের মধ্যে তার দিয়ে ঘেরা পৃথক পৃথক বসবার জায়গা। অভ্যাগতদের কার্ড পরখ করার পর নিয়ে গিয়ে বসানো হচ্ছে নির্দিষ্ট খুপরির আসনে। ঠিক যেন এক একটা খোঁয়ার। একটা খোঁয়ারে বসবেন কেবল লর্ড সভার সদস্যরা, আর একটায় হাউস অফ কমন্সের মাননীয় সভ্যরা, তার পাশেরটায় সমাজ শিরোমণি এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। বার্লিন অ্যাকাডেমীর ডক্টর ড্রিসিঙ্গার এবং সর্বোনের লা পেলিয়ারও থাকছেন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে। টিন আর বালির বস্তা দিয়ে বিশেষ একটা দিক একেবারে আলাদা করে রাখা হয়েছে অন্যের থেকে—এখানে বসবেন রাজ পরিবারের তিনজন।

এগারোটা পনেরো নাগাদ স্টেশন থেকে পর পর এল কয়েকটা গাড়ী। বিশিষ্ট অভ্যাগতরা এলেন সেইসব গাড়ীতে। কম্পাউণ্ডে নেমে গেলাম অতিথি আপ্যায়নে সাহায্য করতে। বিশেষভাবে ঘেরাও করা জায়গার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। মাথায় ভার্নিশ করা চকচকে উঁচু টুপী, গায়ে সাদা ওয়েস্টকোটের ওপর জমকালো ফ্রককোট। চোখে হাড়পিত্তি জ্বালানো চাউনি—যেন নেমন্তন্ন করে এনে কৃতার্থ করেছেন অতিথিদের—দাঁড়ানো ভঙ্গিমায় পরিস্ফুট আত্ম-অহমিকা—যেন ওঁর সমকক্ষ ব্যক্তি এখানে কেউ নেই, একমেবাদ্বিতীয়ম। এই চেহারা দেখেই কিন্তু একজন ছিদ্রান্বেষী সমালোচক রসিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'জেহোভা কমপ্লেক্স কাকে বলে—প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তার আদর্শ নিদর্শন'। অতিথিদের উনিও অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। মাঝে মাঝে অভ্যাগতদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দিচ্ছেন। সবাই যখন এসে গেলেন, উনি গিয়ে উঠলেন একটা উঁচু টিলায়। চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ালেন দেশ বিদেশের মনীষীরা। চ্যালেঞ্জার তখন এমন ভাবে বুক ফুলিয়ে চারপাশে তাকালেন যেন মনে মনে চাইছেন এবার পটাপট হাততালি দিয়ে উঠুক জ্ঞানীগুণীরা। কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হল

না। হাততালির ধার দিয়েও কেউ গেল না। ধড়িবাজ প্রফেসর তৎক্ষণাৎ সরাসরি শুরু করলেন মূল বিষয় নিয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা। গমগমে কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে গেল কম্পাউণ্ড ছাড়িয়েও বহুদূর পর্যন্ত।

বললেন বজ্রনাদ কণ্ঠে—'ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের অনুষ্ঠানে ভদ্রমহিলাদের উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। তাই নিমন্ত্রণ জানাই নি কাউকে। তার মানে এই নয় যে আমি মহিলা বিদ্বেষী। কেন না,' অপরিসীম কৌতুকবোধ এবং কপট বিস্ময় দেখালেন চ্যালেঞ্জার—'এখনও পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব বা সুসম্পর্কে চিড় ধরেনি এতটুকুও। আসল কারণ তা নয়। আজকের এক্সপেরিমেন্ট শেষ পর্যন্ত সফল হবেই—কিন্তু বিপদশূন্য নাও থাকতে পারে। আপনাদের মুখে যে অস্বস্তি ফুটে উঠতে দেখছি এই মুহূর্তে—আশা করি তা এই বিপদের কথা শুনে নয়। খবরের কাগজ থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের খুশী করার জন্যে জানাই—মাটির যে পাহাড় ওদিকে দেখছেন, ওর ওপরেই বিশেষ একটা জায়গায় আপনাদের বসবার ব্যবস্থা আমি করেছি যাতে খুব ভালভাবে দেখতে পান এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে কি ভাবে। আজকের এক্সপেরিমেন্টে ওঁরা যে আগ্রহ দেখিয়েছেন প্রথম থেকেই, একদিক দিয়ে তার সঙ্গে ঔদ্ধত্যের কোনো ফারাক নেই। কিন্তু আজ আর তাঁদের কোনো নালিশ থাকা উচিত নয়—আরামে বসে দু'চোখ ভরে দেখবার সব আয়োজনই আমি করেছি। অপ্রীতিকর কিছু নাও ঘটতে পারে—সেক্ষেত্রে রিপোর্টারদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে আমার ত্রুটি থাকবে না। আর যদি কিছু ঘটে যায়, তাহলেও আয়েশ করে মাটির পাহাড়ে বসে শেষ পর্যন্ত সবকিছু দেখে লিখে নিতে পারবেন—অবশ্য যদি শেষ পর্যন্ত লেখবার মত অবস্থা থাকে।

'সামান্য একপাল মানুষকে খোঁটা দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার প্রাঞ্জল হওয়া দরকার। আমার মত একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে আমার সব কাজের কার্য কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কাউকে অসম্মান করার জন্যে এ কথা কিন্তু বলছি না। ভদ্রভাবে ক'জন কথার মাঝে বাগড়া দেওয়া চেষ্টা করছেন দেখছি। মোষের শিংয়ের চশমাধারী ভদ্রলোককে অনুরোধ করছি, দয়া করে ছাতাটা নাড়াবেন না। (একজনের কণ্ঠস্বর: অভ্যাগতদের সম্পর্কে এ জাতীয় কথা বলা অত্যন্ত আপত্তিকর।) বুঝেছি, 'একপাল মানুষ' মন্তব্যটা অনেকের মনঃপূত হয় নি। তাহলে বরং বলা যাক, আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছেন অসামান্য একপাল মানুষ। কথার কচকচি নিয়ে খামোকা মাথা গরম করে লাভ নেই। ফট করে ভদ্রলোক বাধা দেওয়ায় যে কথাটা বলতে গিয়েও বলা

হল না, এবার তা বলি। যে কাজ নিয়ে আজকের এক্সপেরিমেন্ট, সে সম্পর্কে খুঁটিয়ে রসিয়ে প্রাঞ্জলভাবে আমি একখানা বই লিখেছি। বইটা এখনও প্রকাশিত হয় নি বটে, কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে পারি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটা সাড়া ফেলবে। পৃথিবী সম্পর্কে, পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে এ ধরনের যুগান্তকারী গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয় নি এবং এককথায় বলতে গেলে, এ যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে থাকবে বইখানা। (দারুণ সোরগোল—আসল কথা বলুন না মশাই! ইয়ার্কি মারার জন্যে ডেকেছেন নাকি? ফালতু কথা শুনতে এসেছি মনে করেছেন?) ব্যাপারটা খোলসা করে বলার মুখেই যদি এ রকম বাধা বারবার দেখা যায়, তাহলে কিন্তু হট্টগোল থামিয়ে শান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব আমি—বলাবাহুল্য সে ব্যবস্থা খুব সুখের নাও হতে পারে। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই : ভূ-স্তর ফুটো করে আমি একটা সুড়ঙ্গ বানিয়েছি এবং পৃথিবীর স্নায়ুময় বহিরাবরণে খোঁচা মেরে ফলাফলটা কি হয় দেখব মনস্থ করেছি। কাজটা খুবই সূক্ষ্ম—তার দিয়েছি অধস্তন ব্যক্তিদের ওপর। এঁদের একজন মিঃ পিয়ারলেস জোন্স—কূপখননে বিশেষজ্ঞ বলে নিজেই নিজের নাম জাহির করেন। আর একজন মিঃ এডোয়ার্ড ম্যালোন—আজকের এক্সপেরিমেন্টে তিনিই আমার প্রতিনিধি। সংবেদনশীল ভূপৃষ্ঠের যেটুকু বেরিয়ে আছে—পিন ফোটানো হবে সেইখানে এবং তারপর যা ঘটতে পারে সেটা এখনও বিতর্কের বিষয়। আপনারা দয়া করে যে যাঁর জায়গায় গিয়ে বসুন। এই দুই ভদ্রলোক কুয়োর মধ্যে নেমে গিয়ে শেষবারের মত দেখে আসবেন যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর আমি এইখানে বসে এই টেবিলের ওপর এই সুইচটা টিপে দেব—সম্পূর্ণ হবে এক্সপেরিমেন্ট।'

চ্যালেঞ্জারের বিছুটির জ্বালা ধরানো গাঁক-গাঁক গলার বক্তৃতা শুনলেই হেন শ্রোতা নেই যাঁর হাড়পিত্তি না জ্বলে যায়—পৃথিবীর বহিরাবরণে ছুঁচ ফোটানোর মত তাঁদেরও মনে হয় যেন ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে স্নায়ুর মধ্যে ছুঁচ ফোটানো হচ্ছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। অসন্তোষ এবং ঘোরতর আপত্তির অস্পষ্ট গুঞ্জনে মুখর হল কম্পাউণ্ড—তারই মধ্যে অভ্যাগতরা গিয়ে বসলেন যে যাঁর জায়গায়। ঢিবির ওপর টেবিলের সামনে একা বসে রইলেন চ্যালেঞ্জার—উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল তাঁর কালো কেশর এবং ঘনকৃষ্ণ দাড়ি—অসাধারণ সেই ব্যক্তিত্ব দেখলে বুকের ভেতরটা কেন জানি গুরগুর করে ওঠে। দৃশ্যটা কিন্তু বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পারলাম না আমি আর ম্যালোন। জল্লাদের হুকুম তামিল করতে ত্বরিৎপদে

অন্তর্হিত হতে হল সুড়ঙ্গের ভেতরে। বিশ মিনিট পরে তলদেশে পৌঁছে দড়ি ধরে টেনে তুলে ফেললাম তেরপল—বেরিয়ে পড়ল ধূসর ধুকপুকুনির পার্থিব প্রহেলিকা।

কি ভাষায় বোঝাই সেই বিচিত্র বিস্ময়কে ? রহস্যময় কসমিক টেলিপ্যাথি মারফৎ বৃদ্ধ গ্রহ যেন আগেই খবর পেয়ে গিয়েছে—আর দেরী নেই—এখুনি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অশ্রুতপূর্ব এক এক্সপেরিমেন্ট—কীটাণুকীট মানুষদের বড্ড বেশী আস্কারা দেওয়া হয়ে গিয়েছে—রগড় দেখতে চায় বসুন্ধরার গায়ে আলপিন ফুটিয়ে। উন্মুক্ত অংশটুকু তাই যেন টগবগ করে ফুটছে প্রচণ্ড রাগে ! বড়বড় ধূসর বুদবুদ চড়চড় শব্দে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে এবং ওপরে উঠেই ফেটে যাচ্ছে বোমাফাটার শব্দে। চামড়ার নিচেই ছোটবড় কোষের মত বস্তু এবং বাতাসের ফাঁকগুলো পর্যন্ত বিষম উত্তেজনায় যেন অস্থির হয়ে উঠেছে—ঘনঘন পরস্পরের গায়ে লেগে গিয়েই আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মৃদু মন্দ ঢেউয়ের মত যে স্পন্দন আগে দেখেছিলাম ধূসর বস্তুটার ওপর দিয়ে সুসমছন্দে বয়ে যেতে—এখন তা অনেক দ্রুত এবং প্রচণ্ড। ঘন কালচে-লাল একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে বিচিত্র বস্তুটার ওপরকার আবরণের ঠিক নিচে—ধমনী-শিরা-উপশিরার পেঁচালো শাখাপ্রশাখা দিয়ে যেন ভলকে ভলকে ছুটছে গাঢ় বর্ণের সেই তরল বস্তু। প্রাণের স্পন্দন পরিস্ফুট পূর্ণমাত্রায়। ভারী বাতাসে উগ্রকটু গন্ধ—মানুষের ফুসফুস সে হাওয়ায় বেশীক্ষণ টিঁকতে পারে না।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছি বর্ণনাতীত সেই দৃশ্যের পানে, এমন সময়ে নিঃসীম আতংকে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কানের কাছে বিকট চেঁচিয়ে উঠল ম্যালোন 'মাই গড, জোন্স ! এদিকে ছাখো !'

পলকের জন্যে সেদিকে চেয়েছিলাম। পরমুহূর্তে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে লাফ দিয়ে লিফটে চড়ে বললাম রুদ্ধশ্বাসে—'চলে এসো ! বাঁচতে যদি চাও, পালাও এখান থেকে !'

চকিতের জন্যে দেখেছিলাম ভয়াবহ সেই দৃশ্য। দেখেছিলাম সুড়ঙ্গের তলার দিকের দেওয়াল ধূসর প্রহেলিকার মতই স্পন্দিত হচ্ছে একই ছন্দে—একই তালে। ধূসর রহস্যের অতি-ব্যস্ততা সঞ্চারিত হয়েছে পাথুরে দেওয়ালেও—আসন্ন যন্ত্রণাশঙ্কায় শঙ্কিত যেন নীরস দেওয়ালও—ধুকধুক স্পন্দনের ছন্দে তাই মুহুর্মুহু সঙ্কুচিত ও প্রসারিত পাতাল-কূপের তলদেশ। কম্পনের ধাক্কা গিয়ে লাগছে বরগা দুটো দেওয়ালের যে গর্তে ঢোকানো—

সেখানেও। নড়াচড়ার ফলে খসে এসেছে বরগা—ইঞ্চি কয়েক আর বাকী—স্পন্দনের ঢেউ আর কয়েকবার আছড়ে পড়লেই খসে পড়বে। তখন আর ইলেকট্রিক রিলিজের দরকার হবে না—ছুঁচোলো ফলা আপনা থেকেই আমূল ঢুকে যাবে ধরার বুকে। সে ঘটনা ঘটবার আগেই ভূগর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের দুজনকেই। আট মাইল গভীর পাতাল রন্ধ্রে থাকতে থাকতেই যদি আরো প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হয়ে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। কখন কোন মুহূর্তে অসাধারণ সেই তড়কা শুরু হবে—তা জানি না। কি মহা বিপর্যয় আরম্ভ হবে, তাও জানি না—শুধু জানি কল্পনাতীত কম্পনটা শুরু হওয়ার আগেই এই নরককুণ্ড থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের। উন্মাদের মত তাই ভূপৃষ্ঠ অভিমুখে ধেয়ে চললাম দুই মূর্তিমান।

দুঃস্বপ্নসম সেই উর্ধ্বযাত্রার স্মৃতি কোনদিনই স্মৃতিপটে ফিকে হবে না—দুজনের কেউই মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারব না কি ভাবে সেদিন প্রাণহাতে নিয়ে দুজনে পালিয়ে এসেছিলাম পৃথিবীপৃষ্ঠে। নক্ষত্রবেগে উড়ে চলেছিল যেন লিফটের পর লিফট—তা সত্ত্বেও প্রতিটি সেকেণ্ডকে মনে হয়েছে ঘণ্টার মত সুদীর্ঘ। সাঁ-সাঁ ঝন-ঝন শব্দে পৌঁচেছি একটা চাতাল থেকে আরেকটা চাতালে—এক লিফট ছেড়ে লাফিয়ে পা দিয়েছি আরেক লিফটে। তবুও মনে হয়েছে জীবন নিয়ে আর বুঝি পৌঁছোতে পারব না সূর্যের আলো আর চাঁদের কিরণে ধোওয়া মধুময় পৃথিবী পৃষ্ঠে। প্রতিবারেই নতুন লিফটে লাফিয়ে উঠে সুইচ টিপে দিয়ে নিবিড় উৎকণ্ঠায় ইস্পাতের জালতির ফাঁক দিয়ে তাকিয়েছি রন্ধ্রমুখে—ক্ষীণ আলোক কণা পরিসরে বৃদ্ধি পেয়েছে একটু একটু করে, আশার আলোয় উদ্দীপ্ত হয়েছে নিরাশার তিমিরে আচ্ছন্ন অন্তর। আলোক বিন্দু অবশেষে বড় বৃত্ত হয়ে উঠে স্পষ্ট করে তুলেছে নীল আকাশকে—রন্ধ্রমুখের ইঁটের গাঁথনি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে দৃষ্টিপথে—তারপরেই কামানের মুখ থেকে গোলা বেরিয়ে আসার মত ছিটকে গিয়ে থমকে গিয়েছে শেষ চাতালে—লাফ দিয়ে নেমেছি বাইরে—পরমানন্দে জ্যামুক্ত তীরের মত ছিটকে গিয়েছি নরম সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারেনি। বুড়ি ছুঁয়ে পালিয়ে আসার মত অবস্থা হল পরের মুহূর্তে। তিরিশ কদমও যাইনি—পাতাল-রন্ধ্রের তলদেশে খসে পড়ল আমার সূচীমুখ লৌহদণ্ড—আমূল গেঁথে গেল ধরিত্রী মায়ের স্নায়ুগ্রন্থিতে এবং উপস্থিত হল চরম মুহূর্ত।

ঠিক কি ঘটেছিল অবিস্মরণীয় সেই মুহূর্তে, তা চোখ খুলে দেখবার মত

অবস্থা আমার বা ব্যালোনের কারুরই ছিল না। বিক্ষুব্ধ-সাইক্লোনের আচমকা ঝাপটে যেন ঠিকরে গিয়েছিলাম দুজনে ঘাস জমির ওপর দিয়ে—বরফ ছাওয়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে পাথর যে ভাবে হড়কে গড়িয়ে পাকসাট খেতে খেতে ছুটে যায় দামাল ঝড়ের উৎপাতে—ঠিক সেইভাবে কে যেন আমাদের শূন্যে তুলেই আছড়ে দিয়ে গড়িয়ে দিল ঘাসজমির ওপর দিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কান যেন ফেটে গেল একটা অতি-ভয়ংকর বুকফাটা ভীষণ আর্ত চীৎকারে। বীভৎস সেই চীৎকার পৃথিবীর মানুষ এর আগে কখনো শোনেনি। সেদিন সেখানে যাঁরা হাজির ছিলেন, বিকট চীৎকারে যাঁদের অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল—অশ্রুতপূর্ব সেই হাহাকার ধ্বনিকে সম্যক-ভাবে ব্যাখ্যা করার ভাষা আজও খুঁজে পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। সে চীৎকার একবারই শোনা গিয়েছিল এবং ঐ একটিমাত্র কদাকার চেঁচানির মধ্যেই যুগপৎ ফুটে উঠেছিল ক্রোধ, যন্ত্রণা এবং মহান প্রকৃতির দলিত সম্ভ্রমবোধ। হাজার সাইরেন ধ্বনির সম্মিলিত নির্ঘোষের মত বর্ণনাতীত সেই চীৎকার পুরো এক মিনিট ধরে বিরাম-বিহীন ভাবে আছড়ে পড়েছিল অনারণ্যের প্রতিটি কানে—নিথর গ্রীষ্মের আকাশ চিরে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি হয়ে ধেয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ উপকূলের দিকে দিকে—চ্যানেল পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল প্রতিবেশী ফরাসীদের কর্ণরন্ধ্রেও। পৃথিবীর ইতিহাসে সে চীৎকারের সমতুল্য চীৎকার আর নেই— কারণ সে চীৎকার আহত ধরিত্রীর আর্ত নিনাদ।

একে মাটির ওপর দিয়ে পাকসাট খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছি, তার ওপরে কানের পর্দায় ঐ অত্যাচার—কানে তালা লেগে গেল, মাথা ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে। দেখবার শোনবার সমস্ত বোধশক্তি লোপ পেল কিছুক্ষণের জন্যে। অত্যাশ্চর্য দৃশ্যটার বর্ণনা শুনেছিলাম পরে—অন্যের মুখে।

ভূগর্ভ থেকে প্রথমেই উৎক্ষিপ্ত হল লিফটগুলো। দেওয়াল থেকে আলগাভাবে ঝুলছিল কেবল লিফটগুলোই—অন্যান্য যন্ত্রপাতি সাঁটা ছিল দেওয়ালের গায়ে। তাই বিস্ফোরণের ধাক্কায় দেওয়ালের যন্ত্র দেওয়ালেই লেগে রইল—কিন্তু তলা থেকে ধাক্কা খেয়ে চোদ্দটা লিফট কামান নিক্ষিপ্ত গোলার মত সটা-সট্ বেরিয়ে এসে শূন্যে উড়ে গেল একে একে। সে দৃশ্য নাকি দেখবার মত। ছররা বন্দুক থেকে পরপর লোহার গুলি ছুঁড়লে যেমন প্রতিটি গুলিই শূন্যে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে উড়ে যায়—ঠিক সেই ভাবেই চোদ্দটা লোহার খাঁচা একে একে শূন্যে ছিটকে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওয়ার্দিং জেটির কাছে সমুদ্র জলে—আরেকটা চিকেস্টারের কাছে একটা ক্ষেতের মাঝে। একটা খাঁচার পেছনে আর একটা খাঁচার উড়ে যাওয়ার সেই দৃশ্য যাঁরা দেখে-

ছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন অমন দৃশ্য কালেভদ্রে কেন, কস্মিন কালেও দেখা যায় না। সুনীল বর্গ ভেদ করে প্রশান্ত অভিযানে উড়ে চলেছে চোদ্দটা লোহার খাঁচা—ভাবতে পারেন?

উষ্ণ প্রস্রবণটা দেখা দিল এর ঠিক পরেই। চোদ্দটা লিফট চোদ্দ দফায় শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পরেই আলকাতরা ধরনের বা ঝোলাগুড়ের মতন চটচটে অতি জঘন্য একটা তরল বস্তু বিপুল ফোয়ারার আকারে গেল ধেয়ে প্রায় দুহাজার ফুট ওপরে। একটা অনুসন্ধিৎসু এরোপ্লেন ঠিক সময়ে উড়ে এসেছিল মাথার ওপর। নিমেষ মধ্যে যেন বিমানবিধ্বংসী কামানের শিকার হতে হল বেচারীকে—প্রাণ নিয়ে পাইলট বেচারী মাঠের মধ্যেই উড়োজাহাজ নামিয়ে ফেলল বটে—কিন্তু দেখা গেল মেশিন এবং মানুষ উভয়েই অতি কুৎসিত সেই নোংরা তরল পদার্থে প্রায় সমাধিস্থ হবার উপক্রম হয়েছে। অতি তীব্র, দুর্গন্ধময় সেই বীভৎস বস্তুটা বসুন্ধরার প্রাণশক্তির আধার রুধির প্রবাহ কিনা সে বিষয়ে মতান্তর আছে। কেন না, বার্লিন বৈজ্ঞানিক মহল এবং প্রফেসর ড্রিসিঙ্গারের মতে আমেরিকায় ভোঁদর জাতীয় বা বেড়াল জাতীয় 'স্কাঙ্ক' চতুষ্পদের মত আত্মরক্ষার্থে পূতিগন্ধময় দেহরস পিচকিরির মত নির্গমনের ব্যবস্থা হয়ত ধরিত্রীর জঠরেও আছে—চ্যালেঞ্জারের মত হানাদারদের খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্যে শেষ মুহূর্তে বসুন্ধরা মা সেই বস্তুটিই অবিরল ধারায় ছড়িয়ে দিয়েছেন কীটাণুকীট দু'পেয়ে উৎপাতদের অঙ্গে। পালের গোদা উৎপাতটি কিন্তু রক্ষে পেয়ে গেলেন আশ্চর্যভাবে—ঢিবির মাথায় সিংহাসনে বসে সানন্দে দেখলেন সফল এক্সপেরিমেন্টের আশ্চর্য ফল—পূতিগন্ধময় বস্তুটার একটা ফোঁটাও পড়ল না তাঁর গায়ে—কিন্তু পুরোপুরি নেয়ে উঠলেন খবরের কাগজের রিপোর্টার বেচারীরা—ফোয়ারার ঠিক নিচেই ওঁরা বসেছিলেন—গায়ের সেই দুর্গন্ধে নাকি কয়েক হপ্তা পর্যন্ত অন্নপ্রাশনের আহার পর্যন্ত উঠে আসার উপক্রম হয়েছিল আশপাশের মানুষদের এবং ভদ্রসমাজে বিচরণ বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিন। মড়াপচা সেই বিকট গন্ধস্রাব ফোয়ারার আকারে হাওয়ায় ভর করে ভেসে গিয়েছিল দক্ষিণ দিকে এবং মজা দেখার আশায় জমায়েত বিপুল জনতার শিরে বর্ষিত হয়েছিল অঝোরধারে। কেউ মরেনি, কেউ জখম হয়নি। বাড়ী-ঘর-দোর ছেড়েও কেউ পালায়নি। কিন্তু কোনো বাড়ীতেই কেউ আর তিষ্ঠোতে পারেনি। নাক টিপে ধরেও ভয়ানক সেই দুর্গন্ধ থেকে নাকি পরিত্রাণ পাওয়া যায়নি বহুদিন পর্যন্ত। প্রতিটি দেওয়াল, প্রতিটি ছাদ, প্রতিটি জানলায় পূতিগন্ধময় স্বাক্ষর থেকে গিয়েছিল সেই পরম লগ্নের।

রন্ধ্রপথ বন্ধ হওয়া শুরু হল এর পরেই। প্রকৃতির নিয়মই হল নিচ থেকে ক্ষত মুখ নিরাময় করা। প্রাণধারায় সূচীবিদ্ধ পৃথিবীও বিদীর্ণ ক্ষত বন্ধ করল অতি দ্রুতবেগে। আতীক্ষ্ণ শব্দলহরী প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলে এক-নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে উঠে এল রন্ধ্রপথ বেয়ে। দেওয়ালে দেওয়াল লেগে ফুটো বন্ধ হয়ে যাওয়া আরম্ভ হয়েছে নিচের দিক থেকে—কর্ণবধিরকারী আতীব্র শব্দের পর শব্দ ভূগর্ভ থেকে অজস্র প্রতিধ্বনি হয়ে ক্রমশঃ উঠে আসছে নিচ থেকে ওপরে। অবশেষে কানের পর্দা যেন বিকল করে দিয়ে বিপুল শব্দে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে জুড়ে গেল রন্ধ্রমুখের ইঁটের তৈরী বৃত্তাকার গাঁথনি। ভূমিকম্পের মত একটা কম্পন তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে গেল চারপাশে। কাঁপুনির ঠেলায় ধ্বসে পড়ল মাটির পাহাড়। আর, সদ্যলুপ্ত ছিদ্র পথের ঠিক ওপরেই গড়ে উঠল পঞ্চাশ ফুট উঁচু লোহা-লক্কর আর বাজে জিনিসের একটা ছোট্ট পিরামিড। চ্যালেঞ্জারের আজব এক্সপেরিমেন্ট শুধু যে পূর্ণ পরিণতিতেই পৌঁছোলো তা নয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে কবরস্থ হয়ে রইল চিরকালের মত। পরে, রয়াল সোসাইটি উদ্যোগী হয়ে চতুষ্কোণ সূচ্যগ্র স্তম্ভ বানিয়ে দেয় ঠিক সেই জায়গাটিতে। এই স্তম্ভটি না থাকলে আমাদের বংশধরেরা কোনদিন অত্যাশ্চর্য ঘটনাস্থলটি শেষ পর্যন্ত খুঁজেও পাবে কিনা সন্দেহ।

অতি-মনোহর বর্ণাঢ্য শেষ দৃশ্যের অবতারণা ঘটল এর ঠিক পরেই। অত্যাশ্চর্য প্রায়-অলৌকিক কাণ্ডকারখানার উপর্যুপরি আবির্ভাবের পরেই নিথর নৈঃশব্দ্য নেমে ছিল রবাহুত, নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত সকলের মধ্যেই। দূরের এবং কাছের অগুন্তি মানুষ টুঁ শব্দটিও করতে পারে নি অনেকক্ষণ। বুদ্ধিবৃত্তি অবশ হয়ে গিয়েছিল। বিচার শক্তি লোপ পেয়েছিল। আস্থা ছিল না দর্শন-শক্তির ওপর, সন্দেহ হয়েছিল শ্রবণ যন্ত্রের সুস্থতা সম্বন্ধেও। তারপর একটু একটু করে ফের জাগ্রত হয়েছিল মগজের বোধ-শক্তি, একটু একটু করে বুঝতে পেরেছিল পরের পর ঘটে যাওয়া অনৈসর্গিক ব্যাপারগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য। ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়েছিল কেন ঘটল এসব, ঘটালেন কে এবং কি ভাবে। সেই মুহূর্তেই নিমেষ মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মত আপামর জনসাধারণের চিত্তাকাশে ঝলসে উঠল অনন্যসাধারণ এক বৈজ্ঞানিকের অসামান্য কীর্তি—অন্তর দিয়ে প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করল অতি-মানুষ এই মহাবিজ্ঞানীর ধ্যানধারণা কত উচ্চ স্তরের, কি পরিমাণ সুদূরপ্রসারী এবং কতখানি নিষ্ঠা, প্রত্যয় ও বিস্ময়কর প্রতিভার সমন্বয় ঘটিয়ে এই মাত্র সম্ভব করলেন এক অসম্ভব এক্সপেরিমেন্টকে

—প্রতিভাত করলেন এক মহাসত্তাকে। আবেগে বিহ্বল হয়ে জনতা ছুটে এল চ্যালেঞ্জারের পানে। মাঠময়দান, টিলা, পাহাড়···দিগন্তব্যাপী কালোমাথার জনতার প্রত্যেকেই ঊর্ধ্বমুখে বিপুলকণ্ঠে অভিনন্দন জানাল তাঁকে। টিবি সিংহাসনে বসে উনি ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন অগুন্তি মানুষ ঘিরে ধরেছে তাঁকে—সহস্রকণ্ঠে প্রত্যেকেই জয়গান গাইছে তাঁর। হাতে হাতে উড়ছে গণনাতীত রুমাল। সে দৃশ্য আজও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে আমার স্মৃতি পটে। আজও চোখ বন্ধ করলে আমি সুস্পষ্ট দেখতে পাই নয়নাভিরাম সেই দৃশ্য। দেখতে পাই বিপুল হর্ষধ্বনির মাঝে আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। স্তিমিত চোখে নিরীক্ষণ করলেন উদ্বেলিত জনগণকে। মুখের পরতে পরতে ফুটে উঠল বিখ্যাত সেই মৃদু হাসি—নিজের প্রতিভা সম্পর্কে সম্যক সচেতনতার স্বাক্ষর। বাঁ হাত ন্যস্ত পাছার ওপর। ডান হাত অদৃশ্য ফ্রককোটের বুকের মধ্যে। স্মরণীয় সেই আলেখ্য কোনদিনই মুছে যাবে না পৃথিবীর ইতিহাস থেকে আরও একটি কারণে। পটাপট ক্যামেরার আওয়াজ শুনলাম আশে পাশে। ধারে কাছে দূরে সর্বত্র দেখলাম ক্যামেরার লেন্সে রোদের ঝলসানি। যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে মাঠে—এমনি ভাবে পটাপট শব্দে অজস্র ক্যামেরায় ধরে রাখা হল মহান দৃশ্যটা। গম্ভীরবদনে ঘুরে ঘুরে আট দিকের সব কটি মানুষকে তিনি মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানালেন—জুন মাসের সোনালী-রোদ সোনা বর্ষিয়ে চলল তাঁর উন্নত শিরে। মানুষের ইতিহাসে যেন সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেল চ্যালেঞ্জারের নাম এবং কাহিনী। চ্যালেঞ্জার মানে সেই মানুষ যিনি পথিকৃৎ, চ্যালেঞ্জার মানে সেই মানুষ যাঁকে জননী বসুন্ধরা পর্যন্ত চিনতে এবং জানতে বাধ্য হয়েছেন কোটি কোটি মানুষের মধ্যে থেকে।

উপসংহারে বলব আর একটি কথা। নতুন করে যদিও বলার নেই, সকলেই জানেন এক্সপেরিমেন্টের প্রতিক্রিয়া টের পাওয়া গিয়েছিল পৃথিবীর সর্বত্রই। পিন ফোটানোর জায়গায় যে ভাবে বিকট চেঁচিয়েছে আহত পৃথিবী, সেভাবে অন্যত্র চেঁচায়নি ঠিকই। কিন্তু সত্তা যে তার একই, সে প্রমাণ রেখে গিয়েছে পৃথিবীব্যাপী বিবিধ আচরণে। যেখানে যত ফাঁক ফোকর এবং আগ্নেয়গিরি আছে—তার প্রতিটির মধ্যে দিয়ে সশব্দে বিরক্তি প্রকাশ করেছে পৃথিবী। সাংঘাতিক ভাবে তড়পেছিল আইসল্যাণ্ডের হেকলা—মহাবিপর্যয়ের আশংকায় প্রাণ উড়ে গিয়েছিল সেখানকার বাসিন্দাদের। চুড়ো উড়ে গিয়েছিল ভিসুভিয়াসের। লাভার স্রোত বেরিয়ে এসেছিল এটনার মুখ দিয়ে এবং ইটালির যাবতীয় আঙুরের ক্ষেত ধ্বংস

করার জন্যে ইটালিয়ান আদালতে পাঁচলক্ষ লিরা খেসারতের মামলা আবা হবে ঠিক হয়েছে চ্যালেঞ্জারের বিরুদ্ধে। এমন কি মেক্সিকো আর মধ্য আমেরিকাতেও পৌঁছে গিয়েছিল পাতাল দেবতার আত্যন্তিক ক্ষোভের একাধিক চিহ্ন। স্ট্রম্বলির আর্তনাদে মুখর হয়ে গিয়েছিল পুরো পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল। দুনিয়া জুড়ে আলোচনা চলুক—এ উচ্চাশা মানব জাতির রক্তে আছে। কিন্তু গোটা দুনিয়াটা গলা ফাটিয়ে চেঁচাক—এ উচ্চাশার অধিকারী কেবল চ্যালেঞ্জারই। □

সমাপ্ত